বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে

বুদ্ধদেব গুহ

BanglaBook.org

দশ বছর বয়স থেকে শিকারে যাচ্ছেন বুদ্ধদেব গুহ। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ 'জঙ্গলমহল'-এর গল্প শুনিয়েই। অরণ্য তাঁর বহু জনপ্রিয় গল্প-উপন্যাসের প্রধান পটভূমি। তবে, অলঙ্কার-নির্মাণের স্বার্থে যেমন খাঁটি সোনাতেও মেশাতে হয় খাদ, তেমনই সে-সব রচনাতে স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত হয়েছে কিছু-কিছু কল্পনা। এই প্রথম এমন-এক রচনা উপহার দিলেন বুদ্ধদেব গুহ, যা সম্পূর্ণ নিখাদ। এ-রচনাও অরণ্যকেন্দ্রিক, তবু প্রতিটি পটভূমি অবিকল, প্রতিটি চরিত্র বাস্তব। আসাম-বাংলা-বিহার-ওড়িশার যে-সমূহ বনাঞ্চল ফিরে-ফিরে এসেছে তাঁর নানান সৃষ্টিতে, সেই অপরূপ পটভূমিতে তাঁর শিকারী-জীবনের অনুষঙ্গে জড়ানো স্মৃতি-অভিজ্ঞতার এক উজ্জ্বল উদ্ধার এই 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে'।

শিকার-জীবনের স্মৃতি, তাই অনিবার্যভাবেই এসেছে তাঁর শিকারী বাবার কথা, যাঁর স্নেহে-প্রশ্রয়ে বুদ্ধদেব গুহর বন্দুকে হাতেখড়ি, শিকারের মধ্য দিয়ে দেশ-মাটি ও আপামর মানুষের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের দিগন্তকে যিনি করে দিয়েছিলেন উন্মুক্ত। এসেছে তাঁরই বিভিন্নবয়সী এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের বন্ধুবান্ধবদের কথা। অন্তরঙ্গ উজ্জ্বলতায় চিত্রিত সেইসব মানুষের বর্ণাঢ্য মিছিলে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর অগ্রজ ডঃ কিরণ বসু, কোডারমার যুগলপ্রসাদ, আসামের গৌরীপুরের হাতি-বিশেষজ্ঞ কুমার প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া, ইনকাম ট্যাক্সের বড়সাহেব কেনেল এডওয়ার্ড জনসন, দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্টের পেশাদার শিকারী, ওড়িশার কালাহাণ্ডির রামচন্দ্র দণ্ডসেনা, ডুয়ার্সের চা-বাগানের বহু সাহেব-ম্যানেজার। এ-ছাড়াও রয়েছেন আসামের ধুবড়ির আবু ছাত্তার— একদিনে বহু আত্মীয়কে গুলি করে মারার অপরাধে যাঁর ফাঁসি হয়; হাজারিবাগের বন্দুকের দোকানি মহম্মদ নাজিম— যাঁর আদলে 'মাধুকরী'র সাবীর মিঞা। রয়েছেন গোপাল সেন, সুব্রত চ্যাটার্জি, কাড়ুয়া প্রমুখ অনেকে।

রাজা-রাজড়া, সাহেব-সুবো থেকে দরিদ্রতম মানুষের এই সঙ্গস্মৃতির মধ্য দিয়ে গোটা ভারতের শাশ্বত নিটোল এক সত্যরূপ যেন আবিষ্কৃত এই অসামান্য গ্রন্থে।

শিকার-জীবনের স্মৃতিকথা, তবু শিকার যেন উপলক্ষ। লক্ষ্য: প্রকৃতির অন্দরমহলেরও কিছু আশ্চর্য মানুষের দুর্লভ সাহচর্যের 'মনমৌজী জবানে' বর্ণনা। সে-বর্ণনার গুণেই এ-গ্রন্থ আদ্যন্ত সরস ও উপভোগ্য।

ISBN 81-7066-192-7

বুদ্ধদেব গুহ পেশাগত দিক থেকে পূর্বভারতের একজন ব্যস্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অথচ একইসঙ্গে এই সময়ের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিকদের অন্যতম। দশ বছর বয়সে শিকার শুরু করেছিলেন। কিন্তু এখন একেবারেই করেন না। এবং শিকারী বলে পরিচিত কখনও হতে চান না। তবে বন-জঙ্গল খুব ভালবাসেন এবং প্রায় বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। কিছুকাল আগেই আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে ঘুরে এসেছেন।

বহু বিচিত্র ও ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতাময় তাঁর জীবন। ইংল্যান্ড, ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশ, কানাডা, ইউ এস এ, হাওয়াই, জাপান ও থাইল্যান্ড এবং পূর্ব আফ্রিকা তাঁর দেখা। পূর্বভারতের বন-জঙ্গল, পশুপাখি ও বনের মানুষদের সঙ্গেও তাঁর সুদীর্ঘকালের নিবিড় ও অন্তরঙ্গ পরিচয়। সাহিত্য-রচনায় মস্তিষ্কের তুলনায় হৃদয়ের ভূমিকা বড়ো—এই মতে বিশ্বাসী তিনি। 'জঙ্গলমহল'—তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। তারপর বহু উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ। অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর বিতর্কিত উপন্যাস 'মাধুকরী' দীর্ঘকাল ধরে অন্যতম বেস্ট সেলার। ছোটদের জন্য প্রথম বই—'ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে'। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন, ১৯৭৭ সালে। প্রখ্যাতা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ঋতু গুহ তাঁর স্ত্রী। সুকণ্ঠ বুদ্ধদেব গুহ নিজেও একদা রবীন্দ্রসংগীত শিখতেন। পুরাতনী টপ্পা গানেও তিনি অতি পারঙ্গম। টি-ভি এবং চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে তাঁর একাধিক গল্প-উপন্যাস।

প্রচ্ছদ □ সুব্রত চৌধুরী

বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে

বুদ্ধদেব গুহ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আনন্দ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম সংস্করণ বইমেলা ১৯৮৯
সপ্তম মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৫

© বুদ্ধদেব গুহ
অলংকরণ নির্মলেন্দু মণ্ডল

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-81-7066-192-4

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

BANJYOTSNAR SABUJ ANDHAKARE
[Novel]
by
Buddhadeb Guha

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

২০০.০০

লেখকের নিবেদন

ভূমিকা হয়তো না লিখলেও চলতো কিন্তু কিছু অনভিজ্ঞ মানুষের তির্যক এবং হয়তো কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রসূত মন্তব্যে বিরক্ত হয়ে আছি বলেই এই ভূমিকার প্রয়োজন ঘটলো।

অল্প ক'দিন আগে ইংল্যাণ্ডের স্পষ্টবক্তা প্রিন্স ফিলিপ শিকার এবং শিকারীদের প্রশস্তি করে কিছু বলে ফেলে বড়ই বেকায়দায় পড়ে গেছিলেন। তিনিই তো আবার ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ডের বড়কর্তাও।

শিকারের ও শিকারীদের নামোচ্চারণ পর্যন্ত এখন বড় পাপের। কিন্তু এই বীরপুঙ্গবদের দেশে একসময় শিকারীরাই বীরের পুজো পেতেন। শিকারীরা প্রজাতি হিসেবেও এখন বোধহয় পাণ্ডা ভাল্লুকের চেয়েও অনেকই বেশি বিপন্ন। তবু শিকার বা শিকারীদের স্বপক্ষে কথা বলার মতো সাহসী ও সৎ মানুষ আজকাল বিরল।

অথচ শিকার, মানুষের আদিমতম নেশা। শিকার করেই আদিম মানুষ জীবন ধারণ করতো। যে-কোনো দেশেই লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি বিভিন্ন গৃহপালিত প্রাণী, জন্তু এবং পাখি, নদী এবং সমুদ্রের লক্ষ লক্ষ টন মাছ সভ্য শিক্ষিত মানুষে মেরে খাচ্ছে প্রতিদিন। তাতে কোনো অপরাধবোধ, কারো মাথাব্যথা নেই, অপরাধ শুধু সেই সংখ্যার তুলনায় নস্যিসংখ্যক বন্য-পশু শিকারের বেলাতেই।

ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ডের পত্তন হয়েছিলো সত্তরের দশকে পৃথিবীর পশুপাখিদের সমুদয় বিপন্ন প্রজাতিদের বংশ যাতে নির্মূল না হয় তা দেখার জন্যে। "কনসার্ভেশন" এখন আধুনিক মানুষের নেশা হয়ে যে দাঁড়িয়েছে এটা অত্যন্ত সুখের কথা। কারো কারো পেশাও হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটা দুঃখের।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আইনশৃঙ্খলার এবং তার সুষ্ঠু প্রশাসনেরও মান বিভিন্ন বিভিন্ন। আমাদের দেশে আইন শুধু কেতাবেই লেখা থাকে। তার উপর আইন কানুনের রকমসকমও "শিবঠাকুরের দেশের আইন কানুনেরই" মতো। শতাধিক বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র বলে গেছিলেন "আইন! সে তো তামাশামাত্র! কেবলমাত্র বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সেই তামাশা দেখিতে পারে।" এ কথা আজকেও সমান সত্য। তা যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন!

নিয়মমাফিক এবং শৃঙ্খলা মেনে শিকার করলে কোনো প্রজাতিরই বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো না। কিন্তু শৃঙ্খলা ও কানুন মানতে হলে কোটাল, বনপালক এবং শিকারী এই তিনজনের কাছ থেকেই সমান দায়িত্বজ্ঞান এবং আত্মসম্মানজ্ঞান প্রত্যাশার ছিলো। সে প্রত্যাশা সফল এতোদিনেও হয়নি বলেই অনেক প্রজাতি দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বন-বিভাগের জ্ঞাতসারেই এবং অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদেরও মদতে

BanglaBook.org

চোরা-শিকারীদের হাতে সত্যিই নষ্ট হতে বসেছিলো।

ইউ. এস. এ-তে, অস্ট্রেলিয়াতে, কানাডাতে, ইংল্যাণ্ডে, আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে এখনও শিকার করা হয়। আইন মেনেই ১৯৭৯ সালে আমি যখন পূর্ব-আফ্রিকার এনগোরোংগোরো ন্যাশনাল পার্ক দেখতে গেছিলাম তখন পাহাড়ের উপরের সরকারী লজ-এ রাতে পর্যটকদের "ওয়াইল্ডবীস্ট" বা "ন্যু" মেরে তার মাংসের "স্টেক" খেতে দেওয়া হয়েছিলো ডিনারে। এবং তা শিকার করেছিলেন এনগোরোংগোরোর গেম-ওয়ার্ডেন স্বয়ং।

তার মানে, কিছু প্রজাতির সংখ্যা যখন কমে আসছে, কিছু প্রজাতির সংখ্যা তেমন 'প্রিসার্ভেশনের' কারণে বেড়েও গেছে। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ইকোলজিকাল ব্যালান্স, মানুষের একসময়ের বেহিসাবী শিকার, বনবিনাশ এবং পরবর্তীকালের বাড়াবাড়ি রকমের প্রিসার্ভেশানের ফলেও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

ভারতবর্ষে বন্য-প্রাণী রক্ষার জন্যে যে স্বাস্থ্যকর ও আন্তরিক দরদ আমরা আজকে লক্ষ করছি সেই দরদের ছিটেফোঁটাও যদি জাতির চরিত্র, সততা, গন্তব্যহীনতা, দিনদুপুরে ডাকাতির মতো দু-কান-কাটা নির্লজ্জ দুর্নীতি, সরকারী বেসরকারী মহলের পুকুর-চুরি বন্ধ করার জন্যে দেখা যেত তবে হয়তো ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকতো। যে দেশের মানুষই জানোয়ারের পর্যায়ে নামিয়ে আনলো নিজেদের গত বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছরে (আমাদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের অনেকই ধন্যবাদ) তাদের জানোয়ার বাঁচানোর চেষ্টাতে সচেষ্ট দেখলে একটু অবাক হতে হয় বইকী।

এই প্রসঙ্গর শেষ নেই। এই ভূমিকাতে তার প্রয়োজনও নেই।

"বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে"তে বনে-পাহাড়ে, ঝিলে-নদীতে এক পুরুষালী খেলায়-মাতা বিভিন্ন বয়সী কিছু মানুষের সারল্য ও চাপল্যময় দিনগুলির স্মৃতিচারণ করেছি মাত্র। আমার বাবা আমাকে দশ বছর বয়সে প্রথম শিকারে নিয়ে যান মায়ের গভীর আপত্তি সত্ত্বেও। তারপর প্রায় তিরিশ বছর একাদিক্রমে বাবা এবং বাবার বিচিত্র সব বন্ধুদের সঙ্গ পাই। আমার বন্ধুদেরও। সেই সঙ্গর চেয়ে অনেক বড় কথা অবশ্য প্রকৃতির সঙ্গ।

এ কথা একশবার বলব যে শিকারের সখ না থাকলে বন্দুক রাইফেল হাতে না থাকলে যেমন সব নিভৃত প্রান্তরে, বনের বুকের কোরকের ভিতরের কোরকে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছিলাম তা কখনওই পারতাম না। এই চমৎকার দেশের আশ্চর্য সরল, অতিথিবৎসল, ঈশ্বর-বিশ্বাসী এবং অতি গরীব দেশবাসীদের অত্যন্ত কাছ থেকে দেখার সুযোগ হতো না। অতি-সাধারণ সব মানুষদের সঙ্গে এক ধরনের একাত্মতা, ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠতো না। শিকার করতে গিয়ে দেশের ও দেশবাসীর সম্বন্ধে আমার মনে যে মমত্ববোধ, সমবেদনা, সমব্যথা জেগেছে সেই বোধই পরবর্তী জীবনে এদেশীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও ভোটরঙ্গর তীব্র সমালোচক করে তুলেছে আমাকে। এ রাজনীতি দেশের বা দেশের সাধারণ মানুষের ভালোর রাজনীতি নয়, নিজ নিজ দল, এবং নিজ নিজ গদী দেশের দশের মূল স্বার্থ বিসর্জন দিয়েও অটুট রাখার রাজনীতি। অথচ এই সত্য ও প্রলয়ংকরী কথাটা বলার সাহস এই স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বাধীন মেডিয়ারও নেই। সকলেই মনে হয় চোখ বুজে আছেন। নিজ নিজ স্বার্থে মগ্ন হয়ে। চোরা-শিকারীদের চেয়েও এই দেশের ভণ্ড, মিথ্যাচারী, বহুরূপী ভোট-চোরাদের অপরাধ অনেকই বেশি। অথচ শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা, ভি-ভি-আই-পি জীবনযাত্রার অধিকার (কারো কারো জন্মগত) তাঁদেরই কুক্ষিগত। দেশের মানুষ আর দেশ জাহান্নামে গেলে যাক তাতে তাঁদের বিন্দুমাত্রও এসে যায় না।

BanglaBook.org

একটি দেশের মানুষের চরিত্রে আর মেরুদণ্ডেই যদি ঘুণ ধরে যায় তবে এশিয়াড ভিলেজ বা হলদিয়া প্রকল্প, মেট্রো রেল বা সি এম ডি-এর ফ্লাই-ওভার বা টাইগার প্রজেক্ট দিয়ে সে দেশের প্রকৃত কোনো উন্নতিই হতে পারে না ! এ কথা বোঝার সময় আমাদের যদি এখনও না এসে থাকে তাহলে তা আর কোনোদিনই আসবে না।

এতো কথা, এই বইয়ের ভূমিকা লিখতে বসে বলা, অনেকের কাছে হয়তো অবান্তর ঠেকবে। কিন্তু আসলে তা অবান্তর নয়। বিপন্নপ্রাণী বাঁচানো, অভয়ারণ্য, বাঘের সংখ্যা মারাত্মক ভাবে হ্রাস পাওয়া আর ভোটের সময় রিগিং, দেশের স্বার্থর পরিপন্থী কাজ করে নিজের নিজের পার্টির গদী শক্ত করা, অসহায় জন-সমস্যা, (ভোটে হাত-পড়ার ভয়ে কোনো রাজনৈতিক দলের সাধ্য নেই যে তা সমাধান করার চেষ্টা করেন এবং যে সমস্যা অচিরে এ দেশকে মরুভূমিতে রূপান্তরিত করে দেবে) খাদ্য সমস্যা, পানীয় জলের সমস্যা, শিক্ষাক্ষেত্রে অব্যবস্থা, চিকিৎসাক্ষেত্রের অচিন্তনীয় হতাশা এই সমস্ত সমস্যার মূল কারণ একটিই। সেই কারণটি যে কি তা যাদের চোখ-কান খোলা আছে, যারা সামান্য বিদ্যাও ধরেন তাঁরাও সকলেই জানেন। জেনে শুনেই তবু আমরা চুপ করে থাকি। যেদিকে বিপদ সেদিকে যাই না, যেদিকে সহজে নিরাপদ স্পর্ধার সঙ্গে পদাঘাত করা যায় সেদিকেই ভীড় জমাই। শিকারীদের পদাঘাত করি অবহেলে তাদের সম্বন্ধে কিছু না জেনেই অথচ রাজনৈতিক দলগুলিকে স্তুতি করি তাদের সম্বন্ধে সবকিছু জেনেও কারণ তাঁরা আমাদের অনেক কিছুই "পাইয়ে দিতে" পারেন। বাড়ি, গাড়ি, যশ, পুরস্কার। অন্ধকে চক্ষুষ্মান করতে পারেন, পঙ্গুকে পারেন গিরিলঙ্ঘন করাতে।

সমসময়ের দেশীয় মানুষদের, শুভাশুভ ও ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান নিয়ে ভবিষ্যতের মানুষেরা প্রহসন রচনা করবেন। এঁদের ভণ্ডামি, দলবাজী, ন্যক্কারজনক জানোয়ারসুলভ গোষ্ঠীবদ্ধতা এঁদের মনুষ্যেতর জন্তুতেই পর্যবসিত করেছে। যে-শিকারীরা বাঘ মারেন মাটিতে দাঁড়িয়ে তাঁদের হেয় এঁরা করবেন না তো কারা করবেন ?

বাঘ শিকারের মতো শিশুসুলভ সরল কর্ম নাকি আর দুটি ছিলো না ও নেই ! এ কথা অনেককেই বলতে ও লিখতে শুনি ও দেখি আজকাল। এই সমস্ত উত্তম মানবসন্তানদের গহন বনে নিয়ে গিয়ে প্রকৃত বন্য-বাঘ (অভয়ারণ্যর পোষা বাঘ নয়) যদি দেখানো যেতো তাহলে তাঁদের অবস্থা যে ঠিক কীরকম হতো তা অনেক অধম শিকারীরই বিলক্ষণ জানা ছিলো। এবং আছে। বাঘ শিকারীকে যাঁরা হেয় করেন তাঁরা যে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী হিসেবে বাঘকেও হেয় করেন এতোটুকু বুদ্ধি তা'বড় তা'বড় পণ্ডিত ও আর্মচেয়ার কনসার্ভেশানিস্টদের মস্তিষ্কে কেন যে ঢোকে না তা বোঝা মুশকিল।

অনেকই অপ্রিয় প্রসঙ্গর অবতারণা হলো এবং তা শেষও করা গেলো।

আমি শিকারী নই। এবং কোনোদিনই ছিলাম না। আমি বনচারী। শুধুই জন্তু-জানোয়ার পশু-পাখি মেরে আনন্দিত-হওয়া একদল শিকারীদের আমিও জানি কিন্তু তাঁদের আমি শিকারী বলে মনে করি না। সত্যিই যিনি বনচারী তাঁর মধ্যে একজন প্রকৃতি-প্রেমিক, অ্যানথ্রপলোজিস্ট, অর্নিথেলাজিস্ট, বটানিস্ট, জুওলজিস্ট, কবি ও সাহিত্য-রসিক বিরাজ করবেন। তাঁর দেশের বা অন্য-দেশের মানুষদের প্রতি মানবিক দরদও তাঁর থাকা উচিত। বাঘের গায়ে পা দিয়ে দাঁড়ানো গুঁফো শিকারীদের পুরোনো ছবিটি আপনাদের দেওয়াল থেকে নামিয়ে এই নতুন ছবিটি টাঙাবার সময় এসেছে।

বনে-পাহাড়ে ঝিলে-নদীতে ঘোরার যে অকপট অমলিন আনন্দ তাই বিকীরণ করার চেষ্টা করেছি এই স্মৃতি-চিত্রে। যাঁদের কথা এই বইয়ে লিখেছি আজ তাঁদের মধ্যে অনেকেই

BanglaBook.org

নেই পৃথিবীতে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই বই একধরনের নৈবেদ্যও বটে। আমার বাবার চলে-যাওয়া বন্ধুদের স্মৃতির প্রতি ; আমাদের চলে-যাওয়া বন্ধুদের স্মৃতির প্রতিও।

বড় কাছ থেকে দেখা বহু অর্থবান, ধনহীন, উচ্চশিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভালো ও মন্দ মানুষের একাধিক যুগ 'বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে'তে ধরা রইলো। "মন্দ" শব্দটি লিখলাম বটে, কিন্তু কারোই মন্দ দিকটি তুলে ধরিনি এখানে। আমার বাবা বলতেন "পৃথিবীতে একজনও খারাপ মানুষ নেই। তাকে ভালো করে লক্ষ করো, দেখবে তার মনের অন্ধকার মাঠেতেও কোনো কোণে রোদ এসে নিশ্চয়ই পড়ে। And then, cultivate his Sunny sides!"

তাই করেছি।

"বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে"র দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে ওড়িষার বন্ধুবান্ধব ও ওড়িষার বিভিন্ন পূর্বতন করদ রাজ্যের বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার অভিজ্ঞতা। ১৯৫৯ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত প্রতি বছর দু-তিনবার করে ওড়িষার কোনো না কোনো জঙ্গলে গেছিই। "পারিধী", লবঙ্গীর "জঙ্গলে", "নগ্ন নির্জন", "বাংরিপোসির দু রাত্তির", "বাঘের মাংস", ইত্যাদি বই-এর পটভূমিতো ওড়িষারই বিভিন্ন বন-জঙ্গল। সোপর্দ'র পটভূমিও ওড়িষার। তবে তা মানুষের জঙ্গলের মানুষী শ্বাপদদের নিয়ে লেখা। তফাৎ এইটুকুই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে

প্রথম খণ্ড

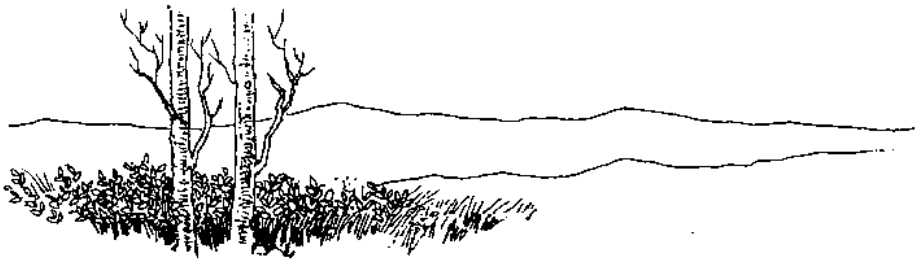

আজ হাটবার। আসামের গোয়ালপাড়া জেলার এই ছোট্ট গ্রাম তামারহাটে হাটের দিনে রঙ আর শব্দ চমকায়। গন্ধ ওড়ে। ব্রহ্মপুত্রের উপরে ধুবড়ি শহর। সেই ধুবড়ি শহর থেকেই পথ চলে গেছে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের প্রথম যুগের প্রবাদপুরুষ প্রমথেশ বড়ুয়া আর তাঁর বিখ্যাত শিকারি এবং হস্তী-বিশারদ ছোট ভাই প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়াদের (লালজী) পৈতৃক নিবাস গৌরীপুরে। গৌরীপুরের "মাটিয়াবাগ প্যালেস" তাঁদের নিবাস। লালজীর দিদি, গৌরীপুরের বড় রাজকুমারীও তেরো বছর বয়সে প্রথম বাঘ শিকার করেন। তাঁর ছেলে মুনীন্দ্র বড়ুয়াও জবরদস্ত শিকারি হয়েছিলেন পরে। পঙ্কজ মল্লিকের গানের মুক্তো-বসানো "মুক্তি" ছায়াছবির সেই প্রকাণ্ড হাতীও ছিলো ঐ গৌরীপুরেরই।

লালজী এখনও আছেন। বছর তিনেক আগেও দেখা হয়েছিলো উত্তরবঙ্গের "মূর্তী"তে। গরুমারা অভয়ারণ্যর কাছে। সাম্প্রতিক অতীতে তিনি উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স-এর জঙ্গলে হাতী ধরেছেন প্রতি বছরই। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে জংলী হাতীর দলকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ান এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়।

ওঁর কথাতে পরে আবার ফিরে আসব।

গৌরীপুর থেকে একটি সাদা, সুগোল নুড়িময় পথ চলে গেছে কুমারগঞ্জ হয়ে তামারহাটে। এই দুই গ্রামের গা-ঘেঁষে বয়ে গেছে গঙ্গাধর নদী। আসলে 'সংকোশ' নদীই। একই নদীর উপরভাগের নাম সংকোশ আর নিম্নভাগের নাম গঙ্গাধর। চেহারাও একেবারে আলাদা দুই ভাগের। গঙ্গাধর গিয়ে পড়েছিলো ব্রহ্মপুত্রে।

আজ থেকে অনেকই দিন আগের কথা। তখনও দেশ ভাগ হয়নি। তামারহাটে নানা জায়গা থেকে পাট আসতো মহাজনী নৌকো করে। মেমসাহেবদের চুলের-মতো-রঙের পাটের মিষ্টি গন্ধে তামারহাটের পাট-ব্যবসায়ীদের টিনের-চালের বড় বড় গদীঘরগুলি ম' ম' করতো। আমার বড় পিসেমশাই-এর বাস ছিলো তখন তামারহাটে। আমাদের "দেশ"ও তখন ছিলো উত্তরবঙ্গের রংপুর শহরে। যদিও আমার জন্ম কলকাতায়। এবং কর্মও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রংপুরে গিয়ে বেশ কিছুদিন ছিলাম। ছুটি-ছাটাতে তখন তামারহাটে যেতাম। অবশ্য পরবর্তীকালে কলকাতা থেকেও বহুবার গেছি। তখন রংপুর থেকে তামারহাটে বেড়াতে যেতাম। সুগন্ধি চালের ফেনাভাত, লাল-আঁশের বিশালাকৃতি

মহাশোল মাছ আর বড় বড় কমলালেবু খেতাম শীতকালে। আশ মিটিয়ে।

হাটের দিকে মুখ-করা গদীঘরের বারান্দাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম, শাল গাছের খুঁটিতে হেলান দিয়ে ; স্কুলের ছাত্র আমি। বয়েল-গাড়ি আর মোষের-গাড়ি তাদের লম্বা-লম্বা পা আকাশে উঁচিয়ে শুয়ে বিশ্রাম করছে। বয়েল ও মোষেরা ইতস্তত বসে-দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে বড় বড় উজ্জ্বল চোখ মেলে। মনমৌজী চৈতি-হাওয়ায় ঘুরপাক-খাওয়া ধুলো আর শুকনো পাতাদের সঙ্গে হাটের পাঁচমিশেলী গন্ধ উড়ছে। মেয়ে-মরদের গায়ের ঘামের গন্ধ, হাঁস-মুরগীর গায়ের ওম্-ধরা গন্ধ, তাদের ডিমের আঁশটে-গন্ধ, তেলেভাজা, বিড়ি আর তামাকপাতার গন্ধর সঙ্গে উঠে আসছে। তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে সর্ষের তেল আর পুরুষ্টু পাঁঠাদের গায়ের গন্ধ।

সব পাঁঠাই বোকা নয়, প্রচুর বুদ্ধিমান পাঁঠাও আছে এদিকে। হয়তো সব জায়গাতেই আছে। তাদের কথাও পরে।

গদীঘরের একটি খুঁটির সঙ্গে বাঁধা আছে বাগডোরা গ্রামের মুনসের সর্দারের টাট্টু ঘোড়া। বেঁটে-খাটো। সাদা-রঙা। চেকচেক মেরুন-রঙা লুঙিপরা, পেকে-যাওয়া খোঁচা-খোঁচা দাড়িময় মুখ আর তীক্ষ্ণ নাকের মুনসের সর্দার আজ হাটে পৌঁছেই শুনিয়ে গেছেন পিসেমশাইকে, যে তাঁদের গাঁয়ে একটা চিতাবাঘ বড়ই দৌরাত্ম্য শুরু করেছে।

পিসেমশাই নিজে শিকার-টিকার করেন না। ডায়াবেটিস্-এ চোখ দুটি নোটিস দিয়েছে। বন্দুক অবশ্য আছে একটি। দোনলা। তবে সেটি শুধু ডাকাতেরই মোকাবিলার জন্যে। এখনও ডাকাত পড়েনি। তাই বন্দুকটি প্রায় অপরীক্ষিতই রয়ে গেছে।

পিসেমশাই বললেন, কি রে লাল ? যাবি নাকি বাঘ মারতে ? তাহলে রতুবাবুকে বলি।

আনন্দে নেচে উঠলাম আমি। বাঘ তো বড় ব্যাপার, খাটাশ হলেও রাজি। শিকারের নেশা তখনই বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে একটু একটু হয়েছে। বড়ই সাংঘাতিক নেশা এ।

পিসেমশাই বললেন রতুবাবুও হাটেই গেছেন। এসে যাবেন একটু পরই। বলব'খনে।

রতুজেঠু ছিলেন তামারহাটের হীরো। ওঁর একনলা বন্দুক ছিলো একটি। তাই দিয়ে মারেননি এহেন জানোয়ার ছিলো না। লম্বায় ছ'ফিট। পেটা চেহারা। রোদে-পোড়া বাদামি গায়ের রঙ। কিছুদিন আগে হাটের মধ্যে একজন পাঠানের মতো ষণ্ডা-গুণ্ডা, খুনির মতো দেখতে মুসলমান-চড়ুয়া তাকে আজেবাজে কথা বলতেই তার পেটে এমনই এক ঘুঁষি কষিয়েছিলেন রতুজেঠু যে পিলে ফেটে সে লোকটি হাটের মধ্যেই অক্কা পেয়েছিলো। অন্য দেশ হলে রতুজেঠুর ফাঁসিই হতো। কিন্তু এ দেশ বলেই হয়নি কিছুই। উল্টে, গ্রামে-গঞ্জে হাটে-বাজারে তাঁর ইজ্জৎ আরও বেড়েছে। মুখে মুখে তাঁর নতুন নামকরণ হয়েছে "পেট-ফাটানো রতে।"

পিসেমশাইর প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডওয়ালা বাড়ির পাশেই রতুজেঠুর একটি কারখানা ছিলো। সেই কারখানায় ঠিক কী কী যে তৈরি হতো অথবা সারাই, তা আমার আজ আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। তবে লুঙি পরে, চোখে নিকেলের ফ্রেমের ঘষা-কাঁচের চশমা পরে উনি একটি মোড়ার উপরে বসে সব সময়ই কিছু না কিছু কাজ করতেন। খুবই কর্মঠ পুরুষ ছিলেন। ওঁরা কিন্তু খাস নর্থ-ক্যালকাটার লোক। কিন্তু কোন্ দৈব-দুর্বিপাকে যে ঐ অজ পাড়াগাঁয়ে বসত করেছিলেন গিয়ে তা কে জানে। ওঁর একাধিক সুন্দরী কন্যা ছিলো। স্পষ্ট মনে আছে। কেউ আমার চেয়ে বয়সে সামান্য বড়, কেউ বা ছোটো। যে-বয়সে মেয়েদের সম্বন্ধে প্রথম এক ধরনের ভালোলাগা ও কৌতূহল জন্মায় আমার তখন সেই বয়স। "বেড়াবিনুনি" বাঁধা ছিপছিপে মেয়েদের লণ্ঠনের আলোয় চক্‌চক্-করা চোখ, তাদের গায়ের পাউডারের শরীর-অবশ করা গন্ধ, চাঁদনি রাতে "চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে" আর অন্ধকার

রাতে "ও আমার আঁধার ভালো" গান আমার কচি-বুকে ধুক্‌পুকানি তুলতো।

রতুজেঠুর গর্বের মধ্যে প্রধান ছিলো দুটি।

প্রথমটি তাঁর টি-এইট মডেলের ফোর্ড গাড়িখানি। সে গাড়ি তেলেও চলতো জলেও চলতো, মিষ্টি কথাতেও চলতো, চলতো লাথি মারলেও। অদ্ভুত ছিলো তার এঞ্জিনের আওয়াজ। এঞ্জিন স্টার্ট করার সঙ্গে সঙ্গেই নাভিশ্বাস-ওঠা, গুলি-খাওয়া ধাড়ি-শুয়োরের মতো ধড়্‌ফড়্‌ আওয়াজ করে উঠতো সে।

দু নম্বর গর্ব ছিলো, একনলা বন্দুকটি।

ওঁর বড় ছেলের নাম ছিলো পাঁচকড়ি। লম্বা, কালো, মিষ্টি মুখের ছিপছিপে যুবক। বছর কুড়ি বয়স তখন। কিশোর-বয়সী আমার তৎকালীন আদর্শ।

পড়া-বিকেলে হাট থেকে ফিরেই সব শুনে রতুজেঠু মুনসের সর্দারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন পিসেমশাইয়ের ইজিচেয়ারে শুয়ে। অন্দরমহল থেকে চা এবং গুয়া-পান এলো। রতুজেঠু ও পিসেমশাই জর্দাও খেতেন। তাই জর্দাও এলো।

বরবাধা আর গুমা রেঞ্জের জঙ্গল পেরিয়ে সাদা নুড়ি ও নরম ধুলো মাখা যে স্বপ্নময় পথটি চলে গেছে রাইমানা কচুপাও হয়ে, ভুটান উত্তরবঙ্গ আর আসামের সঙ্গমস্থলে ছবির মতো নদী সংকোশের পারের রহস্য আর বিপদঘেরা "যমদুয়ার"-এর দিকে, সেই পথের পানে চেয়ে চা ও পান খেয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে রতুজেঠু সেই পথের দিকে চেয়ে রইলেন।

বিড়ি-কোম্পানীর ক্যাটিক্যাটে লাল-রঙা ভ্যান এসেছে ধুবড়ি শহর থেকে। গাঁক্‌-গাঁক করে গান বাজছে অ্যাম্‌প্লিফায়ারে। রতুজেঠু স্বগতোক্তি করলেন গহর জান্‌-এর রেকর্ড। খেম্‌টার তালে তালে সেই গান ঝাঁপিয়ে পড়ছে হাট-করা মেয়ে-মদ্দর হাট-করে-খোলা বুকের উপর। কেঁচো বনে যাচ্ছে সকলেই গহরজান-এর সেই গানের দাপটে।

"আমি রূপ দেখে সই কুল হারালেম বকুলতলায় এসে।
চলে যেতে পড়ছি টলে, উল্লাসে প্রাণ ভাসে।
জানা গেছে অনুভবে
এবার কি যৌবন রবে ?
কত নারী কুল হারাবে আজকে সরোবরে এসে॥
আমি রূপ।
আমি রূপ।
আমি রূপ দেখে সই কুল হারালেম বকুলতলায় এসে"॥

মুনসের সর্দার, জংলী হুলো বেড়ালের সাইজের একজোড়া লালচে মোরগাকে মুণ্ডু নিচে পা-উপরে করে হাত ঝুলিয়ে নিয়ে হাট থেকে গুটি-গুটি এলেন। কাঁধের ঝোলাতে আরও নানা সামগ্রী। রতুজেঠু আর ওঁর মধ্যে কথাবার্তা হলো। আমি পাশেই উৎকর্ণ, উন্মুখ এবং যাবতীয় উঃ হয়ে 'দ'-এর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম শালের খুঁটি ধরে।

রতুজেঠু বললেন, তিনি আগামী রবিবারের আগে সময় করতে পারবেন না।

আমি কাঁদো-কাঁদো মুখে বললাম, জেঠু !

জেঠু বললেন, মনমরা হোস্‌নিকো। পাঁচকড়িকে বলে দেবো। ও তোকে নিয়ে কাল আলোকঝারি পাহাড়ে শুয়োর বা হরিণ মারিয়ে নিয়ে আসবেখন। তাপ্পর রোব্‌বারে যাবো তোকে নিয়ে বাঘডোরা গ্রামে। আমি নিজে যাবো। গাড়ি করে যাবো। তোর অনারে।

BanglaBook.org

পরদিন দুপুরে পাঁচকড়িদাদার সঙ্গে সাইকেলে করে তো বেরিয়ে পড়লাম। পিসেমশাই দয়াপরবশ হয়ে তাঁর বন্দুকটা এবং দুটি এল. জি. এবং দুটি বুলেট দিলেন হাতে তুলে। বেরুবার সময়।

বললেন, দেখিস, মানুষ মেরে জেলে পাঠাস না।

ধুলোর মধ্যে ক্যাঁচোরকোঁচর করে সাইকেল চালিয়ে কুমারগঞ্জে তো পৌঁছলাম আমরা। মাইল তিনেক পথ হবে বোধহয়। পথে, বাঁদিকে ঢিল-খাওয়া দেবীর "থান" পড়লো। সাইকেল থেকে নেমে পাঁচকড়িদাদা ফটাফট্ কটা পাথর ছুঁড়ে মারলো পথ-পাশের কোটরে। আমাকে বললো, তুইও মার। যে ঠাকুরের যে পুজো। পাথর খেয়েই বেঁচে থাকে এ বেটি। পাথর না মারলেই চটিতং।

অতএব মারলাম।

যে যা খেতে চায় তাকে তা খাওয়ানোই ভালো। বুয়েচিস্। সে ঢিল, চুমু, অথবা যাই হোক না কেন।

পাঁচকড়িদাদা বললো।

পাঁচকড়িদাদার "অ্যাডাপ্ট" কনভার্সেশানে "মাইনর"-এর গা-শিরশির করে উঠলো।

মনে আছে, এই কুমারগঞ্জের নসু-ডাক্তারের বাড়িতেই জীবনে প্রথমবার এঁচড়ের চপ খেয়েছিলাম। সে এঁচড় পাকা ছিলো কি না জানি না, হয়তো ছিলো। যতদূর মনে পড়ে ডাক্তারবাবুর দুই ছেলে ছিলো। দুলু আর রামু।

কুমারগঞ্জ গাঁকে ডাইনে রেখে শূন্য ধানক্ষেতের আলের উপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম গহন গভীর এক জঙ্গলে। পাঁচকড়িদাদা বললো, অ্যাই দ্যাখ্। টুঙ্-বাগান। মস্ত মস্ত টুঙ্ গাছের গভীর জঙ্গল সেখানে। মনে হলো, সব সময়ই ছায়াচ্ছন্ন হয়ে থাকে জায়গাটা। একটি তিরতিরে ঝর্ণা নেমে এসেছে আলোকঝারি পাহাড় থেকে। ছায়ার গভীর থেকে গভীরে বয়ে গেছে।

এই টুঙ্-এর ফল থেকেই এরোপ্লেনের গায়ে যে রঙ হয় সেই রঙ তৈরি হয়। বুঝলি লাল।

পাঁচকড়িদাদা বললো।

টুঙ্ বাগান পেরিয়ে আলোকঝারি। আহা! কী চমৎকার পাহাড়। বাঁশ আর হরজাই জঙ্গল সেখানে। পাতা-ঝরা গাছের উপরে বিকেলের হলুদ রোদে অতিকায় লাল-কালো ঝুম্‌কো ফুলের মতো সব বনমুরগী ফুটে আছে।

উত্তেজিত হয়ে আমি বললাম, মারব?

বলেই, বন্দুকে গুলি ভরতে গেলাম।

BanglaBook.org

একদম্ নয়।

পাঁচকড়িদাদা তারপর ধমকে বললো করাত-চেরা আওয়াজ করে রোজই একটা চিতা সন্ধের পর ঐ সামনের কাছিম-পেঠা পাহাড়ের ওপাশ থেকে। এসেছিস বড় শিকারে। মুরগী মেরে জাত খোয়াবি কেন?

সাত-বোশেখির মেলা বসে প্রতিবছর এই আলোকঝারি পাহাড়ে। বুয়েচিস্। কালো কুচকুচে শরীরের দিল্-ধড়কান্ সব চক্‌চকে সাপের মতো সাঁওতালী মেয়েরা ধবধবে সাদা পরিষ্কার শাড়ি পরে কালো মোরগার ফিন্‌কি-ওঠা লাল রক্ত দিয়ে পুজো করে সেই দিনটিতে বনদেওতাকে। সাতোই বোশেখে। জানলি।

এত সব তথ্যে চমৎকৃত হয়ে আমি বলি, হুঁ।

নেশা লেগে যাচ্ছিলো আমার। ঘোর প্রকৃতির বুকের কোরকে পৌঁছে।

আলোকঝারির পর আরও পাহাড় পেরিয়ে রাঙ্গামাটি-পর্বতজুয়ারের জঙ্গলে এসে পৌঁছলাম আমরা। এখানে মেচ্ উপজাতিদের বাস। সাইকেল দুটো টুঙ্ বাগানেরই গাছতলাতে রেখে দিয়ে হেঁটে আসছিলাম আমরা। এমন সময় পাঁচকড়িদাদা বললো, দাঁড়া, আমি আমার সাঁটুলির সঙ্গে দেখা করে আসি চট্ করে একবার। নইলে রাগ করবে জানতে পেলে। এই গেনু আর এনু।

বলেই, বললো, আচ্ছা তুইও চ দেখেই আসবি। বাড়িতে ফিরে মুখ যদি খুলেছিস তবে....

তবে কী যে হবে। তা আর বললো না।

"সাঁটুলী" কাকে বলে, এই চিন্তাতে পড়ে বড়ই উদ্বিগ্ন হলাম। তবে এটুকু বুঝলাম যে মেয়ে-ঘটিত ব্যাপার। হয়তো যে-মেয়ে ঐটুলির মতো হেঁটে থাকে তাকেই বোধহয় "সাঁটুলী" বলে। ভাবলাম।

এই মেচ্ উপজাতীয়রা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এবং এরা ভারি সুন্দর দেখতেও। নিজেদেরই হাতে-বোনা নানা-রঙা পোশাক পরে মরা-বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে, ঝক্‌ঝকে-করে গোবর-লেপা উঠোনে বসে তাঁত বুনছিলো স্বপ্নে দেখা রাজকুমারীরই মতো একটা অল্প বয়সী মেচ্ মেয়ে। তার চুল-ওড়ানো চৈতি-হাওয়ায় লাল-হলুদ-কালো ঝরে-যাওয়া সব কাঁটাল পাতারা উড়ে উড়ে আল্‌তো পায়ে নামছিলো এসে এক এক করে সেই নিকোনো উঠোনে। মৃদু খস্‌স-খস্‌স শব্দ হচ্ছিলো তাদের নিচে নামার। এক-দুই-তিন-চার করে জড়ো হচ্ছিল পাতারা একটি একটি করে। এও যেন এক রকমের তাঁত বোনা।

হাওয়াটাও তাঁতী হয়ে গেছে। মনে হলো আমার।

পাঁচকড়িদাদা মেয়েটির ঠিক পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়েই, হঠাৎ 'কু' দিয়ে চম্‌কে দিলো তাকে। একটা ভুটিয়া কুকুর বাঘের মতো হম্বিতম্বি করে কামড়াতে এলো পাঁচকড়িদাদাকে।

মেয়েটি খুব বকে দিলো কুকুরকে। মরালীর মতো গ্রীবাভঙ্গি করলো সেই মেয়ে। আমার কিশোর বুকের সব রক্ত ছলাৎছলাৎ করে উঠলো একই সঙ্গে।

পাঁচ মাইল এবড়ো-খেবড়ো পথে ও আলে আলে সাইকেল চালিয়ে এসে এবং পাহাড়ে চড়ে হাঁপাচ্ছিলাম আমরা দুজনেই। অনভ্যস্ত আমার তো খুবই পিপাসা পেয়েছিলো। তাই দেখে মেচ্ সর্দারের মেয়ে, পাঁচকড়িদার "সাঁটুলী", ঘর থেকে তাড়াতাড়ি জল এনে দিলো আমাদের, ঝকঝকে পেতলের গ্লাসে। আহা। চোখ দুটি সেঁটে গেল আমার "সাঁটুলী"তে।

BanglaBook.org

পাকা চাঁপাকলার মতো তার গায়ের রঙ, গুমোর-গড়ানো চিবুক, কোমর-সমান পেঁয়াজ-খসী রঙের ঘন চুল। চুলের মধ্যে আবার কাঁটাল কাঠের হলুদরঙা কাঁকই গোঁজা।

কোকিল ডাকছিলো শিহর তুলে তুলে পলাশ গাছের লাল ফুলের মধ্যে কালো শরীর মিশিয়ে। আর সজনে গাছের ডালে বসে ঝাঁপাঝাঁপি করছিলো হলুদ-বসন্ত পাখি। নীরবে। বড় ভালো লাগছিলো আমার।

হলুদ-বসন্ত, বসন্ত চলে গেলে, কথা কম বলে।

পাঁচকড়িদাদা আমাকে দেখিয়ে তার 'সাঁটুলী'কে বললো, এ হচ্ছে গিয়ে ক্যাল্‌কেশিয়ান্। কলকাতায় থাকে। আমার নতুন চেলা। শিকার শিখবে; শিকার। বুয়েচিস্?

মুখ দেখেই মনে হলো যে, কলকাতার নাম ওরা কেউই শোনেনি।

তখনও এই পৃথিবীতে অনেকই অচেনা দেশ ছিলো। ছিলো, না-দেখা শহর। তখনও দ্রুতগতি যানবাহন আর পিচ-কংক্রিটের পথ, দূরত্ব পেরুবার কষ্টর মধ্যে যে বিলাস ছিলো তার শবব্যবচ্ছেদ করেনি বিজ্ঞানের আর প্রযুক্তির লাশকাটা ঘরে নিয়ে গিয়ে কেউ। পৃথিবীর সমস্ত গোপন, অন্ধকারাচ্ছন্ন, রহস্যময় কোণকেই তার কোরক থেকে বাইরে এনে তার উপর তীব্র আলো ফেলে বে-আব্রু, বে-ইজ্জৎ করেনি তখনও। মানুষের "অগ্রগতি"। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা তখনও "প্লেজেন্ট-সারপ্রাইজের" ছিলো। প্রিয়জনকে "দূর দেশে" বয়ে-নিয়ে-যাওয়া বিধুর রেলগাড়ির পেছনের দ্রুত-অপসৃয়মান লাল আলো তখনও প্রোষিতভর্তৃকাকে অচিন কোনো রহস্যময় দেশের আভাস দিয়েই বিলীন হয়ে যেতো বেনারসীর পাড়ের মতো ঝক্‌মকে লাল-কালো-জমকালো সান্ধ্য-অন্ধকারে।

স্বপ্নে-দেখা রাজকুমারী, সেই মেচ-কন্যা আমার দিকে অপলকে তাকিয়ে ছিলো। আমাকে কোনও স্বপ্নে-দেখা রাজকুমার ভেবে। অমন সুন্দরী কোনও মেয়ে, তার আগে অমন সুন্দর চোখে তাকায়নি কখনওই আমার দিকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতোই দাঁড়িয়ে ছিলাম। কলকাতার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের টমী আর নিগ্রো সৈন্যে ভরা, মিলিটারী ট্রাক আর ভিখিরির আর্তিতে চিৎকৃত আবিল পরিবেশে বাস-করা এক বালক এই অনাবিল, স্বপ্নময় প্রকৃতির মধ্যে নিঃশেষে নিমজ্জিত হয়ে গেছিলো প্রকৃতিরই এক কন্যার দিকে চেয়ে।

পাঁচকড়িদাদা হাত ধরে টানলো। বলল, চল্ চল্ লাল। ওরা যাদু জানে।

যাদু জানলে কি যে হয় তা বললো না আর।

বললো, তোকে খুব ফর্সা আর লালটু দেখতে তো। তাইই তোকে যাদু করে দেবে।

আমার মন বলছিলো দিকই না যাদু করে। এ মেয়ে যা খুশি তাইই করতে পারে আমাকে নিয়ে।

যেতে যেতে একবার পেছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম, মেচ-সর্দারের মেয়ে, আমার স্বপ্নে-দেখা রাজকুমারী, একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমাদেরই পথের দিকে, তাদের উঠোনের বাইরে এসে, একটি মস্ত গাছের গোড়াতে দাঁড়িয়ে। সেই গাছে ফিকে বেগুনি ফুল ফুটেছে থোকা থোকা। আমার অনাঘ্রাত শরীরে আর নবীন মনে তখনও ফুলের বন বা নারীর মন সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিলো না। শুধু বিস্ময়ের আনন্দ ছিলো সেদিন। আর আজকে বিস্ময় শব্দটিই মুছে গেছে নিজস্ব অভিধান থেকে।

মেয়েটির চুল এলোনো ছিলো বুকের ওপরে। নামিয়ে দিয়েছিলো বুকের বাঁদিক দিয়ে। তখন হলুদ হয়ে গেছে রোদ। হলুদ হয়ে গেছে মন। তখন বুঝিনি, আজ চল্লিশ বছর পেরিয়ে এসে বুঝি, "মনে-হলুদ" কাকে বলে।

পাঁচকড়িদা চলতে চলতে বললো, বুঝলি লাল, নেকস্ট্ লাইফে শালার "গড্"-এর কাছে

স্রেফ একটা জিনিসই চাইবার আছে।

আমি পেছনে আর না তাকিয়ে বললাম, কি ?

পাঁচকড়িদা বললো, কালোজিরের মতো গায়ের রঙেই সব্বোনাশ হলো। সব্বোবাঁশও বলতে পারিস। তোর মতো গায়ের রঙ যদি পেতাম রে লাল ! এ দেশ কোনোদিনও স্বাধীন হবে না। বুয়েচিস্। শালার মানুষের দাম নেই, দাম যত গায়ের চামড়ার রঙের !

আমি বললাম, কৌতূহলে, কী করতে তাহলে ? মানে, তোমার রঙ যদি সাহেবদের মতো হতো ?

কী করতাম ? আরে ক্যান্টার করে বেরিয়ে যেতাম। যাকে বলে রিয়্যাল ক্যান্টার। বলেই, নিজের গায়ের জ্বালা মেটাতে একনলা বন্দুকের লম্বা নলটি দিয়ে ঘা মেরে পথপাশের একটি শালের চারাকে একেবারে ফ্ল্যাট করে দিলো।

বুঝলাম, পাঁচকড়িদাদা বেজায়ই রেগেছে আমার উপরে।

বাঃ রে ! আমি কী করলাম ?

ভয়ে ভয়ে শুধোলাম আমি।

করিসনি। তবে ইচ্ছে করলেই করতে পারিস। তুই একটি ফেরোশাস্ জানোয়ার। তোকে বিশ্বাস নেই। শালা। আমার এতদিনের জল-দেওয়া লতাকে তুই কী না মুড়িয়ে দিয়ে এলি। ছাগলের জাত তুই।

ফেরোশাস্ ? বলেই, চুপ করে গেলাম। ইংরিজির জ্ঞানের দামের চেয়েও প্রাণের দামটা অনেক বেশি তাই। কিন্তু একাধারে "ফেরোশাস্" এবং সেই আধারেই "ছাগল" ? ভাবা যায় না।

এইবারে পাঁচকড়িদাদা পাহাড় চড়তে লাগলো। নিজের বন্দুকটাতে গুলি ভরে নিলো। আমিও পিসের বন্দুকে গুলি ভরতে যেতেই বললো, একদম না। নিজের গুলিতে নিজেই মরবি আছাড় খেয়ে। শিকারের জানিস কিছু ? সাদা-চামড়া। ওয়ার্থলেস্।

মাথা নাড়লাম। বললাম, না।

মেরেছিস কিছু ? গুল্ ছাড়া ?

হ্যাঁ। বললাম আমি।

কি ? সেটা কি ? কোন্ জাতের ? কত বড় জানোয়ার ?

একটা বক।

বক ? ইগ্রেট্ ?

আমি আবারও বললাম, হ্যাঁ।

তবে তো তুই মস্ত শিকারীই।

আরও কিছুটা উপরে ওঠার পর বললো, শোন্। এবারে কিন্তু কতা-বাত্রা একদমই বন্ধ। যেকোনো সময়েই জানোয়ার বেরিয়ে পড়তে পারে। সময় হয়ে গেছে।

আমি ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে চলতে লাগলাম।

পাহাড়টা এবারে ঢালু হয়েই সামনের জঙ্গলে নেমে গেছে। পাহাড় যেখানে জঙ্গলের সঙ্গে মিলেছে ঠিক সেইখানেই মস্ত একটা ফর্সা শিমুল গাছ দুদিকে সার সার হাত সমান্তরালে টান-টান করে দাঁড়িয়ে আছে সটান।

পাঁচকড়িদাদা গাছটা দেখিয়ে বললো, গাছে চড়তে পারিস ?

একটু একটু।

শিখলি কোথায় ? তোদের ক্যালকাটাতে তো গাছই নেই।

BanglaBook.org

রংপুরে তো আছে।

বললাম আমি।

অ! তালে তুইই আগে ওঠ্

শিমুল গাছে কাঁটা হয় একরকমের। গাছের গায়েই আসল-বসন্তর মতো সেই কাঁটাগুলো উঁচু উঁচু হয়ে থাকে। তাছাড়া ডালগুলো ফাঁক ফাঁকও হয়। তবুও গাছের নিচে জুতো-মোজা খুলে বন্দুকটাকে চামড়ার স্লিং-এ ঝুলিয়ে গাছে উঠতে যাব ঠিক এমন সময় আমার লোকাল গার্জেন বললো, তোর জামাকাপড় সব খুলে ফ্যাল্।

হতভম্ব হয়ে আমি শুধোলাম, কেন?

জানোয়াররা দেখতে পাবে। মানে, তোর জামাকাপড় দূর থেকে দেখতে পাবে। হলুদ শার্ট পরে কেউ শুয়োর মারতে আসে? অলিভগ্রীন কী খাকি ছেলোনি?

আমাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে বললো ন্যাকামি করিসনি। তুই কি মেয়েছেলে? সব খোল। হ্যাঁ। হ্যাঁ। সব।

তবুও আমি কিন্তু কিন্তু করাতে বললো কি র‍্যা? নিচে নেই কিছু?

আছে।

কি?

বাইক।

সেটা আবার কী বস্তু? তোদের কলকাতাইয়া ব্যাপারই আলাদা। যাই থাকুক আছে তো কিছু নীচে। খোল জামাকাপড়।

উত্তর না দিয়ে জামাকাপড় সব ডাঁই করে গাছতলার ঝোপের উপর রেখে আস্তে আস্তে গাছে উঠলাম। হাত পা কাঁটাতে ছিঁড়ে যেতে লাগলো। কিন্তু নিচে থেকে ক্রমাগতই অর্ডার আসতে লাগলো হাঁক দিয়ে দিয়ে, আরও উপরে, আরও, আরও। প্রায় মগডালে পৌঁছেছি যখন তখনই থামার হুকুম এলো। গাছের কাণ্ড আর একটি মোটা ডালের সন্ধিস্থলে ঘোড়ার মতো দু'দিকে দু পা ঝুলিয়ে বসলাম আমি। দুটি-পা শূন্যে ল্যাগ্‌ব্যাগ করে ঝুলতে লাগলো।

যে-পরিমাণ চেঁচামেচি হলো তাতে মনে হলো যে, মাইল দুয়েকের মধ্যেও কোনও জানোয়ার যদি থেকে থাকে এবং সে যদি আত্মহননকামী ব্যর্থ প্রেমিক না হয়, তবে এই বীরপুঙ্গবদের হাতের গুলি খেতে কখনওই আসবে না। এই 'গুলি' তো সুখাদ্যের মধ্যে আদৌ গণ্য নয়।

সভয়ে নিচে চেয়ে দেখলাম, পাঁচকড়িদাদা উলঙ্গবাহার হয়েই, তাঁর কাঁধের ঝোলা থেকে একটি কালো-রঙা গামছা বের করে পরে নিলো। তারপরই গাছে উঠতে লাগলো। উঠলো, উঠলো, উঠলো; ততক্ষণই উঠলো যতক্ষণ না তার মাথাটি আমার পায়ের পাতার ইঞ্চি ছয়েক নিচে রইলো। তখন থেমে গিয়ে জাঁকিয়ে বসে আমার ডান পায়ের তলায় একটা চিমটি কেটে বললো, সিগন্যাল দেব এই পায়ে আসল আসল সময়ে। বুয়েচিস্।

"বাইক" বস্তুটিতে লজ্জাস্থানের সামনেটুকুই শুধু ঢাকে। সমস্ত পেছন উদোমই থাকে বলতে গেলে। তাই পশ্চাৎদেশের নিরাবরণ কোমল মসৃণ ত্বকে কাঁটাগুলো বড়ই লাগছিলো।

পাঁচকড়িদাদা বললো ওপরে তাকিয়ে, তোর মাকাল ফলের মতো পেছনটা একবার যদি চোকে পড়ে তবে যে কোনও জানোয়ারই বহুদূর থেকে দেখে অ্যাট্রাকেটড্ হয়ে চলে আসবে। চিন্তা করিস্‌নি কোনো।

তারপর বললো, ভালো করে চেয়ে দ্যাক্। সামনের ঐ কুলগাছটা অবধি বন্দুকের

রেঞ্জের মধ্যে পাবি। ঐ গণ্ডীর মধ্যে কেউ এলেই ঠুকে দিবি। আমার নাম নিয়ে।

আমি চিন্তিত হয়ে বললাম, পাঁচকড়িদাদা, কিন্তু যদি পেছন দিয়ে আসে ? জানোয়ার ?

আঃ। পেছন দিয়ে তো আমরা এলাম। ওরা পেছন দিয়ে আসবে কোন্ দুঃখে ?

এই প্রথম আমার গুরুর কথায় অবিশ্বাস হলো।

গুরু বললো, গুলি ভরে নে। বাঁ দিকের ব্যারেলে বুলেট আর ডান দিকের ব্যারেলে এল্-জি। তোর পিসের বন্দুকের দুটি ব্যারেলই চোকড্। চিন্তার কিছু নেই। আর কতাবাত্‌রা কিন্তু একদমই বন্ধ। মনে থাকে যেন। এখানের জানোয়ারেরা সব কথা বোঝে।

আমাকে কথা বলতে মানা করে এদিকে পাঁচকড়িদাদা নিজে একাই এমন চিৎকার করছিলো যে, মনে হচ্ছিলো বিয়েবাড়িতে শুভদৃষ্টি হচ্ছে।

একটা কথা।

আমি বললাম।

আবার কী কতা ?

বিরক্ত গলায় বললো লোকাল গার্জেন।

কোন্ কোন্ জানোয়ার আসতে পারে ? পাঁচকড়িদাদা ?

আমার গলার স্বরে, আমি যে ভয় পেয়েছি তা বুঝতে পেরেই বললো, গণ্ডার, হাতী আর বুনোমোষ এই জঙ্গলে নেই। বুয়েচিস্। তাছাড়া সবই আসতে পারে। বাঘ এবং চিতা এবং শুয়োরেরই আসার চান্স অবশ্য বেশি। আর কতা নয় একটাও। এত কোশ্চেন কেন ? মেরেছিস তো এর আগে একটা বক। তোর কাছে সবই বিগ গেম। যা কিছু চারপেয়ে হেঁটে আসবে তাকেই আমার নাম স্মরণ করে শুইয়ে দিবি।

আমি বললাম, পাঁচকড়িদা, দু-একটা কথা কি ইংরিজিতেও বলতে পারি না ?

পাঁচকড়িদা এবারে চিন্তাতে পড়লো একটু।

ভেবে বললো, মাত্র দু-একটাই। ওরা হয়তো ইংরিজি নাও বুঝতে পারে।

চোখ এবং কান এবং নাক সজাগ রেখে সামনে তাকিয়ে বসে রইলাম। আবারও উৎকর্ণ, উন্মুখ এবং যাবতীয় "উঃ" হয়ে।

আমরা চুপ করে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো জঙ্গলের অনেক কিছুই বলার ছিলো আমাদের। এতক্ষণ বলার সুযোগই পায়নি সে। পশ্চিমে মুখ করে বসেছি আমরা। সূর্য ডুবতে এখনও দেরি আছে আধঘণ্টাখানেক। সূর্য ডোবার পরও ফাঁকা জায়গায় এবং জঙ্গল যেখানে পাতলা, সেখানে আলোর আভা থাকে অনেকক্ষণ।

জায়গাটাতে অনেকরকমই গাছ। আমি শুধু বাঁশ আর শালগাছ চিনলাম। নানারকম রঙীন ফুলভরা ঝোপঝাড়ে ভরা জঙ্গলের তলা। গরমের সময় বলে বেশির ভাগ গাছেরই পাতা ঝরে গেছে। উপরে অসংখ্য হাত তুলে নাগাসন্ন্যাসীর মতো এক জায়গাতে দাঁড়িয়েই হেঁটে যাচ্ছে ওরা। বেচারারা। বড় কষ্ট ওদের। যেখানে জন্মায়, সেখানেই মরে। চলার আনন্দ যে কী তা ওরা জানলো না।

নিচে হলুদ, কমলা, নীল, সাদা এমন কি কালচে রঙা ছোটো ছোটো একরকম ফুল-ধরা গোল-গোল পাতা-ভরা ঘন ঝোপ। এই ঝোপের নাম জানি না। নাম তখন জানি না প্রায় কোনও কিছুরই কিন্তু ভারি ভালো লাগছিলো পাহাড়ের পর পাহাড় আর বন জঙ্গলের সবকিছুই। কেন যে ভালো লাগছিলো এতো, বুঝতেও পারছিলাম না।

ময়ূর ডাকছে এবার পেছনের ঘন জঙ্গল থেকে। ডাক তো নয়, জঙ্গলের বুক যেন তার

BanglaBook.org

আওয়াজের ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে দিচ্ছে। বাঁদরেরা হুপ্-হুপ্ করে ডাকছে নানারকম। নাম জানি না আমি কারোরই। সেই মেচ-সর্দারের বাড়ির দিক থেকে ডাকা কোকিল আর হলুদ বসন্তের নাম ছাড়া। পাথরের খোঁজ-খাঁজ থেকে ঝাঁঝালো গন্ধ বেরুচ্ছে দিনশেষে। একেই কি শিলাজতু বলে। গাছ থেকে ঝরে-যাওয়া পাতাদের লাল হলুদ খয়েরী শাড়ির মতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে পাথর আর লালমাটির উপর দিয়ে মন্থর হাওয়াটা। মচ্‌মচ্ করে শব্দ করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে খট্‌খটে শুকনো পাতারা পাঁপর ভাজার মতো। নানা নাম-না-জানা ফুলের গন্ধে ভরে যাচ্ছে একটি আনন্দে উদ্বেল কিশোরের নাক। ঐ উঁচু গাছের উপরে বসে থাকায়, বহুদূর অবধিই চোখ যাচ্ছে পাহাড়তলির ভিতরে। একটি ছোট্ট নদী চলে গেছে এঁকেবেঁকে, পাথর আর বালি বুকে করে নদীটা মাঝে মাঝে আড়ালে পড়ে গেছে জঙ্গলের। বড় বনমুরগীর একটা মস্ত ঝাঁক নদীর খোলের মধ্যে নেমে জল খাচ্ছে। ওপাশ দিয়ে একদল হরিণ এলো। গায়ের রঙ তাদের সোনালি। তার ওপর কালোর টিপ বসানো সাদা গোল গোল ছাপ। পশ্চিমে মুখ করে রয়েছে ওরা। মাথা তুলে দেখছে বারে বারে। নরম লাল রোদ এসে পড়েছে ওদের গায়ে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। বন্দুকের রেঞ্জের অনেকই বাইরে। রাইফেল থাকলে হয়তো মারা যেতো। কিন্তু আশ্চর্য। মারামারির কথা একবারও মনে হচ্ছে না। সব কিছু মিলিয়ে মোহাবিষ্ট হয়ে গেছি আমি। হরিণগুলো টঙ্-এ বসা দুই মূর্তিকে দেখতে পেল। হঠাৎ বড় হরিণটি, শিঙাল, দু'বার ডাকলো। কী দারুণ ওদের ডাক। শুনিনিও তো কখনও তার আগে। সর্দার ডাকতেই, সোনার হরিণের দল সোনার চৈত্রবনে সোনার আলোর মধ্যে থেকে বনের মধ্যের মরীচিকার মতো সোনালি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

অনেকক্ষণ বসে থেকে এবং লাল পিঁপড়ের কামড়ে পেছনটা যখন প্রায় অসাড় হয়ে এসেছে তখন একবার মনে হলো কিছু একটা শিকার করতে পারলে বেশ হতো। বাহাদুরি করা যেতো তাহলে তামারহাটে ফিরে। লণ্ঠনের আলোতে চক্‌চক্ করে উঠতো পাঁচকড়িদার কিশোরী বোনেদের উদ্বেল চোখ আমার প্রশস্তিতে।

মনে হলো, শিকার কি মানুষে শুধুই বাহাদুরীর জন্যেই করে ? কে জানে ? নইলে এই মারামারি কেন ?

রতুজেঠুর মেয়েদের কথা আজ মনে হলে মনে হয়, আহা ! ভালোলাগা কতই সহজে আসতো তখন। ভালোবাসা কত ঘন ঘন। জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই আড়ষ্টতা ছিলো না কিছুমাত্রই। জীবনের চাল ছিল স্বচ্ছতোয়া পাহাড়ি ঝর্নারই মতো। কে জানে, রতুজেঠু বেঁচে আছেন কি না। কী করে পাঁচকড়িদাদা ? সেও কি বুড়ো হয়ে গেছে ? কোন্ সুদূর পাহাড়ে এখন সে তার স্বাধীনচেতা জীবন কাটাচ্ছে কে জানে ?

আর সেই সুন্দরী একঝাঁক মেয়ে ? তারাও প্রৌঢ়া ? নিশ্চয়ই মা, দিদিমা। জীবনটা বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। বিচ্ছিরি !

শিকার নাই হলো। বন-জঙ্গলের মধ্যে এলেই যে দারুণ ভালো লাগে। মনটাই অন্যরকম হয়ে যায়। চোখ-নাক-কান যা রোজ এবং সবসময়ই দেখে শোনে এবং যা কিছুর গন্ধ নেয় তা থেকে অন্য কিছু, আলাদা কিছু দেখতে শুনতে পেয়ে, নতুন নতুন গন্ধ নিয়ে নাকে নিজেকে একেবারে টাট্‌কা আন্‌কোরা নতুন করে তোলে। অন্য মানুষ একটা। মনে হয়, এইই বোধহয় আসল মা আমার। সকলেরই মা। এই প্রকৃতি। অন্য মা।

পশ্চিমের আলো দেখতে দেখতে মরে এলো। পশ্চিমে সূর্যের আলো কমার সঙ্গে সঙ্গে পূবে চাঁদের আভাস জাগতে লাগলো। দুটি বড় পাখি, ছাই-রঙা, লম্বা ঠোঁটের ;

BanglaBook.org

নিষ্কম্প-ডানায় গ্লাইডিং করে ভেসে ভেসে দিনের রাজ্য থেকে রাতের রাজ্যে রাতের খবর নিতে গেলো, তাদের ডানায় দিনশেষের গন্ধ আর উষ্ণতা মেখে। পশ্চিমাকাশে নীল আর সবুজে-মেশা সন্ধ্যাতারাটি আকাশের আলো স্তিমিত হতেই আলো আর অন্ধকারের মধ্যবর্তী এলাকার নো-ম্যানস্ ল্যান্ডের প্রহরীরই মতো জেগে উঠলো যেন। আর সেই সঙ্গে চাঁদও। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই চাঁদ উঠলো।

না-সূর্য, না-চাঁদের গোলমেলে মুহূর্তটিতেই পশ্চিমের দূর নদীটির দিক থেকে হঠাৎ গুম-ম্-ম্ করে একটি আওয়াজ হলো। বন্দুকের গুলির আওয়াজ।

আমার পায়ের নিচে মাথা দিয়ে বসে থাকা গুরু বললো, গম্ভীর গলায়; কোন্ হারামজাদা! কে জানে? গাদা বন্দুকের আওয়াজ।

বন্দুকের আওয়াজের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঁ-আঁ-ও-উ করে প্রচণ্ড এক চিৎকারে বন-পাহাড় গম্‌গমিয়ে ডেকে উঠলো বড় বাঘ। সেই ডাক খোলা জঙ্গলে নিজ কানে না শুনলে কখনও বোঝানো যাবে না অন্যকে যে তা কী রকম।

তার একটু পরেই দেখলাম, নদীর রেখা ধরে মালকোঁচা মেরে ধুতি-পরা, খালি-পা, খালি গায়ের একজন ছোটোখাটো লোক দৌড়ে আসছে এদিকেই। আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইলাম। লোকটি মনে হল মেচ্-বস্তিতেই যাবে। যখন একেবারে কাছে চলে এলো তখন দেখলাম যে, বড় কেউ নয়, আমারই বয়সী একটি মেচ্ ছেলে তার মাথা সমান একটা গাদা বন্দুক নিয়ে তীরের বেগে দৌড়ে আসছে। বন্দুকের ভারে সে প্রায় চাপা পড়ে গেছে। বেশ বেঁটে ছেলেটি। সে ঐ লম্বা বন্দুকটি ছুঁড়লো কী করে, কে জানে?

পাঁচকড়িদাদা চিৎকার করে ডাক্‌লো ওকে। নামটা যে ঠিক কী, তা বুঝতে পারলাম না।

ছেলেটি শিমুলগাছের মগডালে ন্যাংটো ব্রহ্মদৈত্যের মতো আমাদের দেখেই বোধহয়, যে ভয়ে দৌড়ে আসছিলো তার চেয়েও বেশি ভয় পেয়ে তার দৌড় আরও জোর করলে।

পাঁচকড়িদাদাও ভয় পেয়েছে কি না বোঝা গেলো না।

বাঘের ডাকের অনুকরণ যেন তখনও উঠছিলো দূর-দূরান্তরে। চিড়িয়াখানায় বাঘের ডাক শুনেছিলাম। কিন্তু কলকাতাবাসী আমার কাছে ঐ বনের বাঘের ডাকের রহস্য, যে ভয় এবং গারদভাঙ্গা মুক্তিরও স্বাদ বয়ে নিয়ে এলো তা বোঝাবার নয়।

ঘুড়ি-ওড়ানো আর ক্যারাম-খেলা অথবা স্কুল-টিমে ফুটবল খেলার চেয়েও অনেকই বেশি রোমাঞ্চকর এক স্বাদু জীবনের স্বাদ পেলো সেই নওল কিশোর। এই বন-জঙ্গলের জীবনকে একবার যে বুকের কাছে অনুভব করেছে, তার উষ্ণতার ভাগ একটুও পেয়েছে সে নগর-সভ্যতার অনেক সস্তা আনন্দকেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে অবহেলায়।

ছেলেটি কিছুটা অন্য দিকে গিয়ে, তারপর দাঁড়িয়ে পরে ভালো করে নিরিখ করে আমাদের গাছের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো। তারপর মেচ্ পাঁচকড়িদাদাকে চিনতে পেরে বন্দুকটা শিমুল গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে রেখে গাছের নিচে ধপাস্ করে বসে পড়লো। নিশ্চিন্তে। দুজন বিদেশি-টোটার বন্দুকধারী শিকারিকে দেখে বোধহয় তার ভয়-পাওয়া মন ভরসা পেলো।

আমরা গাছ থেকে নেমে পড়লাম। জামাকাপড় পরে ভদ্র হলাম। প্রায়-উলঙ্গ আমাকে ছেলেটি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করছিলো।

কী হয়েছিলো? বলো।

পাঁচকড়িদাদা বললো।

ও তখনও হাঁফাচ্ছিলো।

BanglaBook.org

হাঁপাতে হাঁপাতেই বললো, একটা হলদু গাছের নিচু ডালে সে বসেছিলো গাদা বন্দুকে আড়াই-আঙুল বারুদ গেদে নিয়ে। শুয়োর মারার জন্যে। বাড়িতে দিদির বর এসেছে। ভগ্নীপতি কাজ করে গোলোকগঞ্জের কাঠ-চেরাই কলে। মা বলেছিলো, যদি শুয়োর পায় তাহলে জামাইকে যত্ন করে খাওয়াতে পারে। শুয়োরের প্রার্থনাই ছিলো। কিন্তু হঠাৎ এলো বাঘ। সে যাচ্ছিলো জলে। বাঘ বলে বাঘ! একেবারে লাল। সোনা-লাল। কালো-ডোরা। বনের সরু পথটা ঘুরতেই চোখাচোখি। মুখ তুলতেই সে দেখল আমাকে। আর আমি তাকে। মাটি থেকে মাত্র তিন হাত উপরের ডালে বন্দুক হাতে বসে-থাকা আমার চোখে বাঘের চোখ পড়লো। শুয়োর মারবার জন্যে বসেছিলাম। শুয়োর তো গাছে চড়ে না তাই বেশি উঁচুতে উঠিনি।

বাঘের চোখের দৃষ্টিতেই আমি বুঝেছিলাম যে, মতলব আদৌ ভালো নয়। পুরো আড়াই-আঙুল তো গাদাই ছিলো বন্দুক। ইয়াব্বড় এক সীসের তালও ছিলো মুখে। বাঘ কী করে না করে তার অপেক্ষাতে না থেকেই দিলাম তার ঘাড়ে নিশানা নিয়ে দেগে। নিশানা নিতেও হয়নি। বন্দুকতো প্রায় তাক করাই ছিলো পথের দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই হুঁ-আ-ও করে বাঘ তো লাফালো ডাইনে। আর আমিও লাফালাম বাঁয়ে। টুঁ শব্দটি না করে। আর এইই তো! দেখছেন। আপনাদের সামনে।

বাঘের কি হলো?

উত্তেজিত আমি বললাম।

বাঘের কি হলো তা তো কাল ভোরের আগে জানা যাবে না।

লোকাল গার্জেন বললো। মেচ্ ছেলেটিও বললো। সন্ধে নেমে এলেই বন-পাহাড় বাঘের। সান্ধ্য-আইন জারি হয়ে যায় সেখানে। সূর্য উঠলেই সাহস ফিরবে বুকে। আবার যাবে ও বস্তির বড়দের সঙ্গে নিয়ে। বাঘের খোঁজ করতে। মরে গিয়ে থাকলেই ভালো। বেঁচে থাকলে কারও কারও মৃত্যু হতে পারে। শিকারিদের মধ্যে।

জামাকাপড় পরা হয়ে গেলে আমরা তিনজনে একসঙ্গেই ফিরতে লাগলাম। আমি ভাবছিলাম, আহত বাঘটা যদি আমাদের কাছে চলে আসে? ওরা কী করে বোঝে যে বাঘ অন্যদিকে গেছে?

ছেলেটা মেচ্ বস্তির পথ ধরলো।

ফিকে-জ্যোৎস্নায়, আমরা ধরলাম রাঙামাটির পথ।

পাঁচশো গজ যাওয়ার পর আমি বললাম, কালকে আসবে? সকালে? পাঁচকড়িদাদা? ঐ বাঘকে খুঁজে বার করবে?

না।

স্পষ্ট দৃঢ় গলায় উত্তর দিলো গুরু।

কেন? এসো না, আমাকে নিয়ে? এসো, এসো।

এলেও একা আসতে পারি। তোকে নিয়ে আসা একেবারেই যাবে না।

কেন?

লাল!

পাঁচকড়িদাদা নির্জন বনপথে গম্‌গমে গলায় বললো, বনে-জঙ্গলে অনেক বছর ঘুরতে হয়। অনেক গুরুর কাছে পাঠ নিতে হয়। অনেক ভুল, অনেক ভয়, অনেক লজ্জার পাত্র করতে হয় নিজেকে। অনেকের রসিকতার পাত্রও হতে হয়। তারপর, শেখার ইচ্ছে যদি সত্যিই থাকে, তবে একদিন শিখবি। একজন ফুটবল প্লেয়ারের কাছে তোদের কলকাতার

BanglaBook.org

আই. এফ. এ শিল্ড যেমন একজন শিকারীর কাছে বড় বাঘও তেমনই। অনেক দৌড়, অনেক ঘাম অনেক কান্নার পরে পাওয়া যায় তা। যাঁরা বাঘকে তাড়াতাড়ি শর্টকাটে চায়, তাদের জীবন দিয়েই সেই ওপরচালাকির দাম দিতে হয়।

ঐ মেচ্ ছেলেটা তো আমারই বয়সী পাঁচকড়িদাদা। ও তাহলে বাঘকে গুলি করলো কি করে? ও কি সবই শিখে গেছে? এতো সব?

আরে ও যে জঙ্গলেরই ছেলে! জঙ্গলই ওর মা-বাবা। ওর সঙ্গে তোর কি তুলনা চলে? ও অনেক শিখেছে, কারণ জঙ্গলই তো ওর স্কুল, ওর খেলাঘর। ও তো আর তোর মতো ইংরিজি পড়েনি। কিন্তু তবু এখনও সব শেখেনি।

মানে? তাহলে তুমি কেন কাল সকালে ওর সঙ্গে যাচ্ছো না? বাঘ যদি ওকে খেয়ে ফেলে? ওতো বড় নয়। আর শেখার যদি বাকিই থাকে এখনও ওর।

আমি না গেলেও অনেকেই যাবে। লোক কম থাকবে না ওর সঙ্গে। তবে বাঘ কাল সকালে ওকে খেয়ে ফেলবে।

অ্যাঁ?

হ্যাঁ।

ওর গায়ে মৃত্যুর গন্ধ ছিলো।

কি বলছো তুমি?

আমি স্তম্ভিত হয়ে বললাম।

হ্যাঁ রে। ঠিকই বলছি। আমি তান্ত্রিকদের কাছে যাই। আমি এসব জানি একটু একটু।

ঐ ছেলেটা কাল সকালেই মরবে বাঘের হাতে।

মেচ্-বস্তীর অত লোক সঙ্গে যাবে বিষমাখানো তীর-ধনুক আর গাদা-বন্দুক নিয়ে যে! অত বড় বড় লোক সঙ্গে থাকতেও ছেলেটাকে বাঁচাতে পারবে না তারা?

না পারবে না। মৃত্যু যখন কাউকে নেবে বলে ঠিক করে তখন লক্ষ লোকেও তাকে পাহারা দিলেও লাভ হয় না কিছুই। বাঘটাই ওর যম। যম বলেই ও এসেছিলো। এই সবই আগে থেকে ঠিক্-ঠাক্ থাকে। বুয়েচিস্।

অন্ধকার এখন আর নেই। চৈত্র মাসের বন-জ্যোৎস্নায় সুগন্ধি বন ভেসে যাচ্ছে। নানারকম রাত-পাখি ডাকছে বনপথের দুপাশ থেকে। রাতের বেলাও যে এত পাখি জেগে থাকে, জানা ছিলো না। নেশার মতো লাগছে আমার। চাঁদের আলো, গরমে পাতলা হয়ে যাওয়া গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে এসে আলো করছে কালো ছায়াকে। আঁকা-বাঁকা বনপথকে সাদা-কালো ডোরাকাটা শতরঞ্চীতে মোড়া বলে মনে হচ্ছে। পিউ-কাঁহা? পিউ-কাঁহা? কাঁহা-কাঁহা-কাঁহা-কাঁহা করে ডেকে চলেছে পিউ-কাঁহা পাখি।

আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা এই চাঁদের বনে কি করছে কে জানে? সে কি ঝর্নাতে চান করতে গেছে এখন? যে-ঝর্নাতে জিন-পরীরাও চান করে এমন বন-জ্যোৎস্নাতে? পাঁচকড়িদাদা তার সাঁটুলীর কাছে আমাকে নিয়ে আসুক আর নাইই আসুক, আমি ঠিক করলাম মনে মনে যে আমি আবার একাই আসব ওর কাছে। বনজ্যোৎস্নায় অথবা সবুজ অন্ধকারে। আসবই। বড়ই কষ্ট হচ্ছে আমার। পিপাসা একরকমের। এই পিপাসার নাম জানি না।

পাঁচকড়িদাদা হঠাৎই বলল, খবদ্দার। ও কম্মোও করিসনি।

চমকে উঠে আমি বললাম, কোন্ কম্মো?

যে-কম্মোর কথা ভাবছিস।

BanglaBook.org

কী বলছো ?

আমাকে না জিজ্ঞেস করে করিসনি। তুই বলি হয়ে যাবি ওদের দেবতার থানে। এরকম লাল ছেলে পেলে···। ওদের মধ্যেও তান্ত্রিক আছে।

তুমি জানলে কি করে, আমি কি ভাবছি ?

আমি জানি। জানতে পাই।

আমাকে একদিন নিয়ে যাবে পাঁচকড়িদাদা ?

ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বললাম আমি। ভয় করতে লাগল খুবই।

কোথায় ?

তান্ত্রিকদের কাছে।

না।

কেন না ?

সব ছাড়তে হয় সেখানে যেতে হলে।

কী ছাড়ব ? আমার কী আছে ?

যা কিছুই আছে। তুই বুঝবি না এসব। অন্য কথা বল।

তারপরই বললো, বন্দুকের নল থেকে গুলি বের করিস নি তো ?

না। কেন ?

বাঃ রাতের জঙ্গলের মধ্যে যে-কোনো সময়েই যা-কিছু ঘটতে পারে। এখানে প্রতি মুহূর্তেই তৈরি থাকতে হয়। তাছাড়া···

তাছাড়া কি ?

এই আলোকঝারিতেএক্‌রাম ডাকাতের দল মাঝে মাঝে মীটিং করে। টুঙ্‌বাগানেও। তাছাড়াও আছে বুড়ো চিতাটা। টুঙ্‌বাগানে করাত-চেরা ডাক যে-কোনো মুহূর্তেই শুনতে পাবি কাছিম-পেঠা পাহাড়টার ওপাশ থেকে।

তুমি আজ আমাকে শিকার করাতে আনোনি, না পাঁচকড়িদাদা ? শিকার করাতে আনলে অমন মগডালে আমাকে কি উদোম্ করে চড়াও ? লাল পিঁপড়ের কামড়ে-কামড়ে আমার পেছনের যা অবস্থা হয়েছে না।

পাঁচকড়িদাদা হাসলো। খুব কম শব্দ করে। শিশির পড়ার শব্দর মতন। বললো, তোর এখনও কয়েক বছর এমনই রংরুটের দিনই চলবে। একটি জানোয়ারের শরীরে বুলেট ঠুকে দিয়ে তাকে পপাত ধরণীতলে করে দেওয়ার মধ্যে তেমন কোনো পৌরুষ নেইরে বোকা। মেয়েরাও তো কত বাঘ মারে। শিকারীই যদি হতে চাস, তাহলে জঙ্গল-পাহাড়কে চিনে নে আগে ভালো করে। ফুল, পাখি, জানোয়ারদের আগে ভালোবাসতে শেখ। আগে ভালোবাসাটা শেখ, তার পরেই না মারামারি।

তুমি এত সব জানলে কি করে ?

ওই। শিখেছি। আস্তে আস্তে।

হড়বড়িয়া-খর্‌খরিয়া মানুষের জন্যে বন-জঙ্গল নয়। আমি তোর চেয়েও ছোট বয়স থেকেই বাবার সঙ্গে শিকার করছি। আমার বাবা কলেজে যায়নি রে লাল, কিন্তু বন-জঙ্গলের পি এইচ ডি।

তুমি আমাকে শেখাবে, পাঁচকড়িদা ?

না।

কেন ?

BanglaBook.org

আমার লাভ কি ?

মানে ?

শিকার কেউই কাউকে শেখাতে পারে না। একটু-আধটু দেখাতেই পারে মাত্র। এক জীবনে, একজনের যা-কিছুতেই আনন্দ তার সব কিছুই তাকে বোধ হয় একা একাই শিখতে হয়। বড় হ। জানতে পাবি। সব কথা তড়িঘড়ি বোঝাও যায় না। সময়কে সময় দিতে হয় রে পাগলা।

আমাকে তান্ত্রিকদের কাছে নিয়ে যাবে তো ?

বলেছি না, না। তুই কলকাতার ভদ্দরলোকের ছেলে। লেখাপড়া শিখে জজ-ব্যারিস্টার হবি। দেশকে ধন্য করবি। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হবি। টাই পরে আপিস যাবি। তুইও কি মুখ্যু হবি নাকি আমার মতো ? পাগলামি করিসনি। বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোর বাবাকে চিঠি লিখে দিতে বলব কিন্তু কলকাতায় তাহলে তোর পিসেকে।

চুপ করে গেলাম আমি।

সেই বনজ্যোৎস্নায়-ভাসা বনে, বন্দুক-কাঁধে আলোকঝারি পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে টুঙ্‌বাগানের দিকে নামতে নামতে, পায়ের তলায় শুকনো বাঁশের আর শালের পাতা মচ্‌মচিয়ে ভাঙতে ভাঙতে হাঁটতে-থাকা সেই কিশোরটির চিৎকার করে চোখের জলে বলতে ইচ্ছে করলো আমি মুখ্যু হবো, মুখ্যু হবো ; মুখ্যু হবো।

BanglaBook.org

আমি আর পাঁচকড়িদাদা বসেছিলাম মস্ত একটা তেঁতুল গাছের তলায়। নদীর ধারে। এক ঝাঁক ময়না পাখি সেই গাছটা ছেয়ে ছিলো। মিষ্টি-মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে। বাদামি পাল তুলে মন্থর গতিতে নৌকো চলেছে নদী বেয়ে। দূরে রুখু ক্ষেতে লাঙল দিচ্ছে একটি লোক। বর্ষার প্রস্তুতি আর কী!

পাঁচকড়িদাদা চেঁচিয়ে বললো, কী করেন হে?

সে বললো, না করি কোনো।

পাঁচকড়িদাদা শুধলো, কী করেন? আর সে বললো, না করি কোনো।

ভাবখানা এমনই, যেন কিছু করছি তো নাইই এবং করতেও চাই না।

চমৎকার।

পাঁচকড়িদাদাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করা সত্ত্বেও সে রাঙামাটিতে নিয়ে যায়নি আর আমাকে। বলেছিলো কী একই জায়গায় যাবি বারবার। একই পথে যেতে যেতে জীবনে ঘেন্না ধরে যায়। একই জায়গাতে যদি যেতে হয়ই, তবেও নতুন নতুন পথ দিয়ে যাবি। নতুন বাঁক, নতুন গাছ, নতুন ফুল, প্রজাপতি, ঝরনা।

তারপরই হেসে বলেছিলো, নতুন কোনো সাঁটুলী। তা বলে ভুলেও আমার সাঁটুলীর কাছে যাসনি। ও মেয়ে দেখতেই অমন নরম। এক মুহূর্তে লালবাবুর ঘাড় চুষে রক্ত খেয়ে নীল করে আলোকঝারির খাদে ফেলে দেবে।

আতঙ্কিত হলাম আমি ঐ কথা শুনে। পাঁচকড়িদাদা বললো, বয়স অনেকই হলো আমার, বুয়েচিস্। তোকে একটা অ্যাডভাইস্ দিয়ে যাচ্ছি। সারাজীবন মনে রাখবি।

কী?

বড় বাঘের সঙ্গে পেঁয়াজি মারলেও মারতে পারিস, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে কখনও পেঁয়াজি মারতে যাবি না। খুবই সাবধানে থাকবি। সারাজীবন। যে-কোনো সিন্টি-পিটিং সোয়েটার-নিটিং মেয়েই নুন-ছাড়াই খেয়ে একেবারে ছিবড়ে করে সাবড়ে দিতে পারে তোকে। তুই যা ক্যাবলা!

কুড়ি বছর বয়সেই পাঁচকড়িদাদার এত জ্ঞান যে হলো কী করে তা আমি ভেবেই পেতাম না। অবশ্য বয়সের সঙ্গে জ্ঞানের সাযুজ্য কোনোদিনও ছিলো না। কিছু জ্ঞান মানুষ বাইরে থেকে পায়, আর কিছু জ্ঞান ভেতরে ভেতরে তৈরি করে নেয়। মানুষে মানুষে তফাত বোধ হয় এই ভেতরের প্রক্রিয়াটার তারতম্যর কারণেই গড়ে ওঠে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কিন্তু কিছু মানুষ নিঃশব্দ এই প্রক্রিয়ারই কারণে ভেতরে ভেতরে অন্যদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়।

BanglaBook.org

ভাবছিলাম, পাঁচকড়িদাদা যাইই বলুক, আমি একদিন একা একাই যাব রাঙামাটিতে। বাঘকে যে গুলি করেছিলো, সেই মেচ-ছেলেটির পরের দিন কী যে হলো, তা জানতে এবং আমার স্বপ্নে-দেখা রাজকন্যাকেও আরেকটিবার দেখতে। আমার সঙ্গে কি সে কথা বলবে? আমি যে তাদের ভাষা জানি না। কী হবে?

এই লাল, বাঁ দিকে একটু সরে বোস। এক কাজ কর, এদিকেই চলে আয়, বরং।

কেন?

আরে, ঐখানে গর্ত কাছে একটা। একজোড়া খরিশ-গোখরো থাকে ওতে।

সে কী? তা, তুমি এত জায়গা থাকতে এখানেই এসে বসলে?

ওরা আছে তো আছে। আমাদের কী? এই মাঠ, এই গাছের ছায়া, ওদেরও যতটুকু, আমাদেরও তাই। ভালোবেসে থাকলেই হলো। ঝগড়া বাধালেই বাধে, নইলে আর কী।

তারপর একটু চুপ করে থেকেই বললো, তুই এই সব শিকার-টিকার করিস কেন?

করলাম আর কই। একটা তো মাত্র বক।

বকটাই বা মারলি কেন? খেয়েছিলি?

বকের মাংস ভালো নয় খেতে। আমি খেয়েছি। বিট্‌কেল গন্ধ।

না। খাইনি।

খাসওনি? তাহলে মারলি কেন?

দেখলাম, বন্দুক ছুঁড়তে পারি কি না।

সে তো কোনো বড় গাছের ডাল বা কাকতাড়ুয়াকে মেরে দেখলেই পারতিস। সুন্দর একটা প্রাণ। মিছিমিছি নিয়ে নিলি? একটা প্রাণ দিতে পারিস?

আগে ভাবিনি।

ভাবিসনি কেন? ভাব। মানুষতো তুই। পাঁঠারা কী গাধারা তো ভাববার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়নি। মানুষও যদি না ভাবে তো ভাববে কে?

পাঁঠারাও হয়তো ভাবে। ওদের চোখ দেখে তো মনে হয় নিশ্চয়ই ভাবে। কী দারুণ ইন্টেলিজেন্ট ইন্টেলিজেন্ট চোখ পাঁঠাদের।

ভাবতেও পারে।

তোমার নাকি বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে পাঁচকড়িদাদা, ডিঙ্গিডিঙ্গার চা-বাগানের বড়বাবুর মেয়ের সঙ্গে? সত্যি? খুবই সুন্দরী না কি সেই মেয়ে? আমি উৎসুক গলায় শুধোলাম।

ঘাসটাকে দাঁতে কেটে, দূরে ছুঁড়ে ফেলে পাঁচকড়িদাদা বললো, জানি না। বাবার হয়তো পছন্দ হয়েছে। বাবার পছন্দ হলে বাবাই বিয়ে করুক না!

হেসে ফেললাম আমি।

বললাম, রতুজেঠু?

তা কী করবে?

তা তুমি বিয়ে করবেই বা না কেন? সকলেই তো করে।

সকলেই যা করে, আমি তা করি না। সকলে করার মতো কি করে? বিয়ে করে, তারপর শুয়োরের মতো একপাল ছেলেমেয়ে পয়দা করে ল্যাজে-গোবরে হয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। সকলে যাই করে আমি তার কিছুই করব না।

তুমি কি করবে তাহলে?

কেটে পড়ব। এখান থেকে লাইফের মতো কেটে পড়ব। এই তামাকপাতা আর পাটের গন্ধ আমার আর সহ্য হয় না।

BanglaBook.org

আমার বুক ধড়ফড় করে উঠলো ভয়ে। আতঙ্কিত গলায় বললাম, যাবে কোথায় ? রতুজেঠু কি জানেন ?

জানিয়ে কি আর কাটে কেউ ? হেসে বললো, পাঁচকড়িদাদা।

কেন ? কাটবেই বা কেন ?

সত্যি দমবন্ধ-দমবন্ধ লাগে রে এই গর্তে। এখানে কোনো চ্যালেঞ্জ নেই।

কী নেই ?

চ্যালেঞ্জ। বাধা না পেলে নিজের মধ্যে কতটুকু শক্তি আছে তা বোঝাই যে যায় না।

কিসের শক্তি ?

জীবনের। জীবনী-শক্তি। মানুষী-শক্তি। আবার কী ?

তা যাবেটা কোথায় ? কষ্ট হবে না ?

দুসস্। কষ্ট হবে কার জন্যে ? বাবা একদিন বিয়ের পর মায়ের সঙ্গে ইয়ে করেছিলো বলেই তো এলুম এখানে। তুই কি জানিস এসব ? মানে, কী করে কী হয় ?

চুপ করে রইলাম।

মাত্র গত মাসেই পাশের বাড়ির মণ্টু ছাদে ঘুড়ি ওড়ানোর সময় এই তথ্য আমাকে প্রথমে জানিয়েছিলো। শোনার পর দিন-পনেরো আমি মা-বাবার মুখে চাইতে পর্যন্ত পারিনি। লজ্জা এবং একটু ঘেন্নাও করেছিলো। এখনও কাটিয়ে উঠিনি সেটা পুরোপুরি। এরই মধ্যে আবার। গা বমি-বমি করতে লাগলো। চুপ করেই রইলাম আমি।

তা তুমি চলে গেলে জেঠিমা কাঁদবেন না ? রতুজেঠু দুঃখ পাবেন না ? তোমার উপরে এত ভরসা ওঁর।

ছাড়তো। কারো জন্যেই কারো ঠেকে থাকে না। আমি কোন হরিদাস এলুম ? তাছাড়া, কিসের দুঃকু ? চারজন ছেলে মারা যাওয়ার পরই তো বুঁচকিপিসি আমায় পাঁচটি কড়ি দিয়ে কিনে নিলো। দুঃকু-টুঃকু যা পাওয়ার, তা তো প্রথমেই পেয়ে গিয়েছে। তাপ্পর ভগবান একেবারে ঢেলে দিয়েছেন। হারাধনের একটি ছেলে গেলে কেউ জানতে পাবে না পর্যন্ত।

তুমি বড় ছেলে। তোমার কর্তব্য-টর্তব্য...?

আমার সবচেয়ে বেশি কর্তব্য আমার নিজেরই প্রতি। বুয়েচিস্। এখানে থাকলে, সেটাই করা হয়ে উঠবে না। তাছাড়া, বললাম না, কারো জন্যেই কারো ঠেকে থাকে না। ঠিকই চলে যাবে।

কিন্তু তুমি যাবেটা কোথায় ?

পুবে যাবো।

আসাম তো পুবেই।

আরো পুবে।

মানে ?

সূর্যের আরো কাছে চলো যাবো।

কী করতে ?

নিজেকে আলো ফেলে দেখতে। পুবে গেলে আরও বেশি সূর্যি পাবো।

কোথায় যাবে ঠিক করে বলোই না।

ডিমাপুরে যাব, সেখান থেকে ডিফু নদীর পাশে পাশে, নাগা পাহাড়ে উঠে-যাওয়া আঁকাবাঁকা পথ ধরে যাবো কোহিমা। মানিকদা ওয়ারে গেছিলো না ! সব দেখে এসেছে। যা গল্প করে না। লাইফে কিছু দেখে এলো মাইরি।

BanglaBook.org

কোন্ মানিকদা ?

আরে, ঐ তো, তোর পিসের কী যেন হয়। এখন মনা মিত্রের বাড়িতে থাকে না ? ভারী মজার মজার কথা বলে।

ও হ্যাঁ বুঝেছি তারপর বলো।

কোহিমার পরে তাদুবী, আর মাও হয়ে নেমে আসবো ইম্ফলে। নেতাজীর আই· এন· এ· যেখানে ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করলো গত বছরে, সেই লকটাক্ লেক-এর কাছে পৌঁছে দেখে নেবো সেই লড়াইয়ের চিহ্ন। টাটকা আছে তো এখনও সবই।

তারপর ?

তারপর মিথুং শিকার করবো পাহাড়ে, তামা-রঙা পাহাড়ীদের সঙ্গে। তোর মতো গরুর পিঠের পোকা-খাওয়া বক নয় রে লালু ছেলে। মিথুং। রিয়্যাল্ মিথুং।

তুমি কি প্রাণ দিতে পারো ? যে নিজে শিকার করবে মিথুং ?

জানোয়ারের প্রাণ দিতে পারি না, মানুষের প্রাণ তৈরী কি করে করে তা শিখে নিয়েছি তো !

থৈবী-থাম্বার প্রেমের গল্প শুনব মণিপুরী মেয়েদের কাছে। থৈবী ছিলেন রাজার মেয়ে আর খাম্বা ছিলো আমারই মতো একজন সাধারণ ছেলে। আর ইম্ফলের রাজবাড়িতে দোলপূর্ণিমাতে দোল খেলব। আহা ! কী দোল খেলাই হয় সেখানে। কোথায় লাগে তোদের শান্তিনিকেতনের নেকু-নেকু দোল।

আমাদের শান্তিনিকেতন মানে ?

ঐ হলো।

ইম্ফল খুবই ভালো জায়গা। ওখানে মেয়েরা কাজ করে আর ছেলেরা বাড়ি থাকে, ঘুমোয়, নেশা করে। সিংহদের জাতের মতো সিস্টেম। বর্ষাকালে খিচুড়ি খেয়ে ক্যাঁতা গায়ে দিয়ে ঘুমোনোরও এমন জায়গা খুব কমই আছে। আর আনারসেরও। শুধু আনারস খেয়েই থাকবো ঠিক করেছি।

তুমি কি মণিপুরী মেয়ে বিয়ে করে বাড়িতে ঘুমোবে ?

না রে পাগলা। আমি বরং ওখানের মেয়েদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে ঘুমন্ত-পুরুষের লাইফ হেল্ করে দেবো। ছ্যাঃ। বিয়ে-টিয়ের মধ্যে আমি নেই। ওখানে ভালো না লাগলে চলে যাবো ডিব্রুগড়। তারপর ডিগ্‌বয়। ইচ্ছে করলে, সেখান থেকেও বার্মায়। ডিগবয় থেকে আরাকান হিলস্ দেখা যায়। জানিস ? নীল। তামারহাট থেকে আকাশ পরিষ্কার থাকলে যেমন কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়, লাল।

যাবে কী করে ? বার্মাতে ? অন্য দেশ তো। বেড়া নেই ?

ইচ্ছে থাকলে, কোনো বেড়াই বেড়া নয় রে পাগলা।

কবে যাবে ?

তা বলবো না।

পয়সা কোথায় পাবে ?

বাবার আলমারি ভাঙবো। যন্তর-পাতি সব ফিট্ করে রেখেছি। বেশি নেবো না। দিন পনেরোর মতো খরচের মাল নেবো। তারপর নিজের রোজগারে খাব। সে কী সুখ। বুয়েচিস, বাপের ঘাড়ে বসে খেতে, হাত পেতে এক টাকা দু টাকা চাইতে ইজ্জতে বড় লাগে।

রোজগার করবে কী করে ?

দরকার হলে জুতো পালিশ করব। এত লোকে এত ধান্দা করে পয়সা রোজগার করছে

BanglaBook.org

আমি একাই কি পারবো না নাকি ? "কী করে", "কী করে" করেই এই বেঙ্গলি জাতটা গেল। বুয়েচিস। নেঃ ! বিড়ি খা একটা।

বিড়ি খাই না আমি।

কী খাস তাহলে তুই ? ঠিক আছে। আমি চলে যাবার পর তুই একদিন যাস আমার সাঁটুলীর কাছে। খবর্দার। তখন ওর বাবা বুড়ো মেচ্-সর্দার যেন না থাকে। বুড়ো তার দাও-এর এক কোপে তোর ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দেবে। আমার সাঁটুলী তোকে অন্য কিছু খাওয়াবে। তোকে ওর কিন্তু মনে খুব ধরেছেরে। তবে সাবধান। খু-উ-ব সাবধান।

কেন ? সাবধান কেন ?

তা বলব না। তবে সাবধান।

কী বলব গিয়ে ?

বলবি, আমি চলে গেছি। আর ফিরব না। দেখিসই না ও তোকে কী করে।

তোমার বদলে ?

আমার বদলে কেন ? ছিঃ। লাইফে কখনও কারো প্রক্সি দিবি না। নিজের রাইটে যতটুকু পাবার, সেটুকুই পাবি। মাথা উঁচু করে। তোকে, ও তোর নিজের জন্যেই···

আমি যে ভাষা জানি না ওদের।

বললাম, আমি।

আরে পাগল। সে তো মুখেরই ভাষা। শরীরেরও ভাষা থাকে। আলাদা ভাষা। এক দারুণ ভাষা। সে ভাষা পৃথিবীর সব পুরুষ আর মেয়েরাই জানে। ঐ ভাষা একবার শিখলে, দেখবি ভাষার তোড় কাকে বলে। ভেসেই যাবি। ভালোলাগায় মরে যাবি রে পাগলা।

তুমি জানো সে ভাষা ?

না জেনে কি আর বলছি। পরের মুখে ঝাল খায় না পাঁচকড়ে বিশ্বেস।

কেমন লাগে ?

কী বলব মাইরি ! তখন মনে হয় যে, ছেলেবেলায় আমাকে রোজই গাঁট্টা-মারা পাঠশালার পণ্ডিতমশাইকে তো বটেই, এমনকি গোলোকগঞ্জের ফুটবল টিমের হাড়ে-হারামজাদা সেন্টার ফরোয়ার্ড, কন্টিন্যুয়াসলি ল্যাঙমারা ন্যাপাকেও ক্ষমা করে দিই···। যাস্। যাস। তোরও তাই মনে হবে। আরামে, আনন্দে মরেই যাবি। তোকে দেবার মতো তো কিছুই নেই আমার। এই ব্লেসিংটুকুই দিয়ে গেলাম চলে যাবার আগে।

বলেই, গা শিউরে উঠলে যেমন করে কেউ, তেমন করে বলে উঠলো : উরি ব্যাবাগো, ম্যাগো···কী রি-রি-রি-ভ্যালোলাগা গো।

পাঁচকড়িদাদার কথা শুনেই আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগলো। আনন্দে, না ভয়ে বুঝতে পারলাম না।

বললাম, সত্যি। তুমি কতো জানো।

হাঃ। জানি কী রে ? কিস্সুই জানি না। জানব বলেই তো বাড়ি ছেড়ে বেরুচ্ছি। কত বড় পৃথিবী। কত্তো দেশ। বার্মিজ মেয়েরা নাকি লুঙি আর ট্রানস্পারেন্ট ব্লাউজ পড়ে থাকে। জানিস ? থোড়ের মতো তাদের গায়ের রঙ, হিজলগাছের মতো থাই। শালা। লাইফে রিয়্যাল ক্যান্টর করে বেরিয়ে যেতাম শুধু তোর মতো গায়ের রঙটা যদি পেতাম। তবু লড়ে যাবো। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। যে যতটুকু নিতে পারে এই পৃথিবী ততটুকু তার।

তারপর পাঁচকড়িদাদা একটু চুপ করে থেকে বললো, আচ্ছা লাল। তুই শ্রীকান্ত পড়েছিস ? চরিত্রহীন ?

BanglaBook.org

না তো। আমাকে বাবা রুডওয়ার্ড কিপ্‌লিং, শার্লক হোমস, এই সব বই কিনে দিয়েছেন। গত জন্মদিনে। বাড়িতে বুক অব নলেজ আছে। রবীন্দ্রনাথের বই। আরণ্যক, বিভূতিভূষণের।

ছাড়্ ছাড়্। তুই শরৎবাবু পড় তো। বেঙ্গলে রাইটার বলতে ঐ একটাই। লোকটা নিকতো ভালো। বেশির ভাগ রাইটারই তো মাল ছড়াচ্ছে আজকাল। পাতাই ভরাচ্ছে দুম্‌স্। ভালো কতা, বয়স কত হলো এখন তোর?

বারো।

ছ্যাঃ। বারো বছরের ছেলেরা ইংল্যাণ্ডের হয়ে রাইফেল হাতে লড়ে জার্মানদের হারিয়ে দিলো। বারো বছরের দিশি মেয়েরা গব্বতী হয়, ছেলে প্যায়দা করে দেয়। আর তুই? "পেট-ফাঁসানো রতে"র চামচে হয়ে গো-বক মেরে বেড়াচ্ছিস। ছ্যাঃ ছ্যাঃ। করার মতো কর কিছু।

চলো, এবার ওঠো।

দাঁড়া না, গফুর মিঞা আসবে। এক নম্বরের হারামি হয়েছে শালা। আমার গাঁজার কল্কেটা ফেরত দেবার নাম নেই। সেই কবে নিয়েছে।

তুমি গ্যাঁজা খাও?

চোখ বড় বড় করে বললাম আমি।

শুধু গ্যাঁজা কেন রে লালু ছেলে, যা কিছু সুখাদ্যির মদ্দে পড়ে সবই খাই। তুই কখনও খেয়েছিস?

কী?

আমার মুখ লাল হয়ে গেলো।

ন্যাকা। খেয়ে দেখলে বুঝবি। কোথায় লাগে বিবি-পসন্দ্ আম।

ভীষণ অপ্রতিভ হয়ে বললাম আমি, তুমি ভীষণ অসভ্য।

পাঁচকড়িদাদা হাসলো হাঃ হাঃ করে।

বললো, ওরে মাস্তু আমার। নেকু-পুষু-মুবুরে। দেখি, দেখি, কাছে আয় তো তুই আসলে ছেলে, না মেয়ে দেখি ভালো করে। কতায় কতায় মেয়েদের মত 'অসভ্য' 'অসভ্য' করিস।

আমি ভয়ের চোটে উঠে পড়ে, পিসেমশায়ের বাড়ি বলে দৌড় লাগালাম। কান গরম হয়ে গেছিলো আমার। শরীরের মধ্যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো। সেদিন জানা ছিল না যে, এই শরীরে অনেকই এবং অনেকরকমই কষ্ট কুলিয়ে যাবে পরে। জানা ছিলো না, এক জীবনে, এক শরীরে অনেক কিছুই আঁটে। একটি মনেও।

পাঁচকড়িদাদা পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললো, আররে বুদ্ধু, দৌড়ে যাবি কোথায় তুই? আমার কাছ থেকে তো পালালি, নিজের কাছ থেকে পালাতে কি পারবি? সারাজীবন দৌড়ে গেলেও পারবি না।

দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি।

পাঁচকড়িদাদা উঠে, হেঁটে এলো আমার কাছে। বললো, চল্ বাড়িই যাই। খিদেও পেয়েছে খুব। নদীর পথটি যেখানে হাটের কাছে মিশেছে এসে, সেই মোড়ে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললো, যখনই দৌড়বি, ভেতরের দিকে দৌড়বি। কোথায় দৌড়ে মরবি বাইরে বাইরে? নিজেকে ভালো করে জানার আগেই তো রঙ-মশলার মশলা শেষ হয়ে যাবে। মনে রাখিস তোর এই মুখ্যু মাস্টেরের কথাটা। আমি তো কেটে যাবো পুবে। আর দেখা হয় কি না হয়!

BanglaBook.org

শীতের দুপুর। গঙ্গাধর নদীর উপরে নৌকোতে চলেছি আবু ছাত্তারের সঙ্গে। এই নদীর দুপাশে বালির খাড়া পাড়। হাওয়া এসে হাত বোলাচ্ছে বেদুইন মেয়ের উরুসন্ধির মতো উজ্জ্বল নরম, পেলব আলো-কালো বালির উষ্ণ শ্রীঅঙ্গে। ফিসফিস করে কথা কইছে বালি আর হাওয়া, হাওয়া আর বালি, যেন মধুচন্দ্রিমার জুটি। ঝুরঝুর করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে বালি পরমুহূর্তেই কুলকুল করে বয়ে-যাওয়া নদীর জলে।

মাথা-উঁচু করে, সোনা-রঙা চখা ডেকে উঠল পারের গভীরের বালিয়াড়ি থেকে সংক্ষিপ্ত, শুদ্ধ স্বরে। চখী, তার দীর্ঘ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে ভেসে-যাওয়া নৌকোকে। নির্জন, নিস্তব্ধ দুপুর বেলার নদী বেয়ে যেতে যেতে সেই চখার বিধুর স্বর বুকের মধ্যে সুপ্ত থাকা সমস্ত কটি শুদ্ধস্বরের তারগুলিতে যেন হঠাৎই একসঙ্গে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। মানুষ আর মানুষীর বুকের মধ্যে কত কীই যে থাকে! তোলপাড়করা বুকের মধ্যে ডুবুরি নামিয়ে খুঁজে-খুঁজেও কতটুকুই বা খোঁজ মেলে! যা খুঁজে পাওয়া গেল বলে জানা যায় সেটুকুকেই সব বলে মেনে নিয়ে সহজ সুখের কনসোলেশান প্রাইজ নিয়েই কেটে যায় দিন।

আর কতদূর? সংকোশ? ছাত্তার?

দূর আছে লালদা।

কতদূর?

তা আরও ঘণ্টা দুই তো বাওন লাগবো বটেই নৌকাখান্। কী কও নাছিরুদ্দি ভাই?

বলেই, মাঝির দিকে তাকিয়ে কনফার্মেশন চাইলো।

নাছিরুদ্দির ছেলে অহিমুদ্দি বসেছিলো হালে। সে বলল, তার চেয়ে এট্টু কমই লাগবো।

তবে চলো ফিরি। ফিরতে ফিরতে তো রাত হবে। শীতের বেলা।

আমি বললাম।

কন কী লালদা? এরই মধ্যে? ক্যান?

হ্যাঁ। আজ বরং ফিরেই চলো। কাল খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে বেরোবো না হয়। তাছাড়া কী আছে সংকোশে? দেখার?

সংকোশই। নদীখানই তো যথেষ্ট। শীতের সংকোশ। তাও আমাগো এখানের।

ও।

আমি স্বগতোক্তির মতো বললাম।

ছাত্তার বলল, নাই কী তাই কয়েন? লাল নীল সবুজ হলুদ সব রঙ-বেরঙা পাথর জলের নীচে। রঙীন মাছে সাঁতরাইয়া যায় বিলাতি ক্যালেণ্ডারের ছিন্-ছিনারির মতো আরসিপারা জলে। আর তারই মইধ্যে মইধ্যে ভাংস্যা বেড়ায় রাজহাঁস। সাদা। এক্কেবারেই সাদা।

BanglaBook.org

গাজনের মেলার বুড়ির চুলের মতন নরম। আর পোচার্ড, ম্যালার্ড, পিন্-টেইল, নাক্টা গাগানি, দ্যাশ-বিদেশের হাঁসা-হাঁসির হিস্‌হিসানি, প্যাঁকোড়-পঁকড়ে জল এক্কেরে গরম হইয়া থাহে। একজনে এট্টা ফায়ার কইর‍্যা উড়াইলেই হইলো আর কী তারপরই পটাপট ফেলাইং মাইর‍্যা ধপাধ্বপ্ ফেলান। তবে অবশ্য একদিন আগে কাউরে পাঠাইয়া ফ্লাইট-লাইনের খোঁজ-খবর ভালো কইর‍্যা লইয়া লওন দরকার। আপনের বাবায় যখন গেল-শীতে আইছিলেন না, বড়দিনের সময়, তহন তো সংকোশে আইছিলাম সক্কলে মিল্যা। সে কী কাণ্ড। যেমন খাওন-দাওন, তেমনই শিকার। গুহ সাহেবের কাণ্ড-মাণ্ডই আলাদা।

ভুস্‌স্ করে একটা শুশুক ভেসে উঠলো নৌকোর পাশে। তারপর তার ভেজা কালো চকচকে শরীরটা ভিস্তিওয়ালার ভিস্তিরই মতো উল্টে দিয়ে ঝুপুস্ করে ডুবে গেল আবার। দুলে উঠলো নৌকোটা। অছিমুদ্দি হালটাকে ডান দিকে টেনে নিয়ে আস্তে চলা ছোট্ট নৌকোটাকে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে দিল একটু।

উপরে ছই-টই নেই কোনো। নিচের পাটাতন থেকে সামান্য জল চুঁইয়ে উঠছে। আমার জুতো-জোড়া তুলে রাখা আছে পাটাতনের উপরে, পাছে নৌকোর খোলের জলে ভিজে যায়। ছাত্তার খালি পায়েই এসেছে। হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তুলে গুয়া পান খেতে খেতে ভেসে চলেছে দুষ্ট-দুষ্ট মুখে এদিকে-ওদিকে দেখতে-দেখতে। আমাদের খালি পায়ের পাতা সপ্‌সপ্ করছে নৌকোর ভেজা খোলে। মনে হচ্ছে, নদীরই উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি যেন। নতুন রঙ হয়েছে, তাই গাব-গাব গন্ধ বেরুচ্ছে নৌকোটা থেকে।

দুপাশের বালিময় উঁচু পাড়ের গর্তে উদ্‌বেড়ালদের অনেকই বাসা। একজোড়া উদ্‌বেড়াল নেমে এলো জড়ামড়ি করতে করতে খাড়া পাড় বেয়ে তাদের ক্ষুদে ক্ষুদে পায়ের পাতায় মিহি বালি উড়িয়ে। তারপরই নেমে গেলো জলে। আরেকজন ব্যস্তবাগীশ উঁচু পাড় থেকেই একটি ডাইভ মারলো ঝপাং করে নিচে। মাছ দেখে থাকবে হয়তো। লাফালো, তা প্রায় ফিট কুড়ি উপর থেকে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার হীরে আচম্বিতে চমকে উঠল মাঝ-দুপুরের উল্লসিত উৎসারিত উত্তপ্ত জলকণায়। নদীর ডান পাড়ের মরা-ঝিকার ডালে বসা মাছরাঙা খুবই উঁচু গলায় উদ্‌বেড়ালদের ধমকে দিল, কে রে ? কে রে ? কেরে ? কেরে ? কেরে ? করে।

মাছের গন্ধ, উদ্‌বেড়ালের গায়ের গন্ধ, বালির গন্ধ, রোদের গন্ধ, এবং হাওয়ার গন্ধের মধ্যেও নদীর গায়ের গন্ধকে আলাদা করে চেনা যায়। এই দুপুর বেলায় আপন মনের নদীর গায়ের গন্ধটা সকাল বেলার গন্ধর থেকে একেবারেই আলাদা। নারীরই মতো, প্রত্যেক নদীর গায়ের গন্ধই আলাদা।

এখানে খুব মাছ আছে। না, ছাত্তার ?

শুধোলাম আমি আবু ছাত্তারকে।

মেলাই। তবে, জিঞ্জিরাম নদীর মতো নয়।

জিঞ্জিরাম নদী ? সে কোথায় ?

গারো পাহাড়ের পায়ে পায়ে শাড়ির পাড়ের মতো বয়ে গেছে সে নদী গারো আর রাভাদের ছোট ছোট গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে। যাবেন নাকি কুমির মারতে ? তো চলেন যাই একবার। তবে ওখানে গেলে ভরা-বর্ষায়ই যাইতে হইব। জিঞ্জিরামে কুমির শিকারের সময় সেটাই ! অন্য জায়গার নদীতে যেমন শীতেই সুবিধা। নদীটা ছোট্ট, মানে চওড়াতে। তবে গভীর খুবই। একেবারে গারো পাহাড়ের পায়ে পায়ে খাদের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে তো। আর কুমিরই বা কত্ত ! আর কত্তরকম। মুখ-সরু ঘড়িয়াল, মাছ-খেকো কুমির।

BanglaBook.org

থ্যাবড়া মুখের সাংঘাতিক সব মানুষ-খেকো। বুড়ো কুমিরগুলোর মাথার চামড়া ঘোঁট পাকিয়ে পেকে গিয়ে ঘটের মতো হয়ে থাকে তাই রাভা, আর গারো উপজাতিদের লোকেরা তাদের বলে 'ঘটওয়ালা' কুমির। প্রতি বছরই বহু রাভা আর গারোরা ওদের খাদ্য হয়। মেয়েরাই অবশ্য বেশি। নদীর সঙ্গে ওদেরইতো যোগ বেশি। ঘন-ঘোর বর্ষাতে কালো আকাশের নীচে ফুসুম-ফুসুম হাওয়া বয় একটা। ভেজা-ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে। সেই হাওয়াতে জলের গন্ধ, গারো পাহাড়ের গায়ে গায়ে ফোটা বুনো চাঁপাফুলের গন্ধ, বৃষ্টির গন্ধ, মাছের গন্ধ, কুমিরের গায়ের গন্ধ, নৌকোর ছইয়ের নিচে বসে মাঝির কাঁচালংকা কালোজিরে দিয়ে রান্না করা আহা-স্বাদের ভাঙনি মাছের গন্ধ, সব মিলে মিশে ভাসতে থাকে তখন। আহা। মনটা এক্কেরে ঢিকুম-ঢাকুম করে।

কী করে বললে ?

ঠিকই কই। হঃ লাল্‌দা। এক্কেরে ঢিকুম্‌-ঢাকুম্‌ করে।

করতেও বা পারে ছাত্তারের মন ঢিকুম্‌-ঢাকুম্‌। কখন কার মন যে কী করে তা একমাত্র সেই মনের মালিকই বলতে পারে।

তাছাড়া অন্য কারো মতোই তো ছিল না আবু ছাত্তার। একেবারে পুরোপুরিই নিজের মতোই ছিলো সে। ছাত্তারকে প্রথম দেখি বোধহয় উনিশশ' চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশে। তামারহাটেই। তারপর ষাটের দশকের শেষ অবধি ছাত্তার আমাদের সঙ্গে অনেক জায়গাতেই শিকার করেছে। দাগী চোরা-শিকারী বলে ওর কুখ্যাতি ছিলো। দুবার বাঘের হাতে আহতও হয়েছিল ও। নাকি একসময় গণ্ডার পর্যন্ত মেরেছিলো চুরি করে।

একথাটা ও বলেনি। লোকমুখে শুনেছিলাম।

আসামের বনবিভাগের আমলারা একটা সময়ের পর থেকে ওর উপর খুবই কড়া নজর রেখেছিলেন। খুবই রাগ ছিলো তাঁদের আবু ছাত্তারের উপরে।

আমার বাবা ছাত্তারকে ভালো চাকরি দেবার কথা একাধিকবার বলেছিলেন। ছাত্তার শুনে হাসতো। সামান্য বিদ্রূপ-মেশানো থাকতো সে হাসিতে। ও বলতো, হাসতে হাসতে বাবাকে , আমি কারো চাকরিই করিনি। আর কখনও করবোও না গুহসাহেব।

শিকারী, সে সাধুই হন আর চোরই হন, বন-জঙ্গলের নেশায় যদি তিনি একবার মজে যান তখন ঘরের বাঁধনই তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকে। আর চাকরির বাঁধন তো ঠেকবেই। চোরাশিকারি ছিলো সে ঠিকই। কিন্তু আমার চোখে ভোট-চোরা, আর মান-চোরা আর যশ-চোরাদের চেয়ে ও অনেকই ছোট মাপের চোর ছিলো। অন্য যে-কোনো চুরির মতোন চুরি করে শিকার করার পেছনেও অনেক এবং অনেক রকমের অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, আইনগত এবং আমলাতান্ত্রিক কারণ চিরকালই ছিলো। সে সব নিয়ে আলোচনা করতে বসলে আলাদা প্রবন্ধ লিখতে হয়। 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে' লিখতে বসে ওই সব তর্কে যাবার কোনো প্রয়োজন ও ইচ্ছা আমার নেই। শুধু ছাত্তারের মতোই অসংখ্য মানুষদের কথাই বলতে বসেছি এখানে। তারা মহৎ কি নীচ, এই শিবঠাকুরের দেশের ন্যায্য ও পবিত্র সব আইন মান্যকারী না অমান্যকারী, সেই সব বাতুল প্রশ্নে যাবার ইচ্ছে আমার নেই। বিশেষ করে যেখানে আইন যাঁরা বানান তাঁরাই যখন ভাঙেন তা অসীম অবহেলায়।

কোনোদিন আমার ছাত্তারের বাড়িতে যাবার সুযোগ হয়নি। ওর সঙ্গে আমার দেখা হতো শুধু জঙ্গলেই। তবে, লোকমুখে শুনেছি যে, আবু ছাত্তার থাকতো ধুবড়ি শহরেই। মস্ত পরিবার ছিলো। শরিক ছিলো অনেকই। ফর্সা, চওড়া চওড়া হাড়ের, ছোট্টোখাট্টো কম-কথা-বলা মানুষ ছিলো সে। তার সবুজ চেক-চেক লুঙ্গি আর খাকি হাফ-শার্ট পরা

BanglaBook.org

লাজুক হাসি-হাসি মুখের চেহারাটি এখনও চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসে।

ওর চওড়া-চোয়ালের মুখের মধ্যে থেকে এক ধরনের চাপা-নিষ্ঠুরতা উঁকি মারতো। সেই নিষ্ঠুরতা তীব্র দীপ্তি পেতো শিকার-করা জানোয়ার হালাল করার সময়ে। অথবা কোনো কারণে ও যদি রেগে যেতো, তখন। ভীষণই বদ্‌রাগী ছিলো ও। যদিও, যে পঁচিশ-তিরিশ বছর ওর সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো, আমার সঙ্গে ও একমুহূর্তের জন্যেও খারাপ ব্যবহার করেনি। 'লালদা' বলে ডাকতো ও আমাকে। বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিলো আমার সঙ্গে ঐ অসমসাহসী, বিনয়ী, শিকারজীবী মানুষটির। ওর রাগটা চড়লে যে কোন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, তা পরে জেনে একেবারেই হতবাক হয়ে গেছিলাম। মনে আছে, ষাটের দশকের শেষের অথবা সত্তরের দশকের গোড়ার এক সকালে ট্রাইব্যুনালে আপীল আছে বলে ড্রেসিং-টেবলের সামনে টুলে বসে ধড়া-চূড়া পরে টাই বাঁধছি গলায়, এমন সময় একটি পোসট-কার্ড দিয়ে গেলো যে আমার খিদ্‌মদগারি করতো, সে। টাই-বাঁধা শেষ করেই দেখি ছাত্তার লিখেছে, গৌহাটি থেকে।

"লাল্‌দা,

পত্রে আপনে আমার ছালাম লইবেন। প্রচণ্ড বিপদে পইড়্যা আপনারে এই খাত্ লিখতাছি। আমার রিস্তেদারগো লগে জমি লইয়া ঝগড়া চলিতাছিলো বহুকাল। একদিন রাগ এমনই চইড়্যা গেলো যে সহ্য না করতে পাইর‍্যা পরপর আমার ছয়জন (৬) রিলেটিভ্‌রে আমি গুলি কইর‍্যা মাইর‍্যা ফেলাইলাম। জানি না, ধুবড়ি থিক্যা আপনে কারো মুখে বা খাত্‌এ ওই খবর পাইছেন কিনা।

ধুবড়ির কোর্টে মামলা হাইর‍্যা গৌহাটি হাইকোর্টে আপীল ঠুকছেন আমার উকিল ছাহেব। ধুবড়ির কোর্ট আমার ফাঁসির অর্ডার দিছে। জামিনতো একেরেই পাই নাই। একদিনের লগ্যেও না। আমারে যদি কিছু টাকা পাঠাইতে পাইরতেন আপনে, তাহলে বড্ডই উপ্‌গারু হইতো। যদি মামলা লইড়্যা ফাঁসি রদ করাইতে পারি তাইলে আবার জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরুম্। খোলা হাওয়ায়, বৃষ্টির পরের সোঁদা গন্ধে, যমদুয়ারের জঙ্গলে আর সংকাশ নদীতে ঘুরুম্। আর রদ না করাইতে পারলে তো অন্য যমদুয়ার।

আমার কোনোই অন্যায় নাই। খুদাতাল্লার কাছে গুনাহ নাই কোনোই।

খুদাহ্ আপনারে ভালো রাখেন। এই আর্জি।

আপনাগো আবু ছাত্তার!"

চিঠিটা পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। গলায় যেখানে টাইয়ের নটটা ছিলো ঠিক সেইখানে কী যেন একটা দলা পাকিয়ে উঠতে লাগলো।

ট্রাইব্যুনালের পর নিজের অফিসে গিয়ে ছাত্তারের জেলের ঠিকানাতে কিছু টাকা পাঠাবার বন্দোবস্ত করলাম, আমার সান্ত্বনা এবং উৎসাহ-দেওয়া চিঠির সঙ্গে। 'কিছু' টাকা বলছি এইজন্যেই যে, আমিই জানি যে, সেই টাকাটার অংক একজন ফাঁসির আসামীকে বাঁচানোর পক্ষে আদৌ যথেষ্ট ছিলো না। কিন্তু নিজেকে এই বলে বুঝিয়েছিলাম যে, আবু ছাত্তারের সঙ্গে শিকার করেছেন এমন মানুষ তো আরো অসংখ্যই আছেন। তাঁদের মধ্যে অর্থ প্রতিপত্তি বয়স সব দিক দিয়েই আমার চেয়ে বড় প্রায় সকলেই। সকলেই দেবেন কিছু কিছু করে। আবু ছাত্তারের প্রাণের দায়িত্ব তো আমার একার নয়।

সেদিন আমার একবারও মনে হয়নি যে গুমা রেঞ্জে যাওয়ার পথে একবার, যমদুয়ারে একবার এবং জিঞ্জিরাম নদীতে আরও একবার আমার প্রাণের দায়িত্ব কিন্তু আবু ছাত্তার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে, বিনা পারিশ্রমিক অথবা পুরস্কারেই নিয়েছিলো নিছক আমাকে

BanglaBook.org

ভালোবাসতো বলেই 'লালদা' বলে ডাকতো বলেই কিশোর বয়স থেকে আমাকে চিনতো বলেই। আমার কাছ থেকে তার কিছুমাত্রই প্রত্যাশা ছিলো না। ভেবেও ভারী কষ্ট হচ্ছিলো যে, যে-মানুষটি উন্মুক্ত আকাশের নিচে, পায়ে দাঁড়িয়েই চিরদিন বাঘের সঙ্গে মোকাবিলা করেছে তার আঠাশ-ইঞ্চি-লম্বা ব্যারেলের রঙ-চটে-যাওয়া, ব্যবহারে-ব্যবহারে পাতলা হয়ে আসা ম্যান্‌টন্‌ কোম্পানির দোনলা শট্‌গানটিকে মাত্র সম্বল করে, সেই মানুষটিই উঁচু প্রাচীর-ঘেরা বড় বড় গরাদওয়ালা রাজধানী গৌহাটির জেলখানার কোনো ছোট্ট বদ্ধ-ঘরের মধ্যে দমবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ভোর থেকে রাত অবধি ফাঁসির মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করছে। সেই মানুষ যদি তার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ডাক পাঠায় তাহলেও কি আমার শুধু ঐটুকু মাত্র করার ছিলো ? শুধুমাত্র ঐটুকুই ?

পরে জেনেছিলাম যে, যাঁদের ছাত্তার চিঠি লিখেছিলো তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তাঁদের মধ্যে কেউকেটা, পরিশ্রম-ব্যতিরেকেই প্রচণ্ড ধনী এমন মানুষের সংখ্যাও নেহাত কম ছিলো না। তবু নাকি বেশি টাকা ওঠেনি। অনেকে নাকি ওর চিঠির কোনো জবাবই দেননি। আমার পাঠানো টাকাটা আমার কাছে সামান্য হলেও ছাত্তার নাকি খুব খুশি হয়েছিলো। কিন্তু এটা আমার গর্ব নয়, লজ্জা। গভীর লজ্জাই। আমার নিজের কারণে লজ্জা, আমি যে-সমাজে, যে-পরিবেশে, যে-শিক্ষাব্যবস্থাতে মানুষ হয়েছি, বেঁচে আছি, সেই সমস্ত কিছুর কারণেই লজ্জা। আমি ইংরিজি বলতে পারি, টাই পরে গাড়ি চড়ে অফিস যাই, শহরের সভ্য মানুষ আমি, "এলিট অফ দ্য সোসাইটি" আমার প্রাণের দাম আর আবু ছাত্তারের মতো একজন সাধারণ গ্রাম্য-মুসলমান "চোরা-শিকারি"র জীবনের দাম কি কখনও এক হতে পারে ?

এইরকম বহু লজ্জা সযত্নে লুকিয়ে রেখেই কিন্তু আমি এবং আমরা বেঁচে আছি, হাসছি, খাচ্ছি, পার্টি করছি, ঘুমোচ্ছি। শিক্ষিত সচ্ছল ভারতীয় পুরুষদের এই লজ্জাস্থান বড়ই গোপনীয়। নারীর লজ্জাস্থান, তাঁদেরই অনুমতিতে, কখনও মনোনীত পুরুষেরা দেখতে পান কিন্তু পুরুষের এই লজ্জাস্থান দেখার মতো বুকের জোর আমাদের নিজেদেরই নেই। অসকার ওয়াইল্ডের "পিকচার অফ ডরিয়ান গ্রে"-তে ডরিয়ান গ্রের যে ছবির কথা আছে আমাদের প্রত্যেকেরও সেই ছবিরই মতো অবস্থা। সেলারে নেমে নিজেদের বিকৃত, বিভীষিকাময় মুখগুলি দেখার সময় বোধহয় আমাদের হয়েছে। সত্যিই এ বড় লজ্জা।

আজ যা ভেবে বড়ই বিমর্ষ বোধ করি, তা হচ্ছে ছাত্তার মানুষটার নিজের জীবনের প্রতি কিন্তু মায়া ছিলো না একবিন্দুও। ও হেঁটে গিয়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের প্রায় ঘাড়ে পড়ে দোনলা বন্দুক দিয়েই তাদের মারতো। বন্দুকের নল প্রায় কানে ঠেকিয়ে। দুর্জয়, দুর্মর, ভয়াবহ সাহস ছিলো ওর। ও বলতো, "এই বাজারে গুলির যা দাম। পৌনে তিন ইঞ্চি অ্যাল্‌ফামাক্স্‌-এর এল· জি· বা রোটাক্স্‌ বল কি নষ্ট করা যায় ?"

ওর নিজের জীবনের দাম যেন তখনকার দিনের আট টাকা দামের একটি এল-জির দামের চেয়েও কম। এমনই ভাবখানা।

ও শুধু নিজেই যে মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো তাই-ই নয়, ওর হঠকারিতায় আমাদের প্রাণও যে-কোনো মুহূর্তে ওরই পৌরোহিত্যে যেতে পারতো। সেরকম সম্ভাবনা একাধিকবারই দেখা গিয়েছিলো। এমন একজন মানুষ যে, তারও মৃত্যু-ভয় এসেছিলো ? সত্যিই এসেছিলো কি ?

জানা নেই, হয়তো প্রবলতম বীরের মনেও মৃত্যু-ভয় আসে। আসে, বিশেষ করে, যদি তাকে মৃত্যুর জন্যে অসহায়ের মতো নিরস্ত্র হয়ে ভীরুর মতোই মাথা নিচু করে দীর্ঘদিন

BanglaBook.org

অপেক্ষা করতে হয়। বীরের মৃত্যু হয়তো তার কর্মের মধ্যেই সবসময় সুপ্ত থাকে। আবু ছাত্তারের মতো সব মানুষদেরই জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে তিলেকের যতিও থাকা উচিত নয়। কর্ম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু তাৎক্ষণিক হওয়া উচিত

তিন মাস পরে ধুবড়ি থেকে একটি পোস্ট-কার্ড পেয়ে জানতে পারি যে ছাত্তার মামলাতে হেরে, আমাদের প্রিয়, চেনা, শিকারভূমি যমদুয়ারে নয়, অন্য অচেনা "যমদুয়ারে" চলে গেছে।

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আষাঢ়ের মাঝামাঝি। গুমোট ছিলো একটু আগেও। এখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে হাওয়া দিয়েছে ঝুরুঝুরু।

ছাত্তার আর আমি তামারহাটের কাছেই, গুমা রেঞ্জের "বরবাধা" রেঞ্জের কাঠের বাংলোর দোতলাতে বসে আছি। বারান্দার রেলিং-এর উপর পাদুটি তুলে দিয়েছি আমি। বিকেলে একটা মোরগা মেরেছিলাম। নিচের রসুইখানায় মোরগার ঝোল, ভাত আর স্যালাড বানাচ্ছে নিলু। এক ঝাঁক জোনাকি, বাংলোর হাতার আমগাছের ডালে সবুজ ক্ষুদে ক্ষুদে টুনি-বাল্ব এর আলপনা দিচ্ছে। নিঃশব্দে। বৃষ্টির পরে সোঁদা-সোঁদা গন্ধ উঠছে বনের মাটি ও ডালপালা থেকে। আকাশ ভরা তারা। ভারী শান্তি এখানে। কথা বলে এই শান্তিকে ছিদ্রিত করতে ইচ্ছে যায় না।

হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে একটি শিঙ্গাল চিতল হরিণের ভয়ার্ত ডাক ভেসে এল। বারবার ডেকেই থেমে গেলো হরিণটা। সিঁড়িতে-বসা ছাত্তার ছিলা-ভাঙা হরিণের মতো তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বললো, চলেন যাই। আমিও তখন আর বাংলার শিকারি নই। বিহারের কোডারমা অঞ্চলে, উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলায়, বাংলার সুন্দরবনে, বরিশালের নদী-নালায় ঝিলে জঙ্গলে, কলকাতার সোনারপুরের বাদায় বাবার হাত ধরে শিকারি হিসেবে আমার শিক্ষানবিশি অনেকদূর এগিয়েছে। নিজের বন্দুক ত হয়েইছে। রাইফেলও। ঐ বত্রিশ ইঞ্চি গ্রীনারটা এবং থ্রী-সিক্সটি-সিক্স্ রাইফেলটি নিয়ে পরবর্তী জীবনে শিকার করিনি এমন জানোয়ার কমই ছিলো। সাইডে সেফ্‌টি ছিলো বন্দুকটির। গোল বোতামের মতো। একেবারেই নিঃশব্দে আনসেফ্ এবং সেফ্ করা যেতো। রিফ্লেক্স্-অ্যাকশানেরই একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছিলো এই যন্ত্রটি আমার দিন-রাতের সঙ্গী।

ছাত্তারকে কোনো সময়েই, কোথায় ? কেন ? কি ? ইত্যাদি প্রশ্ন করা অবান্তর ছিলো। তাই প্রশ্ন না করে ঘর থেকে বন্দুক দুটি তুলে নিয়েই প্রায় দৌড়েই দুড়দাড় করে বন-বাংলোর কাঠের সিঁড়িতে শব্দ করে নেমে গেলাম দুজনে। ছাত্তারের সাইকেলটা ছিলো শূন্য-গারাজের মধ্যে। সেটাকে বের করেই বেরিয়ে ছাত্তার বললো, আইসেন। বইস্যা পড়েন !

রাতে ও দিনে বনের মধ্যে অথবা জলের উপরে শব্দ শুনে সেই শব্দ স্থানকে ত্রুটিহীন ভাবে চিহ্নিত করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিলো ছাত্তারের। আমাদের দেশের অনেক রাজ্যে এবং বিদেশেও শিকার করেছি সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিকারীদের সঙ্গে। ছাত্তারের মতো অভিজ্ঞ ও সাহসী শিকারী খুব কমই দেখেছি।

সেই সাইকেল চালাচ্ছিলো। আমি ক্যারিয়ারে বসেছিলাম।

BanglaBook.org

অবাক হয়ে লক্ষ করলাম আজই বিকেলে বনের মধ্যের যে সুঁড়িপথে ঢুকে আমি বনমোরগটি মেরেছিলাম সেই দিকেই চলেছে ছাত্তারের সাইকেল। সন্ধের পরই একফালি চাঁদ উঠেছে। শুক্লপক্ষ। তাতে বনের অন্ধকার তখনও পুরো দূর হয়নি। কিন্তু রহস্য বেড়েছে। নালার মধ্যে দিয়ে ঝরঝর শব্দে সবে-থামা বৃষ্টির জল বয়ে যাচ্ছে। ঘনসন্নিবিষ্ট সাদাটে-হলদেটে বেতবনে ফিকে জ্যোৎস্না এসে পড়ায় সমস্ত এলাকাটি স্বপ্নময় দেখাচ্ছে। কেয়া ফুল ফুটেছে কোথায় যেন। বড় বড় কেয়াবন আছে এই জঙ্গলে। শ্রাবণে এই জঙ্গলে সৌন্দর্য আর গন্ধ অবর্ণনীয় হয়ে ওঠে। খিচুড়ি খেয়ে আর কাঁথা মুড়ি দিয়ে বসে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে হয় তখন সেই সিক্ত সৌন্দর্য বাংলোর বারান্দায় বসে। খামোকা দৌড়াদৌড়ি না করে। হাওয়ার দমকে দমকে গন্ধ আসছে কেয়াফুলের। কদম এখনও ভালো ফোটেনি, নইলে এই অঞ্চলের বর্ষার বনে কদমের গন্ধে বিবশ করে দেয় মন।

মিনিট সাতেক-আষ্টেক জোরে সাইকেল চালিয়ে যেতেই জঙ্গলের বেশ গভীরে, আজ বিকেলে যে দোলা মতো মাঠের মধ্যে মুরগীর ঝাঁকটিকে দেখেছিলাম আমি তার-সমান্তরাল পথে সাইকেল থেকে নেমে, সাইকেলটা একটা জংলী বেলগাছের গায়ে হেলান দিয়ে ছাত্তার ফিস-ফিস করে বললো বন্দুকে গুলি পুইর‍্যা ন্যান্।

ব্যাপারটা কী ?

আমি শুধোলাম।

চলেন, আপনারে হরিণ খাওয়াইমু আজ।

ছাত্তার নিজের বন্দুকেও গুলি পুরলো। পুরেই, নিঃশব্দ পায়ে এগোলো শালবনের নিচে নিচে গজিয়ে-ওঠা কতগুলো সজীব শটিগাছের মধ্যে দিয়ে। এই শটিগাছ থেকেই আবীর তৈরি হয়। আবীরের মুখ্য উপাদানই হলো শটি। শহরের অনেকেই এ কথা জানেন না হয়তো।

আমাকে ওর পক্ষপুটে নিয়ে ইতি-উতি ধূর্ত শেয়ালের মতো চাইতে চাইতে চলতে লাগলো ছাত্তার। বনে-জঙ্গলে যাঁরা শিকার করেন, বা পাখি দেখেন বা মধু পাড়েন বা ফল, যাঁরা মূল খোঁড়েন তাঁরাও সকলেই জানেন যে, হাঁটার এক বিশেষ রকম আছে জঙ্গলে। তার মধ্যে শিকারীদের হাঁটাই সবচেয়ে সাবধানী। দিনে-রাতের সবসময়ই পায়ের নিচে কুটো বা শুকনো পাতা যেন না মুড়মুড়িয়ে বা মচমচিয়ে ওঠে তা না-দেখেও দেখার অভ্যেস করে ফেলতে হয়। একই সঙ্গে ওপরে এবং নিচে, ডাইনে এবং বাঁয়ে এবং সামনে তো অবশ্যই চোখ রাখতে হয়। রাখতে হয়, মাঝে-মাঝে পেছনেও। চোখের দৃষ্টি মেলে রাখতে হয় একশ-আশি ডিগ্রিতে। দুই চোখের ডাইনে এবং বাঁয়ে সমান রেখা টেনে গেলে দিগন্ত অবধি যতটুকু দৃষ্টিগোচর হয় ততটুকু এলাকার মধ্যে ন্যূনতম নড়াচড়াও ভালো শিকারীর চোখে পড়ে। এই অভ্যাস আয়ত্ত করা এমন কিছু কঠিন নয়। গাড়ি যাঁরা চালান তাঁদেরও এই অভ্যাস অত্যন্ত উপকারে লাগে। একটু সচেতনভাবে চেষ্টা করলে কিছুদিনের মধ্যেই এই একশ-আশি ডিগ্রী দৃষ্টি-শক্তি অর্জন করা যায়।

বেশ কিছুটা সুঁড়িপথে আলোছায়ার গালচে মাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে ঐ ফাঁকা দোলামতো জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছবার আগেই ছাত্তার একটা ঝোপের আড়ালে বসে পড়ে শুধুমাত্র মুখটি বাড়িয়ে জায়গাটাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে নিয়েই ইশারায় আমাকে এগিয়ে আসতে বললো। আবারও এগোতে লাগলাম। ও আগে, আমি পিছনে, ঐ দোলার মধ্যে নেমে এলাম। ভরা-বর্ষায় এ দোলা জলে ভরে যাবে। এখন ছোট ছোট ঘন ঘাসে ভরে আছে ঢেউ-খেলানো জায়গাটা। এক কোনাতে একটি গর্তে ঘোলা জল জমেছে। কাদা-কাদা হয়ে

BanglaBook.org

আছে জায়গাটা। দুপুরে শুয়োরেরা তাতে গড়াগড়ি দিয়েছে। মুরগী মারার সময়ই লক্ষ্য করেছিলাম।

ব্যাপারটা যে কী তা আমি তখনও বুঝতেই পারছিলাম না। অতি স্বল্প আলোয় এইরকম প্রায়-নিশ্ছিদ্র বনে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়ানোর কোনোই মানে আমার মাথায় অন্ততঃ আসছিলো না।

ছাত্তার ছোটো দোলাটা পেরিয়ে গিয়েই ডানদিকে ঘুরল। ঘুরে, কয়েক পা যেতেই দেখতে পেলাম ঐ গভীর বনের মধ্যে এক বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। দু-এক বছর আগে হয়তো "ক্লিয়ার-ফেলিং" হয়ে থাকবে এ জঙ্গলে। জঙ্গল এখনও এসে পুরোপুরি জবরদখল নেয়নি এই ন্যাড়া জমির। কিন্তু ঘাসেরা নিয়েছে। গোড়ালি-সমান ঘাসে ভরে গেছে সেই প্রান্তর আর সেই প্রান্তরের ঠিক মধ্যিখানে একটি প্রকাণ্ড শায়ীন শিঙাল চিতল হরিণের পাশে অতিকায় আকৃতির এক জোড়া চিতা বাঘ।

হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেলো আমার। তারা দুজনে রমণ করছে। মেয়ে চিতাটির পেছন দিক থেকে পুরুষ চিতাটি কুকুরের মতো উঠে পড়েছে। মেয়ে চিতাটি যেন লজ্জায় এবং আরামে অধোবদন হয়ে আছে।

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে, ছাত্তার বোধহয় হরিণ খুঁজতে এসে একসঙ্গে জোড়া বাঘ দেখে ঘাবড়ে গেছে। আমি ওর বাহুতে আঙুল ছুঁইয়ে নীরবে বোঝাবার চেষ্টা করলাম ওকে। মানে, ও কি দেখেছে?

ও নিঃশব্দে আমার হাতে চিমটি কেটে বোঝালো যে, আমাকে পাকামি করতে হবে না। ও ঠিকই দেখেছে। আমি যেন নীরবে থাকি।

তারপরই ছাত্তার বন্দুকটাকে রেডি-পজিশানে ধরে ঐ খোলা মাঠের মধ্যে আড়াল ছেড়েনেমে পড়লো। এবং বলাবাহুল্য, আমিও ওর পেছন পেছন। ঐ ভাবে দুই-মূর্তিকে এগোতে দেখে মৈথুন-রত বাঘ দুটি হতভম্ব হয়ে গেলো। বাঘেদের কোনো দোষ ছিলো না। মানুষ হলেও হতভম্ব হতো। রাগ তো হতো বিলক্ষণই। ওদেরও হলো।

পুরুষ চিতাটি বিযুক্ত হয়ে মেয়েটির পেছন থেকে নেমে পড়ল। অনপনোদিত কাম এবং আশাভঙ্গতায় হ্রস্ব হয়ে গেলো তার শরীর এবং মন। অনবধানে।

মেয়েটি কিছুক্ষণ আমাদের দিকে "কী অসভ্য মানুষ।" গোছের চোখে তাকিয়ে থেকেই ঢুকে গেলো বনের ছায়াচ্ছন্ন সিক্ত গভীরে। আর পুরুষটি এবার গর্-র্-র্-র্র্-গ-র্-র্-র করতে লাগলো লেজটা দুলোতে দুলোতে আমাদের দিকে মুখ করে।

আবু ছাত্তার এমনই ডেয়ার-ডেভিল আন্প্রেডিকেটেবল্ এবং তার সঙ্গীর পক্ষে অতীব বিপজ্জনক শিকারী যে, সে তখনও সোজা এগিয়েই চললো তার বন্দুক তাক করে বাঘটার দিকে। আমার তখন নাড়ি ছেড়ে যাবার উপক্রম হলো। হয় গুলি কর্ নয় অকুস্থল থেকে নিঃশব্দে কেটে পড়্। তা নয়, এ কী চিত্তির রে বাবা! তাছাড়া আমার তো কিছুই করণীয় নেই। স্বল্প-অভিজ্ঞ, হাতের বন্দুককে লাঠির মতো উঁচিয়ে ছাত্তারের দণ্ডধর হয়েই আজ বাঘের পেটে সেঁধিয়ে যেতে হবে বলে মনে হচ্ছে। স্বাদু মোরগার ঝোল আর খাওয়া হল না। ততক্ষণে মিস্টার আবু ছাত্তার আর মিস্টার নাম-না-জানা চিতাবাঘের মধ্যের দূরত্বও প্রায় হাত দশেকে পৌঁছেছে এসে।

আমার কৃতিত্ব বলতে এইই যে, আমি ভয় পেয়ে সোজা পিটটান দিয়ে বাংলো বলে দৌড় লাগাইনি। যে-শিকারী বাঘের কানের ফুটো খুঁজে তাতে তার বন্দুকের নল গুঁজে দিয়ে তারপরই ট্রিগারে টান দেয়, তার সঙ্গী হওয়া বড় সহজ কম্মো নয়। আমার হীরো এবং

BanglaBook.org

পথপ্রদর্শক মিঞা সাহেবের পিঠে মুখ-থেকে-বের-করে সেঁটে-দেওয়া চ্যুয়িংগামেরই মতো সেঁটেছিলাম আমি।

"শো-ডাউন" যখন একেবারে তুঙ্গে ঠিক তখনই বিনা-যুদ্ধে বিনা গোলাগুলিতেই সেই সাংঘাতিক মামলার হঠাৎই নিষ্পত্তি হলো। ব্যর্থকাম-চিতা রণে ভঙ্গ দিলো। ব্যর্থ-কাম মানুষের মতো। গড়গড়-গুড়গুড় করতে করতেই সে যে-পথে তার সখী গেছে সেই পথেই স্বল্পালোকিত মঞ্চ ছেড়ে অন্ধকার উইংসের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

কেনই যে ছাত্তার এলো, কেনই যে এমন বদ্-রসিকতার জন্যে এই সুখী-যুগলের মিলনে বাধা দিলো, আর দিলোই যদি তো দশহাতের মধ্যে গিয়েও কেন যে গুলিই করলো না তা আমার বুদ্ধিতে এলো না। উত্তেজিত হয়ে এই "একসারসাইজ ইন ফিউটিলিটির" আপত্তি করতে যেতেই ছাত্তার আমার ডান হাতের কব্জি ধরে আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই ঐ মরা হরিণটার পাশে থেবড়ে বসিয়ে দিয়ে বললো, "খুব সাবধানে থাইক্যেন্। চারদিক দেইখ্যেন। আমি এই আইলাম বইল্যা। যামু আর আমু।"

কোথায় যাবে ? কেন যাবে ? এখানে ততক্ষণ থেবড়ে-বসে আমি কোন্ কম্মোটা করব এই সব প্রশ্ন করার বিন্দুমাত্র সুযোগই আমাকে না দিয়ে ছাত্তার গুঁড়ি মেরে যে ছিদ্রপথে মঞ্চের অন্য দুজন অভিনেতা উইংসে ঢুকেছিলো সেই ছিদ্রপথেই অন্তর্ধান করলো।

ঝুপড়ি অন্ধকার হাঙ্গরের মতো গিলে নিলো তাকে। তখন বিপদগ্রস্ত আমি পড়লাম ঘোরতর বিপদে। মাচা থেকে, জীপ থেকে, ব্লাইন্ড থেকে শিকার করা এক, আর প্রায়-অন্ধকারে, চারিদিকে গভীর রাতের জঙ্গলের মধ্যের ভিজে মাঠে ঘাড়-মটকানো এক চিতল-শিঙ্গালের পাশে বসে সঙ্গমে-বাধা-প্রাপ্ত এক জোড়া চিতাবাঘের খাদ্য হওয়ার জন্যে ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করা আর এক।

লাভের মধ্যে এইটুকুই হলো যে, চিতল হরিণের গায়ের গন্ধের সঙ্গে ভালো করে পরিচিত হওয়া গেলো। প্রত্যেক জানোয়ারের গায়ের গন্ধই আলাদা। তাদের রক্তের গন্ধও আলাদা। প্রত্যেক শিকারীই এ কথা জানবেন যদি তিনি যত্ন করে লক্ষ করে থাকেন। চিতলটাকে দু-খাবলা খেয়েছিলো ওরা, সাহেব মেমসাহেবরা যেমন আদর-টাদর করার সময় মাঝে মাঝে এক-আধ কামড় হ্যমবার্গার বা ফ্রাংকফুটার খায়, দু-এক পাত্তর বীয়ার চড়িয়ে তেমনই আর কী !

এ সবই অবশ্য আমার শোনা কথা। পাঁচকড়িদাদাই বলেছিলো। মানিকদা নাকি বলেছেন তাকে। "ওয়ারে" গিয়ে মানিকদার জ্ঞান এতোই বেড়ে গেছিলো যে, সৎপাত্র পেলেই তা অফফ্-লোড করতেন। এবং সেই ঝেড়ে-ফেলা জ্ঞান শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হয়ে আমাদের মতো অবচীনদের মস্তিষ্ক ভারী করতো।

এই মানিকদা একজন গ্রেট ক্যারাকটার। বিনি-পয়সায় পেয়েছিলেন বলে একবার তিনি এক কৌটো পেতল-পালিশ-করা ব্রাসোও খেয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর কথা বললে আলাদা উপন্যাস লিখতে হয়। এই পরিসরে এবং পরিবেশে তিনি অকুলান এবং অপ্রাসঙ্গিক।

ছাত্তার অদৃশ্য হতেই আমি উঠে একটা গাছের নিচের ছায়ায় নিজের পেছনটা গুঁড়িতে প্রোটেক্ট করে লুকিয়ে বসলাম।

মাথা থেকে এলোমেলো ভাবটা ঝেড়ে ফেলে চিতলের মড়িতে কনসেনট্রেট্ করতে চেষ্টা করছিলাম। এখন আমার জীবন বিপন্ন। ছাত্তারের নটি জীবন। বেড়ালদেরই মতো। মরলে, ও কোনো দজ্জাল রমণীর কামড়েও মরতে পারে কিন্তু কোনোদিনও বাঘের কামড়ে মরবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। সে কী করতে যে অমন করে অন্ধকারের সুড়ঙ্গে সেঁধিয়ে

BanglaBook.org

গেল সত্যিই কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না।

পেছনের জঙ্গল থেকে একঝাঁক চিতল হরিণী টিউ-টিউ-টিউ করে ডাকতে লাগল চম্‌কে চম্‌কে। কদমগাছের মাথায় জমাট বাঁধা জোনাকির ঝাঁক যেন চম্‌কে চম্‌কে উঠতে লাগলো তাতে। ক্রো-ফেজেন্ট পাখি ডাকতে লাগলো ডানদিকের জঙ্গলের গভীর থেকে। তার দোসর সাড়া দিলো না কোনো। বড় বড় গাছের পাতা থেকে তখনও জল ঝরছিলো টুপ্ টুপ্ করে। এক ফোঁটা জল পড়ারও কত্ত শব্দ। একটি জংলী ইঁদুর ভিজে ঘাসের মধ্যে নড়াচড়া করলেও কত স্পষ্ট তা শোনা যায়। আমি ভাবছিলাম, শিকারটা সত্যিই একটা মস্ত ছুতো। হাতে বন্দুকটা না থাকলে, ছাত্তারের সঙ্গে শিঙালের চকিত-ডাকের রহস্য উন্মোচন করার ছুতো করে এখানে না এলে তো এই স্তব্ধ বৃষ্টিভেজা আষাঢ়ের ভয় এবং কৌতূহল মিশ্রিত বনের গভীরে এমন করে বসে থাকা হতো না। প্রকৃতি হচ্ছে নারীরই মতো। ভয় নিয়ে, সংকোচ নিয়ে ভণ্ডামি নিয়ে, সম্পূর্ণভাবে সুখী করার অক্ষমতা নিয়ে তাকে পাওয়া যায় না। আগে তাকে জয় করতে হয়, তার বিশ্বাস অর্জন করতে হয়, শ্রদ্ধাও। সবচেয়ে বেশি হয়তো সেটাই। তারপর সে নিজেই উজোড় করে দেয় কিছুমাত্রই বাকি না রেখেই। সে প্রাপ্তির প্রাবল্যে তখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে হয়। আর যে একবার এই পরমা নারীর, সব নারীর সেরা নারী এই প্রকৃতিকে হৃদয়ে পেয়ে থাকে তবে তার আর কোনো রক্ত-মাংসের নারীর প্রয়োজনই হয় না। অবশ্য এই মানসিকতা, এই বোধ আসে জীবনে পরিণত বয়সে পৌঁছেই। সেই মুহূর্তে যেহেতু তখনও অনেকই অনুভূতির শরিক হওয়া বাকি ছিলো কলেজের-ছাত্র আমার তাই মরতে একটুও ইচ্ছে করছিলো না। বাঘের কামড়ে তো নয়ই। তাছাড়া ঘাড়ে একটা ফোঁড়াও হয়েছিলো গত কদিনের অসহ্য গরমে। বাঘে এখন ঘাড়ে কামড়ালে ফোঁড়াটাতে বড়ই লাগবে যে, সে ভয়েও কম ভীত ছিলাম না।

সময় যাচ্ছে। রাত বাড়ছে। সুখের বিষয় এই যে, চাঁদের আলোটা রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জোর হচ্ছে। কিন্তু আবু ছাত্তারের কোনো পাত্তাই নেই। মাঝে মাঝেই ঘাড়টা আস্তে করে এদিক-ওদিকে ঘুরাচ্ছি, প্রিজনার-অফ-ওয়ারদের ক্যাম্পের টাওয়ারের সেন্ট্রির রাতের সার্চলাইটের মতো। তবে অত্যন্তই আস্তে। মাঝে মাঝে পেছনেও দেখছি চেয়ে। পেছন থেকে ঘাড় হাপিস্ যে হবে না এমন কোনো গ্যারান্টি তো নেই। ঘাড়টা ডানদিক থেকে বাঁদিকে ঘুরোচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎই মনে হলো যেন একটা ঝোপের আকার আগেকার মাথা ঘুরোবার সময় ঠিক যেমনটি দেখেছিলাম, তেমনটি যেন আর নেই। ঘাড় শক্ত করে মনোযোগ সহকারে সেদিকে চেয়ে রইলাম।

ঠিকই! ঝোপটা অন্যরকমই দেখাচ্ছে পেছনের সামান্য ফাঁকা আকাশের পটভূমিতে। তারপরই ঝোপটার আকার আরও একটু পাল্টালো এবং পাল্টাতেই দেখলাম, একটি চিতা, ঝোপের পাশে ফাঁকায় এসে দাঁড়ালো। তারপর মুখ তুললো আমারই দিকে।

আমি ভাবলাম, আমারই দিকে। কিন্তু ও আসলে হয়তা তাকিয়েছিলো রক্তের মধ্যে শুয়ে থাকা শিঙাল হরিণটার দিকেই। সম্ভবত আমাকে সে দেখেনি।

এ ব্যাটা আবার কে?

তৃতীয়জন সব সময়েই ঝামেলা বাধায়। সে মানুষের দাম্পত্য জীবনেই হোক কি চিতার সঙ্গমের ক্ষণেই হোক। এই নবাগন্তুক কি মেয়ে-চিতাটির দাবিদার? ইতিমধ্যে আরো দু পা এগিয়ে এলো আমার দিকে। কী বিপদ! সে কি এখনও আমাকে দেখতে পায়নি? এমন একজন বীর-শিকারি বসে আছে ইংল্যান্ডের তৈরি বিখ্যাত বন্দুক হাতে আর তার ভ্রূক্ষেপই নেই। কে জানে, হয়তো আমার ক্যামোফ্লেজিং অজানিতেই এমনই ভালো হয়েছিলো যে,

BanglaBook.org

আমার পেছনের পটভূমির সঙ্গে অলিভ-গ্রীন পোশাক-পরা আমাকে সে আলাদাই করতে পারেনি।

মনে মনে আমি বলছিলাম, হতভাগা, চলে যা। আমার ইজ্জৎ এবং তোর প্রাণ একই সঙ্গে বাঁচুক। একই মন্ত্রে প্রাণ পাক মৃগী ও নিষাদ। কিন্তু চিতাটা আমার নীরব আকুতি উপেক্ষা করে আরো দু পা যখন এগিয়ে এলো তখন আর আমার "আমি খেলবো না ভাই" বলে পালাবারও উপায় ছিলো না। কিন্তু শব্দ না করেও চিৎকার করে আমি বলছিলাম "আমার ভয় করছে, ভীষণই ভয় করছে ; তুই দয়া করে ফিরে যা।" কিন্তু সে ব্যাটা নেহাৎই একটা ছোটলোক। দয়ামায়াহীন।

চিতাটা যেই ওর বা কাঁধের উপর দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকালো অমনি মুহূর্তের মধ্যে আমি বন্দুক তুলে তার বুকে নিশানা নিলাম। সামান্য হলেও বৃষ্টিভেজা বনে বনে প্রতিসরিত চাঁদের আর তারাদের আর জোনাকির আলোতে বন্দুকের মাছি ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো। চিতাটা ঘাড়টা সোজা করতে গিয়েও পুরো সোজা করতে পারলো না। গুড়ুম্ করে লেথাল-বল্ আমার হৃদয়ের দৌর্বল্যর সঙ্গে তার গলা আর বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে গেলো। যেখানে সে ছিলো সেখান থেকে ছল্‌কে সে আমার দিকে লাফাতে চেয়েছিলো কিন্তু না পেরে একটা বিরাট ঝাঁকুনি তুলে মুখ-থুবড়ে পড়ে গেলো। হতভাগা ! আমার মতো শিকারীর হাতে মরে তার স্বর্গর দরজা চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেলো।

নিজেই নিজের কাঁধে থাপ্পড় মেরে কনগ্রাচ্যুলেট করতে যাব নিজেকে ঠিক অমনি সময়ে আমার সদ্যার্জিত শ্লাঘাকে ইঁদুরে-কাটা বালিশেরই মতো ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে পড়ে-যাওয়া চিতার পেছন থেকে যমদূতের মতো প্রচণ্ড গর্জন করে এগিয়ে আসতে লাগলো অন্য একটি চিতা আমার দিকে। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমি শক্ত করে বন্দুক ধরে ঐদিকে নল ঘুরিয়ে দাঁড়ালাম। ডানদিকের ব্যারেলের গুলি তো বদলাবার সময় পাইনি। সময় পেলাম কোথায় ? বাঁ ব্যারেলে একটি অ্যালফাম্যাকস্-এর এল জি আছে।" এল জি দিয়ে এই অবস্থায় দূর থেকে মারা একেবারেই উচিত নয়। "শেষ মুহূর্ত অবধি দেখে যত কাছ থেকে সম্ভব এটি দিয়ে মারতে হবে।" মাথার মধ্যে কে যেন বলে উঠলো। রেঞ্জ যত কম হবে, এল জি-র স্টপিং-পাওয়ার ততই বেশি হবে। এই সব মুহূর্তই শিকারীদের ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে আসে। বড় শিকারীদের কাছে পরম সুখের মুহূর্ত। আর আমা-হেন শিকারীর কাছে পরম দুর্যোগের। ঠিক সেই সময়ই লাল্‌দা-আ-আ-আ-আ বলে চিৎকার করে উঠলো অঘটন-পটিয়সী মিস্টার আবু ছাত্তার। সে যে ছিদ্র দিয়ে নির্গত হয়েছিলো সেই ছিদ্রপথেই আবারও উদিত হয়ে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দাঁড়ালো এসে। তার চিৎকার আমাকে ও চিতাটাকেও চমকে দিয়েই অন্যমনস্ক করে দিলো। বুঝলাম যে, চিতাটাকে অমনোযোগী করে দেওয়াটাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো ওর। সে উদ্দেশ্য সফলও হলো। চিতাটা থম্‌কে দাঁড়িয়ে ছাত্তারের দিকে তাকালো ঘাড় ঘুরিয়ে আর সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্তেরও কম সময়ে বন্দুকটাকে এক ঝট্‌কায় ঘুরিয়ে নিয়ে নিশানা নিয়ে তেড়ে-আসা চিতাটাকে যে কী প্রত্যুৎপন্নমতিত্বর সঙ্গে গুলি করলো ছাত্তার যে কী বলব !

চিতাটা এক গর্জন এবং গড়ান দিয়েই পড়ে গেলো।

এত সব ঘটনা কিন্তু ঘটে গেলো, বলতে যত সময় লাগলো তার চেয়ে অনেকই কম সময়ে। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। শিকারী একেই বলে।

পরে দেখেছিলাম, ছাত্তারের গুলি লেগেছিলো একেবারে কপালের মাঝখানে। দু চোখের মধ্যিখানে। সিঁদুরের টিপের মতো।

BanglaBook.org

যত্ত ঝামেলা। আপনে মারলেন ক্যান ওটাক্ ?

ছাত্তার বললো।

মানে ? শিকারেই তো এসেছিলাম আমরা, না কি ?

তা ঠিক। তবে এই চিতা-মিতা ফাল্তু জানোয়ার মাইর‍্যা লাভ কি ? আমি আইছিলাম হরিণেরই লইগ্যা। অনেকদিন খাই নাই। ন্যান্ বন্দুকখান ধরেন দেহি, হরিণটারে বানাই।

বলেই, তার সাইকেলের সঙ্গে বাঁধা খাকি ঝোলা থেকে রেমিংটনের ছুরিটা নিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে বসলো, খাইবেন কি তাই কন ? যা খাইবেন, সেইমতো কাটুম্। চাঁব না কাবাব না কালিয়া না কলিজা না কবুরা না রেজালা ? ভালো কইর‍্যা ভাইব্যা কন্। বলেই, মরা-শিঙালটাকে আড়াই-প্যাঁচ লাগিয়ে হালাল করে নিল।

আমি কিন্তু আমার পরিচিত কোনো মুসলমান শিকারীকেই জীবিত-মৃতে তফাৎ করতে দেখিনি হালাল করার সময়ে। ভাবখানা, রক্ত ঠাণ্ডা না হলেই হল।

আমি বললাম, আমি নাও খেতে পারি। তোমার জন্যেই নাও। ছাত্তার উঠে পড়ে ছুরিটা খাপে ভরে বললো, ছাড়ান্ দ্যান তবে। নিলুরেই পাঠাইয়া দিমু। দলবল লইয়া এটারে বাংলায় লইয়া আসুক। তখন দেখুমানে। চিতা দুটারেও লইয়া আসবনে। আপনার লাগবো তো ? চাম্ড়া ?

চামড়াটা না নিয়ে গেলে কলকাতার ড্রয়িংরুমে, কাজিন্-দিদিদের শ্বশুরবাড়ি, বোনের বন্ধুদের কাছে বলব কী ? বাহাদুরী পাবো কি করে ?

সাইকেলের দিকে এগোতে এগোতে আমি বললাম, আচ্ছা ছাত্তার, তোমার কী রকম আক্কেল বলো তো ! আমাকে ঐভাবে একা ফেলে জোড়া-বাঘের পেছনে পেছনে তুমি কী করে চলে গেলে।

ছাত্তার খুবই অবাক হলো। সত্যিই। বললো, জোড়া বাঘের পেছনে ? আমি ? খাইয়া দাইয়া কাম নাই নাহি ?

আমি আরও অবাক হয়ে বললাম, কী বলছো তুমি ? পাগল হয়ে গেলে ? জোড়া-বাঘের পেছনে নয় ?

ছাত্তার হো-হো করে হেসে উঠলো।

বললো, বাঘের জন্যে থোড়াই গেছিলাম। এপ্রিল মাসে এইখানে শুয়োর মারতে আইস্যা আমি আমার পানের ডিব্বাটারে এই অঞ্চলেই কোথাও ফেলাইয়া গেছিলাম। হরিণের ডাক শুইন্যা যখন আইস্যাই পড়লাম তখন জায়গাটারে চিনা-চিনা লাগতাছিলো। চিতা দুগা যেই ওদিকে চইল্যা গেলো অমনি মনে পইড়্যা গেল গিয়া। ভাইবলাম, এট্টু খুঁইজাই দেহি। পাইছি। চাঁদের আলো পইড়্যা এক্কেরে চক্চক্ করতাছিলো। বহরমপুরের খাগড়া থিক্যা লইয়া আইছিলো আমার খালায়।

আমার বাক্‌রোধ হয়ে গেলো।

বললাম, চিতা বাঘ তুমি মারতে চাও না ? মানে চাওনি ?

নাঃ। কী হইব ? খাম্কা মাইরা ? পাইকারেরা পঞ্চাশ টাকাও দেয় না দাম ও চামড়ার। বড় বাঘ হইলে তাও হয়। তিন-চারশ তো কম-সে-কম পাওয়া যায়। ওগুলান্‌রে পোলাপানেই মারুক। এই ডিবাখানের দাম এহনে কম-সে কম একশ টাকা হইব।

আমার লজ্জা করতে লাগলো খুব। অমন একটা স্পেকটাক্যুলার শট্-এ চিতাটা মারলাম, গুরু কোথায় অ্যাপ্রিসিয়েট করবে ; তা না বলে কি না "পোলাপানে মারুক"।

"পোলাপান" মানে, ছেলেমানুষ।

BanglaBook.org

ওকে একটু টাইট করবার জন্যে বললাম, মেট্-করা জানোয়ারদের ডিসটার্ব করা কি তোমার মতো ভালো শিকারীর উচিত ?

সাইকেলের সঙ্গে বাঁধা থলেতে ছুরিটা রাখতে রাখতে সাইকেলটা পায়ের মাঝখানে এনে ছাত্তার বললো, আইস্যেন। চড়েন।

বলেই, প্যাডল্ করতে শুরু করলো।

আমি একটু দৌড়েই ক্যারিয়ারে বসে পড়লাম।

ছাত্তার বললো, মেট্-করার সময় মানে ? "মেট" কথাটার অর্থ কী ?

মানে, মিলনের সময়ে আর কী।

ছাত্তার হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বললো, আপনাদের ছাহেবগো শিকারের বইয়ে ঐ সব আছে বুঝি ? ঐসব আপনাগো মতো শখের ছিকারীদেরই মানায়। মিলনের সময় ডিসটার্ব ? আমাগো দ্যাশে, গ্রামে, মিঞায় বিবিরে কোন্ ঘরে ঐ কম্মো করে জানেন কি আপনে ? যে ঘরে, অন্য পোলাপানে, তাগো মা-বাবায়, তাগো ছাগল-গরুতে শুইয়া থাকে সেই একই ঘরে। অন্যে, জায়গ্যা থাকলে, মধ্যে একখান্ শাড়ি টাঙাইয়া লয়। আমরা নিজেরাই মানুষ হইয়া লই আগে, একখান্ কইরা শোওনের ঘর জুটুক আল্দা আল্দা ; তারপরই চিতাবাঘেদের সুখের কথা লইয়া ভাববোনে।

আমি চুপ করেছিলাম। সাইকেল চলছিলো ক্যাঁচোর-কোঁচর করে।

ছাত্তার আবার বললো, ব্যাপারটা কী জানেন লাল্দা ? যে-দ্যাশের মানুষের প্যাটে বড়ই ক্ষুধা, যে-দ্যাশের ছাত্তারের বিবি-বাচ্চাগুলানরে দুগা ভাত দিবার লইগ্যা বনে জঙ্গলে জানোয়ার মাইর‍্যা তার চাম্ মহাজনেগো বিক্কিরি কইর‍্যা কোনোক্রমে বাঁইচা থাকন লাগে, সে দ্যাশে ঐসব কিতাবি আইন-কানুনের মানে নাই কোনো। ছাহেবদের দ্যাশে হইলেও হইতে পারে। মানুষেই যদি না-খাইয়া মরে তয় জানোয়ার বাঁচলো কি মরলো তা ভাইব্যা আমাগো কোন্ ঘণ্টার লাভ হইব ? কন্ আপনে ?

আমি আর কী বলব। কতটুকুই বা জানি আমি ? চুপ করেই রইলাম। নাকে হরিণের রক্তর গন্ধ ভরে ছিল। বাংলোতে পৌঁছেই বাথরুমে গিয়ে ভালো করে চান করলাম আবার।

চান-টান করে পায়জামা পাঞ্জাবী পরে যখন এসে বারান্দায় বসলাম তখন চাঁদের আলো আরও জোর হয়েছে। নিলু এবং ফরেস্ট গার্ডেরা সকলে মিলে একটা বয়েলগাড়ি জোগাড় করে চলে গেছে জোড়া-চিতা আর হরিণটাকে তুলে আনতে। আবু ছাত্তার কুয়োতলায় কপিকলে জল তুলে তুলে চান করছিল। কপিকলের শব্দটা এই নির্জন প্রকৃতিতে কী জোরই না শোনাচ্ছে।

মাথায় জল ঢালতে ঢালতে ছাত্তার লালন ফকিরের গান গাইছিলো—

"সকলি কপাল করে ॥
কপালের নাম গোপালচন্দ্র
কপালের নাম গু-এ-গোবরে ॥
কেউ রাজা কেউ হয় ভিকারি
কপালের ফের সবারি
মনের ফেরে বুজতে নারি
খেটে মরি অনাকারে ॥
জার জমন মনের করুণা
তোমনী ফল পেএছে সে না

লালন বলে ভেবলে হয় না
বিধির কলম আর কি ফেরে ॥"

বারান্দাতে বসেই আমি চেঁচিয়ে বললাম, ও ছাত্তার। এই লালন ফকিরের গান শেখালো কে তোমায় ?

ছাত্তার দু হাতে চোখের ওপর থেকে ভেজা চুল সরিয়ে চোখ এদিকে তুলে বললো, ঐ গত বচ্ছর কুষ্ঠিয়ার এক মৌলভী আইছিলো শিকারে। সে মস্ত ভক্ত লালন ফকিরের। তাগো দাড়িওয়ালা এক জমিদার নাহি আপনাগো গেরেটে কবি ? মৌলভীর কাছেই শিখছিলাম মুখে মুখে কয়খান গান।

বেশ তো গাও তুমি।

আমি বললাম, দাদাগিরি দেখিয়ে।

হঃ। আমাগো আবার গান। আমাগো এই-দুই-নলা গান্‌ই ভালো। অন্য গান্‌-এ আর দরকার নাই।

BanglaBook.org

আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ি শহরে পঞ্চাশের দশকে "টাউন স্টোরস্" আর "টাউন হোটেল" খুবই বিখ্যাত ছিলো। রায় পরিবারের মালিকানাধীন।

"টাউন স্টোরস্"-এর শচীন রায় মশায়, আমার বাবা, এবং আবু ছাত্তারের সঙ্গে একবার জিঞ্জিরামে কুমীর শিকারে সত্যি সত্যিই যাওয়া হয়েছিলো। ভরাশ্রাবণে। বর্ষার উত্তাল ফণা-তোলা লাল-জলের ব্রহ্মপুত্র পেরিয়েছিলাম ভয়-কম্পিত হৃদয়ে ছোট্ট ছইওয়ালা নৌকোতে বাদামী পাল তুলে। সত্যিই সে এক অভিজ্ঞতা!

ছইওয়ালা নৌকো বলতেই বুদ্ধদেব বসুর 'ছোকানুর' কবিতা এবং সেই কবিতার সঙ্গের ছইওয়ালা নৌকোর রোম্যান্টিক ছবিই মনে পড়ত আমার। কিন্তু ভরা শ্রাবণে ব্রহ্মপুত্র অথবা তিস্তা, এই দুই নদ ছোটো নৌকোতে পাল তুলে পার হওয়ার মতো আত্মহননের চমৎকার বন্দোবস্ত খুব বেশি নেই বলেই মনে হয় এখনও।

ধুবড়ি শহরের স্টিমার ঘাটের পাশের নেতিধোপানির ঘাট থেকে আমাদের নদীপথের যাত্রা শুরু হয়েছিলো। আগের দিনই প্লেনে রূপসী এয়ারোড্রোমে নেমে ধুবড়িতে পৌঁছেছিলাম আমি আর বাবা।

বাবার কথা এসে পড়লো, তাই এখানে ওঁর কথা একটু বলে নেওয়া বিশেষই দরকার। বাবার বয়স এখন হয়েছে বিরাশি। মা, দশ বছর আগেই, তাঁর বাষট্টি বছর বয়সে হঠাৎ চলে গেছেন। আমার নিজের চোখে বাবা ছিলেন যেন পৌরুষেরই সংজ্ঞা। এমন সুপুরুষের সঙ্গ জীবনে খুব বেশি পাইনি। এখন চলা-ফেরা করতে অসুবিধে বোধ করেন বলে বনে-জঙ্গলে নদী-বিলে বাবার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত থাকি। এবং যখনই বনে-পাহাড়ে যাই, এক ধরনের শূন্যতাবোধ করি।

বাবার হাত ধরেই শিশুকালে বন-জঙ্গল, পাহাড়-নদী, প্রকৃতি এবং বহির্মুখী জগতের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিলো এই কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে মনে করি। আমার বন্ধুদের বাবারা যে সব কাজে বাধা দিতেন তাদের, যে-সব জায়গায় পাঠাতে ভয় পেতেন, বাবা সেই সব কাজে এবং জায়গাতেই জোর করেও আমাকে পাঠাতেন। জীবনের সব ক্ষেত্রেই শুধু পড়াশুনাতেই ভালো ছেলে বাবার পছন্দ ছিলো না। "স্কোয়ার" করে তোলাই ছিলো তাঁর শিক্ষা। বাবা বলতেন, জানার সীমানা যেখানে শেষ, ভয়ের শুরু সেখানেই। সব কিছু জানার তীব্র ইচ্ছার আরেক নামই জীবন। বাবার মতো হাসিখুশি, রসিক, পরিশ্রমী, সাহসী এবং প্রকৃতার্থে উদার মানুষ ওঁদের প্রজন্মে খুব বেশি দেখিনি। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করার শিক্ষাই ছিলো বাবার কাছে সবচেয়ে বড় শিক্ষা। খেতে এবং খাওয়াতেও দারুণ ভালোবাসতেন উনি।

BanglaBook.org

জিঞ্জিরাম নদীতে কুমীর শিকারের অভিজ্ঞতা বলার আগে বাবার চরিত্রর মজার দিকের কথা আরও একটু বলে নেবার লোভ সামলাতে পারছি না। তাছাড়া, না বললে হয়তো পিতৃঋণ অস্বীকারের হীন অপরাধেও অপরাধী হতে হবে।

জীবন ও সমসময় সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী একেবারেই ওরিজিনাল ছিলো বাবার। উনি যা করতেন তা অন্যরা করার কথা ভাবতে পর্যন্ত পারতেন না। আমার বিয়ের পরই বাবা তাঁর গায়িকা বৌমাকে অলিভ-গ্রীন শিকারের পোশাক বানিয়ে দিলেন। তারপর তার কাঁধে বন্দুক দিয়ে নিয়ে গেলেন একেবারে বাঘের জঙ্গলে। বিরাট দল করে। বাবার শিকারের দল আর যাত্রাপার্টির মধ্যে তফাৎ বিশেষ থাকতো না। এ ব্যাপারে বাবার সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য ছিলো। শিকার উপলক্ষে অনেকে মিলে হৈ-হল্লা, খাওয়া-দাওয়া, জঙ্গলের গভীরে কাটানোটাই মুখ্য ছিলো ওঁর কাছে।

বিরাট দলে, চারটি গাড়ি ও একটি জীপে বিহারের চাতরার জঙ্গলের গভীরে শুকিয়ে যাওয়া পাহাড়ী নদীর বুকে তাঁবুর সারি পড়েছিলো। উনিশশো বাষট্টির মে মাসে। সঙ্গে আমার মা, বোন, শ্বশুরকুলের কিছু আত্মীয় ও আত্মীয়া, ঠাকুর, চাকর, ড্রাইভার সব মিলে এক এলাহী কাণ্ড। যারা ছুলোয়া করতো তারাও সকলেই খেতো আমাদের সঙ্গে। অর্থাৎ এ-বেলা ও-বেলা প্রায় পঞ্চাশজনের পাত পড়তো। সেই সুদূর দুর্গম জঙ্গলেও। সেবারে দুটি শম্বর ও একটি নেকড়ে শিকার হয়েছিলো ছুলোয়াতে। নেকড়েটি মেরেছিলো স্কুলের-ছাত্র ছোট ভাই বিশ্বজিৎ। পয়েন্ট টু টু রাইফেল দিয়ে।

শিকারীর বেশে, বন্দুক-কাঁধে নববধূরা হয়তো রাজন্য পরিবারে সহজেই মানিয়ে যান। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারে এমন শিকার-রোগ সচরাচর দেখা যায় না। তাঁদের তন্বী তরুণী গায়িকা কন্যাটির এমন সাংঘাতিক রূপান্তর দেখে আমার শ্বশুরকুলের অনেকেই তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিলেন।

মনে পড়ছে, বাবার সঙ্গে বড়দিনের ছুটিতে একবার তামারহাটে গেছি। "যমদুয়ারে" যাওয়া হবে। পারমিটও জোগাড় করা হয়েছে।

প্রথমে ঠিক হয়েছিলো যে, ধুবড়ি থেকে একটি জীপ ভাড়া করে যাওয়া হবে। সেই সময়ে কলকাতা থেকে ধুবড়িতে প্লেনেই আসা যেতো। কুচবিহার হয়ে। আমরা প্লেনেই আসতাম। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে কয়েক বছর হলো। দেশ ভাগও হয়ে গেছে। অ্যামেরিকানরা একটি এয়ার স্ট্রিপ বানিয়ে ছিলো "রূপসী"তে। জ্যামেয়ার কোম্পানি এবং যতদূর মনে পড়ে, অন্যান্য কোম্পানিও ফ্রেটার সার্ভিস চালু করেছিলো। ড্যাকোটা প্লেনের দুপাশে বেঞ্চি পাতা থাকতো। মধ্যে থাকতো দড়ি-বাঁধা মাল। বেঞ্চির সামনেও দড়ি-বাঁধা থাকতো। সেই দড়ি ধরে বসে থাকতে হতো।

প্লেন টেক্-অফফ্ করলেই বেঞ্চিগুলো পেছোতে চাইতো। আতংকিত প্যাসেঞ্জারেরা প্রবল-বিক্রমে বাধা দিতেন। এবং বিফল হতেন। তার উপর গরমের দিন হলে তো আর কথাই নেই। বিশেষ করে, রূপসী থেকে কলকাতা ফেরার পথে। মালের মধ্যে বেশিই থাকতো চা, তামাক পাতা আর গারো পাহাড়ের ময়না পাখি। গারো পাহাড় থেকে গারো ও রাভারা পাখিদের ব্রহ্মপুত্র পার করিয়ে নিয়ে আসতো নৌকোতে। তারপর পাখির পাইকারেরা চালান দিতো কলকাতায়।

প্রায় খরচের খাতায় লিখে-দেওয়া ড্যাকোটা। গাঁক্ গাঁক্ করে উপরে উঠতেই নন্-এয়ারকন্ডিশানড্, নন-প্রেসারাইজড প্লেন রোদে প্রচণ্ড তেতে উঠতো। বিট্‌কেল গন্ধ বেরুত তামাকপাতার গাঁটরি থেকে এবং ঠিক সেই সময়ই ক্যাঁকো-ম্যাঁকো চিৎকারে মাথা

BanglaBook.org

খারাপ করে দিতো হাজার হাজার পাহাড়ী ময়না। এবং তারই মধ্যে উয়াক্-উক্ আওয়াজ করে পেট থেকে উগরে দিতেন পুরী, আচার, পাঁপড় এবং কড়হি, বিপুল ব্যবসায়ীর বিপুলা পত্নী মাল-বাঁধা দড়ির সঙ্গে জড়ামড়ি করে বসে।

"রূপ্সী" এয়ার-স্ট্রিপের চারধারে ছিলো গভীর শালের জঙ্গল। আর বিস্তৃত নিশ্ছিদ্র ল্যান্টানা বা পুটুসের ঝাড়। স্ট্রিপের কাছাকাছি আমও ছিলো কিছু। এই মিশ্র জঙ্গলের মধ্যে ছিলো চিতা বাঘেদের আড্ডা। বছর পঁচিশ আগেও "রূপ্সী" এলাকাতে চিতা বাঘ শিকার করেছেন অনেকেই। জানি না, এখন কেমন জঙ্গল আছে। অথবা আদৌ আছে কি না। এ দেশের সব জঙ্গলই মানুষের লোভের মহামারী-কবলিত হয়ে শেষ হতে চলেছে।

"যমদুয়ারে" যাওয়ার জন্যে ধুবড়ি থেকে জীপ ভাড়া করবার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে নাকচ হয়ে গেলো। কারণ ছিলো। কারণটা আমার পিতৃদেব নিজেই। অনেকেই লোক "আম্মো যাবো", "আম্মো যাবো" করতে লাগলেন এবং বাবা কাউকেই 'না' করতে পারলেন না।

বাবা আমার সমুদ্র-হৃদয় মানুষ। বাবার চেহারাও ছিলো সমুদ্রেরই মতো। অত্যন্ত রসিক এবং ভোজন-রসিক বলেও তাঁর খ্যাতি ছিলো। এখন বিরাশি বছর বয়সে পৌঁছে বাবা রোগা হয়ে গেছেন। কানে সামান্য কম শোনেন। কিন্তু চোখ এবং মস্তিষ্ক চমৎকার সজাগ আছে। সম্ভবত বাবাও এই লেখা পড়ছেন মনোযোগ দিয়ে।

একবার পুরী-প্যাসেঞ্জারে কলকাতা থেকে পুরী যাচ্ছি। তখন তো আর এ-সি কোচ-টোচ হয়নি। শুধুই ফার্স্ট-ক্লাস। আর বি এন আরের (আজকালকার এস ই আর) যতো ওঁচা কোচ সব দিতো পুরী-প্যাসেঞ্জারে ঠেলে। পুরীর উপর এত রাগ কেন বি এন আর-এর তা জানা ছিলো না। প্রচণ্ডই দুলতো কামরাগুলো। মাঝে মাঝে মনে হতো ডি-রেইলড্ হয়ে যাবে। একটি বিরাট ফার্স্ট-ক্লাস কম্পার্টমেন্টে আমরা চলেছি পুরীতে। সম্ভবত ইস্টারের ছুটিতে। ঠিক মনে নেই আর এতো বছর পর। ভাই-বোনেরাও সঙ্গে আছে। বাবা শুয়েছেন উপরের বার্থে। কামরার বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাতের রেলগাড়ি, পাড়ি দিয়েছে পড়ি-মরি করে দুলতে দুলতে, যেন হাওয়ায় ফুলতে ফুলতে। "গাড়িভরা ঘুম, কামরা নিঝুম।"

হঠাৎ মাঝ রাতে বাবা চিৎকার করে উঠলেন, লাল। লাল। তাড়াতাড়ি।

ঘুম ভেঙে চম্‌কে উঠে বসলাম।

বললাম, কী বলছো বাবা?

আজ্ঞে-আপনি করা বাবা পছন্দ করতেন না একদমই।

বাবা বললেন, হোল্ড-অল্-এর চামড়ার বেল্টটা খুলে এক্ষুণি দে তো আমাকে।

হোল্ড-অল্-এর বেল্ট?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। না তো, বলছি কি?

কামরার বাতি জ্বালিয়ে আমি শূন্য হোল্ড-অল্-এর ইয়া পুরু চামড়ার বেল্টটা তা থেকে খোলার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু তখনকার দিনের মানুষেরই-চেহারার মতো, জিনিসপত্তরও অত্যন্ত বড়-সড়, পাকা-পোক্ত; লম্বা-চওড়া হতো। সদ্য-ঘুম-ভেঙে-ওঠা একজন কিশোরের পক্ষে সেই সময়কার হোল্ড-অল্-এর বেল্ট খোলাও চাট্টিখানি কথা ছিলো না।

মা বললেন, তোমার জন্যে কি এক মুহূর্ত শান্তি পাবার জো নেই?

বাবা বললেন, ব্যাপারটাকে আন্ডার-এস্টিমেট কোরো না। এতো বড় একটা ক্যালামিটির

কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না। তুমি একটু শান্তি চাইছো আর আমার চিরশান্তি হয়ে যাবার জোগাড়। এতো বড় পার্সোনাল ক্যালামিটি হয় না।

কী বলছো কি ?

এবার আমারও চোখ বড় বড় হয়ে গেলো।

পাঁচটি নয়, দশটি নয় একটি মাত্র বাবার পার্সোনাল ক্যালামিটিতে বড় পুত্র হয়ে চুপ করে থাকি কি করে ?

বাবা, নিজের কাৎ-হয়ে শুয়ে-থাকা দোদুল্যমান ভুঁড়িতে ডান হাত দিয়ে চাপড় মেরে বললেন, আমার ভুঁড়িটা ট্রেনটা ছাড়বার পর থেকেই নাচতে আরম্ভ করেছিলো সাংঘাতিকভাবে। এখন এমনই মোমেন্টাম্ গ্যাদার করেছে যে, যে-কোনো মুহূর্তেই পেটের খোল থেকে খসে নিচে পড়ে যেতে পারে। এতো এবং এতো কিছু এতো বছর খেয়ে-দেয়ে এই নিমকহারাম ভুঁড়ি আজ মুক্তি চাইছে। হোল্ড-অল্-এর বেল্ট দিয়ে এই অবাধ্য ভুঁড়িকে ভালোমত শাসন না করলে এই সর্বনাশ আর ঠেকানো যাবে না। তোদের গায়েই হয়তো খসে পড়বে কখন তার ঠিক নেই।

মা পাশ ফিরে শুয়ে বললেন, রসিকতার তো সময় থাকবে একটা ?

বাবা রেগে বললেন, কী ইন্‌কন্‌সিডারেট ! রসিকতা ! দে, লাল। বেল্ট দে। বলে, সত্যি সত্যিই হোল্ড-অল্-এর বেল্টটা আমার হাত থেকে নিয়ে ভালো করে নিজের পেট শাসন করে শুয়ে পড়লেন আবার।

কিন্তু বাবা শুয়ে পড়লেও মামলার নিষ্পত্তি হলো না।

বাবা আর তাঁর এক বন্ধু দুজনে মিলে পাখি মারতে গিয়ে বহরমপুরের এক গাঁয়ের একটি মাঠ-কোঠার ঘরে শুয়ে একসঙ্গে নাক ডেকে সেই বাড়ি ধ্বসিয়ে সেই ঘরের নিচে সমাধি যাবারই উপক্রম করেছিলেন। তবে, আমাদের ভাগ্য ভালো, পুরী-প্যাসেঞ্জারের নাক, বাবার নাকের চেয়ে অনেকই বেশি জোরে ডাকছিলো।

তা, আমার এহেন বাবা যমুদয়ারে শিকারে যাচ্ছেন শুনে প্রায় জনা পঞ্চাশেক চামচে জুটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। জীপে তাই-ই স্বাভাবিক কারণেই কুলোলো না। শেষ পর্যন্ত একটি ট্রাক ভাড়া করতে হলো। তখন তো আর লাক্সারী বাস, ডিল্যুক্স বাস এসব ছিলো না। বাসই বা ক'টা ছিলো ? গ্রামে গঞ্জে যে সব বাস চলতো তাদের চেহারা ও ড্রাইভার কনডাকটরের চেহারাও দেখার মতো ছিল। প্যাসেঞ্জাররাও কিছু কম যেতেন না।

সেবারে আমাদের সঙ্গে শিকারে অত্যুৎসাহী এবং অনভিজ্ঞ নিপাট ভালো মানুষ আমার এক কাকাও এসেছিলেন। আমার ব্যাচেলর ছোটকাকা। উইনস্টন চার্চিল যেমন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একজন উদ্বেল পার্লামেন্টারীয়ানকে বলেছিলেন যে, "দ্যা অনারেবল্ মেম্বার শুড নট ইনডালজ্ ইন মোর ইন্‌ডিগ্‌নেশান্ দ্যান হি কেন কনটেইন্", তেমনই আমার ছোটকাকার শিকারের অত্যুৎসাহ সম্বন্ধেও আমার তাই-ই বলতে ইচ্ছে করতো। শিকারের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার চেয়ে উদ্দীপনা বেশি হলেই সমূহ বিপদ। উদ্দীপ্ত ব্যক্তির নিজের যতখানি না বিপদ তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বিপদ তার চেয়ে অনেকই বেশি।

অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত 'ম্যান্‌লিকার শুনার' কোম্পানি থেকে ডায়রেকট্‌লী দুটি রাইফেল ইমপোর্ট করিয়েছিলেন বাবা সেই বছরই। একটির বোর ছিলো পয়েন্ট থ্রী-সিকস্‌টি-সিকস। আর অন্যটির ছিলো পয়েন্ট থার্টি-ও-সিকস্। দুটি রাইফেলেই হেয়ার-ট্রিগার লাগানো ছিলো। আগেই বলেছি, আঠারো বছর বয়স হতেই বাবা আমাকে একটি বত্রিশ-ইঞ্চি, ডাবল-ব্যারেল, ডাবল-চোক, ডাবল-ইজেকটর, সাইড-সেফটি-ক্যাচ-এর ডাব্লু

BanglaBook.org

ডাব্লু-গ্রীনার-এর পৃথিবী বিখ্যাত বন্দুক কিনে দেন। ঐ বন্দুক ও রাইফেল দুটি আমার যৌবনের সবুজ দিনগুলির দুরন্তপনার নীরব সাক্ষী হয়ে আছে। এখনও ঐ দুটি অস্ত্র একবার হাত-ছোঁয়ালেই কত স্মৃতিই যে মনে আসে তা কী বলব ! কত বিচিত্র সব মানুষ, কত বিচিত্র পরিবেশে, গ্রীষ্ম, হেমন্ত, বর্ষা, শীত, বসন্তর কত স্মৃতিই যে ফিরে ফিরে আসে সব কাজ ফেলে শুধু বসে বসে ভাবতে ইচ্ছে করে তখন।

যাত্রার সময় যখন সমুপস্থিত, ট্রাকের বাল্ব-হর্ন-এর ভেঁপু ; থুরি, 'ভেঁপু' না বলে 'নিনাদ' বলাই ভালো। কারণ এই ট্রাকের হর্ন শুনেই তামারহাটের মারোয়াড়ী পাট-ব্যবসায়ী গুলাবচাঁদবাবুর সাতানব্বই বছর বয়স্ক সম্পূর্ণ সুস্থ বাবা এবং গিরিডি জেলা থেকে সদ্য এসে তামারহাটে বসত-করা রসিয়া ধোপানীর যুবক কিন্তু অসুস্থ গাধা একই সঙ্গে হার্ট ফেল করে মরেছিলো।

সে তো শিকার-যাত্রা নয়, যেন গণ্ড-গাঁয়ের যাত্রা-পার্টি 'দ্যাখন-সখী' পালার কল্-শো পেয়ে দূরান্তরের গণ্ডগ্রামে চলেছে।

ভেঁপু বাজার সঙ্গে সঙ্গে পড়ি-কী-মরি করে সৈন্যদল তাদের যার যার গন্ধমাদন নিয়ে ধুলিধূসর ট্রাকে সামিল হলো।

বিচিত্র চেহারার, বিচিত্র বয়সের, বিচিত্র বুদ্ধির, বিচিত্রবীর্য পুংলিঙ্গরা উঠে বসলেন একে একে সেই ট্রাকে। এই নাটক সম্পূর্ণই স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত। উঠল নানা সাইজের হোল্ড-অল্, ঝুড়ি-ঝুড়ি কমলালেবু, চারটি ইনটেলিজেন্ট পাঁঠা, রোজ সকালে ওয়ালডর্ফ রেস্তোরার সামনে যে-সাইজের গোল খাঁচাতে করে মুরগী সাপ্লাই হয় ইদানীং তেমনই সাইজের পাকা-বেতের খাঁচায় চড়ে উঠলো উভয়-লিঙ্গর গোটা পঞ্চাশেক কুকুট। নানা সাইজের একনলা-দোনলা বন্দুক। এবং রাইফেলও। তার মধ্যে কিছু খাপে-ভরা আর কিছু খাপ-খোলা। খাপে-ভরার মালিকেরা কখন খাপ খুলবেন সেই অপেক্ষাতে অপেক্ষমান। ছুরি-ছোরা। বেঁটে ও লম্বা অগণ্য বিচিত্র বর্ণের টর্চ।

ট্রাক গাঁক্-গাঁক্ আওয়াজে চলেছে। জলহস্তীর পিঠের মতো গোদা-গোদা হোল্ড-অল্-এর উপরে শুধুমাত্র ভি-আই-পি এবং বয়োজ্যেষ্ঠদেরই বসার জায়গা হয়েছে। বাবা মধ্যমণি হয়ে ভীমাকৃতি এক হোল্ড-অল্-এর উপরে বসে পানের বাটা খুলে সযত্নে পান সাজছেন। ট্রাকের এক কোণায় এক হাঁড়ি মজা-সুপুরী। উত্তরবঙ্গ এবং আসামে ঐ রকম সুপুরী খাওয়ার চল আছে। গুয়া নয় এ মহা-গুয়া। পিতৃপুরুষের ভিটের নিচে বহুদিন ধরে হাঁড়িতে পুঁতে-রাখা পচে-যাওয়া সেই গুয়ার গন্ধে আমার বালিগঞ্জী পেট থেকে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসতে চায়। কিন্তু বাবার রাজ্যে বসবাসকারীদের হিটলারের রাজ্যের বসবাসকারীদের চেয়ে কিছু কম ভয়ে বাঁচতে হতো না। প্রতিবাদ করলেই কন্সেন্ট্রেশান ক্যাম্প।

বাবা বলতেন, স্বার্থপরের মতো কোনো রকম আনন্দই একা একা করা উচিত নয়। 'যমদুয়ারে' যেতে পারার সুযোগ ক'জনের জীবনে আসে ? "ছেলে-ছোকরারা" যেতে চাইছে, ওদের ফেলে কি যাওয়া যায় ? 'যমদুয়ারে'র মতো ভয়ংকর সুন্দর জায়গা বলে কথা !

বাবার ঐরকমই মত ছিলো। যদিও প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর আমি জেনেছিলাম যে, শিকারের মতো গভীর খেলাতে তো বটেই, অন্য যে-কোনো আনন্দর বেলাতেও একা-একাই যাই করার তা করতে হয়। বড় জোর, দোকা-দোকা। কিন্তু নবাব হারুনুর-রসিদ স্বয়ং দ্বিজ হয়ে এসেছিলেন বাবার মধ্যে।

আমি কিছুই বলিনি। কোনো কথা বলার এক্তিয়ারও ছিলো না। কিন্তু ভেবেছিলাম যে, 'যমদুয়ারে' যেতে তো একটি দড়ি আর কলসীই যথেষ্ট ছিলো। গঙ্গাধর নদীও তো কিছু দূরে ছিলো না। তবে ?

বেরোনো হয়েছিলো হাড়-কাঁপানো শীতের মধ্যে। জোগাড়-যন্ত্র করতে করতেই তো সূর্য ডুবে গেলো। বাবার যাত্রার জোগাড়-যন্ত্র তো সন্নিসীর একচড়ার বন্দোবস্ত নয়। ঠিক হলো যে সারা রাত ধরে আস্তে আস্তে যাওয়া হবে। পথে যদি হাতীর দল বা বুনো মোষের দল বা বাঘের প্রসেশানও মেলে তাহলেও চিন্তার কিছুই নেই কারণ যে পরিমাণ গোলাগুলি ও অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে আছে এবং যে প্রকার বিচিত্রবীর্য সৈন্যবাহিনী সদা-প্রস্তুত থাকবে তাতে বর্ডার ক্রশ করে পূব-পাকিস্তানে চলে গেলে পূব-পাকিস্তান জয় করাও কঠিন ছিলো না সেই বাহিনীর পক্ষে।

ট্রাক ছেড়েছে। তামারহাট ছেড়ে মাইল খানেকও আসা হয়নি এমন সময় ঠিক পথের বাঁদিকে, পথ থেকে বড় জোর দশ হাত দূরে একটি প্রকাণ্ড চিতা-বাঘকে ভাবগম্ভীর দার্শনিকের মতো শুয়ে থাকতে দেখা গেল। বাঘটা বড় বাঘের চেয়ে কোনো অংশেই ছোট নয়।

ক্ষেত থেকে ধান কেটে নিয়েছে। খড়ও কেটে নিয়েছে। কাটা-খড়ের গোড়াগুলো আমাদের অংকের স্যার অমূল্যবাবুর গোঁফের মতো খোঁচাখোঁচা হয়ে মাথা উঁচিয়ে আছে। শিশির পড়াতে শূন্য মাঠ ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে। তার উপরে তিনি আরাম কেদারায় শুয়ে থাকারই মতো 'পোজ্‌'-এ শুয়ে আছেন।

আমার মনে হলো যে, ব্যাটা বাঘ নিশ্চয়ই হাত দেখতে জানে। আমাদের মতো শিকারীর গুলি খেয়ে সে যে উর্ধ্বলোকে যাবে না তা সে বিলক্ষণই জানতো। তা ছাড়া, তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে তার মুখচোখের ভাব দেখে মনে হলো যে, এ বাঘ মোটেই গুলিখোর নয়। গাঁজা খেলেও বা খেতে পারে। গুলিখোর বাঘের চেহারাই আলাদা হয়।

আমার উপরে পিতৃকুলের স্ট্যাণ্ডিং ইনস্ট্রাকশন ছিলো যে, পরমপূজ্য পিতা অথবা তস্য সহোদর অথবা তস্য বান্ধবেরা যদি কোনো লক্ষ্যে বাণ নিক্ষেপ করে লক্ষ্যভ্রষ্ট হনও তবুও এই বালখিল্যর সেই লক্ষ্যে শরসন্ধানের অধিকার বর্তাবে না। নিতান্তই যদি কোনো দৈব-দুর্বিপাকে এবং সেই লক্ষ্য-বস্তুর পূর্বজন্মের অশেষ পাপে সে এমত শিকারীদের গুলিতে আহত হয় শুধুমাত্র তখনই এই অধম তস্য ধনুতে বাণ সংযোজন করতে পারবে।

বাঘকে আমি আর ছাত্তার দুজনেই দেখেছিলাম। কিন্তু আমি তো হিটলারের জার্মানীর ইহুদী। ছাত্তার যদিও ইতালির মুসোলিনী। সিচুয়েশান্‌টা সাইজ-আপ্‌ করছিলাম আমরা। নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে।

বাবার পারমিশান পেলে ছাত্তার লাফিয়েই বাঘের ঘাড়ে পড়ে তার গামছা দিয়েই ফাঁসী দিয়ে দিতো তাকে। বন্দুকেরও দরকার হতো না। কিন্তু পারমিশান নেই বলে, যাত্রার প্রথম অংক এবং প্রথম দৃশ্যের "ছিন্‌-ছিনারী" কীরকম দাঁড়ায় তাই কৌতুকভরে নজর করছিলো।

আমার খুল্লতাতর হাতে আন্‌কোরা নতুন থার্টি-ও-সিকস্‌ রাইফেল। তিনি কালে-ভদ্রেই শিকারে আসেন। তারপর আবার হেয়ার-ট্রিগার ব্যাপারটা অত্যন্তই বাজে। হেয়ার-ট্রিগার লাগানো রাইফেলের ট্রিগারে সুন্দরীর মাথার ফুল বা কুশ্রী মানুষের গোঁফের ছোঁয়া লাগলেই গদ্দাম্‌ করে গুলি বেরিয়ে যায়। তাকে তখন কেঁদে-কঁকিয়ে, বাছা, ফিরে আয়, ফিরে আয়, বললেও সে আর ফেরে না। এবং যে-সব শিকারী সর্বদাই উত্তেজিত ও হাইপারটেন্স্‌ তাঁদের হাতে এই মারণাস্ত্র থাকলে তাঁদের থেকে নিদেনপক্ষে শত যোজন দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু ঘটনাটা যা ঘটলো, তা সম্পূর্ণ উল্টো। গুলি-করার অনুমতি-হীন আমি কাতর চোখে শায়ীন বাঘের দিকে অপলকে তাকিয়ে ছিলাম। অথচ তার আগেই ন্যাশানাল ক্যাডেট কর্পস-এর পশ্চিমবঙ্গর প্রতিভূ হয়ে আর্ল রবার্ট ক্যাডেট ট্রফী ও ন্যাশানাল শুটিং-এর জন্যে মনোনীত হয়েছি। হাত খারাপ ছিলো না। কিন্তু হলে কী হয়। বাবার কাছে আমি তখনও ছেলেমানুষ।

হঠাৎই পাশ থেকে প্রচণ্ড এবং প্রাণঘাতী একটানা উঃ। উঃ। আঃ। উঃ। উঃ। শব্দ শুনতে পেলাম।

কী হলো ? থেমে-থাকা ট্রাকে কি কোনো ভাল্লুক উঠে পড়লো ? পরক্ষণেই মনে পড়লো এই অঞ্চলে তো ভাল্লুক নেই।

আঃ উঃ ইঃ মর্মস্পর্শী আওয়াজই হোক আর বুকই ফেটে যাক সেই ঘটনা এবং আওয়াজ মৃগয়াধিপতি, আমার পিতৃদেবের গোচরীভূত না হওয়ায় অথবা তাঁর অসংখ্য তাঁবেদারদের মধ্যে কেউই গোচরে না আনায় তস্য সহোদরের মরম-যাতনা শুধু আমাদেরই মরম তীক্ষ্ণ মোরামের মতো বিদ্ধ করতে লাগলো।

এমন সময় সেই যাত্রাপার্টির মধ্যে কোনো ছুটকি-ভূমিকার নাম-না-জানা একজন একস্ট্রা তড়াক্ করে দাঁড়িয়ে উঠেই চেঁচিয়ে বললো, মনাদা। বাঘ।

বাবার ডাকনাম মনা, ভালো নাম শচীন্দ্রনাথ গুহ। মোহনবাগান ক্লাবের গোলকিপার ছিলেন। খেলার মাঠে ঐ নামেই জানতো সবাই। গোষ্ঠ পাল, ইউ কুমার, মনা দত্ত, ক্যাবলাকাকাদের সমসাময়িকই ছিলেন বাবা। বিলেতের "হাইল্যান্ডার্স" টিমের সঙ্গে খালি পায়ে খেলবার সময়ে তাদের ফরোয়ার্ডদের বুট-পরা পায়ের লাথি খেয়ে হাঁটুর হাড় সরে গিয়ে জল জমে যাওয়াতে ফুটবল থেকে ইস্তফা দিতে হয় ওঁকে। ফুটবল ছাড়াও টেনিস, হকি, ক্রিকেটও খেলতেন। টেনিস অনেকই দিন এবং স্বল্প সময় স্কোয়াশও খেলেছেন।

পরক্ষণেই বোঝা গেল যে, মনাদা। বাঘ। বলে ডেকেছিলেন আসলে কাসেম মিঞা।

এই কাসেম মিঞা গোল্‌গাল ফর্সা চেহারার একজন ইন্টারেস্টিং মানুষ। ধুবড়িতে বাড়ি ছিলো। যমদুয়ার-প্যাসেঞ্জারের যাত্রা-পার্টির যাত্রীদের বেশিই ধুবড়ি থেকে এসেছেন। উনি কি করতেন তা মনে নেই আমার। পরনে চেক্-কাটা লুঙ্গি, তার উপর ফুলহাতা সোয়েটার। পোলো-নেক্-এর। তার উপরে অ্যামেরিকান ডিসপোজালের অলিভ-গ্রীন জার্কিন। গলায় লাল-হলুদ চেক্-চেক্ মাফলার। মাথায়, বিবির বানিয়ে দেওয়া ঘোরতর লাল বর্ণের উলের গোলাকৃতি টুপী।

বাবা পান সাজছিলেন। পান খেতেন। কিন্তু পান-দোষ একেবারেই ছিলো না। যা কিছুই করতেন প্রচণ্ড মনোযোগের সঙ্গে করতেন। পানে সবে চুন লাগিয়েছিলেন। বাঘের কথা শুনেই তড়ি-ঘড়ি পানধরা বাঁ হাতটাকে পান-মুক্ত করার জন্যে গাল-বাড়ানো ভগ্নদূত কাসেম মিঞার গালেই চুন লাগানো পানটা সেঁটে দিলেন। এবং হিপোপটেমাস্ হোল্ড-অল্ থেকে এক গড়ানে নেমে থ্রী সেফেন্টি-ফাইভ হল্যান্ড অ্যান্ড হল্যান্ডের সিংগল-ব্যারেল রাইফেল নিয়ে বাঘের দিকে নিশানা নিলেন।

এদিকে আমার খুল্লতাত সমানে মুখবিকৃতি করে পর পর তীব্র আর্তির সঙ্গে উঃ-আঃ-ইঃ-ঈঃ এবং স্বরবর্ণের অন্য সমস্ত অক্ষর উচ্চারণ করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ শব্দক্ষরণ চাল বদলে ব্যঞ্জনবর্ণ ধারণ করলো। ঘঃ-গঃ-ঋঃ-কঃ।

কাকা আমার কেন যে হঠাৎ শিশুকালে-পড়া স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে পড়েছিলেন সে কথা পরে বলছি। ইতিমধ্যে বাবার মতো ওজনে-ভারী তদুপরি রাশভারী মানুষকে ইংল্যান্ডে

তৈরি রাইফেল দিয়ে তারই সাধের চামড়ার উপর নিশানা নিতে দেখে সেই গুল্-বাঘ হঠাৎ তড়াক্ করে উঠে পড়েই "আমি খেলবো না ভাই" গোছের কিছু একটা নিচুস্বরে বলেই কুকুরেরই মতো দৌড়তে শুরু করলো।

সে না খেললে কী হয়, বাবা তো খেলবেনই ! সুতরাং, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাজল্ থেকে খেলিয়ে-দেওয়া অথবা লেলিয়ে দেওয়া গুলি ধাবিত হলো গুল্-বাঘের দিকে। কিন্তু সে ব্যাটা ইনকন্সিডারেট গুল্বাঘ ততক্ষণে চষা ক্ষেতের পেছনের বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে হাওয়া। প্রভুভক্ত গুলি মাটিতে তার মাথা ঠেকিয়ে ধুলো উড়িয়ে সেখানেই পড়ে রইলো বাবার নৈবেদ্য হয়ে। বাঘটা যে মরতে মরতেই বেঁচে গেল এই কথাটা অন্য গুল্বাঘেরা "গুল্" বলে উড়িয়ে দেবে কি না তাও জানা গেলো না।

ছোটোকাকার বৈকল্যর কারণ রাইফেল আনসেফ্ করতেই ভুলে যাওয়া। ঐ ঘনসন্নিবিষ্ট যাত্রাদলের মধ্যে কার গায়ে কখন লোডেড রাইফেল থেকে গুলি বেঁধে সেই ভয়ে তিনি গুলি ভরেই সেফটি-ক্যাচ্টি ঠেলে দিয়েছিলেন। উত্তেজিত অবস্থায় হেয়ার-ট্রিগার ধরেই যমেমানুষেরই মতো টানাটানি চলছিলো। সেফটি-ক্যাচকে যে আগে নোটিস দিতে হবে সে কথা আর মনে ছিলো না। কিন্তু অস্ট্রিয়ার জিনিস বলে কতা ! ট্রিগার যেখানে ছিলো সে জায়গা থেকে একচুলও নড়েনি।

সেবারে যমদুয়ারে গিয়ে কী কী শিকার হয়েছিলো তার বিস্তারিত ফিরিস্তি দেবো না। পারমিটে যা যা ছিলো সবই হয়েছিলো। শুধু সেবারেরই কেন ? কোনোবারের শিকারেরই পুরো ফিরিস্তি দেবো না "বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে"তে। কারণ, শিকার-কাহিনী এ নয়। বরং স্বীকার-কাহিনী বলাই ভালো। এ লেখা বন-পাহাড়ের মানুষদের নিয়ে, শিকার-পাগল এবং শিকারীদেরই নিয়ে। শিকার এখানে গৌণ, শিকারীরাই মুখ্য।

বাবা বারবার একটা কথা বলতেন শিকারের ব্যাপারে। "ফেইলিওর্স, আর দ্যা পিলাবুস্ অফ সাকসেস্"।

বড় হবার পর, ঐ কথাটা যে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই কতখানি প্রযোজ্য তা হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম। আমাদের দেশের নানা স্তরের, নানা চরিত্রের, নানা মানুষদের কথাই বলতে বসেছি এখানে। নিজেদের স্থূল এবং জান্তব হনন-কৃতিত্বের বাহাদুরী বর্ণনার জন্যে আদৌ নয়। তাই মুখ্যত ফসকানো-গুলির কথাই বলব। এ লেখা অ-শিকারী, সাধারণ রসিক পাঠিকা এবং পাঠকদেরই জন্যে। যাঁরা অনেকই বাঘ-হাতী-গণ্ডার শিকার করেছেন এবং শিকার করা বলতে শুধুমাত্র প্রাণী নিধনই জেনেছেন তাঁদের জন্যেও নয় এ লেখা। অথবা যাঁরা বন-জঙ্গল সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ সেই সমস্ত প্রভূত অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ শিকারীদের জন্যেও নয়। আরাম কেদারায়-বসা পুঁথিগত-বিদ্যাদিগগজ বন এবং বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের জন্যেও এই লেখা নয়।

শিকারী অথবা বন-বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমার কোনো দাবিই নেই। কোনো দিনই ছিলো না। আমি একজন সামান্য লেখক মাত্র। লেখকের চোখ দিয়ে শিকার এবং বনজঙ্গলের মধ্যে থেকে সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে যতটুকু আনন্দ ও অভিজ্ঞতা তুলে আনতে পেরেছি তাতেই আমি খুশি থেকেছি চিরদিনই। সবিনয়ে এবং সহর্ষে সেই অনাবিল আনন্দরই ভাগীদার করতে চাই আপনাদের সকলকে।

সেই অভিপ্রায়েই এই ধারাবাহিকের সূচনা।

BanglaBook.org

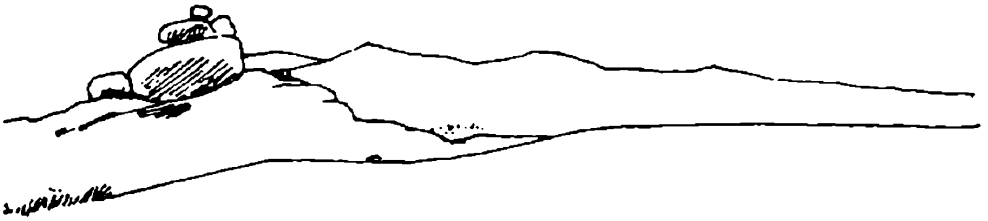

বর্ষার ব্রহ্মপুত্র বা তিস্তা বা মহানদী দেখলে সত্যিই ভয় করে। কাবেরী, গোদাবরী দেখলেও করে। কিন্তু নিরাপদ স্থলভাগে দাঁড়িয়ে নদীর রূপ দেখা একরকম আর ছোট্ট ছইওয়ালা নৌকোতে বসে পাল তুলে দিয়ে খর-হাওয়ার মধ্যে ভরা শ্রাবণের ব্রহ্মপুত্রকে কোনাকুনি পেরোনোর সময়ে দেখাটা আরেকরকম।

বড় নৌকো নেওয়ার উপায়ই ছিলো না কোনো। মোটর-বোটও নয়। কারণ আমাদের গন্তব্য তো জিঞ্জিরাম ! সে নদী নারীর মতোই গভীর কিন্তু চওড়াতে এই শ্রাবণের শেষেও, আমাদের কালীঘাটের গঙ্গার চেয়ে মাত্র দু-তিন গুণই বেশি। সেই ক্ষীণ-কটি নদীতে বড় এবং চওড়া নৌকো নিয়ে বাইতে-যাওয়া একেবারেই সম্ভব ছিলো না।

দুপুরে ধুবড়িতে খাওয়া-দাওয়া সেরেই বেরুনো হয়েছিল। ব্রহ্মপুত্র পেরোতে পেরোতেই বিকেল হয়ে গেলো। ভয়ে, প্রাণও বেরিয়ে এলো। আমি যে-প্রকার সাঁতার জানি তা সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের বর্ণনানুযায়ী গোয়ালন্দী স্টীমারেরই মতো। যে-পরিমাণ জল সরাই চারপাশে সে-পরিমাণ এগোই না আদৌ। তাই ভয় না পাওয়া অমূলক নয়।

নদী পেরিয়ে 'পাগলা' নামের একটি ছোট্ট নদীতে ঢুকে পড়লাম আমরা। পাগলাতে সুন্দরবনের 'দোয়ানির'ই মতো বিপরীতমুখী স্রোত ছিলো কি না এখন আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। তবে ঐটুকু নদী হলে কী হয়, সে যেন সাপের মতোই ফুঁসছিলো। তার বুকের ফেনিল আবর্ত দলা দলা লালচে ফেনা, আইসক্রিমের গোলাকৃতি বলের মতোই দ্রুতবেগে দৌড়ে যাচ্ছিল বিপরীত দিকে। একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গলে যাচ্ছিলো বিড়বিড় আওয়াজ তুলে স্বগতোক্তি করতে করতে। 'পাগলা' চলেছিলো গারো পাহাড় জেলার দিকে, ফুলবাড়ি বন্দরের সঙ্গে মিশবে বলে। পাগলামিরও নানা রকম থাকে !

পাগলা বেয়ে চলতে চলতেই সন্ধে হয়ে এলো। বৃষ্টি-থামা বর্ষার সন্ধের ঠিক আগের মুহূর্তটিকে, আকাশে যখন সেই প্রাচীনতম চিত্রকর হালকা এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্যর সব রঙ নিয়ে ছবি আঁকতে বসেন, তখন আকাশ যেন একটি "ইজেল"ই হয়ে ওঠে। স্বল্পক্ষণ বাদেই চওড়া তুলির দ্রুত-বোলানো কালো রঙে মুছে যাওয়ারই জন্যে যেন সন্ধেবেলার এইসব অসামান্য ছবি আঁকা হচ্ছিলো। সেই সন্ধ্যাকাশের ইজেলের নানারঙা ছায়া পড়েছিলো পাগলা নদীতে আর বিচিত্র সব রঙের আভাসই যে আলতো হাতের মোলায়েম আঁচড়ে ফুটে উঠতে লাগলো ক্ষণে ক্ষণে নদীর মুকুরে, তা কী বলব।

আকাশে, মাটিতে, নদীতে বা বনে যেসব ছবি অনবরত আঁকেন এবং অবলীলায় মুছে দেন সেই অদৃশ্য শিল্পী। সেই সব অবিজ্ঞাপিত আশ্চর্য ছবির নেশায় যাকে একবার পেয়েছে তার আর কোনো আর্ট গ্যালারির মধ্যে ঢুকে ছবি দেখতে ভালো লাগার কথা নয়। সমস্ত সৌন্দর্যর যা উৎসমুখ তাই-ই যাকে ভেতরে ভেতরে উৎসারিত করে রেখেছে তার এক

অববাহিকা থেকে অন্য অববাহিকাতে দৌড়ে বেড়ানোর সব প্রয়োজনই বোধহয় ফুরিয়ে যায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য তার অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে তার সমস্ত ইহকাল ও পরকাল একেবারেই ঝরঝরে করে দেয়।

'শালমাড়া' নামের ছোট্ট জনপদের পাশ দিয়ে নৌকো যাচ্ছিলো তখন। বৃষ্টি-ভেজা লালরঙা টিনের বাড়ি। সবুজ সতেজ গাছ-গাছালিতে ভরা বর্ষার জনপদ। বৃষ্টি-থামা বিকেলের আকাশে সাদা-কালো কবুতরদের ঘুরে ঘুরে ওড়া।

মনে পড়লো, পাঁচকড়িদাদা বলেছিলো যে, শালমাড়াতে কলিতা-দারোগা পোস্টেড ছিলেন নাকি একসময়।

কে ঐ কলিতা-দারোগা তা আমি জানি না। অথচ সেই অদেখা দারোগার সঙ্গে শালমাড়ার পাশ বেয়ে যেতে যেতে খুবই একাত্ম বোধ করছিলাম। স্বপ্নে বা শৈশবে শোনা প্রায় ভুলে-যাওয়া কোনো নাম কত কীই যে বয়ে আনে মনে!

ফুলবাড়ি বন্দরের কাছে পৌঁছবার আগেই অন্ধকার নেমে এলো। দূর থেকে গঞ্জের গুঞ্জরন জলের উপরে উপরে সাঁতরে কানে আসছিলো। দূর থেকে দেখা গেলো নদীর বুকের সবে-সন্ধের কুহেলিকার মধ্যে লণ্ঠন এবং হ্যাজাকের লাল এবং সাদাটে আলোর বিন্দু। বৃষ্টিভেজা হাওয়ায় স্পন্দিত হচ্ছিলো আলোগুলো বিস্ময়াহত চোখের মতো। তারপর নৌকো একটা বাঁক নিতেই সমস্ত ফুলবাড়ি গঞ্জ হাজার আলোর চোখ তুলে তাকালো আমাদের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে। ছিপ-নৌকোতে রোদ-বৃষ্টির গন্ধমাখা, খালি গায়ের একদল স্বাস্থ্যবান ছেলে বাইচ্ খেলায় জিতে গান গাইতে গাইতে চাবুক মারার মতো সপ্‌সপ্ দাঁড় বাইতে বাইতে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো। নৌকোর ছইয়ের উপরে বসে সুবেশ ক্যালকেশিয়ান আমি ঈর্ষামাখা মুগ্ধ চোখে অপসৃয়মাণ সমবয়সী তাদের দিকে চেয়ে রইলাম।

কে জানে! তারাও হয়তো ঈর্ষারই চোখে আমার দিকে চেয়েছিলো চলে যেতে যেতে। যে জীবনকে জানা নেই, যে জীবন, যে সমাজ ঐ দ্রুতগতি ছিপ-নৌকোরই মতো জলজ অন্ধকারে অজানা বন্দরের দিকে অপসৃত হয়ে যায়; তার প্রতি মানুষমাত্রেরই এক মোহগ্রস্ত দুর্বলতা থাকেই। আমাদের চেনা-জানা জগৎটুকুই যে সব নয়! আমাদের অভিজ্ঞতার, অনুভূতির বৃত্তের ঘেরাটোপের বাইরেও এক মস্ত জগৎ পড়ে আছে বলেই আমাদের এই একঘেয়ে জীবনকে সেই জগতের কল্পনা দিয়ে আমরা ভরিয়ে তুলতে পারি।

ভাগ্যিস পারি!

নৌকো এখন ফুলবাড়ি ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। ঘাট থেকে হঠাৎ একটি নারীকণ্ঠের চিকন তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার ভেসে এলো, "আমারে ফ্যালাইয়া যাইও না গো-ও-ও-ও, আমারে ফ্যালাইয়া যাইও না-আ।" এবং তারই সঙ্গে একটি শিশুও চিৎকার করে উঠলো, "আব্বাজা-আ-আ-ন্" বলে।

এই নদী আর সমুদ্র, নৌকো, জাহাজ আর পুরুষরা বড়ই নিষ্ঠুর। নারী, চিরদিনই পুরুষকে কাছে রাখতেই চেয়েছিলো। খুবই কাছে। শিশুর মুখচ্ছবি আর নিজের মৃণালভুজের ঘের দিয়ে পুরুষকে ঘিরে রাখতেই চেয়েছিলো সে। কিন্তু পুরুষমাত্রই বুঝি টেনিসনের উ্যলীসীস। সে বলছে

"আই ক্যান্ট রেস্ট ফ্রম ট্রাভেল আই উইল ড্রিঙ্ক লাইফ টু দ্য লীজ..."।

সে বলেছে:

"দ্য লাইটস্ বিগিন টু টুইঙ্কল্ ফ্রম দ্য রকস্

দ্য লঙ ডে ওয়েনস্ দ্য স্লো মুন ক্লাইম্বস্
দ্য ডীপ
মোনস্ রাউন্ড উইথ মেনি ভয়েসেস্, কাম মাই ফ্রেন্ডস্
টি'স নট টু লেট টু সীক্ আ নিউয়ার ওয়ার্লড্।"

কে জানে ? কোন্ আব্বাজান তার সুন্দরী তরুণী স্ত্রী আর ক্রন্দনরত শিশুকে ছেড়ে এই বর্ষা-সন্ধ্যায় নৌকো ভাসালো কোন্ নতুনতর পৃথিবীর উদ্দেশে ! কিন্তু আমার মন বলে উঠলো ভালো হোক তার প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রী আর শিশুপুত্রর। ভালো হোক পৃথিবীর সকলেরই। নৌকোর খোলে ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে ফুলবাড়ির মাঝি। খয়েরি আর কালো চেক চেক লুঙ্গি পরে নামাজ পড়া শেষ করলো। মসজিদ থেকে সন্ধের আজানের শিহব-তোলা শব্দ উঠেছিলো খানিক আগে। সেই শব্দ স্তব্ধ হয়ে আছে নদীর গভীরে মন্দিরের ঘণ্টা আর গৃহস্থ বধূর শাঁখের আওয়াজও যেন এই জলের মধ্যে মাখামাখি হয়ে আছে। আমাদের ছোট্ট ছইওয়ালা নৌকোখানি আমার দেশের নর-নারীর, তাদের সুখ-দুঃখ, তাদের নানা ভাষা ও ধর্মর আশীর্বাদে সম্পৃক্ত হয়ে ভেসে চলেছে। দাঁড় বাওয়ার শব্দ একটানা শোনা যাচ্ছে ছপ্ ছপ্। ছপ্ ছপ্। তিনভাগ জল ও একভাগ স্থলের এই পৃথিবীর দাঁড় বাওয়ার শব্দও, শিকারিদের আঁকা গুহাগাত্রের ছবিরই মতো ; প্রাগৈতিহাসিক। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো হঠাৎই আমার।

ভেজা হাওয়াতেই কি ?

কে জানে ?

বাবা বললেন, মনে আছে তোর ? 'তুরা'র কথা ?

হ্যাঁ।

আমি বললাম।

মনে পড়ে গেল 'তুরা'র কথা। তুরা হচ্ছে গারো পাহাড়েরই রাজধানী।

গারো পাহাড়ে হাতী ছিলো অনেকই সেই সময়ে। আমরা প্লেনে গৌহাটি গিয়ে সেখান থেকে গাড়িতে গেছিলাম 'তুরা'। ফুলবাড়ি হয়েই। অবশ্য স্থলপথে। বর্ষাকালেই। ফেরবার সময় পাহাড় থেকে সমতল অবধি অনবরত বিদ্যুৎ চমকেছিলো। শব্দহীন। এবং প্রায় যতিহীন টানা তিনঘণ্টা। অমন অভিজ্ঞতা আর কখনওই হয়নি। অন্য নানা কারণ তো ছিলোই মনে করে রাখবার মতো, কিন্তু শুধু ঐ এক কারণেরই জন্যেই 'তুরা'র কথা ভুলবো না কোনোদিনও।

ছাত্তারের ইচ্ছে ছিলো ফুলবাড়ি ছাড়িয়ে যতখানি এগিয়ে যাওয়া যায় গিয়ে রাতের মতো নোঙর করবো আমরা। যাতে পরদিন ভোরে নৌকো ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি জিঞ্জিরাম নদীতে পৌঁছনো যায়। কিন্তু ফুলবাড়ি ছেড়ে আসার কিছুক্ষণ পরই ঝেঁপে বৃষ্টি নামলো। রৈ রৈ বৃষ্টির সঙ্গে, হৈ হৈ করতে লাগলো দামাল হাওয়া। আর নৌকোর পাটাতনে ঝম্‌ঝম্ করতে লাগলো ইলিশমাছের আঁশের মতো বৃষ্টির রুপোলি ফোঁটা।

মাঝিরা সামাল সামাল করে উঠলো। শক্ত হাতে হাল ধরলো বুড়ো মাঝি সামসের মিঞা। তারপর বুদ্ধি করে তাড়াতাড়ি নদী ছেড়ে জিঞ্জিরামের প্লাবিত ব্যাকওয়াটারের বাদায় ঢুকে, কম জলে, নলখাগড়ার বিজ-বিজ করে নিজেদের মনে কথা-বলা, হিজিবিজি বেড়ার আড়ালে নোঙর করলো নৌকোকে তারা।

বৃষ্টির দাপট চললো তারও পর প্রায় আধ ঘণ্টাটাক। সমস্ত সময় ছই-এর নিচে আমরা জড়সড় হয়ে অসাধ্য-সাধন করে বসেছিলাম। ছাত্তার মিঞা তারই মধ্যে এক কোনায়

BanglaBook.org

স্টোভ ধরিয়ে অসাধ্য-সাধন করে চা বানিয়ে খাওয়ালো বাবা আর শচীনবাবুকে। নিজেও খেলো এবং মাঝিদেরও দিলো।

চা-এর পাট শেষ হলে হাঁসের ডিমের ঝোল আর ভাতের আয়োজন করতে লাগলো।

বাইরের ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেলেই নৌকোর ভিতরের স্টোভের শব্দ জোর হলো। নৌকোর বাইরে এসে ভেজা-ছইয়ের উপরে বসলাম। আঃ, কী শান্তি এখন। আমরা স্থলচর জীব বলেই হয়তো স্থলের সৌন্দর্যেই বেশি করে, কাছ থেকে চিনি শিশুকাল থেকে। জলভূমির দিন-রাতের সৌন্দর্যও বড় কম নয়, কম বিচিত্রও নয়। পাতিহাঁসের ডিমের গন্ধ, দূরের বুনো-হাঁসের ডানার গন্ধ এবং এই ভেজা জলভূমির গায়ের মিশ্র গন্ধে আমার নাক ভরে গেলো।

আকাশ এখন পরিষ্কার। উজ্জ্বল তারারা ঝিকমিক করছে সেই বৃষ্টি-ভেজা রাতের নীল আকাশে। দূরে অন্ধকারের মধ্যে গুঁড়ি মেরে বসে-থাকা ডাইনোসরের মতো গারো পাহাড়ের অন্ধকারতর পিঠের আভাস দেখা যাচ্ছে। দিনের বেলায় যা-কিছুই স্পষ্ট, অন্ধকারে তাইই রহস্যময় এবং অনেক সময় ভয়াবহও হয়ে ওঠে। দূরের গারো পাহাড়ের পিঠে আর কোলে পড়া বৃষ্টি আর নাম-না-জানা নানা ফুলের গন্ধ বয়ে নিয়ে ভেসে আসছিলো ভেজা, গন্ধে-গাঢ় হাওয়াটা নদীর উপর দিয়ে, জলের আঁচল উড়িয়ে ; ছুটে। মাথার উপর দিয়ে, ঘাড়ে কেশরওয়ালা একদল হেরন বক, ওয়াক্-ওয়াক্ করে উড়ে যাচ্ছিলো। ওরা রাতপাখি। রাতের সব গন্ধ আর আধো-অন্ধকার ওদের ডানায় চারিয়ে দিয়ে যায় ওরা।

হাঁসের ডিমের ঝোল আর ভাত দিয়ে রাতের খাওয়া সারার পর মাঝিরা লণ্ঠনের ফিতে নামিয়ে পাটাতনে রেখে দিলো। নৌকোর খোলে জলের আঙুলগুলি মৃদু চাপড় দিয়ে দিয়ে কুপুৎ-কুপুৎ আওয়াজ করে ঘুমপাড়ানি গান গাইছিলো যেন। আশ্চর্য এক দুলুনি ছন্দে বাঁধা সেই নিরক্ষর গান। তবে তালটা বড়ই গোলমেলে। সম্-এ পৌঁছনোর কোনো ঠিকঠিকানাই নেই। খুশিমতো পৌঁছচ্ছে যখন-তখন।

বাবার পাশে শুয়ে, দুলতে দুলতে, আমার ঘুমন্ত বাবার গায়ের গন্ধে নদীর গায়ের গন্ধে, বুঁদ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এক সময়ে। আরামে। একমাত্র শিকারে গিয়েই বাবাকে অত কাছে পেতাম আমি। অথবা বাবা আমাকে। ভারী সুখের আর শান্তির ছিলো শৈশবের কৈশোরের প্রথম যৌবনের সেই সব দুরন্ত দিন এবং রাতগুলি। ঘুম ভাঙলো স্টোভের সোঁ সোঁ আওয়াজে।

রোদে ঝলমল করছে চারদিকের জলের পৃথিবী। নলবনে নানা পাখি ওড়াউড়ি করছে। একটি কিং-ফিশার মাছরাঙা জিঞ্জিরাম নদীর দিকে উড়ে যেতে যেতে আমার কাছাকাছি এসেই হঠাৎ এক ডিগবাজি খেয়ে তার কাঁচ-ভাঙা আওয়াজের গলায় বলে গেলো গুড মর্নিং!

তার এই হঠাৎ-সম্ভাষণে ও ডিগবাজিতে মুঠিভর নীল উজ্জ্বল আকাশকে রঙের পিচকিরিতে রাঙিয়ে দিয়ে চলে গেল।

কিং-ফিশার মাছরাঙার ঘন-নীল শরীর দূর থেকে দূরতর হয়ে ফিকে হতে হতে আকাশেরই রঙের সঙ্গে মিশে গেল।

সকালের সেই নিস্তরঙ্গ স্নিগ্ধ শান্তির মধ্যে শন্ শন্ শব্দ করছিলো ছাত্তারের স্টোভ। চা বানাচ্ছিলো ছাত্তার। সঙ্গে ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কিট দিয়ে দেবে। তারপর চিঁড়ে-ভাজা।

ছাত্তার বললো, হাত মুখ ধুইয়্যা নাস্তা কইর‍্যা ন্যান্। এইবার নোঙর উঠান্ লাগবো।

জিঞ্জিরাম নদীতে কুমীর শিকারের প্রসঙ্গ থেকে কত অন্য প্রসঙ্গে এসে গেলাম। আবার

BanglaBook.org

সেখানে ফিরে যাই। দুরুদুরু বুকে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে একটি ছোট নদীতে ঢুকলাম। তার নাম আজ মনে নেই।

বেশ কিছুক্ষণ নৌকো বাওয়ার পর দূর থেকে একটি জনপদ চোখে পড়লো। তা পেরিয়ে যাবার সময় ছাত্তার বললো, এই থানাঘাট। এরপর আর বলার মতো বড় বসতি নাই। লালদা, একটু পরই জিঞ্জিরামের খোলে ঢুকুম আমরা। নৌকোর ছইয়ের উপরে রাইফেল লইয়া বসেন। গলায় দূরবীনটারে ঝুলাইয়া লন।

আমি বললাম, দাঁড়াও। নৌকো এগোক আগে।

কুমীরে জলের উপর পোড়া কাঠের মতো নাক-ভাসাইয়া থাকবোঅনে। মাথা কিংবা বুক আন্দাজ কইর‍্যা মারণ লাগব। এ নদী গহন খুব। মোক্ষম মার না হইলে কুমীর ভাইস্যা যাইব স্রোতের টানে। কবে পাওন যাইব আর পাওন যাইব কি না তারই বা ঠিক কী ? তা ছাড়া বদমাশ কুমীর হইলে তো জলের নীচায় নদীর পারের গর্তে যাইয়া বইস্যা রইব, চোট যদি তেমন মোক্ষম না হয়।

বাবা বললেন, কুমীর মারার সবচেয়ে সুবিধা যখন তারা চরে বা পারে উঠে রোদ পোয়ায়। ওড়িশার মহানদীর, বিহারের শোন আর গণ্ডকের, মধ্যপ্রদেশের নর্মদার চরে বা সুন্দরবনে যেমন শীতকালে মারতে সুবিধা। এখন তো ভরা শ্রাবণ। তা ছাড়া, জিঞ্জিরামে চর বলতে যা দেখবি তা কাদা-প্যাচ্‌প্যাচে, কালো, বৃষ্টি-ভেজা একফালি ঢিবির মতো জমিই। তাকে চর বলে না।

নৌকো এগিয়ে চলেছে। নদীর দু'পারেই এখন জঙ্গল। তবে বড় বন নয়। ডানদিকে গারো পাহাড়ের অববাহিকার জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। হরজাই জঙ্গল। তার আড়ালে কাছিম-পেঠা গারো পাহাড়। লম্বালম্বি শুয়ে আছে নদীর ডান পার বরাবর। বাঁদিকে গোয়ালপাড়া জেলা আর ডানদিকে গারো পাহাড় জেলা।

জল যেখানে শেষ সেখানে নলখাগড়ার হিজিবিজি বন। আলো ছায়ায় দারুণ এক স্বপ্নিল আবেশ তৈরি হয়েছে। নানারকম ফড়িং উড়ছে রাতের বৃষ্টির পর। গারো পাহাড়ের দিক থেকে নাম-না-জানা ফিকে লাল মৃদুগন্ধী অজস্র ফুলের বাস ভেসে আসছে সকালের হাওয়ায়।

জিঞ্জিরাম নদীর গভীরে ভালো করে ঢুকতে-না-ঢুকতেই আবার আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামলো। সে কী বৃষ্টি। তার সঙ্গে দমক দমক হাওয়া। ছই-এর ওপর থেকে নেমে নৌকোর ভিতরে জবুথবু হয়ে বসে রইলাম সকলে। ছইয়ের পর্দা ফেলা। এক পাশে মাঝিরা আর ছাত্তার আর অন্য পাশে আমরা তিনজন। মাঝিদের তামুক খাওয়ার হুড়ুক-গুড়ুক শব্দে আর তামাকের গন্ধে ভরে গেলো নৌকোর ভিতরটা। এমন সময় ছপ্‌ছপ্‌ করে শব্দ করে একটি নৌকো আসার শব্দ শোনা গেল। বড় মাঝি পর্দা তুলে দেখে বলল, ছিপ্‌।

ছিপ্‌ নৌকো করে ডাকাতরা ডাকাতি করে। শুধু এখানেই নয়, সুন্দরবনেও। নদীমাতৃক বাংলা এবং আসামের এবং অন্যান্য রাজ্যের সব জায়গাতেই। তখন অন্তত করত। তবে আমাদের সঙ্গে বিশেষ সুবিধা হবে না। সুন্দরবনের নদী-খালগুলিকে যিনি নিজের হাতের রেখার মতো জানতেন সেই বাগচী বাবু (গোপেন্দ্রকিশোর বাগচী) একবার ডাকাতরা ডাকাতি করে যাওয়ার পর তাঁর লুকিয়ে রাখা ফোর সেভেন্টি ডাবল-ব্যারেল হল্যান্ড এন্ড হল্যান্ডের দোনলা রাইফেল দিয়ে ডাকাতদের নৌকোর পেট ফাঁসিয়ে দিয়েছিলেন। সুন্দরবনের মাঝ নদীতে নৌকোডুবির চেয়ে রাইফেলের গুলি খেয়ে মরাও অনেক ভালো। ডাকাতরা শেষে তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে; ডাকাতি-করা জিনিস সব ফেরত দিয়ে তাঁর

BanglaBook.org

বোটে চড়েই নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে বাঁচে। তারপর নাকে-কানে খৎ দিয়ে পালায়।

দিন-দুপুরে ডাকাতি এরা করতে আসেনি নিশ্চয়ই। ছিপ-নৌকোর একজন মাঝি পুটুর-পুটুর বৃষ্টির মধ্যে সেই বৃষ্টিরই মতো আওয়াজ করে বললো, আগুন আছে কি মিঞা ?

'এই আগুন আছে কি মিঞা' বাক্যটি আমাদের শিশুকালে পূব-বাংলার রাতের নদীনালায় বড় ভয়াবহ ছিলো। ডাকাতের নৌকোরা এসে এমনি করেই আগুন চাইত।

বৃষ্টি ততক্ষণে ধরে গেছে। নৌকোর পর্দাগুলো তুলে দিলাম আমরা দু'দিক থেকেই। একটু আগেই মাঘী-কুয়াশার মতো সোঁদা অন্ধকার ছিলো নদীর ওপরে। বৃষ্টি থামার সঙ্গে সঙ্গেই রোদ হেসে উঠলো গারো পাহাড়ের পায়ের কাছের বনে, জিঞ্জিরামের বন-ছায়া-বুকে-ধরা সবুজ জলে।

ছিপ নৌকোয় ছ'জন মাঝি। আমাদের মাঝিরা আগুন দিলো তাদের। বিড়ির আগুন ফুটলো মুখে মুখে। বৃষ্টি ভেজা কালো-কালো উদ্‌লা শরীরগুলো রোদের মধ্যে, জল থেকে লাফিয়ে-ওঠা চিকন কাতলা মাছের শরীরের মতো চক্‌চক্ করে উঠলো।

ছাত্তার শুধোলো, কুমীরের খবর জানেন নাকি কিছু ?

হ্যাঁ। কুমীরের অত্যাচারে তো সিঁটাইয়া আছে দুই পারের লোকজন। বৌ-মাইয়ারা জল নিতে কাপড় কাচতে পারতাছে না। এমন গ্রাম নাই যে গ্রাম থিক্যা মানুষ নেয় নাই হারামজাদারা।

শুনে আমি অবাক হলাম। জিম করবেটের বইয়ে কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘেদের কথা পড়েছিলাম। এমন গ্রাম ছিলো না সেখানে যেখান থেকে বাঘে মানুষ নেয়নি। মানুষখেকো বাঘে ভরা ওড়িশার কালাহাণ্ডী জেলার কথাও শুনেছিলাম নানা শিকারীদের মুখে। কিন্তু মানুষখেকো কুমীরও যে এমন বিভীষকার কারণ হতে পারে তা জানা ছিলো না।

ছিপ নৌকোর বুড়ো মাঝি বললো ছাত্তারকে, তাড়াতাড়ি বাইয়া যান, আইড়াকাঠার চড়ায় দেইখ্যা আইলাম বড় বড় তাড়িয়াল কুমীরে রোদ পোয়াইতাছে।

তারপর ছিপ্ নৌকো ছপাছপ্ দাঁড় ফেলে চলে গেলো। কোথায় যাবে ওরা কে জানে।

জারি ও সারি গান গাইতে গাইতে এখনও কত ছিপ নৌকো চলে যায় আমার স্মৃতির সন্ধ্যেবেলার শান্ত নদী বেয়ে। জলে নিঃশব্দ ঢেউ ওঠে, পারে পারে পৌঁছে যায়, শেষ সূর্যর গুঁড়ি গুঁড়ি সিঁদুর মাথায় মেখে পুরোনো দিনের সতী-সাধ্বী বোবা মেয়েদের মতো।

জোরে দাঁড় বেয়ে চললো মাঝিরা। কিছুটা যেতেই একটি ছোট মাছ-ধরা নৌকোর সঙ্গে দেখা। বাবা তাকে দাঁড় করিয়ে ভাঙনি মাছ কিনলেন। শচীন রায় মশায় বললেন, আহা। এই মাছের কী স্বাদ গুহসাহেব। কাঁচালংকা, হলুদ আর কালো জিরা ফোড়ন দিয়া ভালো কইরা রাইন্ধো হে ছাত্তার। আজ পেট-মাদাইয়া খাইয়া ঘুমান্ লাগবো। রাতে ভালো ঘুম হয় নাই।

বাবা বললেন, প্রথম রাতে ভালো ঘুম হয় না কখনোই। সে ট্রেনই হোক, নৌকোই হোক, গরুর-গাড়িই হোক আর কুটুম-বাড়িই হোক।

যা কইছেন।

শচীন রায় মশায় বললেন।

আইড়াকাঠার চড়ায় যখন পৌঁছনো গেলো তখন বেলা হবে এগারোটা। চড়া-ভর্তি নরম প্যাচ্‌প্যাচে কাদাতে কুমীরের অসংখ্য পা আর বুক আর ল্যাজের ভিতরের দিকের অংশের দাগ। কিন্তু কুমীর নেই। জলের মধ্যে মাঝে মাঝে বুড়বুড়ি উঠছে। কিন্তু জলের নীচে কামান দিয়েও কুমীর মেরে লাভ নেই। মরে যাবার পর জলের তোড়ে উজোনে বা ভাঁটার

BanglaBook.org

কত মাইল দূরে গিয়ে যে ভেসে উঠবে তার ঠিক নেই। প্রাণ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ভাসবে না আদৌ। আর কুমীরকে আজেবাজে জায়গায় গুলি করা না করা সমান।

ছাত্তার বললো, আরো আগে চলেন মিঞা। পাহাম্ গ্রামে যাইয়া খোঁজ-খবর করন লাগে। বলেই, আবার জোরে দাঁড় বাইতে বললো মাঝিদের।

আমি আবার ছইয়ের উপরে এসে বসলাম রাইফেল আর ফিল্ড-গ্লাস্ নিয়ে। সামনেই কী একটা গ্রাম। বৌ-মেয়েরা চান করছে। কিন্তু বলতে গেলে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে। সতেরো বছরের ছেলে তখন আমি। ভীষণ ইচ্ছে করছিলো যে সুডৌল জল-লেজা সুতনুকা শরীরের মসৃণ রৌদ্রোজ্জ্বল স্তনগুলিকে আমার দুই চোখের সঙ্গে ছোঁওয়াই দূরবীনের দূরদৃষ্টি দিয়ে টেনে এনে। কিন্তু ছইয়ের নীচেই আমার বাঘা-বাবা। ঘুণাক্ষরেও জানতে পেলে এই কুমীরভরা জিঞ্জিরামেই ঠেলে ফেলে দেবেন এই অধমকে যে তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিলো না।

বাবা সব সময়ই বলতেন, শিকারের সবই ভালো, যদি মদ আর মেয়েমানুষ না থাকে। বলা বাহুল্য, মেয়েমানুষ মানে খারাপ মেয়েমানুষ। নদীর ঘাটে যদিও ভালো মেয়েমানুষরাই চান করছিলো কিন্তু মনে কুচিন্তা এলে তারাই খারাপ।

বাবারা ছিলেন বাবাদেরই মতো। তাই-ই এখনও এত শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। আমরা তাঁদের পরের প্রজন্মর মানুষেরা আমাদের মতো। অত বাড়াবাড়ি রকমের ভালো হতে পারিনি আমরা। এক প্রজন্মের সঙ্গে অন্য প্রজন্মর তফাৎ থাকাটা স্বাস্থ্যকর। স্বাভাবিক তো বটেই। এখন পেছন ফিরে তাকিয়ে মাঝে মাঝে মনে হয় বাবাদের প্রজন্ম হয়তো অনেক অনুপনোদিত কামনা-বাসনা নিয়েই চলে যাবেন। ঐ প্রজন্মের মানুষদের খাদ্যদ্রব্যর উপর বাড়াবাড়ি রকমের লোভ, আমার মনে হয়, জীবনের অন্যান্য লোভের ক্ষেত্রে হয়তো নিজেদের এক ধরণের স্বেচ্ছা-বঞ্চনা ও হতাশা থেকেই জন্মাতো। এই মনে হওয়া ঠিক কী না জানি না। এসব মনস্তাত্ত্বিকদেরই ব্যাপার।

পাহাম্-এ পৌঁছনো হলো না। নোঙর করে দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ করতে না করতেই আবার আকাশ কালো করে দিনকে রাত করে দিয়ে বৃষ্টি নামলো। একেবারে শ্বাসরোধ করা বৃষ্টি। চললো টানা ঘণ্টা দুয়েক। নৌকোর ছইয়ের মধ্যে বসেও আমরা ভিজে গেলাম চুপচুপে হয়ে, দমকা হাওয়া আর বৃষ্টির ছাঁটে শচীন রায় মশায়ের ঘুম হলো না। বাবারাও না।

বৃষ্টি থামলে ছাত্তার বললো, আর একটু এগিয়ে মস্ত বটগাছের নীচে আজকের মতো নোঙর করে রাতটা কাটানো যাবে। কাল সকালে পাহাম্-এ পৌঁছেই খোঁজ-খবর করা যাবে। নৌকো একটা বড় বটগাছের কাছে আসতেই বাবা বললেন ছাত্তারকে, রাতে রাঁধবে কি ?

খিচুড়ি।

কি ডালের ?

মুগ ডালের।

সঙ্গে কি দেবে ?

আলু, ডিম, কুমড়ো।

ভাজা হবে না কিছু ?

কড়্কড়ে করে আলু ভাজা, আলুর চোচা ভাজা, কাঁঠালের বিচি ভাজা আর ভাঙনি মাছের রসা। গা-মাখা-গা-মাখা।

BanglaBook.org

বাঃ। ফাস্টোকেলাশ।

বললেন, শচীন রায় মশায়।

বাবা আনন্দে ডগমগ হয়ে বললেন, একটা পান খাওয়ান শচীনবাবু। জর্দা দেবেন বেশি করে

আজকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পিছন ফিরে যখন ঐ বিকেলবেলার কথা ভাবি তখন আমিও আনন্দে ডগমগ হই। কিন্তু সেই সময়ে, খাওয়া নিয়ে ঐ বাড়াবাড়িতে ভীষণই বিরক্ত হতাম। ভাবতাম, আনন্দর এত কিছু আছে জীবনে অথচ এমন এপিকিউরিয়ান হন কি করে বাবারা! সাধারণ মানুষ ছাড়া এমন খাই-খাই করা সম্ভব নয়। মনে হতো তখন। আজ কিন্তু মনে হয় না! জিঞ্জিরাম নদীরই মতো মানুষখেকো ঘড়িয়াল আর তাড়িয়াল, অদৃশ্য সব কুমীরে-ভরা আমাদের এই জীবন। প্রত্যেকেরই জীবন। এই জীবনে অনেকখানি এগিয়ে আসার পর ছোট্ট নৌকোর ছোট্ট ছইয়ের নীচে, 'ছোকানু' না হলেও অন্য কোনো কাছের মানুষের সঙ্গে ছোট্ট ছোট্ট সুখ নিয়ে এই জীবনটা নিরাপদে, সসম্মানে কাটিয়ে দিতে পারাটাও যেন মস্ত একটা ব্যাপার। সত্যিই মাথা উঁচু করে, একজন মানুষের মতো মানুষ হয়ে অতি সাধারণভাবে বেঁচে থাকাটাই বড় কঠিন। একটু খাওয়া, একটু আদর, একটু ভালোবাসা এই-ই এখন যথেষ্ট বলে মনে হয়। প্রথম যৌবনের দিগন্তব্যাপী লাল সূর্য-ওঠা সব সামুদ্রিক স্বপ্ন এখন জিঞ্জিরাম নদীরই মতো শীর্ণকায় এবং গহন নদীর অপ্রমত্ততার মধ্যে নিহিত হয়ে গেছে। ক্ষীণকটি এক নদী, আর ক্ষীণকটি এক নারী, আর মুগের ডালের খিচুড়ি, এই-ই যেন অনেক বেশি চাওয়া; অনেক বেশি পাওয়া।

ঘুম ভেঙে গেছিলো আমার। নৌকোর বাইরে এসে দেখি চাঁদের আলোয় পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে। শেষ রাত। নৌকো থেকে পাড়ে নেমে বটগাছের ঘেরাটোপ ছেড়ে এসে ফাঁকা ঘাসের প্রাঙ্গণে দাঁড়ালাম।

রাতের নদী আর নদীপারে কত শব্দ। রাতের গারো পাহাড়ের অস্পষ্ট, রহস্যময়, নীলচে খোলের গ্রামে কারা যেন গান গাইছে, বাজনা বাজিয়ে। বিয়ে-টিয়ে আছে কি না কে জানে। দূরাগত সেইগানের ও বাজনার ক্ষীণ আওয়াজ শেষ রাতের নদীর শান্ত স্বগতোক্তির সঙ্গে মিলে মোহাবিষ্ট করছিলো আমাকে। একটি মস্ত জ্যাকারাণ্ডা গাছের মাথার উপরে জলজ কুয়াশামাখা হলুদ চাঁদ আকাশ-প্রদীপের মতো ঝুলে আছে। জলের নীচে কুমীর ডাকছে। অদ্ভুত সেই আওয়াজ। ঘাই মেরে যাচ্ছে অতিকায় চিতল মাছ। মুহূর্তের জন্যে সে শূন্যে চিৎ হয়ে চাঁদকে দেখছে। চিৎ হয় বলেই কি তার নাম চিতল? তা হলে ছিটেল হরিণের নামই বা চিতল কেন? তা হয়ত চিত্রল থেকে চিতল হয়েছে। কতসব আপাত-তুচ্ছ এলোমেলো অথচ সুন্দর সব ভাবনাতে মাথা ভার হয়ে আসছে। এইসব চিন্তা টাকার নয়, ক্ষমতার নয়, যেন-তেন-প্রকারেণ ছিনিয়ে-নেওয়া যশেরও নয়, এসব অর্থহীন, লাভহীন চিন্তা। এ-সবের দাম কারো কাছে অনেক, কারো কাছে কানাকড়ি। যে যেমন মন, যেমন চরিত্র, যেমন প্রাপ্তির আশা নিয়ে এই পৃথিবীতে আসে তার চিন্তাও তেমনই হয়।

স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়েছিলাম সেই রাতের দিকে। ঘাসের বনের মধ্যে পা দুটি গেঁথে। মন বলছিলো, কুমীর শিকার হোক আর নাই-ই হোক তাতে যায় আসে না কিছুই। কলকাতায় ফিরে যাব এই রাতকে বুকে করে। তারপর যতদিন বাঁচব, জীবনের আর পৃথিবীর অনেক রাতের সঙ্গে এই রাতকে মিশিয়ে দিয়ে এইসব কোমল স্বরের ঝুমঝুমি-বাজা রাত-সমষ্টির মধ্যে একটি ছোট্ট চাঁদপোকারই মতো বেঁচে থাকব।

সেই হবে এক চমৎকার বাঁচা।

BanglaBook.org

বাঁচার যে কত রকম হয় সে খোঁজ কি সবাই-ই রাখে ?

পরদিন খুব ভোরে নৌকো ছেড়ে দেওয়া হলো। চা খাওয়ার জন্যে অপেক্ষা না করেই। 'রাভাতালা'-তে গিয়ে যখন নৌকো ভিড়ল তখন সবে রোদ এসে পড়েছে নদীপারের মুসলমান চাষীর উঠোনে। সেখানেই চাটাই পেতে আমাদের বসতে দিয়ে মুড়ি বাতাসা আর চা দিয়ে আপ্যায়ন করলো তারা। ছোট্ট গ্রাম। মাত্র কয়েকঘর লোকেরই বাসা। একটি মাঝবয়সী মানুষ বললো, তার বউকে কুমীরে নিয়ে গেছে চারদিন হলো। দুপুরে চান করতে গেছিলো। তার মুখ দেখে বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কথা বলছিলো। শোনা গেলো যে এই বছরেই জিঞ্জিরামের দু'পারের বিভিন্ন গ্রাম থেকে সবশুদ্ধ পনেরোজন মেয়ে এবং দু'জন পুরুষকে কুমীরে নিয়েছে। এখনও ভাদ্র আশ্বিন মাস বাকি আছে। শ্রাবণেই এই সংখ্যা। ওরা অনেক কাকুতি-মিনতি করে বলল, যতগুলো সম্ভব কুমীর মেরে দিতে। যদি চেহারাও না দেখা যায় তবুও রাইফেল দিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি করলেও ওরা ভয় পাবে।

তেমন করা সম্ভব ছিলো না। তবে সে কথা তাদের বলা গেল না। ওরা বললো, রাভাতালা থেকে পাহাম্ অবধি ভাঁটিতে যেতে। সারা দিন-রাত অমন উজান-ভাঁটায় নৌকো বাইলে মোলাকাৎ হবেই হবে। রাতের নদীতে টর্চের আলো ফেললে কাঠকয়লার আগুনের মতো জ্বলে উঠবে কুমীরের চোখ। তা জ্বলে যে সত্যিই ওঠে তা সুন্দরবনেই দেখেছিলাম অনেকবার।

রাভাতালা থেকে নৌকো ছাড়ার পর ছাত্তার এবং বাবা মিলে ঠিক করলেন যে পাহাম্ অবধি গিয়ে কুমীরের রাহান্-সাহান-এর খবর ভালো করে জেনে নিয়ে এই বাকি দু'দিনের স্ট্র্যাটেজী ঠিক করে নিয়ে তিনজন নদীর তিন জায়গায় আলাদা আলাদা বসে থাকবো। এক মাইল বা দেড় মাইল পরপর। আর ছাত্তার নৌকো নিয়ে উপর নিচ করবে সারাদিন মাঝিদের সঙ্গে। সন্ধের মুখে মুখে এক এক করে তুলে নেবে আমাদের। ব্যাপার যা দাঁড়ালো তাতে ট্রফি হিসেবে কুমীর মারার কথা না ভেবে এই অঞ্চলের মানুষদের বাঁচাতে যতগুলো সম্ভব কুমীর নিধন করার চেষ্টা করাই উচিত বলে সাব্যস্ত করলেন ওঁরা। তাতে আড়িয়াল বা তাড়িয়াল যাই শিকার হোক না কেন। শুধু ঘড়িয়াল মারা হবে না ঠিক হলো। কারণ তারা মেছো কুমীর। মানুষ খায় না।

পাহাম্-এর দিকে যেতে যেতে বিকেল হয়ে গেল। আজ আর খাওয়া-দাওয়ার বিলাসিতা করার সময় হয়নি। রাভাতালার মানুষদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের সকলেরই মন ভারাক্রান্ত ছিল। পাঁউরুটি আর ঝোলাগুড় দিয়েই লাঞ্চ সারা হলো যাতে নৌকো দাঁড় করাতে না হয়।

বিকেলবেলায় নৌকো এমন একটি জায়গায় এসে পৌঁছলো যে, আমরা যে ভারতেরই জিঞ্জিরাম নদীতে আছি না পশ্চিম আফ্রিকার বেলজিয়ান কঙ্গো-তে তা বোঝারই উপায় রইলো না। দু'দিকে ঘন সন্নিবিশিষ্ট গাঢ় সবুজ ক্লোরোফিল-উজ্জ্বল জঙ্গল। সেই জঙ্গলের দীর্ঘ বাহুবা নাতিপ্রস্থ জিঞ্জিরাম নদীর মাথার উপরে ঘনঘোর চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করেছে। দু পাশের সামান্য ফাঁক-ফোকর দিয়ে রোদের আলো পরিস্রুত হয়ে এসে ড্রইংরুমের মানি-প্ল্যান্টস্ বা বেবীস্-টিয়ারস্-ফার্ণ-এর সবুজ চাপা আলো যেমন করে আভাসিত করে রাতের দেওয়ালকে তেমন করে আভাসিত করেছে। তারই মধ্যে অতলান্ত নদী বয়ে চলেছে কচুরীপানার রঙের সবুজাভ জল নিয়ে। নদীর দু'পাশে বাদামী-রঙা অর্ধনগ্ন গারো আর রাভা ছেলেরা লম্বা লম্বা ছিপ ফেলে জঙ্গলময় ডাঙায় দাঁড়িয়ে মাছ ধরছে।

BanglaBook.org

এখানে কোনো মেয়ে নেই। কুমীরের ভয় তো আছেই। তার উপরে এমন সোঁদাগন্ধী বনজ অন্ধকারে, ভরা-শ্রাবণের ভেজা আবহাওয়ায়, যৌবনের কাছে যৌবন থাকলেই সর্বনাশ হতে পারে বলেও হয়তো বা। মেয়েরা ছিলো আরও পরে নদীর উপরে কাঠের পাটাতন তাতে বসে তারা জল তুলে তুলে চান করছিলো আমরাও রাভা আর গারো ছেলেমেয়েদের যেমন কৌতূহলের চোখে দেখছিলাম, পরম বিস্ময় নিয়ে, ওরাও তেমনিই আমাদের দেখছিলো।

ভারতবর্ষ, তখনও ভারতীয়রাই আবিষ্কার করেনি পুরোপুরি। ভাবছিলাম আমি। আমাদের এই পরম সুন্দর, বিরাট, স্বরাট বিচিত্র বিভিন্নতার দারুণ দেশকে আমরা সকলেই যদি সমান ভালোবাসার সঙ্গে জানবার চেষ্টা করতে পারতাম তা হলে এই সোনার দেশটি এতদিনে পৃথিবীর সবচেয়ে গর্বিত দেশ হতে পারতো। কিন্তু এই দেশে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গধারী জীবই অগণ্য। প্রতি মুহূর্তে তেলাপোকারই মতো, বা গিনিপিগেরই মতো সংখ্যা বাড়ছে তাদের। দেশে যদি মানুষ-পদবাচ্য মানুষ কিছু বেশি থাকত। আর এই রাজনৈতিক নেতারাও যদি মানুষের মতো মানুষ হতেন, তবে…

ছাত্তারের এসব অনেকবারই দেখা। তাই-ই ওর মুখে, ওর হাসিতে আমার দেশের মাটির, দেশের জলের গন্ধ ভাসে সবসময়। ছাত্তার বললো, চুপ কইর‍্যা ভাবেন কি এত লালদা আপনে সবসময় ?

আমি হেসে চুপ করে রইলাম। উত্তর দিলাম না কোনো।

ও আবারও বললো, কি ভাবেন, কয়েন না ক্যান ?

ঘন বনের চন্দ্রাতপের মধ্যে নদীর একটানা সড়সড় আওয়াজ আর নৌকোর দাঁড়ের ছন্দোবদ্ধ ছপ্‌ছপ্‌ আওয়াজকে ওর নিচু গলার স্বর গমগমিয়ে চমকে দিল।

আমি তবুও জবাব না দিয়ে হাসি-হাসি মুখে চেয়ে রইলাম নদীর মুখে।

ভাবলাম বলি, আমি যে মানুষ, তাই-ই ভাবি।

পরমুহূর্তেই ভাবলাম, বলে লাভ নেই। ছাত্তার অনেক জানে, অনেক দেখেছে ও, অনেক-ই ওর অভিজ্ঞতা। ওর কাছে আমার শেখার আছে অনেক কিছু। কিন্তু তবু আমি আমিই। ও, ও। সব মানুষের কাছেই সব মানুষের শেখার থাকে। কারণ মানুষ মাত্রই আলাদা আলাদা। স্বয়ম্ভূ না হলেও মানুষমাত্রই স্বয়ম্ভর। প্রত্যেক মানুষেরই বুকের মধ্যে জিঞ্জিরাম নদীর এই প্রায়ান্ধকার, কটুগন্ধী, গভীর রহস্যময় ফালিরই মতো একটি ফালি থাকে, যেখানে অন্যের প্রবেশ নিষেধ, যেখানে সেই মানুষের মনের অর্দ্ধনগ্ন সত্তাগুলি এই গারো ও রাভা ছেলে-মেয়েদেরই মতো তার নিজের মনের গভীরে লম্বা ছিপ ফেলে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দিনের পর দিন। বছরের পর বছর। হয়তো অনন্তকাল ধরেই। নদীরই আরেক নাম তো জীবন। মানুষ, মাছ, কুমীর এইসব বুকে করে, বুক পাশে নিয়ে সে চলেছে অনাদিকাল ধরে। আমার দেশ নদীমাতৃক দেশ। এই বাংলাদেশ। আমার জীবনও নদীমাতৃক। জীবনের আর নদীর মধ্যে তাই তফাত করিনি। করি না কোনো।

BanglaBook.org

তামারহাট এবং নিম্ন আসামের ঐ অঞ্চলের কথা এবার গুটিয়ে আনবার সময় হলো। ছাত্তারের কথাও। ছাত্তারের সঙ্গে শেষ শিকার যাত্রার কথাটি উল্লেখ করেই এই পর্ব শেষ করব।

কেনেথ এডওয়ার্ড জনসন তখন আসাম মণিপুর ত্রিপুরা এবং নাগাল্যাণ্ডের আয়কর কমিশনার ছিলেন। মিজোরাম, মেঘালয়, অরুণাচল ইত্যাদি হয়নি তখনও। ষাটের দশকের গোড়ার কথা বলছি।

জনসন সাহেবের হেড কোয়ার্টার্স ছিলো শিলং-এ। ওঁর দাদা ছিলেন লেস্‌লি জনসন। আই· সি· এস·! পশ্চিমবঙ্গের এক সময় রাজ্যপাল ধরমবীরেরই ব্যাচের। লেস্‌লি, দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং তার পরে অয়েল অ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশানের চেয়ারম্যান হয়ে রিটায়ার করেন। কেনেথেরও সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডায়রেক্ট ট্যাক্সের চেয়ারম্যান হয়েই রিটায়ার করার কথা ছিলো কিন্তু স্বাধীন ভারতের সরকারি চাকুরেদের অ-খেলোয়াড়সুলভ "টপকানো-টপকানো" খেলায় হেরে ওঁকে মেম্বার হয়েই রিটায়ার করতে হয়। এখন কেনেথ ব্যাঙ্গালোরের কাছে হোয়াইট ফিল্ডে অবসর জীবন যাপন করছেন। আমার সঙ্গে নিয়মিত চিঠিপত্রর আদান-প্রদান এখনও আছে। যদিও উনি আমার বাবার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন এক সময়। এমন শিকারি-বন্ধু জীবনে খুব বেশি হয়নি আমার। শিকারি কে কত বড় সেটা অবান্তর। কে কেমন মানুষ, জঙ্গলের বন্ধু হিসেবে, সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা।

ডি ওয়াংডিও তখন আয়কর বিভাগে। যুদ্ধের সময় এয়ারফোর্সে ছিলেন। কেনেথও ছিলেন আর্মিতে। কে· ই· জনসন ও ও· ভি· কুরুভিল্লা এই দুজন আর্মির ক্যাপ্টেন. যুদ্ধ শেষে আয়কর বিভাগে যোগ দেন এবং দুজনেই সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডায়রেক্ট ট্যাকসের মেম্বার ও চেয়ারম্যান হয়ে রিটায়ার করেন।

ওয়াংডি সাহেব বাবাকে 'দাদা' বলতেন। চিঠি লিখলেন যে, জনসন সাহেবের জন্যে আসামের কোথাও যেন শিকারের বন্দোবস্ত করেন বাবা। অনেকদিন ট্রিগার না টেনে হাত নিসপিস করছে ওঁদের।

বন্দোবস্ত করলেন বাবা, ধুবড়ীর শচীন রায় মশায়কে বলে, কিন্তু নিজে যেতে পারলেন না। বদলে আমাকে পাঠালেন। আমি তখন সবে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সী পাশ করে বাবার পার্টনার হয়েছি এবং বিয়েও করেছি।

যাওয়ার আগে বাবা বললেন, জনসন চমৎকার মানুষ। রিয়্যাল স্পোর্টসম্যান। একেবারে "আন্‌-অ্যাসুমিং"। 'ভেরি গুড শট'। অনেক বাঘ মেরেছে শুনেছি। আমার সঙ্গে একটি লেটার অফ ইনট্রডাকশানও দিলেন। তাতে লিখলেন যে, "লাল ইজ আ বেটার শট্

কমপেয়ারড টু মী"।

তখনও জনসন সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। ছাত্তারকেও খবর দিয়ে রেখেছিলেন শচীন রায় মশায় ধুবড়িতে। সে সঙ্গে থাকবে লোকাল গার্জেনেরই মতো।

প্রথমে চার চোখের মিলন হলো ধুবড়ির সার্কিট হাউসে। আমি তার আগের দিন প্লেনে রুপসী হয়ে ধুবড়িতে পৌঁছেছিলাম। সার্কিট হাউসে গিয়ে দেখি জনসন সাহেব, ওয়াংডি সাহেব তো আছেনই সঙ্গে ভল্লিভয় সাহেব উনি তখন পশ্চিমবঙ্গর মুখ্য আয়কর কমিশনার। কলকাতাথেকে উনি এবং দিল্লি থেকে কোদণ্ডরমন সাহেব ট্যাক্স "স্কেলিং-ডাউন" করার জন্যে শিলং-এ গেছিলেন জনসন সাহেবের সঙ্গে মিটিং-এ বসবেন বলে। কোদণ্ডরমন ফিরে গেলেন দিল্লি। ভল্লিভয় সাহেব বাঘ শিকার দেখার লোভে জনসন সাহেবের সঙ্গে চলে এলেন ধুবড়িতে।

ভল্লিভয় সাহেব গুজরাটি 'ভোরা' মুসলমান ছিলেন। ব্যাচেলর। তাঁর জীবন ছিলো কাজ, গল্ফ্ এবং হুইস্কি। লোকমুখে শুনেছি, "গে-ব্যাচেলর" ছিলেন। কাজের সূত্রে ওঁকে আমি চিনতাম। ওয়াংডি সাহেবকেও। কারণ তার আগে বিহারের বিভিন্ন জায়গাতে ওয়াংডি সাহেবের সঙ্গে শিকার করেছিলাম। জনসন সাহেবের সঙ্গে কিন্তু সেই প্রথম আলাপ।

যখন সার্কিট হাউসে গিয়ে পৌঁছলাম ছাত্তারকে নিয়ে তখন ওঁরা হুইস্কি খাচ্ছিলেন এবং তাস খেলছিলেন। তখন স্কচ হুইস্কির বোতলের দাম ছিলো পঞ্চাশ টাকার একটু বেশি। কেস-কেস কিনতেও অসুবিধা ছিলো না। তবে আমার বাবা অথবা আমি মদ ছুঁতাম না।

ভল্লিভয় সাহেব আমাকে দেখেই বললেন, হাল্লো গুহা। কাম প্লীজ হ্যাভ আ ড্রিংক।

আমি বললাম, থ্যাংক উ্য। আই ডোন্ট ড্রিংক।

তাতে ভল্লিভয় সাহেব বললেন, উ্য ডোন্ট ড্রিংক দেন, হোয়াট ডু উ্য লিভ্ ফর?

হেসে বললাম, মে বী, আই হ্যাভ আদার রীজনস্ ফর লিভিং।

তখন উনি বললেন, কাম দেন। জয়েন আস ইন দ্যা গেম।

বললাম, আই ডোন্ট ইভিন নো দ্যা কার্ডস, নট-টু স্পীক অফ দ্যা গেম্।

ভল্লিভয় বললেন, ফুঃ। উ্য অ্যাপীয়ার টু বী ওয়ান অফ দোজ ফানী কেভ-মেন।

পরদিন ভোরবেলা ওয়াংডি সাহেবের গাড়ি সার্কিট হাউসেই রেখে জিপে করে আমরা "যমদুয়ারের" দিকে রওয়ানা হলাম। যেতে হবে গৌরীপুর হয়ে। তারপর কুমারগঞ্জ পেরিয়ে ডানদিকে আলোকঝারি, রাঙামাটি পর্বতজুয়ারকে রেখে তামারহাট ছুঁয়ে, গুমা রেঞ্জ পেরিয়ে কচুগাঁও রাইমানা হয়ে।

যমদুয়ারের নামটিই জায়গাটির ভয়াবহতা সম্বন্ধে মনকে সচেতন করে। এর আগেও যদিও বহুবার গেছি তবুও যমদুয়ারে প্রতিবারই যাওয়ার সময় গা একটু ছম্‌ছম্ করেই। রাইমানার ছোট্ট রেঞ্জ অফিস পেরুনোর পরই প্রকৃতি মা যেন শিশুর মতো হাত ধরে নিয়ে যান আমাকে প্রতিবার।

উন্মুক্ত, আদিগন্ত ঘাসবন, যেখানে বুনো মোষেদের আর নানা জাতীয় হরিণ আর অ্যান্টিলোপের খেলা। এবং মেলা। মাইলের পর মাইল। অনেকটা 'মানস' অভয়ারণ্যর কথা মনে পড়িয়ে দেয় এই খোলা মাঠ যদিও 'মানস' টাইগার প্রজেক্টের একসময়ের ফিল্ড ডিরেক্টর এবং আসামের বর্তমান চিফ্-কনসার্ভেটর অফ ফরেস্ট সঞ্জয় দেব রায় সাহেব এ কথা শুনেই আমাকে অপ্রসন্ন হয়ে বলেন, "কী যে বলেন। আমার 'মানস' পৃথিবীর সব পুরুষের মানস-সুন্দরীর চেয়েও বেশি সুন্দরী। মানস মানস। তার সঙ্গে তুলনা চলে না

BanglaBook.org

কারো।"

হয়তো উনি ঠিকই বলেন। মানসের সঙ্গে যমদুয়ারের কিছু সাদৃশ্য থাকলেও থাকতে পারে তবে তারা আলাদা আলাদাই। নদীর মতো ; নারীর মতো।

যমদুয়ারে পৌঁছনোর আগে যে গভীর, আদিম, ঘনসন্নিবিষ্ট শালবনের মধ্যে দিয়ে ফ্যাকাসে মাটির ধূলিধূসরিত কাঁচা রাস্তায় অনেকক্ষণ জিপ চালিয়ে যেতে হতো সেই বনের আদিমতা মধ্যপ্রদেশের, বানজার-এর ও হালোর, উত্তরবঙ্গর তিস্তার এবং ওড়িশার মহানদীর অববাহিকার কিছু কিছু জঙ্গলের সঙ্গেই মাত্র তুলনীয়।

অত্যন্ত সুন্দরী কোনো নারীকে নগ্ন দেখলে যেমন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, গলার কাছে ব্যথা ব্যথা করে, যমদুয়ারের জঙ্গলের মতো নগ্ন-নির্জন জঙ্গলকে দেখলেও তেমন হয়। নগ্নতা এবং নির্জনতার কোনো বিকল্প নেই। একমাত্র তাদের মধ্যে দিয়েই আদম আর ঈভের কাছে ফিরে যেতে পারি আমরা, এই একবিংশ শতাব্দীর দুয়ারে-দাঁড়ানো পরতের পর পরত জামাকাপড় পরা, আস্তরণের পর আস্তরণ ভণ্ডামি-জড়ানো নারী ও পুরুষেরা। বহুবার আমার মনে হয়েছে 'যমদুয়ারের' নাম বদলে দিয়ে রাখা উচিত 'নবজীবন'।

দূর থেকে বাংলোটা দেখা যায়। উঁচু। দোতলা। হাতীর উপদ্রবের জন্যে আসাম এবং বাংলার ডুয়ার্সের সর্বত্র এবং অন্যান্য সব জায়গাতেই বন বাংলো এমন দোতলা করেই বানানো হয়। বিরাট পরিধির শাল গাছের গুঁড়ি দিয়ে নিচের খুঁটি। যাতে হাতীর ঠেলাঠেলিতেও তা না পড়ে যায়। বাংলোর অদূরেই রসুইঘর, স্যাভেন্ট-কোয়ার্টার, চৌকিদারের ঘর এবং গ্যারাজ। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সংকোশ নদী। অনেকটা 'মানস' নদীরই মতো। গঙ্গাধরেরই উৎসর দিক। যমদুয়ারে এসেই পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ভুটানের সীমান্ত মিলেছে। ভুটানের মহারাজা মাঝে-মধ্যে হেলিকপ্টারে করে পাহাড়ের মাথা থেকে এখানে এসে নামেন দলবল নিয়ে শিকার করার জন্যে। কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে ভুটানী এবং নেপালী গোয়ালাদের মোষের বাথান ছিলো। কিছু চোরাচালানকারীর আনাগোনা ছিলো পাকদণ্ডী পথ বেয়ে। "ভুটান অরেঞ্জ" কমলালেবুর ছবি ছাপা লেবেল দেওয়া হুইস্কির বোতল। আরও অনেক কিছুর কারবারী ছিলো তারা।

বিকেলে পৌঁছে চানটান করে আমরা বাংলোর দোতলার বারান্দাতে বসে ছিলাম। ছাত্তারের সঙ্গে পরামর্শ করছিলাম কি উপায়ে আমাদের অতিথি কেন্ জনসনকে একটি বাঘ মারিয়ে দেওয়া যায় তিনদিনের মধ্যে। ভল্লিভয় সাহেব জীবনে গন্ধস্টিক্ হাতে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো ধাতু নির্মিত জিনিসই নেননি। তিনি দর্শক।

ওয়াংডি-সাহেবের হাত খুব ভালো ছিলো। যদিও ওঁর রাইফেলটা ছিলো পয়েন্ট থ্রী সেভেন্টি, অর্ডিনারী। তাঁর গুলি লাগতো মোক্ষম জায়গায়। অন্তত দশ পনেরো বছর আগে যখন কোডারমা-বাজৌলির ঘাটে ওঁর সঙ্গে শিকার করেছিলাম, তখন তাই দেখেছি। কিন্তু ওয়াংডি সাহেবের বড় সাহেব জনসন সাহেব। "পারকিনসন্স্ ল" অনুসারে বড় সাহেব খুশি থাকলেই জগৎ খুশি।

ছাত্তার ইংরিজি জানে না। ওঁরা ইংরিজিতে কথা বললে মুখ নিচু করে হাসে শুধু। ইংরিজি জানে না বলেই বোধহয় মানুষটি এখনও খাঁটি আছে। এ দেশের ইংরিজি-শিক্ষিত অধিকাংশ লোকই দেখি মেকী, ভণ্ড এবং অমানুষ হয়ে ওঠে। কেন, জানি না। যার যত উচ্চ শিক্ষা সে ততই বেশি মেকী মানুষ, ভণ্ড মানুষ, বাজে মানুষ।

ছাত্তার শুধোলো আমাকে, গুহছাহেবের বন্ধু ছাহেব শিকারি কেমন ?

বললাম, বাবা তো বলেছেন খুবই ভালো শিকারি। মিলিটারী সাহেব। আগে বাঘও

মেরেছেন।

থোয়েন। থোয়েন।

ছাত্তার আগুনে জল ঢেলে বললো। সব শিকারিই কয় বাঘ মাইর‍্যা আইছে আর বাঘ দ্যাখাইয়া দিলে কাপড় খারাপ কইর‍্যা বসে। আপনে নিজে কি সে বাঘ দ্যাখছেন ? যে বাঘ সাহেব মারছে বইল্যা শোনেন ?

না। আমি কী করে দেখব। এই তো প্রথম আলাপ।

ওঁর রাইফেলটা কত বোরের ?

টু সেভেনটি ফাইভ।

কন কি ? অত্ত ছোট্ট বোরের ?

হ্যাঁ। রাইফেলটাকে একটু আগে উনি বের করে তেল মুছছিলেন পুল-থ্রু দিয়ে। দেখেছি আমি।

তাই যদি হয় তো যথার্থ ভালো শিকারীই হইব। কানের ফুটায় গুলি না গলাইলে কিংবা অন্ডকোষ না ফাটাইলে পয়েন্ট টু সেভেন্টি-ফাইভ দিয়া বড় বাঘ মারন ন্যালাখাবা শিকারীর কাম নয়।

আমারও মনে জনসন সাহেবের রাইফেলটার সঙ্গে শুভদৃষ্টি হবার পর থেকেই দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো। কারণ, বাঘ যদি জীপ থেকেই শিকার হয় তবে অন্য কথা। জীপ থেকেও ঐরকম হালকা রাইফেল ব্যবহার করা ঠিক নয়। কিন্তু মাচায় বসে মারতে হলেও কিন্তু মাটিতে বসে বীটিং এ টু-সেভেন্টি-ফাইভ রাইফেল হাতে যে শিকারি বড় বাঘের মোকাবিলা করতে যাবেন তাকে নিয়ে ভয় তো আছেই। তার সঙ্গীদের জন্যেও ভয়। দেশ-বিদেশের বড় বড় শিকারীরা বলেন, পায়ে হেঁটে বাঘের মোকাবিলা করতে গেলে সব সময় পয়েন্ট ফোর হান্ড্রেডের চেয়ে বেশি ভারী বোরের রাইফেল নিয়েই করা উচিত। তবে থ্রী-সেভেন্টি-ফাইভ ম্যাগনাম এবং অন্যান্য আরো কয়েকটি ফোর হান্ড্রেডের চেয়ে নিচু বোরের হলেও তাদের সুনাম আছে। যেমন আমার থ্রী সিকস্টি-সিক্স (নাইন পয়েন্ট থ্রী)

জনসন সাহেবকে জিজ্ঞেস করাতে বললেন, ঐ রাইফেলটি দিয়ে বাঘ মেরেছিলেন উনি হাতি থেকে। উত্তরপ্রদেশের জঙ্গলে। লেপার্ড নয়। টাইগারই। জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে বেশ ভালো ধারণা আছে জনসন সাহেবের। ওঁর বাবাও ছিলেন উত্তরপ্রদেশের কনসার্ভেটর অফ ফরেস্ট।

পরদিন আর্লি-ব্রেকফাস্ট সেরে জিপে করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। স্কাউটিং-এর জন্যে। জনসন সাহেব বাঘই মারতে চান। অন্য শিকারে তাঁর উৎসাহ নেই।

জীপ চলছে। ছাত্তার বললো, মাইল তিরিশেক গিয়ে একটা জায়গাতে বাঘের খোঁজ সম্ভবত পাওয়া যাবে। সেদিকেই ড্রাইভারকে যেতে বললো ছাত্তার। এই সব অঞ্চল ছাত্তারের নখদর্পণে ছিলো। যমদুয়ার এবং যমদুয়ারের সংলগ্ন এলাকাতে হাতি ছিলো অজস্র। গণ্ডারও চলে আসতো কখনও সখনও। বুনো মোষের দল ছিলো একাধিক। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব মোষের। শম্বর, কোটরা, চিতল হরিণ, চিতা বাঘ এবং অন্যান্য জানোয়ারের তো অভাবই ছিলো না। আর বড় বাঘের জন্যে তো অতি-বিখ্যাতই ছিলো এই অঞ্চল। পৃথিবীর কত শিকারী যে এই 'যমদুয়ারে' এসে শিকার করে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

জীপ চলেছে। ফুরফুর করে হাওয়া লাগছে। চুল উড়ছে এলোমেলো। শিমুল গাছে ফুল ধরেছে। প্রাগৈতিহাসিক সব শিমুল। তার নিচে কোটরা হরিণ পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে শিমুল

ফুল খাচ্ছিলো। জীপের আওয়াজে সে বিরক্ত হয়নি। ভল্লিভয় সাহেবের হঠাৎ উচ্ছ্বসিত চিৎকারেই সে চমকে তাকালো ঘাড় ঘুরিয়ে। ওয়াংডি সাহেব ওঁর রাইফেল তুলেছিলেন। আমিই হাত দিয়ে নলটা নামিয়ে দিলাম।

উনি বললেন সরি আমি ভুলেই গেছিলাম যে, আমরা বাঘ মারতে এসেছি।

আমি কিছু বললাম না। আসলে বাঘ মারতে এসেছি শুধু সে জন্যেই নয়। চৈত্র শেষের এই উদাস মিষ্টি হিমেল আমেজ-মাখা শান্ত সকালে, এই প্রেমিক হাওয়ায়। এখনও শিশিরে ভিজে-থাকা মিষ্টি গন্ধ-মাখা ধুলোর পথে অনেকই ভালোলাগা জমে এবং ছড়িয়ে আছে। বন্দুক-রাইফেলের শব্দর জন্যে, ফোটা-কার্তুজের বারুদের গন্ধের জন্যে তখনও প্রস্তুত হয়নি প্রাতের প্রকৃতি। এ সব কথা কাউকে বলার নয়। কাউকে বললে সে হয়তো বুঝবেও না। এক জীবনে ক'টা কথাই বা বলা যায় আর বলা হয়ে উঠলেও ক'জনই বা তা বোঝে। বললে, অন্য শিকারীরা বলবেন এ কেমন ভণ্ড শিকারী ?

প্রায় তিরিশ মাইল ধূলি-ধূসরিত পথ বেয়ে গিয়ে ছাত্তার যেখানে জীপ দাঁড় করালো তার সামনেই একটি বিস্তীর্ণ শুকিয়ে যাওয়া নদী। নাম বললো, রাঙা। সেই রাঙা নদীর বুক ধরেই আমরা হেঁটে চললাম। ছাত্তার আগে। আমরা পেছন পেছন। বুঝতে পারছিলাম যে, ছাত্তার কাছাকাছিই কোনো জলের দিকে এগোচ্ছে। এই দিকে অন্য কোনো জলের উৎস নেই। সংকোশের মতো রাঙা নদীতে সারা বছর জল থাকে না। ভুটানের পাহাড় থেকে বর্ষায় যে জল নামে তাই এ নদীর মূলধন। তা ছাড়া, জায়গাটা একটি বিরাট সমতলভূমি। ঘাসবন। দিগন্তে গিয়ে মিলেছে শ্রীকৃষ্ণর গায়ের রঙের মতো ভুটানী হিমালয়ে। আর ঘাসবনের পরেই ডানদিকে শুরু হয়েছে গভীর নিবিড় শাল জঙ্গল।

অনেকই ভালো ভালো ট্র্যাকার দেখেছি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। কোডারমা অঞ্চলের যুগলপ্রসাদ, হাজারীবাগের কুসুমভা গাঁয়ের কাড়ুয়া, ওড়িশার মহানদীর অববাহিকার জঙ্গলে ফরেস্ট কন্ট্রাক্টর সুরবাবুদের মুন্সী দুর্গা, কুলি-মেট রাজেন, কটকের চাঁদবাবু, সুন্দরবনের গোপেন বাগচী মশায়, মধ্যপ্রদেশের সিওনীর বিবি বাইগা, কিন্তু আবু ছাত্তারের মতো ট্র্যাকার আজ অবধি সত্যিই আর দেখলাম না।

হঠাৎ ছাত্তার থমকে দাঁড়ালো।

এই নদীর বালি প্রায় নুড়িতেই ঢাকা। বালি থাকলে বাঘের পায়ের দাগ দেখা অতি সহজ। পেলো কি ?

কিন্তু থমকে দাঁড়াতেই দেখি মাটির দিকে নয়, উপরের দিকে চেয়ে আছে ও। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমরা সকলেই। প্রায় পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ ফিট উঁচু একটি মস্ত বড় মাচা। মোটা শালকাঠের খুঁটি দিয়ে বানানো। প্রায় বন-বাংলোর মতো মাপের। তার উপর মোটা করে খড় পাতা। হাঁড়িকুঁড়ি। নিচে আগুন জ্বালানোর চিহ্ন। আগুনে পোড়া মাটির হাঁড়ি। গোটা চারেক এঁচড়।

ছাত্তার সংক্ষিপ্ত স্বরে আমাদের তৈরি থাকতে বললো। নিজেও নিজের বন্দুকে গুলি পুরে নিল। এই মাচা কোনো বড় সংঘবদ্ধ চোরা-শিকারিদের দলেরই বানানো। আমাদের সকলের গায়েই খাকি, নয় জলপাই-সবুজ শিকারের পোশাক। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। জীপে করে এসেছি আমরা। পুলিশ বা মিলিটারীর লোক বলে আমাদের ভুল করতেই পারে ওরা যদি কাছাকাছি থাকে। এবং করলে, আড়াল থেকে আমাদের ওপর গোলাগুলি চালানোও একটুও আশ্চর্য নয়।

তবে ভাবলাম. গোলাগুলি চললে চলুক। এই রকম অর্গানাইজড-পোচিং সাধারণত

হাতির দাঁত এবং গণ্ডারের খড়্গের জন্যেই হয়ে থাকে। চোরাশিকার তো ছাত্তারও করে থাকে কিন্তু সস্তার দোনলা বন্দুক দিয়ে পায়ে হেঁটে একা একা বাঘ শিকারে দুর্জয় সাহস ও ক্ষমতার দরকার হয়। কিন্তু এই রকমভাবে এত বড় মাচায় বসে এত লোকে মিলে ব্যবসার জন্যে হাতি ও গণ্ডার মারতে সাহস এবং ক্ষমতার কিছু মাত্রও দরকার হয় না। এরা অতি ঘৃণ্য লোক। এরকম অর্গানাইজড পোচিং পরবর্তী জীবনে পূর্ব-আফ্রিকার জঙ্গলেও দেখেছি।

চারদিকে আমাদের ভালো করে নজর রাখতে বলে ছাত্তার মাচায় উঠে গেলো। ওঠার সময় আমার জার্মানীর তৈরী জাইস্-এর দূরবীনটা নিয়ে নিলো গলা থেকে। মাচায় উঠে ও দূরবীন চোখে চারদিক দেখতে লাগলো। তারপর একদিকে স্থির হয়ে রইলো দূরবীন-ধরা ওর হাত দুটি। অনেকক্ষণ। প্রায় মিনিট তিন-চার পর নেমে এসে বললো দূর থেকেই আমাদের জীপের শব্দ শুনেই পালিয়েছে। ভেবেছে, ফরেস্ট ডিপার্ট অথবা পুলিশের লোক।

ক'জন ছিলো ?

আজকে দু-তিনজনের বেশি ছিলো না। কিন্তু আগে নিশ্চয়ই অনেকে ছিলো। ঐ মাচায় পাশাপাশি অনেক লোক আরামে শুয়ে থাকতে পারে। আর এই দেখুন। স্টেনগানের ফোটা-কার্তুজ। আর্মির। প্রহিবিটেড-বোরের গুলি।

জনসন সাহেব দূরের আকাশে আঙুল দেখিয়ে আমাকে বললেন, ঐ দিকে শকুন উড়ছে কেন ?

ছাত্তারকে বলতেই ও বলল, শুধু ঐ দিকেই নয় চারদিকেই। আপনারা একটা খোলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন বলে দেখতে পাচ্ছেন না। এটা তো রাঙা নদীরই বুক। পাঁচটা হাতি পড়ে আছে ঘাসবনের পাঁচ জায়গায়। দাঁত কেটে নিয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

একদিকে কি দেখছিলে তুমি ?

ওদের। একটা মস্ত দাঁত বয়ে নিয়ে ছ'জন লোক ভুটানের পাকদণ্ডী ধরে চলে যাচ্ছিলো। রওয়ানা হয়েছে নিশ্চয়ই কাক-ভোরে। হাতির দাঁতের গোড়াতে তখনও রক্ত ও মাংস লেগে ছিলো। ওরাই বোধ হয় রাতে ছিলো মাচার উপরে। অন্যরা আগেই চলে গেছে। শেষে গেছে বাকিরা। মাচার নিচে রক্ত মাংসর চিহ্ন ও গন্ধ। মাছি ভন্‌ভন্ করছে। রক্ত খেকো ছোটো পাখিগুলো নেচে বেড়াচ্ছে দেখলেন না ?

ভল্লিভয় সাহেব বললেন, আমাদের এক্ষুণি পুলিশ এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে ইনফর্ম্ করা উচিত। তাই না ?

আমি বললাম, একি আমেরিকা না কানাডা ? আড়াই-তিন ঘন্টা জীপের পথ পেরিয়ে রাইমানাতে গিয়ে বললে রেঞ্জার কি করবেন ? সাইকেল ভরসা তাঁর। একটি রাইফেলও নেই। পুলিশেরও একই অবস্থা। সবকিছু জেনেশুনেই না পোচাররা এতোখানি সাহস পায়।

অ্যান্টি-পোচিং স্কোয়াড তৈরি করা উচিত নয় কি ?

ভল্লিভয় সাহেব আবারও বললেন।

উচিত তো কত কিছুই। দেশের লোকের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা উচিত, তাদের চিকিৎসা, তাদের ন্যূনতম শিক্ষা, তাদের মাথার উপরে ছাদ সব কিছুর বন্দোবস্তই করা উচিত। আপনারা যে গলায় গামছা দিয়ে ট্যাক্স্ আদায় করেন আমাদের কাছ থেকে তা কিভাবে এবং দেশের মানুষের কোন উপকারে লাগে তা কি কখনও ভেবে দেখেন

BanglaBook.org

আপনারা ? পাবলিক এক্সপেন্ডিচারের ক্ষেত্রে যতদিন না দেশের সরকার সততা এবং নিয়মানুবর্তিতা আনতে পারছেন পাবলিক ইনকাম-এর আদায়ে ততদিন ফাঁক থেকেই যাবে। তার কষ্টার্জিত রোজগারের বেশিটাই সে ট্যাক্স দেবে আর তার ট্যাক্সের টাকা চোখের সামনে নয়-ছয় হবে, তার নিজের উপকারে তো নয়ই, দেশের গরীবদেরও কোনো উপকারে আসবে না তা দেখার পরও ট্যাক্স-পেয়ারকে গালাগালি করতে পারি না আমি অন্তত। আমার দেশে এই চোরা-শিকারি রোধের সমস্যা, প্রায়রিটির বিচারে, অতি নিচের দিকের সমস্যা। মানুষ মোটামুটি খেতে পরতে পেলে এ সব করতো না। আপনার কি ধারণা, এই লোকগুলো খুব বড়লোক ? আসল মুনাফা মারে দেখুন গিয়ে পাহাড়ের মধ্যের গ্রামের নেপালি কি সমতলের পাইকার আর ব্যবসাদারেরা। যাদের মাধ্যমে এই মাল পাচার হয়। যারা আর্মির ওয়েপন জোগাড় করে দেয় এদের। গুলি জোগাড় করে দেয়।

ছাত্তার ইংরিজি বোঝে না বটে তবে অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং আমাকে বিশেষভাবে চেনে বলে বক্তব্যের কিছুটা হয়তো আন্দাজে বুঝলো।

তারপর এগিয়ে চললো সামনে মাচাটা অবধি গিয়ে, বাঁদিকে। ওয়াটার-হোলটা ওখান থেকে দেখা যাচ্ছিলো না। এবং তার চারপাশ ছেয়ে ছিলো অতি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল লতানো সবুজ জংলী লতাতে। মনে হয় তারা প্রখর গ্রীষ্মেও বেঁচে থাকবে।

রীতিমতো মুশকিল হচ্ছিল হাঁটতে। কারণ বর্ষাকালে যখন জলাটার পরিধি অনেকই বিস্তৃত ছিলো তখন হাতি, বুনো মোষ, গণ্ডার, শম্বর, শুয়োর ইত্যাদি জানোয়ারেরা এখানে রীতিমত কেলি এবং দলাইমলাই করেছে। নানা আকারের গর্তর সৃষ্টি হয়েছে তাতে। আর এখন লতাপাতাতে তা ঢেকে যাওয়াতে সেগুলো যে আছে তা বোঝা পর্যন্ত যাচ্ছে না। সব চেয়ে বিপদ হচ্ছে, হাতির পায়ের গর্তগুলো নিয়ে। ঠিক হামানদিস্তার মতো গর্ত। পা সটান ঢুকে গেলেই ফ্যাক্চার। ছ'মাস ব্যাণ্ডেজ-করা ঠ্যাং-তুলে শুয়ে থাকতে হবে কমপক্ষে।

যাই হোক, অতি সাবধানে হাঁটি হাঁটি পা-পা করে তো গিয়ে পৌঁছনো হলো সেখানে। জলার চারপাশের বড় বড় গাছের গায়ে পনেরো-ফিট কুড়ি-ফিট অবধি শুকনো কাদার প্রলেপ। তাতে নরম কাদায় ডুবে উঠে গাছে গাছে গা ঘষছিল যারা তাদের গায়ের লোম আটকে আছে এখনও সেই সব গাছে। জলাটার পরিধি তখন মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ ফিটে এসে পৌঁছেছে। জলকে আর জল বলে মনে হচ্ছে না। কাদার পিটুলি গোলা যেন। তারই চারধারে সবরকমের জানোয়ারের পায়ের দাগ এবং লোম।

জলের একেবারে কোণা থেকে ছাত্তার উদ্ধার করলো বাঘের পায়ের দাগ। উবু হয়ে বসে একটু নিরীক্ষণ করেই অ্যাবাউট টার্ন করে ঐ নিচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখতে দেখতে ফিরে চললো। শুকনো জায়গাতে পৌঁছেই আরেকবার দেখে বললো, জোড়ায় আছে। কপাল ভালো আমাদের লালদা। তারপর প্রায় দেড়শো গজ ফিট চওড়া রাঙা নদীর পুরো প্রস্থ পায়ের দাগ দেখে পেরিয়ে এসে ঢুকলো ছোট্ট একটি নদীতে। ঐ নদীটি রাঙারই একটি ফর্ক। ধনুকের মতো বেঁকে মূল নদীর সঙ্গে দুদিকে যুক্ত হয়েছে মাঝখানে পঁচিশ-তিরিশ ফিট চর ফেলে। কত বছর আগে সেই চর পড়েছিলো তার ঠিক নেই। এখন গাছ-গাছালি গজিয়ে গেছে বড় বড় তাতেও। ঝোপ-ঝাড়।

বোঝা গেল, বাঘ এই ধনুক-নদীর ওপারে যে গভীর শাল জঙ্গল তারই মধ্যে কোথাও শুয়ে আছে দিনেরবেলায়। সূর্যাস্তের সময়ে অথবা পরে জল খেতে আসবে। বাঘিনী এখন নেই। সমস্যা হলো এই নিয়ে যে, ধনুক নদীর দুই মুখেই বাঘের পায়ের দাগ পাওয়া গেল। মাঝারী সাইজের বাঘ। বাঘিনীর পায়ের দাগ রাঙা নদীর বুকে ছিলো। বাঘিনীই বড়। বাঘরা

BanglaBook.org

তো আর মানুষ নয়। আদর করার বেগ চাপলে মা-বোন মানে না। বাঘিনীও বাপ-দাদা মানে না। বাঘ হলেই হলো

ঠিক করা হলো পরামর্শ করে যে, তাড়াতাড়ি তিরিশ মাইল পথ ফিরে গিয়ে লাঞ্চ সেরে আবার ফিরে এসে বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে আমাদের দু দলে ভাগ হয়ে মাটিতেই বসতে হবে। কারণ এখানকার শাল গাছের যা চেহারা তাতে প্রথম ডালই বেরিয়েছে পনেরো কুড়ি-ফিট ওপরে। অত অল্প সময়ে এবং লোকবলও অত্যন্ত কম থাকাতে মাচা-বেঁধে বসার আশা ত্যাগ করতে হলো। মাটিতেই ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল নিয়ে বসতে হবে। ব্যাপারটা হচ্ছে, ছাত্তার বা আমার বাঘ মারলে চলবে না। অতিথি জনসন সাহেবকে দিয়েই মারাতে হবে বাঘ। শিকারের অলিখিত নিয়ম হচ্ছে যে, আগে তার গুলিতে রক্তপাত ঘটাবে জানোয়ারের, শিকার তারই অতিথি যদি বাঘের ল্যাজেও গুলি করে রক্তপাত ঘটান এবং সেই ল্যাজে-গুলি-লাগা বাঘকে যদি অন্যদের খুঁজে বের করে প্রাণ বিপন্ন করে মারতেও হয় তবু বাঘ, যিনি প্রথমে রক্ত ঝরিয়েছেন, তাঁরই হবে।

তাইই হোক। নিদেন পক্ষে রক্ত ঝরুক। তার পরের কথা পরে।

যমদুয়ারের বাংলোতে ফিরে এসেই ভল্লিভয় সাহেব বললেন, বাঘ শিকার বড়ই ঝকমারির। অনেক পরিশ্রম। জীপে এই ষাট মাইল যাওয়া আসা করেই গায়ে ব্যথা হয়ে গেছে। আমি খেয়ে দেয়ে ঘুমোব। তারপর সান্‌ডাউনের পর বারান্দায় বসব নদীর দিকে মুখ করে আমার হুইস্কী আর আগাথা-ক্রীস্টি নিয়ে। উইশ উ্য অল দ্যা লাক। বাঘ নিয়ে ফিরে এসো। তারপর কাল সকালে ছবি তুলবো তোমাদের।

বলতে ভুল হয়ে গিয়েছিলো, আমাদের সঙ্গে ধুবড়ির তৎকালীন ইনক্যামট্যাক্স অফিসার নীতিরঞ্জন ভট্টাচার্যিও এসেছিলেন। উনি কলকাতায় ছিলেন কিছুদিন আগে সীনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার হিসেবে। নীতিবাবু বন্দুক শুধু চোখেই দেখে ছিলেন। তার আগে বকও মারেননি। তবু তাঁর নিজের কমিশনার এবং পশ্চিমবঙ্গের কমিশনার এসেছেন এবং দু'জনেই সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্টর ট্যাক্সের চেয়ারম্যান হবেন কালে। অতএব একটি বন্দুক জোগাড় করে নীতিবাবুও রীতিমতো ঐ সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন। ওঁর দোষ ছিলো না কোনো। ওঁর অবস্থাতে পড়লে সকলেই তাই করতেন হয়ত। চাকরী, তায় সরকারী চাকরী কম জ্বালার নয়।

BanglaBook.org

ভল্লিভয় সাহেবকে বাংলোতে রেখে, লাঞ্চের পরই আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম। ধূলিধূসরিত তিরিশ মাইল ফিরতি-পথ পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা চারটে বাজল। ঠিক হলো, ছাত্তার, আমি এবং আমার অতিথি জনসন সাহেব ধনুক নদীর ডানদিকের মুখটি আগলে থাকব। আর বাঁ দিকের মুখ আগলে থাকবেন ওয়াংডি সাহেব, ভট্টাচার্যি সাহেব এবং জীপের ড্রাইভার। ঢাকার লোক তিনি। ওরিজিনাল ঢাকাইয়া ভাষায় কথা বলেন। ভট্টাচার্যি সাহেব যদিও পশ্চিমবাংলার ভাষা বলেন কিন্তু খারাপ রান্নায় লংকা ঠেসে দেওয়ার মতো তাঁর সীলেটি টানও প্রবলমাত্রায় উপস্থিত থাকে।

ভরসা হল এই কথা ভেবে যে, বাঘ যদি ওঁদের গোলাগুলিতে মরতে নাও চায় তাহলেও রমেনবাবু আর ভট্টাচার্যি সাহেব একসঙ্গে গলা মিলিয়ে জোরে বকে দিলে সেই মিশ্র ছর্‌রার হর্‌রাগুলিতে যত প্রবলই সে হোক না কেন অক্কা সে নিশ্চয়ই পাবে।

যার যার জায়গায় আমরা বসে পড়লাম।

গরমের বিকেল। তখনও ভালো রোদ আছে। ধনুক নদীর দু প্রান্তর দূরত্ব হবে দুশো গজ মতো। কমও হতে পারে। চারদিক থেকে নানারকম পাখি ডাকছে। ময়ূর। বন-মুরগী। কাঠঠোকরা কাঠ ঠুকছে ঠক্‌ঠক্ করে। টিয়ার ঝাঁক ট্যাঁ ট্যাঁ করে প্রথম গ্রীষ্মর হালকা সবুজ জঙ্গলের উপরে যেটুকু নির্মেঘ আকাশ দেখা যাচ্ছে তার ক্যানভাসকে সবুজতর ছুরির মতো চিরে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায় চাবুক মেরে। নীল কাঁচপোকা, লাল রোদের মধ্যে চম্‌কে চম্‌কে চর্‌কির মতো ঘুরছে বুঁ-বুঁ-বুঁই-ই-ই আওয়াজ করে। চারদিকে লাল, খয়েরি, হলুদ, ফিকে-হলুদ ঝরে-যাওয়া শাল পাতা। ঝরা সবে শুরু হয়েছে।

আমরা বসেছি নদীর সাদা বালিময় বুক থেকে হাত দুয়েক উঁচু ডাঙাতে। ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল দেখে। অন্য দলকে দেখা যাচ্ছে না। ওঁরাও নিশ্চয়ই নদীর মুখ আগলেই বসেছেন।

ছাত্তার দু চারবার জনসন সাহেবকে স্টেজ-রিহার্সাল দিইয়ে দিলো। বাঘ আমাদের দিকে এলে আমাদের আট-দশ ফিট সামনে দিয়েই নদীর বালির ওপর দিয়ে সে হেঁটে যাবে। ওয়াংডি সাহেব আর ভট্টাচার্যি সাহেবদের দিকে গেলেও তাই। বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ দিয়ে কী করে আলো ফেলবে রাইফেলের রিয়ার-সাইট আর ফ্রন্ট-সাইটের উপরে এবং সেই আলো জনসন সাহেবের পক্ষে উপযুক্ত কি না তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিনের আলোতেই করা হয়ে গেলো। বাঘ দিনের আলোতেও যে আসবে না তাও বলা যায় না। গভীর জঙ্গলের মধ্যে যেখান থেকে মানুষের বসতি অনেকই দূরে, সেখানে দিনের বেলাতেও বাঘ স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে। যদি করতে চায়।

জনসন সাহেবকে ছাত্তার জিগ্যেস করতে বললো, সাহেব ওর দোনলা বন্দুকটি নেবেন

BanglaBook.org

কি না, অথবা আমার রাইফেলটা ? পয়েন্ট টু-সেভেন্টি-ফাইভ রাইফেলের সরু নলটি দেখে ওর কিছুতেই 'পেত্যয়' হচ্ছিলো না যে ঐ যন্ত্রের আঘাতে মহাবল শায়ীন হবে। সে কথা জনসন সাহেবকে বলতেই উনি বললেন 'এনাফ ইজ এনাফ'। আমি তো তোমাদের বলেইছি যে, এই আমার হাতের রাইফেল এবং উত্তরপ্রদেশে আমি এ দিয়েই দু'দুটি বাঘ মেরেছি।

সন্দেহর নিরসন হলো নতুন করে। টু-সেভেন্টি-ফাইভ রাইফেলের নলের চেয়েও ছিপছিপে অনেক মেয়েকে আমি বাঘের চেয়েও বলীয়ান অনেক নরবাঘকে নিহত করতে দেখেছি চোখের সামনে। এই রাইফেলও হয়তো সেই রকম উপাদানে তৈরি হবে এই ভেবে ওঁদের দুজনের ডানদিকে, হাত তিনেক পেছনে ঝোপের আড়ালে বসে নিজেকে প্রবোধ দিলাম। তবে আমাদের বাড়ির পুরোহিত-কাম-গণৎকার আমার হাত দেখে বলেছিলেন যে আমার মা বেঁচে থাকতে বাঘের ব্যাদান-করা মুখের মধ্যে আমার মাথা ঢোকালেও মাথার কিস্‌সু হবে না। তাই নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে বসে বাঘের আগমনের এবং ঐ রাইফেলের চমৎকারিত্ব দেখার অপেক্ষায় থাকলাম।

সোয়া-পাঁচটা নাগাদ সামনের জঙ্গলের গভীর থেকে বাঘ ডাকল। আর সে কী ডাক ! মেটিং-সীজন্‌-এ বাঘের ডাক যাঁরা শুনেছেন একমাত্র তাঁরাই জানবেন সেই ডাকের মহিমা। তখনও সে অনেকই দূরে ছিলো। মাইলখানেক তো বটেই। আরো বেশি হবে। তাতেই ওষুধ হলো। বনের রাজা হাঁক ছাড়া মাত্রই প্রজারা সব চুপ মেরে গেল। কাঠঠোকরা মোটা ডালের উপরে ফ্রিজ করে গেলো। ময়ূরের কেকাধ্বনি থেমে গেলো। ছোটো ছোটো নানা পাখি কিচির-মিচির করছিলো। তারাও চুপ।

বাঘ পরের বার ডাকতেই প্রায় একই সঙ্গে একদল হনুমান, একটি ময়ূর এবং একটি কোটরা হরিণ হুপ্‌-হুপ্‌ হুপ্‌-হুপ্‌ কেঁয়া কেঁয়া কেঁয়া আর ব্বাক্‌ ব্বাক্‌ ব্বাক্‌ করে কিছুক্ষণ হিস্টিরিয়া রোগীদের মতো চিৎকার করে সমস্ত জঙ্গলকে বাঘের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানান দেওয়ার পরই সমস্ত জঙ্গল একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল।

ছাত্তার ফিসফিস করে বলল, আইতাছে ! আপনাগো সাহেব, শিকারি কেমন ?

ফিসফিস করেই বললাম, খুব ভালো শিকারি।

ভালো হইলেই ভালো।

স্বগতোক্তি করলো ছাত্তার।

অন্য প্রান্তে কী ঘটেছিলো তা তখন না জানলেও পরে জেনেছিলাম বিস্তারিত। ওয়াংডি সাহেব বেচারী ভট্টাচার্জি সাহেবের উপর ভার দিয়েছিলেন মোক্ষম মুহূর্তে তাঁর কাঁধে আলো ফেলবার। সেই জন্যেই পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ এবং দোনলা বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন তিনি। কারণ রাইফেল দিয়ে অন্ধকারে মারা অসুবিধের। ব্যাক সাইট এবং ফ্রন্ট সাইটে আলো না পড়লে মারা যায় না। বেশি আলো পড়লেও আবার চোখ ধেঁধে যায়।

এইম কি করে করতে হয় ?

ভট্টাচার্জি সাহেব ফ্র্যাংকলি জিজ্ঞেস করেছিলেন ওয়াংডি সাহেবকে।

ওয়াংডি সাহেব বলেছিলেন কখনও যদি গুলি এর আগে ছুঁড়ে না থাকেন তাহলে এইম করে মারবার দরকার নেই।

তবে ? মারব কী করে ?

জেনারেল ডিরেকশনে নল বাগিয়ে দু চোখ প্যাট প্যাট করে খুলে রেখে হেঁইও বলে ট্রিগার টেনে দিলেই হবে। বাঘ যদি আত্মহত্যা করতে চায়ই তাহলে তাতেই সে নির্ঘাত

মরবে।

ভট্টাচার্জি সাহেবের মানসিক অবস্থা মোটেই রসিকতা হজম করার মতো ছিলো না। বিশেষ করে বাঘের ডাক শোনার পর। ভাবছিলেন, এতো ডিপার্টমেন্ট থাকতে মরতে ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে চাকরি নিতে গেলেন কেন? ব্যবসাদার মানুষ শিকার করাই যাঁদের কাজ তাঁদের যে চাকরি-রক্ষার্থে বাঘও মারতে হতে পারে অথবা বাঘের হাতে মরতে হতে পারে এমন তো জানা ছিলো না আগে।

ওয়াংডি সাহেব এবার সীরিয়াসলি বললেন, বাঘকে আদৌ গুলি করবেন না আপনি।

ভট্টাচার্যি সাহেব বললেন, আচ্ছা!

ওঁরা বসেছিলেন ঝড়ে ভেঙে-পড়া একটি বটগাছের আড়ালে। এবং নদীর বুক থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে। প্রায় হাত পাঁচেক হবে। ধনুক নদী আর রাঙা নদী ঐখানে বেশ গভীর তাই নদী-খাতও গভীর হওয়াতে পাড় উঁচু ছিলো।

ডানদিকে ওয়াংডি সাহেব। তাঁর হাত ছয়েক বাঁয়ে ভট্টাচার্জি সাহেব। এবং তাঁদের দুজনের পেছনে রমেনবাবু। ড্রাইভার। তিনি কখনও বাঘ শিকার দেখেননি তাই দেখবেন বলে জীপে না বসে থেকে ওঁদের সঙ্গেই এসেছেন। বাঘের জঙ্গলে তিনি অনির্দিষ্টকাল একা জীপে এবং অন্ধকারে বসে থাকতেও রাজি ছিলেন না।

বাঘ প্রথমবার ডাকা মাত্রই রমেনবাবু উল্লসিত হয়ে বলেছিলেন "আইতে আছে। মারেন। মারেন। হালারে মারেন। তারপর জীপের বনেটে ফ্যালাইয়া বাইন্ধা লইয়া যাইম্যু আনে।"

কিন্তু বাঘ যতই ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসতে থাকলো রমেনবাবু ক্রমশ মানুষ থেকে উটপাখি হয়ে যেতে লাগলেন। এবং বাঘিনী যখন সত্যিই কেন-দেখা আলোতে এসে পৌঁছলো তখন রমেনবাবু উটপাখিরই মতো মুখ বালিতে গুঁজে পশ্চাৎদেশ উঁচু করে তুলে নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে গেছিলেন। উটপাখি না হঠযোগী তা তখন তাঁকে দেখে বোঝার উপায় ছিলো না।

তবে মিথ্যে বলব না। বাঘ দেখলে ভয় করেই। সকলেরই করে। আমার তো নিশ্চয়ই করে। মেটিং-সীজনে বাঘ বা বাঘিনী যখন মেদিনী-কাঁপিয়ে সমস্ত পাহাড় জঙ্গল নদী পাথরে অনুরণন তুলে ডাকতে ডাকতে মাটিতে বসে থাকা বাঘ-প্রত্যাশী শিকারীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে তখনও যে-শিকারীর ভয় করে না আমি তেমন অতিমানব অথবা অতি মিথ্যেবাদীদের দলে পড়ি না। ভয় বিলক্ষণই করে। রাইফেলের স্মল্-অফ্ দ্যা বাট্-এ রাখা ডান হাতের পাতা ঘেমে ওঠে। গলার কাছে অনুপস্থিত শ্লেষ্মার প্রবল এবং বিরক্তিজনক উপস্থিতি নিজেকে ত্রস্ত করে তোলে।

দশ বছর বয়স থেকে প্রায় চল্লিশ বছর বয়স অবধি ভারতবর্ষর এবং ভারতবর্ষর বাইরেরও বিভিন্ন বন-জঙ্গলে শিকারে শিকারে ঘুরেছি। অনেকবার দিনে রাতে বাঘ ও সিংহের গর্জন শুনেছি। কিন্তু অক্ষত বাঘের আওয়াজে সেই শেষ বিকেলে যেমনটি ভীত হয়েছিলাম তেমনটি আর কখনওই হইনি। গুলিতে আহত বাঘের গর্জনেও হইনি।

বাঘ একটু এগোয়, একটু থামে, এক একবার ডাকে, মুখ তুলে, মাথা ঘুরিয়ে। গভীর বনের মধ্যে সেই ডাকের পূর্ণ প্রভাব যে না শুনেছে তার পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নয়।

বেলা দ্রুত পড়ে আসছে, বাঘও দ্রুত এগিয়ে আসছে। নাড়ির গতি ততই চঞ্চল হচ্ছে। যখন সে সামনের জঙ্গলের প্রান্তে এসে পৌঁছবে তখন ধনুক নদীর কোন্ মুখ দিয়ে রাঙা নদীতে পড়ে নদী পেরিয়ে সে জলে যাবে তার উপরই নির্ভর করছে সব। মানে, বাঘ

BanglaBook.org

জনসন সাহেবের হবে না ওয়াংডি সাহেবের ?

শব্দ না করে, বাঘ যেন পাখি এমন ভাবেই ডাকতে লাগলাম, "আয় বাঘ আয়, গুলি খাবি আয় ! আমাদের দিকে আয় ।"

শেষবার যখন সে ডাকলো তখন মনে হলো যেন তার নিঃশ্বাস এসে পড়লো আমাদের মুখে । বাঘের মুখে এমন গন্ধ যে চুমু খেতে মোটেই ইচ্ছে করে না । তখন ঘড়িতে ছটা বাজে । আলো, দিনকে 'টা টা' জানিয়ে বাইরের দরজা বন্ধ করে ঘরে এসে দুয়ার দিয়েছে । কিন্তু সেই ফিকে অন্ধকার এবারে আস্তে আস্তে গাঢ় হয়ে উঠলো । কাছ থেকে শেষবার ডাক শোনার পর আর কোনো শব্দ বা দৃশ্য আমাদের কানে বা চোখে এলো না । বড়ই উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে রইলাম । ওয়াংডি সাহেবের অর্ডিনারী থ্রী-সেভেনটি-ফাইভ রাইফেলটিও যে মাটিতে বসে বড় বাঘের মোকাবিলা করার উপযুক্ত এমন নয় । তাছাড়া সঙ্গে দুজন অ-শিকারি । না বাঘের আওয়াজ শোনা গেল, না গুলির আওয়াজ । শিকারীদের আওয়াজ তো নয়ই !

জনসন সাহেবের অবস্থা সাংঘাতিক খারাপ । বাঘ যে এদিকে এলো না তা বিলক্ষণই বুঝতে পেরেছিলেন । তবে বাঘ কি ওয়াংডিই মেরে দেবে ? বড়ই উন্মুখ, উৎকর্ণ, উৎসুক এবং যাবতীয় উঃ হয়ে উনি একটা গাছের শিকড়ের উপর বাঁ ঠ্যাং রেখে তার উপরে ডান ঠ্যাং তুলে বসেছিলেন রিকেটি-শিশুর মতো রোগা তাঁর রাইফেলটিকে কোলে নিয়ে ।

ছাত্তারের অবস্থাও ত্রিশংকুর মতো । সেই কম্যান্ডার ইন চিফ্ । প্রত্যেক শিকারেই একজনকে নেতা মানতে হয় । ছাত্তার আমাদের অবিসংবাদী নেতা । সে কারণেই তার দায়িত্বও অনেক ।

প্রায় মিনিট দশেক কেটে গেলো । আমরা অন্ধকারে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি । নীরবে ।

ছাত্তারই প্রথম কথা বললো ।

ঐদিকের নেপালী শিকারী কেমন ?

শুধোলো আমাকে ।

নেপালী নন, উনি ভুটানী ।

ঐ হইলো । কেমন শিকারি ?

শিকারী তো খুবই ভালো । আমি জানি ।

ভালো তো, তার রাইফেল কথা কয় না ক্যান্ ?

তা কী করে বলব ?

তবে বাঘে কি তিনটারে মাইর‍্যা থুইয়া গেল নাকি ?

সে কি কথা ?

চোখ কপালে তুলে আমি বললাম ।

হঃ । সেইরকমইত মনে হইতাছে । চলেন যাই দেখি গিয়া ।

বললাম, চলো । যথা আজ্ঞা ।

আমরা তিনজনেই উঠে পড়ে পেছন ফিরে, ধনুক নদীতে না নেমে রাঙা নদীতে পড়ে ধনুক নদীর অন্য মুখের দিকে এগোতে লাগলাম । অন্ধকার রাত । বিস্তীর্ণ শুকনো রাঙা নদীর বুকের মধ্যে মধ্যে এলিফ্যান্ট গ্রাস, ঢাঢ়ঢা বা নলবন । এখন শুকিয়ে কুঁকড়ে অন্যরকম দেখাচ্ছে । শীতকালে এদের ফুল হয় ভারি সুন্দর । রূপোলী-সোনালী । চুমু খেতে ইচ্ছে হয় তখন । এমনই সুন্দর ফুল ।

মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালানো হচ্ছে পথ দেখার জন্যে । তিনজনের হাঁটায় শব্দ না হলেও

BanglaBook.org

পরিবেশে আলোড়ন উঠেছে। বাঘ যে ওখানে এতক্ষণ বসে নেই সে সম্বন্ধে আমরা তিনজনই নিশ্চিন্ত ছিলাম।

অন্য প্রান্তে প্রায় গিয়ে পৌঁছেছি এমন সময় দেখা গেল কে যেন টর্চ জ্বালিয়ে তা আমাদের দিকে ফেলে ক্রমান্বয়ে চরকির মতো ঘুরাচ্ছে।

কী ব্যাপার ? বোঝার আগেই আমরা প্রায় বাঘের ঘাড়ে গিয়েই পড়লাম অন্ধকারে। হঠাৎ প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ গর্জনে আকাশ বাতাস খান্-খান্ হয়ে গেলো। এক লাফে বাঘ নদীর খোল ছেড়ে লাফিয়ে গিয়ে পড়লো ঘন শালের জঙ্গলে আর সেখানে এমন গর্জন করতে লাগলো যে মনে হল বড় বড় শালগাছই পড়ে যাবে থর্‌থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে। বাঘের এমন রাগ বড় দেখিনি !

আমার তো শালগাছেদের চেয়েও বেশি ভয় করতে লাগলো।

ওয়াংডি সাহেবরা তিনজন একই সঙ্গে এবং দুর্বারগতিতে কথা বলতে লাগলেন। প্রথমত অত কাছে বড় বাঘের দীর্ঘ সান্নিধ্য। দ্বিতীয়ত নিজের নিজের প্রাণ নিজের নিজের পকেটেই থাকা। তৃতীয়ত সঙ্গীরা এসে পড়ে বলবৃদ্ধি করা। এই তিন আনন্দ একীভূত হয়ে তাঁদের প্রত্যেককে তোত্‌লা করে দিলো।

ছাত্তার আমাকে শুধোলো, কী করুম কন্ ? হারামজাদী তো মহা হল্লা বাধাইলো দেহি। কয়েন তো দিই শেষ কইর‍্যা। আমার বন্দুকে তো টর্চ ফিট্ করাই আছে। যাইম্যু আর আইম্যু।

বললাম, তুমি মারলে তো হবে না ছাত্তার। জনসন সাহেবকে দিয়েই তো মারাতে হবে।

তা ঠিক।

কিন্তু ওটা যে বাঘিনী তা তুমি জানলে কী করে ?

বাঃ। ছাওয়াল আর মাইয়ার গলার স্বর আলাদা হইব না। গলা শুইন্যাই তো বোঝন যায়।

বাঘ তাহলে কোথায় গেল ?

সে হারামজাদাই জানে। কী খিটক্যাল্ কন্ তো দেহি !

আমি বললাম, মানুষের বেলায় বুঝি। কাকের ডাক শুনে কি বুঝতে পারি কোন্‌টা ব্যাটা কাক আর কোন্‌টা বিটি-ছাওয়া ? কাকের তফাৎই বুঝি না তা বাঘের তফাৎ বুঝব কেমন করে ?

ছাত্তার বললো, গরম হইয়া আছে তো হারামাজাদী। ভাবতাছিলো কখন বাঘে আইস্যা ঘাড়ে উঠব আর আমরা আইয়া এই ঝামেলা বাধাইলাম। গোসা হইব না ?

পরক্ষণেই ছাত্তার বললো, এক কাম করন যাক। আজ চলেন যাই যমদুয়ারে ফির‍্যা। গুলির শব্দ তো আর হয় নাই। আমরা যে শিকারি সে কথা বেটি বোঝে নাই। বিরক্ত হইছে মানুষ আর আলো দেইখ্যা। জলে তো কালও অরে আসতেই হইব। এ তল্লাটে ঐ জল ছাড়া আর জল নাই এখন তিরিশ মাইলের মধ্যে। কাল আইস্যা আবার বসুম, বেটি যায় কোথায় দেখা যাইবনে। কাল ব্যাটার লগ্যেও দেখা হইতে পারে। জোড়ায় পাইবার চান্স্ আছে।

আঃ।

ছাত্তারের প্রস্তাবে ধড়ে প্রাণ এলো। কালকের কথা কালকে। আজকের মতো ইজ্জত আর প্রাণটা তো বাঁচবে।

জনসন সাহেবের মুখে টর্চের ফোকাস্ মেরে দেখলাম ভয় উনি আমার চেয়ে কিছু কম

BanglaBook.org

পাননি। দুটি-বাঘ মারা ক্যাপ্টেন জনসন হলে কী হয়! ভয়, কাউকেই খাতির করে না।

জনসন সাহেব প্রস্তাব শুনে খুশিতে ডগমগ হয়ে বললেন, দ্যাট উড বী আইডিয়াল।

জীপের দিকে ফিরে চললাম আমরা। উটপাখি রমেনবাবু ততক্ষণে জিরাফ হয়ে গেছেন আবার। বীরদর্পে আগে আগে চললেন।

জীপে বসেই জনসন সাহেব বললেন ওয়াংডি, উ্য কুড নট শুট আ টাইগার হোয়েন ইট ওজ সিটিং প্রিটি লাইক আ সিটিং ডাক উইদিন ফাইভ ইয়ার্ডস্। শেম্! শেম্! অন উ্য।

ওয়াংডি সাহেব বললেন, ইট ওজ নট অ্যান অর্ডিনারী টাইগার।

জনসন সাহেব বললেন, ইয়া! আই নো। বাট ফর দ্যাট ম্যাটার, ওল্ টাইগারস্ আর একসট্রাঅর্ডিনারি।

জীপ চলেছে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল স্পীডে, এমন সময় একটা ডাঁশ উল্টো দিক থেকে ঐরকম স্পীডেই উড়ে এসে আশি মাইলের ইম্প্যাক্টে ফটাস্ করে আমার ডান গালে ফেটে পড়লো। ব্যাটা আমাকেই যে বাছলো কেন অত লোকের মধ্যে তখন বুঝিনি। পরে বুঝেছিলাম সে ব্যাটা নয়, বেটি। আমার নিস্পাপ—চরিত্র-নাশিনী।

নিউক্লিয়ার বম্-এর চেয়ে কিছু কম এফেক্ট হলো না তার। এই ডাঁশ বা হর্স-ফ্লাই-এর কামড়ের ভয়ে বাঘ পর্যন্ত জঙ্গল ছেড়ে পালায়। বাঘের হাত থেকে যদি বা বাঁচলাম তো মরলাম ডাঁশের হাতে। কী কেলো!

দেখতে দেখতে আমার তখনকারদিনের সুকুমার মুখটি বাঘের মতো জাঁদরেল হয়ে উঠলো ফুলে। অসহ্য যন্ত্রণা আর জ্বর। বেহুঁশ হয়ে যাবার অবস্থা। যমদুয়ারে পৌঁছে আমাকে প্রায় অজ্ঞানাবস্থায় ওঁরা পাঁজাকোলা করে দোতলায় তুলে বিছানাতে শুইয়ে দিলেন। ঘোরের মধ্যেই শুনলাম যে, ভল্লিভয় সাহেব বললেন, 'দ্যা ওনলি মেডিসিন উই হ্যাভ হিয়ার ইজ স্কচ হুইস্কি। গিভ আ লার্জ ওয়ান টু হিম উইথ হট ওয়াটার এন্ড পুট হিম টু স্লীপ।'

অতএব চরিত্র নষ্ট হলো। বড় একটি গ্লাসে গরম জল মেশানো সেই লাল তরলিমা ক্যাস্টর অয়েলের মতো অনিচ্ছাতে গিলে কম্বল টেনে শুয়ে পড়লাম।

সকালে উঠেই একেবারে ফিট। কোথায় ফুলো, কোথায় ব্যথা, কোথায় জ্বর? চমৎকার বাথরুমও হলো।

বাবা আর আমাকে আমাদের মক্কেলরা কেস্-কে-কেস্ স্কচ-হুইস্কি পাঠাতেন তখন ক্রিস্মাস্ আর ন্যু-ইয়ারে। আমারটা আমি বাবাকে দিয়ে দিতাম। বাবা সব বিলি করে দিতেন তাঁর পরিচিতদের মধ্যে। ঠিক করলাম এইবার থেকে দু এক বোতল এই মৃতসঞ্জীবনী সুরা নিজে গ্যাঁড়া মেরে রেখে তার পর বাবাকে দেব। তবে খেতে হবে খুবই গোপনে। মুখে মদের গন্ধ পাওয়ায় বাবা আমাদের অফিসের একজন অত্যন্ত দক্ষ কর্মচারীকে দু মিনিটের নোটিশে ছাঁটাই করে দিয়েছিলেন। খুবই অন্যায় করলাম আমি। কিন্তু অন্য কোনো ওষুধ যে ছিলো না। তাছাড়া নিজে তো খাইনি। খেতে বাধ্য করা হয়েছিলো অসুস্থ আমাকে।

BanglaBook.org

ভল্লিভয় সাহেব পরদিন সকালে জনসন সাহেবের কাছে বাঘের ডাকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শুনেই চেপে গেলেন। বললেন, মাই গড। আই হ্যাভ নেভার হার্ড আ টাইগার রোরিং ইন আ জঙ্গল। ইউ মাস্ট টেক মী অ্যালঙ্ টুডে।

আমি না-বলেই বললাম "পাঁচুদা যেওনি। তোমার পিলে চম্‌কে যাবে।" মুখে কিছু বললাম না।

জনসন সাহেব আড়ালে ডেকে বললেন, "লুক লাল, দিস চ্যাপ হ্যাজ আর্থরাইটিস্। হি কান্ট রান। হি কান্ট ক্লাইম আ ট্রি। এন্ড হি ইজ গোয়িং টু জয়েন দ্যা সি·বি· ডি· টি· উইদিন আ মান্থ অর সো। ইফ এনিথীং হ্যাপেনস্ টু হিম আই উইল বী ইন ট্রাবল। এন্ড দ্যাট টু ফর আ লিটল্ ফান।"

আমি বললাম, আমার কাছে বাঘ এবং ভল্লিভয় সাহেব দুজনেই শত হস্তেন বর্জেন। বলিতে হয়, তুমি বলো। 'না' বলে শেষে মরি আর কী। তিনিই তো পশ্চিমবঙ্গের আয়কর বিভাগের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমার সব কেস-এ সেকশন টু সিকসটি-থ্রি নোটিস ছেড়ে লাইফ হেল্ করে দেবেন ইচ্ছে করলেই। ঐ অপ্রিয় বাচন আমার দ্বারা হবে না।"

জনসন সাহেব কিছুক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে থেকে বললেন, দেন উই হ্যাড ইট্ ম্যান। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা মাঝে মাঝেই এরকম ইংরিজি বলতেন।

সংকোশ নদীর বরফ-গলা জলের বালির নিচে বিয়ারের বোতল পোঁতা ছিলো। লাঞ্চের আগে সেগুলো তুলে এনে বারান্দায় ওদের সার্ভ করলেন খিদ্‌মদ্‌গাররা।

ভল্লিভয় সাহেব বললেন, "গুহা, উ্য হ্যাড আ ড্রিংক লাস্ট নাইট। উ্য আর আ কনভার্ট নাও। হ্যাভ আ গ্লাস অফ বিয়ার।"

মনে পড়লো, বাবা বলেছিলেন, একদিন বিয়ার খেয়ে দেখেছিলাম। কী বিচ্ছিরি খেতে। চিরতার জলের মতো তেতো তেতো লাগে। কেন যে মানুষ ঐ সব ছাইভস্ম খায়!

কিন্তু যতই পিতৃভক্ত হই না কেন পরের মুখে ঝাল অথবা তেতো খাওয়াটা আমারও চরিত্রানুগ নয়। ভাবলাম, সবকিছুরই অভিজ্ঞতা থাকা ভালো। গেলাসে-ঢালা বিয়ার থেকে হলুদ আভা বেরোচ্ছিল। লক্ষ লক্ষ বুড়বুড়ি উঠছিলো আর ভেঙে গড়িয়ে যাচ্ছিলো চিতার আগুনের শিখার মাথায় যেমন আগুনের ফুলকিরা ভাঙে।

খেলাম এক চুমুক। দুগ্গা দুগ্গতিনাশিনী বলে।

নদী থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিলো। বেশ ক্ষিদে ক্ষিদে লাগছিলো। গ্লাস খালি হয়ে গেলো। আবার ভর্তি করে দিলেন ভল্লিভয় সাহেব।

এক হতভাগী, হারামজাদী, নাম-না-জানা বাঘিনী এবং ডাঁশের কারণে আমার তিরিশ বছর ধরে বাঁচিয়ে রাখা চরিত্রটি কোনও চাঁপাফুলের মতো মেয়ের সতীত্বরই মতো নষ্ট হয়ে

BanglaBook.org

গেলো।

এখন প্রথম বিকেল। ভল্লিভয় সাহেবের পরনে চুড়িদার বোম্বেওয়ালা পায়জামা। গায়ে ফুটো ফুটো কাপড়ের হাতকাটা গেঞ্জী, তার উপরে স্বচ্ছ আদ্দির গিলে করা কুর্তা। হাতে ভাঁজকরা ওয়াটার প্রুফ এবং আগাথা ক্রীস্টির বই। বাঘ শিকারে চলেছেন আমাদের সঙ্গে।

কিন্তু ওঁকে কিছু বলবে কে? রাজীব গান্ধী যদি লালরঙের মোজা এবং বুট জুতো পরে অথবা খালি গায়ে আন্ডারওয়্যার পরে গণ্ডার শিকারে যান তাহলে তাঁকে কিছু বলার সাহস কোনো খাণ্ডার রমণীরও নেই। রাজাদের, মন্ত্রীদের, বড় বড় আমলাদের এই সব প্রেরোগেটিভ থাকেই। ছিলো এবং থাকবেই।

অকুস্থলে পৌঁছেই জনসন সাহেব প্রথমেই যা করলেন তা অতি নিষ্ঠুর কাজ। ওয়াংডি সাহেব, ভট্টাচার্জি সাহেব এবং রমেনবাবুকে রাঙা নদী পার করিয়ে সেই জলের দিকের পাড়ে থিতু হতে বললেন। বললেন, যদি দৈবদুর্বিপাকে আমি বাঘকে না মারতে পারি এবং আমার গুলি খেয়ে অথবা না-খেয়েও যদি সেই গুলিখোর বাঘ গুলি খাওয়ার লোভে তবুও তোমাদের দিকে যায়, তবেই তোমরা তাকে গুলি করবে। গতকাল পাঁচ গজের মধ্যে বসে থাকা বাঘকে যদি না মেরে থাকতে পারো তবে আজকের সুযোগটা আমাকেই দাও।

গতকাল বাঘিনী এসে ওয়াংডি সাহেবদের সামনে বালিতে বসে পড়েছিলো। তারপর মিহি বালির পাউডার মাখছিলো মিলনের আগে। তখন অন্ধকারও হয়ে গেছে। ভট্টাচার্জি সাহেবের আলো দেবার মতো অবস্থা ছিলো না। ওয়াংডি সাহেবের বাঘ মারার সদিচ্ছা উবে গেছিলো। আমারও যেতো।

ছাত্তার ভল্লিভয় সাহেবের হেভি-ওয়েট কুস্তিগিরের মতো চেহারা দেখে বোধহয় নিশ্চিন্ত হয়েছিলো যে জনসন সাহেবের গুলি ফসকালেও ভল্লিভয় সাহেব যদি বাঘের পিঠে চেপে বসেন তাহলে সে এমনিতেই মরে যাবে। হয়তো এইকারণেই সে সেদিন সঙ্গে শুধুমাত্র একটি ছোরা এনেছিলো, কোমরে গুঁজে, বাঘের চামড়া ছাড়াবার জন্যে। বন্দুকটাকে রেখে এসেছিলো। মাটিতে বসে যদি কোনো শিকারী ঐরকম হালকা রাইফেল দিয়ে বাঘ মারবেন বলে বদ্ধপরিকর হন তবে তাঁর প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা শুধু অভিজ্ঞ কেন অনভিজ্ঞ শিকারীরও উচিত নয়।

দেখা গেল, কাল রাতে ডিস্টার্বড্ হয়ে বাঘিনী আমরা ধনুক-নদীর যে বাঁকে বসেছিলাম সেই বাঁক দিয়েই গভীর রাতে রাঙা নদীতে গেছে। তারপর নদী পেরিয়ে জলে। অতএব কালকের জায়গাতেই বসবেন বলে জনসন সাহেব এবং ছাত্তার স্থির করলো। বসাও হলো।

ছাত্তার আর জনসন সাহেব কালকের জায়গাতেই বসলেন। সামনে ভল্লিভয় সাহেব আর আমি হাত তিনেক পেছনে ডাইনে এবং বাঁয়ে। গ্রান্ড-স্ট্যান্ড ভিউ-এর আশায়।

বাঘিনী অথবা বাঘ, ছাত্তারই জানে, সেদিনও তেমনি "ছুয়াউ" করে ডাকলো প্রথমবার। সঙ্গে সঙ্গেই ভল্লিভয় সাহেব উল্লসিত হয়ে বললেন, "হোয়াট ফান। ইটস্ কামিং। গেট ইওর টাইগার কেন্।"

কাঠঠোকরারা থেমে গেলো। জঙ্গল নিস্তব্ধ। কোটরা হরিণ ডাকলো শুধু একবার। প্রথমবার ডাকের পর কিন্তু আর একবারও ডাকলো না সেদিন বাঘিনী। বোধহয় নিজের অবস্থান জানান দিতে চায় না। বাঘিনীই হবে। চালাক এবং সাবধানী হয়ে গেছে। কালকে সে ধনুক নদীর মোড়ে এসে বালির বিছানাতে শুয়ে বালির পাউডার মেখে সুন্দরী হয়ে বাঘের সঙ্গে মিলিত হবার আশাতে যখন অধীর হয়ে বসে অপেক্ষা করছিলো তখনই ঐ বিপত্তি। তাই বোধহয় আজ সে কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না। আমাদেরও ঝুঁকি নেওয়া

BanglaBook.org

উচিত নয়। কালও যদি সে মিলিত না হতে পেরে থাকে তবে তার মেজাজ আজ আরো খারাপ থাকবে। কে জানে, দুজনেই আসছে কী না একসঙ্গে।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে আলো কমে আসছে। প্রায় অন্ধকার হয়ে এলো। কোথাও কোনো শব্দ নেই। নদীর সাদা বালির রেখা দেখা যাচ্ছে। ওপাশের শাল-জঙ্গলের গাছগুলিকে আর আলাদা করে চেনা যায় না। কালো ব্রাশ দিয়ে কোনো শিল্পী তাদের এক করে দিয়েছেন। প্রথম গ্রীষ্মের সন্ধ্যার বন থেকে যে একরকম অসভ্য জারজ কটুগন্ধ ওঠে তেমনই গন্ধ উঠছে এখন। টুপটাপ করে পড়ছে শুকনো শালপাতা। হাওয়ার সওয়ার হয়ে ব্যালেরিনার মতো ঘুরে ঘুরে নেমে আসছে মাটিতে। চুমু খাচ্ছে মাটিকে।

তখন ঘড়িতে ঠিক ছটা বাজতে দশ মিনিট। আজও এতবছর পরে ঘড়িতে সন্ধে ছটা বাজতে দশ মিনিট হলে অবকাশের মুহূর্তে ঐ ছবিটি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। কালো একটি ছায়া দেখা গেলো আশী ডিগ্রী কোণে। বাঁদিকে। নদীর ওপর। আমাদের দিকের জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে। জনসন সাহেব হাতে হাত ছোঁওয়ালেন ছাত্তারের। লটর-পটর করতে করতে ক্ষীণ-কটি সুন্দরীর মতো সে নিতম্ব দোলাতে দোলাতে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ক্রমশ এগিয়ে আসছে এদিকে।

যদি আমাদের দেখতে না পায় তবে আমাদের সাত থেকে দশ ফিট সামনে দিয়ে হেঁটে যাবে সে ব্রডসাইড টার্গেট হয়ে। জায়গামতো শুধু বুলেটটিকে ঠুকে দেওয়া দরকার। এই টার্গেট মিস হওয়ার কথা নয় যদি স্নায়ু না গড়বড় করে। আর বাঘ শিকার স্নায়ুরই ব্যাপার।

আসছে, আরো কাছে, এসে গেছে ; এসে গেল। চার হাত দূরে। একেবারে সামনে। হঠাৎ পাঁচব্যাটারীর টর্চ জ্বলে উঠলো ছাত্তারের। আসামের গাঢ়-বাদামী আর কালো ডোরা বাঘের জামা ঝলমল করে উঠলো। বাঘটা এক ঝটকায় মুখ ঘুরিয়ে তাকালো আমাদের দিকে। এক মুহূর্ত। অন্তহীন মুহূর্ত। ছাত্তার নিষ্কম্প হাতে টর্চ ধরেছিলো। কিন্তু গুলির শব্দ কোথায় ? গুলি নেই নাকি ?

বাঘটাও বোধহয় ভাবছিলো কী করবে ? জনসন সাহেবও ভাবছিলেন। দুজনেরই ভাবাভাবি শেষ হলে গদ্দাম্ করে আচমকা গুলি হলো। গুলিটা যতখানি নিজের ঈজ্জৎ বাঁচাতে করলেন জনসন সাহেব ততটা বাঘ মারার জন্যে নয়। এমন অপকর্ম আমিও দু একবার করিনি যে এমন নয়।

বাঘিনী যেমন ছিলো তেমন দাঁড়িয়েই রইলো।

এবার চার ব্যাটাকেই ছিঁড়ে খাবে।

আমি একটু ডানদিকে উঠে দাঁড়িয়ে রাইফেল তুলে গুলি করব মনস্থ করলাম অন্ধকারেই, যতটা বাঘ শিকারের জন্যে নয়, তার চেয়ে অনেকই বেশি শব্দসঞ্চার করে পৈত্রিক প্রাণটি বাঁচানোর জন্যে।

কিন্তু আমার মতো কাপুরুষের হাতে মরার জন্যে অপেক্ষা না করে সে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমাকে আমার কর্তব্য সম্বন্ধে হদিস দিয়ে ঐ চার পায়ে দাঁড়ানো অবস্থাতেই একটি লাফ দিয়ে প্রায় পঁচিশ হাত উপর দিয়ে উল্টোদিকের শাল জঙ্গলের অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলো। তার পালিয়ে যাবার শব্দটি পর্যন্ত আমাদের জানতে না দিয়ে।

বাঘ যে কেমন জানোয়ার, কতখানি শক্তি তার সুন্দর শরীরের মোড়কের আড়ালে সে লুকিয়ে রাখে তা আরও একবার বোঝা গেল নতুন করে।

বাঘ চলে যেতেই হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ করে জঙ্গল-ফাটানো হাসিতে ফেটে পড়লেন ভল্লিভয় সাহেব। হাসির তোড় কমতে সময় লাগলো। বললেন, জনসন। আই হ্যাভ বীন

BanglaBook.org

হিয়ারিং ইওর শিকার ইয়ার্নস্ সিল মেনি ইয়ারস্। অ্যান্ড ইজ দিস দা কাইন্ড অক শুটিং উ্য হ্যাভ বীন ডুয়িং মাই ফুট! হোয়াই ডিডনট উ্য গিভ্ দ্য রাইফেল টু মি? আই কুড হ্যাভ ভলি ওয়েল শট্ দ্যাট টাইগার।"

জনসন সাহেব রেগে লাল হয়ে বললেন 'আই শ্যাল নেভার শুট্ এগেইন্ ইন ইওর কম্পানী। ইউ আর দ্যা মোস্ট আনলাকি পার্সন আই হ্যাভ এভার কাম টু শুট উইথ্।'

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে ভল্লিভয় সাহেব হাসতেই লাগলেন। জনসন সাহেবের গুলি বাঘিনীর পেটের নিচ দিয়ে গিয়ে নদীর বালিতে গর্ত করেছিলো। কেশাগ্রও স্পর্শ করেনি।

ছাত্তার প্রচণ্ড রেগে গেছিলো। জনসন সাহেবের উপরে তো বটেই আমার উপরেও। নিচুস্বরে আমাকে বললো, "বাঘ লইয়া এমন ফাইজলামি করণের কামডা ছিলো কি?

আমি ভাবছিলাম, বাঘ মরেনি তো কী। প্রাণ তো বেঁচেছে। এই ভেবেই মহানন্দে ছিলাম।

এমন সময় ভল্লিভয় সাহেব আমার দিকে ফিরে বললেন, "ওয়েল, মিঃ গুহা। ইওর ফাদার রোট্ দ্যাট উ্য আর আ বেটার শট্ দ্যান হিম। ওয়েল, ইফ দিস্ ইজ ইওর স্টান্ডার্ড আই রিয়ালি ওয়ান্ডার হোয়াট্ ইওর ফাদারস্ স্টান্ডার্ড ইজ।"

অধোবদনে রইলাম। মান গেল। যায় যাক। তবু, মান, প্রাণের চেয়ে অনেকই কম দামী তো।

জনসন সাহেব শিলং-এ ফিরে গিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। মাই ডিয়ার লালু, আই হ্যাভ রিটন্ আ পোয়েম।

"কেয়া বদ্‌নসিবী হামারা
শের আয়া, নেহি মারা।"

জনসন সাহেব পরে কলকাতার চিফ-কমিশনার হয়ে এসেছিলেন সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ট্যাক্সের মেম্বার হয়ে যাবার আগে। তখন অনেকই জায়গায় অনেকই শিকার করেছি আমরা একসঙ্গে। আবারও বাঘ শিকারেও গেছিলাম। মানুষখেকো বাঘে-ভরা ওড়িশার কালাহাণ্ডীতে। সেবারে বাঘ মারাও পড়েছিলো। সে গল্প ছাত্তার সম্পর্কিত নয় বলেই তা এখন নয়। পরে।

ভল্লিভয় সাহেব কলকাতাতে ফিরে তাঁর কলিগদের কাছে ঐ অভিজ্ঞতার কথা বলার পর আমাকে ফোন করে দেখা করতে বলেছিলেন। তারপর প্রায় কেঁদে ফেলেই বলেছিলেন, "হাইট অফ ইরেসপন্‌সিবিলিটি। হাইট অফ ইরেসপন্‌সিবিলিটি। ইউ ট্রায়েড টু ক্রিয়েট টু ভ্যোকাশীস্ অ্যাট দ্যা টপ্ লেভেল বাই কিলিং টু সীনিয়র কমিশনারস্ টুগ্যাদার। আই ওয়ান্ডার হোয়াট প্রম্পটেড উ্য ট্যু ডু সো।"

হো হো করে হেসেছিলাম আমি।

বলেছিলাম, ওয়েল আই হ্যাভ গিভন উ্য এন এক্সপীরিয়েন্স্ অফ আ লাইফ টাইম। দ্যা টেল, উ্য উইল বী টেলিং টু ইওর গ্র্যান্ড-চিলড্রেন হোয়েন উ্য আর রিটায়ার্ড এন্ড ওল্ড।"

ভল্লিভয় সাহেব ব্যাচেলর ছিলেন। আজকে ছাত্তার, ভল্লিভয় সাহেব এবং ওয়াংডি সাহেবও জীবিত নেই। ওয়াংডি সাহেব ইনকামট্যাক্স অ্যাপীলেট ট্রাইবুনালের মেম্বার ছিলেন কলকাতার। দার্জিলিং-এর পথের 'ঘুম'-এ ওঁর পৈতৃক বাড়িতে একঘর থেকে অন্য ঘরে যাবার সময় নিচু দরজাতে মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান আর ফেরেনি। কলকাতায় আনা হয়। কিন্তু কিছুই করা যায়নি।

ওঁরা নেই। আমিও থাকবো না একদিন। কিন্তু যমদুয়ারের এই স্মৃতিচিত্র, ছাত্তারের

BanglaBook.org

কথা, সব রয়ে যাবে রসিক পাঠিকা ও পাঠকের জন্যে।

জনসন সাহেবের শরীরেও আগের মতো জোর ছিলো না। শিকার তো এখন সারা দেশে বন্ধই। মাছ ধরতেন। আজকাল তাও ধরেন না। টাইপ করে দীর্ঘ চিঠি লেখেন এখনও আমাকে প্রায়ই ব্যাঙ্গালোরের কাছের হোয়াইটফিল্ড থেকে। অমন ভদ্রমানুষ এবং ভালো বন্ধু জীবনে কমই পেয়েছি অত্যন্ত উঁচুতলার সরকারী আমলাদের মধ্যে। বেশির ভাগ আমলাই তাঁদের চেয়ারের মাপের চেয়ে বড় হয়ে উঠতে পারেন না বলেই চেয়ার ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের আর কেউই মনে রাখে না। স্বার্থ অথবা ক্ষমতার দম্ভ দিয়ে সাময়িক খাতির ও সম্মান পাওয়া যায় হয়তো কিন্তু সে সব বড়ই ক্ষণস্থায়ী। জনসন সাহেবও এই বই 'সানন্দা'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার পর উনিশশো সাতাশীর ক্রিসমাসের রাতে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। ব্যাঙ্গালোর এবং পুটাপট্টির কাছের হোয়াইটফিল্ডেও।

ছাত্তারের কথা সব লিখতে বসলে তাকে নিয়েই আলাদা বই লিখতে হতো। খুনী, ফাঁসীতে-ঝোলা, চোরা-শিকারি, আমার সেই জঙ্গলের বন্ধুর হাসিমুখটি আশা করি দেখতে পাবো আবারও। যখন স্বর্গে যাব। ছাত্তারের "বেহেস্তে"। "ইন্ দ্যা হ্যাপী হান্টিং-গ্রাউন্ডস্।"

সেই দিনের জন্যেই প্রতীক্ষা করে আছি।

BanglaBook.org

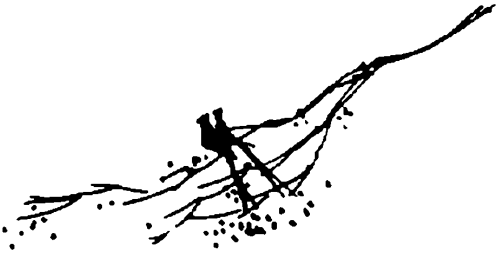

আমাদের এই হীনমন্য, মানুষে ভরা দেশে, দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরেও সাহেবরা সার্টিফিকেট না দিলে বা নেমন্তন্ন না করলে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই যেন সম্পূর্ণ স্বীকৃতি আসে না। সাহেবরা ভালো বললেই আর কথা নেই। তারা ডাকলেই কাছা খুলে দৌড়ে যাই আমরা। অথচ রবীন্দ্রনাথ এবং অন্য দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রকৃত গুণীদের ক্ষেত্রে দেশজ এবং স্বদেশীয় সম্মানই তাঁদের একমাত্র সম্মান। এবং সেই হয়তো আসল সম্মান। স্বদেশ, স্বভাষা-ভাষী যাকে বড় না বলেন বিদেশী সম্মান তাঁকে কোনোদিনও বড় করতে পারেনি। পারবেও না।

সাহেবে সম্মান দিয়েছে তবু দেশের লোক তাঁকে যোগ্য সমাদর করলো না এমন দৃষ্টান্ত বাংলা চলচ্চিত্র জগতের পথিকৃৎ প্রবাদ-প্রতিম প্রমথেশ বড়ুয়ার ছোট ভাই প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়ার মতো বেশি নেই। প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়ার ডাকনাম "লালজী"। কিশোর বয়স থেকেই আমি তাঁকে ঐ নামেই জানি।

লালজীর মতো এত বড় হাতিবিশেষজ্ঞ এই মুহূর্তে পৃথিবীতেও খুব বেশি নেই। সাম্প্রতিক অতীতে ওড়িয়া ও ডগলাস হ্যামিলটন দম্পতি পূর্ব-আফ্রিকার ডালা (NDALA) উপত্যকায় হাতিদের সঙ্গে বছর কয়েক থেকে একটি বই লিখেছেন "অ্যামঙ্গস্ট্ দ্যা এলিফ্যান্টস্"। ওঁরা অবশ্য ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির স্কলারশিপ নিয়েই গেছিলেন। ওসব দেশে কত সুযোগ-সুবিধা! যে কোন বিষয়ে কারো বিশেষ কোনো যোগ্যতা থাকলেই তাঁর উপরে সুযোগ যেন বর্ষিত হয়। অথচ এদেশীয় লালজীকে এখন শুধুমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যেই ব্যস্ত থাকতে হয়।

সম্মান?

সে তো অনেকই বড় ব্যাপার। সভ্য এবং সৎ মানুষদের দেশেই যোগ্য জনে যোগ্য সম্মান প্রত্যাশা করতে পারেন। এদেশে সম্মান এবং যশও তো এখন "কন্ট্রোলড্ কমোডিটি" হয়ে গেছে। কিছু ক্ষমতাবান ও কুচক্রী মানুষদের হাতে তার কলকাঠি।

হ্যামিলটনদের বইটিও ভালো তবে ওঁদের মাত্র কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা। আর লালজীর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা। হাতিদের সঙ্গে, হাতি শিকার করে, হাতি ধরে সমস্তটা জীবন হাতির জঙ্গলেই কাটিয়ে দিলেন উনি। এক ফরাসী ভদ্রলোক, তাঁর নাম গাব্রিয়েল বের্ত্রাঁ "লা হশের্শ্ দে জেলেফঁ সোভাতা" বলে একটি ছবির বই প্রকাশ করেছেন। লালজীর হাতি ধরার জীবন নিয়ে। আমি ফরাসী জানি না। জানি না বলে লজ্জিত নই। খুব কম ফরাসীই বাংলা জানেন। তবে জানলে, পড়তে পারতাম বইটি।

অহমিয়া ভাষায় লালজীর উপরে কোনো বই আছে কিনা জানি না। তবে বাংলাতে, পুলিশের প্রাক্তন ডি আই জি পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য লালজীর বামনপোখরির ডেরায় গিয়ে

BanglaBook.org

থেকে, তাঁর কথাবার্তা টেপ করে একটি বই লিখেছিলেন "হাতির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর" ! ওঁর সাক্ষাৎকার ছাড়াও পাঁচুগোপালবাবু অনেক পড়াশোনা করেছেন বইটি লেখার আগে। বই পড়েই তা বোঝা যায়। ধৃতিকান্ত লাহিড়ীচৌধুরির ভূমিকাও ঐ বইয়ের দাম আরও বাড়িয়েছে। চমৎকার বই। অসম্ভব না হলে আপনারা জোগাড় করে পড়বেন। কলেজ স্ট্রীটে খোঁজ করলেই পাবেন। বইটির সমালোচনা আমিই আনন্দ করে করেছিলাম আনন্দবাজারের পাতায়। বইটি আপনারা পড়লে লালজী সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবেন। এবং হাতি সম্বন্ধেও। পাঁচুগোপালবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

লালজীর, আমার উপর বহু বছর থেকেই এক তীব্র স্নেহমিশ্রিত অভিমান আছে। যা তিনি গত দশ বছরে একাধিকবার আমার অফিসে এসে, আমাকে অসংখ্য চিঠি লিখে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছেন। অভিমান এই কারণে যে, আমি কেন ওঁকে নিয়ে কিছু লিখিনি। বা লিখি না। আজই (১৭-১১-৮৬) আমার অফিসে লোক দিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।

প্রমথেশ বড়ুয়ার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের পেছনের বাড়ি এখন ভেঙে মালটিস্টোরিড বাড়ি হয়েছে। এবারে সেখানেই এসে উঠেছেন উনি। যমুনা দেবীর কাছেই। দু-একদিনের মধ্যেই বম্বে চলে যাবেন চিকিৎসার জন্যে। এর মধ্যেই দেখা করতে হবে ওঁর সঙ্গে।

ওঁকে নিয়ে যে লিখিনি এমনও নয়। আমি কারোরই জীবনী বা কোনো বিশেষ মানুষকে নিয়ে এ পর্যন্ত কোনো আলাদা লেখাই লিখিনি। তবু ওঁকে খুশি করার জন্যে ওঁরই উপরে একটি আলাদা বই লেখার ইচ্ছা রইলো কোনোদিন।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় আমার বাবা ওঁর এইট মি·মি· মুভি-ক্যামেরাতে লালজীর হাতিধরার ক্যাম্পের উপর দু-রীল কালার্ড ছবি তুলে নিয়ে এসেছিলেন। মনে আছে, আমরা ভাইবোনেরা মহোল্লাসে বসে দেখতাম হাতির খেদা, ফান্দা দিয়ে হাতি ধরা, হাতির চান, হাতিদের দৌড়াদৌড়ি করে একসসারসাইজ্ করা, শীতের শুকিয়ে-যাওয়া নদীর সাদা পাথর-নুড়ি বুকে। আমি প্রথমবার ওঁকে চাক্ষুষ দেখি উনপঞ্চাশ-পঞ্চাশে, রাইমানার জঙ্গলের ক্যাম্পে। সঙ্গে নীহার দেবীর (বড় রাজকুমারীর) ছেলে মণীন্দ্র বড়ুয়াও ছিলেন। তখন মণীন্দ্রবাবু ছেলেমানুষ। পরে মণীন্দ্রবাবুরা আমাদের নতুন বাড়ির কাছেই বাড়ি করেন দক্ষিণ কলকাতার পূর্ণদাস রোডে। একদিন সলিসিটর সলিল মুখার্জির সঙ্গে এসেও ছিলেন আমার কাছে। আমাদের রাজা বসন্তরায় রোডের বাড়িতে। জানি না, জঙ্গলের জীবনে যারা অভ্যস্ত, জঙ্গল যাদের তেমন করে ডাকে, তাদের মৃত্যুও বোধহয় জঙ্গলেই নিহিত থাকে। অথবা তাঁদের অধিকাংশরই মৃত্যু-বীজ তাঁরা জঙ্গল থেকেই কুড়িয়ে আনেন।

"হাতির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর"-এর সমালোচনা আনন্দবাজারে প্রকাশিত হওয়ার পর লালজী একটি চিঠি লেখেন। আরও অসংখ্য চিঠি উনি লিখেছেন আমাকে তার আগে ও পরে। কিন্তু শুধু এটি থেকেই কিছুটা তুলে দিলাম নিচে।

১২/৮/৮২...

"গুহসাহেব,

আপনি বনপ্রেমী ও শিকারি, জঙ্গলকে নানা রূপে দেখেছেন ও তার বিভিন্ন ঋতুতে রাত্রে দিনে অন্ধকার জোছনায় তার বিভিন্ন রূপ অনুভব করেছেন—যা আপনার বইগুলিতে ফুটে উঠেছে।

এই বই-ই আপনি লিখলে অন্যরূপ নিত ও আরও ভাল হতো। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে দশ বছর চেষ্টা করেও একজন লেখক পেলাম না। পাঁচুবাবু জলপাইগুড়ির ডি আই জি পুলিশ ছিলেন। তিনি এসে আমাকে গ্রেফতার করে যতটুকু সম্ভব টেপ করে নিয়ে

BanglaBook.org

গেছিলেন। ১৯৭৮-এ। আপনার আলোচনার দাম আছে সেজন্যে আনন্দ পেলাম তবে এ বই আরও বিশদভাবে সুন্দর হতো আপনার মতো লেখকের হাতে।

লোকে বলে, আমি নিজে কেন লিখি না। তার উত্তর খুব সহজ (আমার কাছে)—আমি যদি লিখতেই পারতাম তবে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করার সময় পেতাম না। "হাতির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর" পড়ে আপনি খুশি হয়েছেন জেনে আমি মনে করি আমার কাছে সার্থক হয়েছে। কারণ আমরা জংলী, জঙ্গল বন্যপ্রাণী বিষয়ে কিছু বুঝি ও বোঝেন।

নতুন বই কিছু লিখেছেন কি ? যদি লিখে থাকেন তবে অনুগ্রহ করে পাঠাবেন। এখানে দেড় বছর আছি। আমি ৬ মাসের মধ্যেই আমার কোটার ১০টা হাতি ধরে এখন জংলী হাতি তাড়িয়ে মানুষের ক্ষেত রক্ষা করছি। কিছু পারিশ্রমিক পাচ্ছি তবে লাভ একটাই যে জঙ্গলে থাকার সুযোগ পাচ্ছি ও আমার আরাধ্য বনদেবী-প্রকৃতিদেবীকে নানারূপে দেখছি, অনুভব করে আনন্দ পাচ্ছি।

বড় চিঠি লিখে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাই না। এমনিতে চিঠি বড়ই হল। কিছু মনে করবেন না। বই পড়ার অঢেল সময় সেজন্য বই-এর প্রার্থনা জানালাম। আপনার যে বইয়ে তামারহাট, গারোহিল ইত্যাদির উল্লেখ আছে সেগুলি কি পেতে পারি ?

ভালোই আছি। আপনার মঙ্গল ও সুনাম বৃদ্ধির জন্য মা মহামায়ার কাছে প্রার্থনা জানাই।

চিঠির উত্তর পাবার আশা রাখি।

ইতি—

প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া

(লালজী)

এই চিঠিটি তুলে দেওয়ার কারণ দুটি। প্রথম কারণ এই যে, পাঁচুগোপালবাবুর বইটি চমৎকার। আমি লিখলে তা কখনওই আরো বেশি ভালো হতো না।

দ্বিতীয় কারণ, এইটুকুই দেখাবার জন্যে যে, প্রকৃতি যথার্থই প্রকৃতীশকে প্রকৃতীশ করেছেন। প্রকৃত বড় শিকারি, বনদরদী বা গুণী যাঁরা তাঁদের প্রত্যেকেরই মধ্যে এমন বিনয় চিরদিনই লক্ষ্য করেছি। বিনয়ের ভান নয়, "পোজ" নয়, ভঙ্গি নয়। সত্যিকারেরই বিনয়। নইলে ওঁর অভিজ্ঞতা, ওঁর সমস্ত জীবনের সান্নিধ্য প্রকৃতির সঙ্গে, এসব আমার মতো শহুরে সখের বনচারীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোনোভাবেই তুলনীয় নয়। ওঁর পায়ের কাছে বসে সারাজীবন শিখলেও হয়তো সব শেখা হবে না। ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরি মশায়ও পাঁচুগোপালবাবুর বইয়ের ভূমিকাতে এই কথাই যথার্থ লিখেছেন।

শুধু হাতিই নয়, একজন মানুষের পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর গভীরতম অরণ্যবাসের অভিজ্ঞতাই কি কম ? ইচ্ছে তো করে আমারও যে, ওঁরই মতো জীবন যাপন করি। এ জীবনে হলো না। পরজন্মে যদি এই পৃথিবীতে বনজঙ্গল একটুও বেঁচে থাকে, কয়েকজন নির্বুদ্ধি, দাম্ভিক, খুনী মানুষের হঠকারিতায় এবং কোটি কোটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের স্বার্থসর্বস্ব নিশ্চেষ্টতায় এই সুন্দর রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-শব্দর পৃথিবী যদি ধ্বংস না হয়ে যায়, তবে ফিরে এসে তখন লালজীর মতোই জীবন যাপন করব। এ জীবনে কিছু হলো না, হায় !

আহা ! জীবনের মতো জীবন ! এই ইঁট-কাঠ-কংক্রীট, ডিজেলের ধোঁয়া আর নয়। আর নয়। "লালজীর মতো জীবন" কথাটা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। পুরুষের যদি প্রকৃতির মধ্যে বাঁচতেই হয়, তার এমন করেই বাঁচা উচিত। লালজীর সঙ্গে আজই সন্ধেয় দেখা হবে

BanglaBook.org

বলেছি যমুনা দেবীর ফ্ল্যাটে। ছিয়াশির আঠারোই নভেম্বরে। কিন্তু জঙ্গলে ওঁর সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার বিবরণটা আপনাদের শুনিয়ে নিই। কারণ "বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে"।

ডুয়ার্সের বামনপোখরি থেকে চিঠি লেখার পর দুটি চিঠি ওঁকে লিখলাম এই কথা জানিয়ে যে আমার পেশার কাজে শিলিগুড়ি যাচ্ছি শিগগির। ওঁর সঙ্গে দেখা করব। জঙ্গলে ওঁর সঙ্গ পেয়েছিলাম প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে তাই এবারে জঙ্গলেই ধরতে চাই ওঁকে।

বঙ্গভূমে চিঠি পৌঁছতে এতোই দেরি হয় যে, বাগডোগরা প্লেনে ওঠার আগে পর্যন্ত কোনো জবাবই পেলাম না।

শিলিগুড়ির কাজ শেষ করে বিকাশের সঙ্গে সকালে গাড়িতে বেরোলাম। "নর্থ বেঙ্গল ট্রাক্টর ও ফার্ম মেসিনারীর" বিকাশ দাস। ব্যাঙডুবি ছাড়িয়ে মিরিক্-এর রাস্তা ধরে হাতিধুরা হয়ে পথের লোকদের জিজ্ঞেস করে করে তো বামনপোখ্‌রিতে এসে পৌঁছলাম শেষে। বনবাংলো। চমৎকার। ইচ্ছে হলো, একবার থাকব এখানে এসে। যেমন ইচ্ছে হয় যেকোনো সুন্দর জায়গায় গেলেই, যেমন সহবাসের ইচ্ছে জাগে যেকোনো সুন্দরী, সুরুচিসম্পন্ন বুদ্ধিমতী নারীর কাছে এলে।

বামনপোখ্‌রির চারিদিকে প্রকাণ্ড মোটা মোটা বাঁশঝাড়। এক একটির বেড় পূর্ণবয়স্ক মানুষের উরুর মতো হবে। উড়িষ্যার মোটা 'ডবা' বাঁশও এই বাঁশের কাছে কিছু নয়। এই বাঁশের পাতাগুলোও একেবারে অন্যরকম। অনেকটা ওড়িশার 'অর্গুন' গাছের পাতার মতো দেখতে। এমন বাঁশ কোথাওই দেখিনি। হিমালয়ের পাদদেশে এবং হয়তো নেফাতেই শুধু হয়।

পৌঁছনো তো গেল বামনপোখ্‌রি, কিন্তু লালজীর দেখা পাওয়া গেলো না। বীট অফিসারও ছিলেন না। চৌকিদার তো 'লালজী' নাম বলতে চিনতেই পারলো না। তারপর চেহারার বর্ণনা এবং গুণপনার বর্ণনা ভালো করে দেওয়ার পর বললো, ও ও ও "রাজার" কথা বলছেন?

"রাজা বলেই সকলে ডাকে তাঁকে। আসলেও রাজা। গৌরীপুরের রাজা। প্রভাত বড়ুয়ার ছেলে তিনি। ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যের অনেক রাজার ছেলে মেয়ের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ-পরিচয় আছে কিন্তু সেই "রাজা-রাণী"দের মধ্যে এক-দুইজনই সত্যিকারের রাজার মতো চলেন বলেন। বর্ধমানের বর্তমান মহারাজা যাঁর ডাক নাম "হেন্‌রী" এবং তস্য সহোদরা রাজকুমারী "করুণা" তাঁদের মধ্যে পড়েন। যেমন লালজীও।

চৌকিদার বললো, এই টিলা ছেড়ে নেমে গিয়ে নিচের ঢালে যে বাড়িটা আছে সেখানে খোঁজ করুন গিয়ে।

সেখানে গিয়ে গরুখোঁজা করে খোঁজা হলো। না। সেখানেও কেউই নেই। চার পাঁচজন নেপালী মেয়ে নদীর জলে যেন কী করছিলো। মেয়েরা জলে কী করে না করে তা দেখা ভদ্র পুরুষের পক্ষে অভদ্রতা। তাই তাকাইনি। তাদেরই মধ্যে বিকাশের প্রশ্নের উত্তরে একজন তরুণী বলল, "রাজা তো চলে গেছেন।"

কোথায়?

মূর্তীতে।

কোন্ মূর্তী?

বিকাশ শুধোল। মেটেলির মূর্তী কি? চাল্‌সা হয়ে যেতে হয়?

তা জানি না। শুধু জানি যে, রাজা মূর্তীতে চলে গেছেন।

BanglaBook.org

বিকাশ বলল, লালদা আজ থাক। অন্যদিকের পথ। কালই যাওয়া যাবে। শিলিগুড়ি থেকে সেভক রোড হয়ে তিস্তার করোনেশন ব্রিজ পেরিয়ে অনেক দূর যেতে হবে। চাল্‌সা ছাড়িয়ে। ওদিকে যে হাতিরই রাজত্ব।

বললাম, হাতির রাজার কাছে যাবে, হাতির রাজত্ব তো হবেই। ফেরার পথে বিকাশ বলল, লালজীর মতো মানুষ আপনাকে এমন সব চিঠি লেখেন ? আপনার জ্ঞানগম্যির কথা জেনে তো ভয় লেগে যায়।

ওকে নিরস্ত করে বললাম, কোথায় ওঁর জ্ঞান আর কোথায় আমার। বড় মানুষ, তাইই বিনয়ের শেষ নেই। আমি কতটুকু জানি তা তো আমার চেয়ে বেশি আর কেউই জানে না!

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে প্রফেসর পি· লাল আমাদের ক্লাশ নিয়ে তাঁর অধ্যাপনা জীবনের শুরু করেন। উনি একটা কথা বলতেন প্রায়ই। "ইট ইজ বেটার টু হাইড ইওর ইগনোরেন্স্ দ্যান টু শো ইওর নলেজ।"

কথাটা খুবই দামী। মেনে চলি।

বললাম, বিকাশ, রাজ-দর্শনে বেরিয়ে আর কাল কেন ? আজই চলো।

ওরে বাবা। খেয়ে দেয়ে যেতে যেতে তো দুপুর। ফিরতে ফিরতে রাত। হাতি মেরে ফেলবে।

চলোই না কিচ্ছু হবে না।

বিকাশ রাজি হলো না। অবশ্য পরের দিন রাজদর্শন করে ফিরতে ফিরতে গভীর রাতই হয়ে গেছিলো।

পরদিন সিনক্রেয়ার হোটেল থেকে বিকাশের বাড়ি গিয়ে চিতলের বড় পেটি দিয়ে ভাত খেয়ে ওর ড্রাইভার অজিতকেও সঙ্গে নিয়ে বেরোনো হলো দুপুরে। লালজীর জন্যে একটি 'রাম্' কিনে নিলাম উপহার হিসেবে। জানি না, খুশি হবেন কিনা। রাজদর্শনে শুধু হাতে যাই বা কী করে। যদি আজও রাজাকে না পাওয়া যায় তবে শীতের রাতে গাড়ির পেছনের সিটে আরাম করে বসে আমরাই 'রাম্ নাম কেবলম্' করতে করতে ফিরে আসব। বিকাশ অবশ্য কোনো ঝুঁকিই নেয়নি। লিকুইড্ কম্বল হিসেবে, আমাদের যাতে সর্দি কাশি না হয় তারও বন্দোবস্ত রেখেছিল। শীতও বেশ জাঁকিয়ে পড়েছিলো।

অনেকদিন পর "করোনেশন ব্রিজ" পেরিয়ে ডুয়ার্সের আদিগন্ত চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলল গাড়ি। "করোনেশন ব্রিজ" পেরুনোর কিছুটা পর পর্যন্ত পাহাড়ি রাস্তা। সমতলে পৌঁছেই অজিত একসিলারেটরে চাপ দিলো। চাল্‌সাতে পৌঁছে বাঁদিকে চড়াইতে যে পথ চলে গেছে "মেটিলী", "শামসিং" ইত্যাদি চা-বাগানের দিকে, সেই মোড়ে তিনটে নাগাদ পৌঁছিয়ে আমরা বাঁয়ে ঘুরে গেলাম। কিন্তু মোড় ঘুরে চড়াই ওঠার আগেই বিকাশকে বললাম, এক কাপ করে চা খাওয়া যাক।

অজিত নামলো, চা আনার জন্যে। ভাগ্যিস নেমেছিলো। চাল্‌সার মোড়েই খোঁজ করে জানা গেল যে রাজা, মূর্তী বাগানে নেই, বাতাবাড়ি চা বাগানের কাছে যে মূর্তী নদী আছে, সেই নদীতে বা নদীর কাছাকাছি কোথাও আছেন।

চা খেয়ে গাড়ি তো বাঁদিকে না ঘুরিয়ে ডানদিকে ঘোরানো হলো। একটু যেতেই গভীর অরণ্যর মধ্যে এসে পড়লাম। ডুয়ার্স আর তিস্তার অববাহিকার অরণ্যর সত্যিই তুলনা হয় না। সমস্ত অরণ্যরই আলাদা আলাদা রূপ,গন্ধ, প্রকৃতি ; নারীরই মতো। তবু এইসব জায়গাতে এলেই অনেকই পুরনো কথা মনে পড়ে যায়।

শিকার আমি উত্তরবঙ্গে বিশেষ করিনি। কিন্তু এই সব অঞ্চলে ঘোরাঘুরিও কম করিনি

BanglaBook.org

পঞ্চাশের দশকের শেষভাগ থেকে। কত চা বাগানের ম্যানেজার, কত বাগান, কত রকম চরিত্র। শিকার ওখানে বিশেষ না করলেও ওখানের একাধিক মানুষ আমাদের সঙ্গে অন্যত্র অনেক শিকার করেছেন। যেমন, শিলিগুড়ির দুর্গা রায় মশাই। যাঁকে, তাঁর নিজেরই ভাষায় বললে বলতে হয়, "আগে ছিলাম মক্কেল এখন হয়েছি বিক্কেল।"

এই দুর্গা রায় মশায়-এর মতো রসিক, বহুভাষী, পশ্চিমবঙ্গর রাইটার্স বিল্ডিং-এ প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি খুব কমই দেখা যেতো সেই সময়। এখন উনি ব্যাঙ্গালোরে আছেন। এত বিভিন্ন, পরস্পরবিরোধী বিষয়ে এমন জ্ঞান, এতো জীবনীশক্তি, এতো উদ্দীপনা সত্যিই খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখেছি। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বড় ভাই কিরণ বসু, যিনি ছিলেন জলপাইগুড়ির রায়কত রাজ রাজা প্রসন্নদেবের একমাত্র কন্যা রাজকুমারী প্রতিভাদেবীর স্বামী, জলপাইগুড়ির নবাব মুশারফ্ হোসেনের এক বংশধর, যিনি 'ভ্যালে' এবং প্রকাণ্ড কোলবালিশ নিয়ে আমাদের সঙ্গে একবার সুন্দরবনে শিকারে গেছিলেন গোপেন্দ্রকিশোর বাগচীর লঞ্চে করে। এবং আরও অসংখ্য মানুষ। এঁদের কথা পরে বলব।

ডুয়ার্স-এর কথা উঠলেই আরও কত মানুষের কথা মনে পড়ে যায় যে তা বলার নয়।

ডনাল্ড ম্যাকেঞ্জী ছিলো বাগরাকোট টি-এস্টেটের ম্যানেজার। সাড়ে ছ-ফিট লম্বা। প্রচণ্ড বলবান মানুষ। ওঁর প্রিয় রাইফেল ছিলো হল্যান্ড অ্যান্ড হল্যান্ডের একটি ডাবল-ব্যারেল থ্রী-সেভেনটি-ফাইভ ম্যাগনাম্। ডনাল্ডই আমাকে প্রথমে দু-চোখ খুলে গুলি করতে শেখায়। দুটি চোখের মধ্যে যেটি "মাস্টার আই" তাকে ব্যবহার করতে শেখায়। পায়ে হেঁটে বড় বাঘ ও শুয়োর মারতে খুব ভালবাসতেন। হাতীর পিঠ থেকে তো মারতোই। অদম্য সাহস ছিলো ডনাল্ডের। তবে সে সাহসের কতখানি স্কচ-হুইস্কীজাত আর কতখানি অন্তর-সঞ্জাত তা বলতে পারি না। ডনাল্ড বাগরাকোটের চা-বাগানের ম্যানেজার তখন। বাগানের একজন কুলি তার পিঠে কুকরি বসিয়ে দিয়েছিলো। কুকরী-শোভিত পিঠ নিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে বিরাশি-সিক্কার এক ঘুষি কষিয়েছিলো ডনাল্ড তাকে। তাতে সেই কুলি তিন ডিগবাজী খেয়ে ছিট্‌কে পড়েছিলো দূরে। ঐ কুকরী-শোভিত হয়েই নিজের বাংলোতে ফিরে এসে চওড়া বারান্দার রেলিং এ বসে হুইস্কীর বোতল খুলে নীট্-হুইস্কী খেতে খেতে তার অপরূপ সুন্দরী স্ত্রী বেটিকে বলেছিলো ডাক্তারকে ফোন করতে।

বেটি ম্যাকেঞ্জীর মতো সুন্দরী ইংরেজ মেয়ে ইংল্যান্ডেও কমই দেখেছি। বেটি ছিলো জমজ বোনের একজন। যৌবনের প্রারম্ভে ওরা দুবোনই ছিলো লাল্‌ডানের ডাকসাইটে মডেল। একজনকে বিয়ে করে আমেরিকার এক মালটি-মিলিয়নীয়র। আর বেটি, ভারতের পূর্বাঞ্চলের পাহাড় নদী বনের গন্ধে মুগ্ধ হয়ে এবং ডনাল্ডের শারীরিক পুরুষালিতে মোহিত হয়ে চলে আসে এখানে।

জীবনের শেষভাগে এসে নানা কারণে ওদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ডনাল্ড শেষের দিকে মদের মাত্রা খুবই বাড়িয়ে দেয়। বেটি অবশ্য চলে যায় তার আগেই ভারত ছেড়ে। ডনাল্ড যখন যায় তখন তপন রায়, বর্তমানে বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প কোম্পানীর ম্যানেজিং-ডিরেক্টর এবং ডনাল্ড-এর প্ল্যান্টার্স জীবনের বন্ধু, আমাকে জলপাইগুড়িতে গিয়ে ওর ইনকামট্যাক্স-এর ক্লিয়ারেন্সটা আদায় করে দিতে অনুরোধ করে। তখন সুদীপ ছিলো জলপাইগুড়ির 'এ' ওয়ার্ডের অফিসার; সুদর্শন মেধাবী সুদীপ রায়। সুদীপই করে দেয়। এক রাতে জলপাইগুড়ির রাজবাড়িতে থেকে পরদিনই ফিরে আসি ক্লিয়ারেন্স্ নিয়ে।

ডনাল্ড এখান থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে হীথ্রো এয়ারপোর্টে কিছুদিন নাকি সিকিওরিটি

অফিসার ছিলো শুনেছি। ও ভারত ছেড়ে চলে যাবার কিছুদিন আগে একবার দেখা হয়ে গেছিলো আকস্মিক ভাবে। তখন ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস্-এ স্ট্রাইক। শিলিগুড়িতে যাচ্ছি ফ্রেটার-সার্ভিসে। ড্যাকোটা-প্লেনে। নামব, জপাইগুড়ির কাছে, আমবাড়ি-ফালাকাটা এয়ারস্ট্রিপে। আসামের ধুবড়ি শহরের কাছাকাছি রূপসীরই মতো এটি আর একটি এয়ার-স্ট্রিপ। তবে "রূপসী" অনেক ভালো। ড্যাকোটা, মাঝে একটি চা-বাগানে নামলো প্রভিশনস্ নামাতে এবং চা-এর পেটি তুলতে। প্লেন তখনও ট্যাক্সিইং করছে, দূর থেকে দেখি ডনাল্ড দাঁড়িয়ে আছে। সকলের চেয়ে তার মাথা উঁচু হয়ে আছে। পায়ে গল্ফ-সু, পরনে খাকি শর্টস্ এবং খাকি হাফ শার্ট। তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রবোধ সান্যাল মশাই। পাশে দাঁড়ানো প্রবোধ সান্যাল মশায়ের মতো দীর্ঘদেহী মানুষকেও বেঁটে খাটো দেখাচ্ছিল ডনাল্ডের তুলনাতে।

প্লেন থেকে নেমে ডনাল্ড এবং সান্যাল মশায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললাম। সত্যিই "প্রেজেন্ট সারপ্রাইজ"।

ডনাল্ড যখনই আমার হাতটা হ্যান্ড শেক্ করার জন্যে হাতে নিতো তখনই আমার লজ্জা করতো। আমার হাত মেয়েদের হাতের মতো নরম। ডনাল্ড-এর রুক্ষ বিরাট হাতের পাতার মধ্যে আমার হাতখানি গুঁড়িয়ে যাবে বলে মনে হতো।

বেটি দারুণ ভালো রান্না করতো। দিশি পুলাউ এবং মাটন কারী রেঁধে রূপোর সার্ভিং-বাওল থেকে নিজে হাতে সার্ভ করে খাইয়েছিলো আমাকে। তার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।

আরেকজন ম্যাকেঞ্জী ছিলো শামসিং চা-বাগানের ম্যানেজার। ভুটানের সীমান্তে সে বাগান। চমৎকার ছিলো ম্যানেজারের বাংলোটি। দু নম্বর ম্যাকেঞ্জির বয়স কম এবং গাঁট্টা-গোট্টা চেহারা ছিলো বলে প্ল্যানটার্স্‌রা তাকে ডাকতো "উই" ম্যাক বলে। ইংরিজি "উই"। (Wee) "উই" ম্যাক ছিলো অবিবাহিত। তার গোটা দশ বারো দিশি কুকুর ছিলো পোষ্য। ম্যানেজারের কাঠের দোতলা দারুণ বাংলোর শোবার ঘরে "উই" ম্যাক উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকতো খাটের দুপাশে দু হাত ছড়িয়ে দিয়ে আর তার পোষ্যরা তার দু হাত চাটতো। এই প্রক্রিয়া না ঘটলে ঘুমই আসতো না তার। তার বাথরুমের লাগোয়া ড্রেসিং-রুমে একটি বাঙালী মেয়ের ছবি ছিলো। তাঁর নাম বলছি না। বিবাহিতা "উই"-এর অনেক পাগলামির মধ্যে এও ছিলো এক পাগলামি। "উই" সেই পরস্ত্রীকে এতোই ভালবেসেছিলো যে তাঁর স্বামীর সঙ্গে "ডুয়েল" লড়ে তাঁকে পেতে চেয়েছিলো চিরদিনের মতো। শুনেছি এ কথা, অন্য সাহেব ম্যানেজারদের মুখে।

এখনও যেন চোখে ভাসে যে আমি আর দুর্গাকাকু ব্রেকফাস্ট সেরে শামসিং বাংলোর ডাইনিং রুমে বসে আছি। আর উই ম্যাক্ এক মগ দুধ আর একগাদা থক্‌থকে পরিজ্-এর পর মোটে ছটা ডিম দিয়ে বানানো ওমলেট্ এবং পাউন্ড খানেক রুটির টোস্ট খেয়ে, তার স্টেশন-ওয়াগনের স্টিয়ারিং-হুইলে গিয়ে বসলো। বসে, ইয়াব্বড় বোল্-এর পাইপ থেকে স্টিম-এঞ্জিনের মতো ধোঁয়া ছাড়ছে। তারপরই তার কুকুরগুলোকে পেছনে উঠতে বলে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি জোরে স্টেশন-ওয়াগন চালিয়ে চলে যাচ্ছে চা-বাগানের গভীরে।

ওর পুরো নাম ছিলো রনাল্ড রস্ ম্যাকেঞ্জী। চেহারাতে ডনাল্ডের তুলনাতে ছোটখাটো ছিলো বলেই "উই" নামকরণ ওর হয়েছিলো। ও আমাদের সঙ্গে অনেক জায়গাতেই শিকারে গেছিলো। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জোরে চলাটাই ওর অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছিলো জীবনের

BanglaBook.org

অনেকই ক্ষেত্রে। খুবই অল্পবয়সে উইম্যাক দার্জিলিং-এ মারা যায়। সিরোসিস্ অফ লিভার হয়েছিলো। "উই" ছিলো স্কটল্যান্ডের অত্যন্ত বিত্তশালী বাবা-মায়ের একমাত্র বকা ও দুরন্ত ছেলে। দুরন্তপনা এবং ব্যতিক্রমই ছিলো ওর জীবনের মূল সুর। কোনো কোনো মানুষ তাদের জীবনে শুধুমাত্র শুদ্ধ-স্বরেই বাজতে চান; কোমল স্বরগুলিকে সযত্নে এড়িয়ে যান। উই মারা যাবার পর দুর্গাকাকুর কাছে তার বাবা-মায়ের লেখা চিঠিতে যে বিলাপ দেখেছিলাম তা পশ্চিমী দেশের মানুষদের মানসিকতায় আশা করা যায় না।

সার্গেসন্ বলে একজন অল্পবয়সী অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার ছিলো। বাগানের নাম আজ আর মনে নেই। 'অল্পবয়সী' বলছি, কারণ তখন আমার বয়সও ওরই মতো ছিলো। পঁচিশ-ছাব্বিশ। একদিন এক বর্ষার ঘনঘটা করে আসা এক বিকেলে পট-হান্টিং-এর জন্যে মুরগী মারতে গিয়ে হঠাৎই হাতীর হাতে পড়ে সে। হাতী মাথাটা পিষে দেয়।

টার্নার ছিলো ইয়ং-টং চা-বাগানের ম্যানেজার। টার্নারের খুব ঘোড়ার বাতিক ছিলো। কলকাতা থেকে ট্রাক-এ করে ঘোড়া আনাতো সে। মিসেস টার্নারকে বেশি করে মনে আছে। তাঁর নাম ছিলো 'লরা'। প্ল্যান্টার্স্‌রা সেই সুন্দরীকে ডাকতো 'লানা' বলে। হলিউড-এর তখনকার দিনের বিখ্যাত অভিনেত্রী 'লানা টার্নারের' অনুসরণে। ঐ সব স্মৃতি একবার ভীড় করে এলে খেই থাকে না আর। নস্টাল্‌জিক্ হয়ে যাই বড়।

গাড়ি চলতে লাগলো। মূর্তী নদীর খোঁজে। পথ অজিতের তেমন জানা নেই। বিকাশেরও নয়।

দুদিকের গভীর জঙ্গল হাতির একেবারে 'প্যারাডাইস'। নইলে "লালজী" এসে এখানে আস্তানা গাড়বেনই বা কেন?

এই পথটিই চলে গেছে লাটাগুড়ি ময়নাগুড়ি হয়ে জলপাইগুড়ি। উত্তরবঙ্গের "বৈকুণ্ঠপুরে" রাইকত্ রাজাদের খাস জঙ্গল ছিলো আগে। যে জঙ্গলের ভিতরে বঙ্কিমচন্দ্রর 'আনন্দমঠ'-এর সন্ন্যাসীকাটা হাট এখনও আছে, শিকারপুর চা-বাগানের গায়ে,। এই পথপাশের জঙ্গলের সঙ্গে বছর তিরিশ আগের বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলের মিল আছে। অমন নিবিড় বন খুব বেশি দেখিনি। মানে, বৈকুণ্ঠপুরের মতো।

শীতের রোদের তেজ ক্রমশ কমে আসছে। শীত শীতও করছে একটু। বাতাবাড়ি চা-বাগান পেরোনোর পর বাঁদিকে একটি পথ চলে গেছে জঙ্গলের ভিতরে। সেই পথেই ঢুকলো অজিত, হাট-ফিরতি একজন রাজবংশী মানুষকে জিগগেস্ করে।

সে পথে একটু যেতেই দেখা গেল বাঁয়ে একটি হাট বসেছে জমজমাট। শীতের অরণ্যর গভীরের চমৎকার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সব তরী-তরকারী। সাদা ও কালো উজ্জ্বল বেগুন। সতেজ লালচে-কালো আলো-ঠিক্‌রোনো সিম হালকা-সবুজ, অন্তর্নিহিত স্বাদু জলজ আভাস দেওয়া লাউ। ইঁটের মতো রঙের কুমড়ো। হাটে রাজবংশী ও সাঁওতালই বেশি। লাল-নীল শাড়িপরা মেয়েরা এবং সাদা ধুতির ওপর পরিষ্কার করে কাচা নানারঙা শার্ট গায়ে-চড়ানো পুরুষেরা হাটময় ঘুরে ফিরে কেনা-বেচা করছে।

আগামীকাল দেওয়ালি, তাই আজ বেচা-কেনা জোর। আতসবাজীর দোকানে মোমবাতি, তারাবাজি, রংমশাল, লাল-নীল দেশলাই, আছাড়ি পট্‌কা সব সাজিয়ে বসেছে দোকানি, তেলে ভাজার দোকান আর কাচের চুড়িওয়ালার দোকানের কাছেই। দিশি মদও বিক্রি হচ্ছে প্রাচীন শালগাছের তলায়। এই গাছকে সাক্ষী রেখেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম মেয়ে-পুরুষে মত্ত হবার মন্ত্র নিয়েছে ওরা; এই বনবাসী পুরুষ-রমণীরা। আমারই মতো সংসার-বিমুখ, অপদার্থ, কুঁড়ে, অসফল, সদা-তিরস্কৃত মানুষদেরই বেশি ভিড় সেখানে।

BanglaBook.org

গাড়ি থামিয়ে অজিত বললো, হাটে গিয়ে রাজার খোঁজ করে নেবো নাকি একবার ? কাছাকাছি ডেরা হলে এই হাটেও তিনি এসে থাকতে পারেন।

বিকাশ বললো নাও। আর কিছু টাট্‌কা সবজিও কিনে নিও।

এইরকম হাটে এনে ছেড়ে দিতে হয় আমার বাবাকে। ইয়েস্। আমার বাবাকে। খাদ্যরসিক অনেকই দেখেছি কিন্তু তাঁরা কেবল বিলিভার-ইন-কোয়ালিটি ওনলি। যেমন, আমার হাজারিবাগের শিকারী বন্ধু গোপাল সেন এবং তার বাবাও। হাজারিবাগের সুব্রত চ্যাটার্জি। মহম্মদ নাজিম। দিল্লীর মিস্টার ইন্দারজিৎ শেঠ। লক্ষ্ণৌর মেহমুদ সাহেব। জুওলজিকাল সার্ভের আশিষ ঘোষ ইত্যাদি। এঁরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব রুচির ক্ষেত্রে যথার্থ খাদ্যসম্রাট। কিন্তু বাবার মতো বিলিভার-ইন্-কোয়ালিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কোয়ান্টিটি আর দেখিনি।

বাবার সঙ্গে গাড়িতে বেরিয়ে, সে ভারতের যে-প্রান্তেই হোক না কেন, পথের উপর কোনো হাট দেখতে পেলে, সে হাট অনেক দূরে থাকতেই আমার মায়ের হার্ট-প্যাল্‌পিটিসান্ হতো। কোরামিন খেতে দেখেছি তাঁকে একাধিকবার বাবার হাট-বাজারের রকম দেখে। মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে মায়ের যে হার্ট-অ্যাটাক হলো এবং চলেও গেলেন তার পেছনে বাবার অপ্রত্যক্ষ কিছু অবদানও হয়তো আছে। মা ছিলেন গিরিডির ব্রাহ্ম পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা মেয়ে। আর বাবা ছিলেন ঘোরতর অব্রাহ্ম। খাদ্যর ব্যাপারে কোয়ালিটির সঙ্গে অ্যাস্ট্রনমিকাল কোয়ানটিটির এমন রাজযোটক মিল আর কারও মধ্যেই আজ অবধি দেখিনি। সাহেবি-ভাবাপন্ন অথচ পাতি-বাঙালি একজন পরিচিত ভদ্রলোক বাবাকে ঐ সংস্থার মূর্তিতে দেখলেই, যেন অতি বীভৎস কিছু দেখেছেন এমন ভাবে মুখ-বিকৃতি ঘটিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতেন "মিস্টার গুহা বিলিভস্ দ্যাট দ্যা ওনলি ওয়ে টু হার্ট ইজ থ্রু দ্য স্টম্যাক।" অথচ একটি সময়ে অবারিতদ্বার আমাদের বাড়ির খাওয়ার টেবলে তাঁরই আসন ছিলো প্রায় চিরস্থায়ী। গালাগালি খেতেন বাবা। আর খাওয়ারটা খেতেন ওঁরা।

এ কারণে, যে-কোনো হাট দেখলেই বাবার কথা মনে পড়ে যায় আমার, সে হাট পৃথিবীর যে-প্রান্তরই হোক না কেন। আর বিস্মিত বোধ করি নতুন করে আমার এই সুন্দর, সুগন্ধী, বিচিত্র ভাষাভাষী মানুষে-ভরা আশ্চর্য দেশ ভারতবর্ষর কথা ভেবে। আমার দেশের হাটের ধুলোর গন্ধ, কালো কুচকুচে মাটির হাঁড়িতে বয়ে নিয়ে যাওয়া সর্ষের তেলের গন্ধ, খোলের গন্ধ, কেরাসিন তেলের গন্ধ, কুচো-মাছের মাটি-মাটি গন্ধ, তেলেভাজার গন্ধ, গাড়ি থেকে বিযুক্ত-করা ছায়ায় বসে জাবর কাটা শান্ত উজ্জ্বল বড় বড় কালো চোখের বলদদের গায়ের গন্ধ, আমার দেশের দুঃখী কিন্তু বড় ভালো, বড় সুন্দরী সব মেয়েদের মুঠি-ভরা বুকের গন্ধ, স্বাস্থ্যবান পুরুষের শরীরের গন্ধ আমাকে যেন নেশাগ্রস্ত করে। মিশ্র গন্ধ ওড়ে চারপাশে, মিশ্র শব্দ, মিশ্র আলো-ছায়া কাঁপতে থাকে চোখের মধ্যে। ভারি ভালো লাগে।

একটু পরেই অজিত দৌড়ে এসে বলল, স্যার আপনার রাজা এখানেই আছেন।

কোথায় ?

গাড়ি থেকে নেমে পড়ে শুধোলাম আমি।

ঐ তো স্যার। পাননি দেখতে ?

কোথায় ?

ঐ তো। ঐ যে।

বলেই, আঙুল দিয়ে দেখালো এবারে।

কতদিন দেখিনি লালজীকে ! শেষবার দেখা হয়েছিলো বছর তিনেক আগে কি আরও

BanglaBook.org

বেশি হবে যখন অফিসে এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে।

হাটের এক পাশে একটি ছোট্ট চালাঘরের মুদির দোকানে দাঁড়িয়ে কী যেন কিনছিলেন। আমরা ওঁকেই খুঁজছি শুনে একজন গিয়ে দৌড়ে খবর দিলো ওঁকে। উনি ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন গাড়ির দিকে। ওঁর দুটি হাত দিয়ে আমার দুটি হাতকে জড়িয়ে ধরলেন।

অলিভগ্রিন ট্রাউজার পরা, পায়ে সস্তাতম খয়েরি-রঙা একজোড়া কেডস্ জুতো। সবুজ-রঙা ফুলহাতা সোয়েটার। মাথাতে, হাতে-বোনা কালো উল দিয়ে বানানো নেপালি টুপি। টুপির ওপরে রূপোর একটি ছোট্ট হাতির এমব্লেম্।

লালজীর ঐ টুপি দেখে আমার আইভান্ সুরিটার কথা মনে পড়ে গেলো। আইভান অনেকদিন নর্থবেঙ্গলের কমিশনার ছিলেন। আইভান সবসময়ই কালো গোর্খা-টুপি পরতেন আর সেই টুপির উপরে জোড়া-কুকরির এমব্লেম্ থাকতো। দার্জিলিং-এ গোর্খাল্যান্ডের গোলমালের খবর যখন রোজই খবরের কাগজে পড়ছি তখন আইভানের কথা খুবই মনে হয়। উনি থাকলে ব্যাপারটা বোধহয় এমন মোড় নিতো না। আইভানকে দার্জিলিং কালিম্পং-এর মানুষেরা কাছের লোক বলে জানতেন শুনেছি। আইভান সুরিটা তাঁর ফোর-সেভেন্টি-ফাইভ ডাবল-ব্যারেল জেফ্‌রী রাইফেলটি যেটি কোনো রাজা-মহারাজার জন্যেই "কাস্টম-বীল্ট" করানো হয়েছিলো, সুন্দর মনোগ্রাম করা, আমাকে প্রায় দানই করেছিলেন। ফর আ সঙ্। হাজারিবাগের টুটু ইনামের বাঘ শিকারের ক্লায়েন্টদের বলে নতুন গুলিও আনিয়ে দিয়েছিলেন অনেক। সবচেয়ে বড় কথা, যখন কলকাতার তৎকালীন পুলিশের আই-জি কড়া করে চিঠি লেখার অপরাধে আমাকে পিস্তল দেবেন না বলেছিলেন তখন আমার পিস্তলের লাইসেন্সটা আইভানের জন্যেই হয়েছিল। সব শুনে, আমার কাছ থেকে আমার অফিসে বসেই অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে নিজেই লাইসেন্স করিয়ে দেন। পরে পিস্তল জলপাইগুড়িতে ডি এম-এর কাছে প্রড্যুস করিয়ে আমার অফিসে নিজে এসে পৌঁছে দিয়ে গেছিলেন। অমন ভদ্রলোক আজকাল কমে আসছে। আইভানের সেই রাইফেলের এক কাহিনী আছে। "নগ্ন নির্জন" উপন্যাসটির মূলে ঐ রাইফেলটি। হাতি-মারা রাইফেল। তা দিয়ে আমি হাতি মারিনি একটিও। তবে প্রসিদ্ধ হাতি শিকারি ধৃতিকান্ত লাহিড়ীচৌধুরী আমাদের রাজা বসন্ত রায় রোডের পৈতৃক বাড়িতে এসে হাতি মারার জন্যে আমার কাছ আইভানের দেওয়া নতুন গুলি নিয়ে গেছেন একাধিকবার।

লালজীর টুপি বড়ই গোলমাল করে দিলো দেখছি। ওঁর কথাতেই ফিরি আবার।

লালজী হাত না ছেড়েই দাঁড়িয়ে রইলেন।

কাল বামন-পোখ্‌রিতে গেছিলাম আপনার খোঁজে।

আমি বললাম।

আর আজ এসেছি এখানে খুঁজতে। মাঝে-মাঝে পত্রাঘাত করে যে কোথায় মিলিয়ে যান। আপনাকে পাওয়ার চেয়ে মানুষখেকো বাঘের হদিস করা সোজা।

ছোট্ট-ছোট্ট তামাটে-সোনা সাদা গোঁফের শীর্ণকায় বৃদ্ধ হেসে বললেন : গরু খোঁজাই বলুন। কী বলেন ?

লজ্জিত হয়ে বললাম গরু খোঁজা ?

হাসলেন।

বললেন, একটু দাঁড়ান। বাজারটা সেরে নিই। মানী-গুণী লোককে তো শুধু চা খাওয়ানো যাবে না। একটু বিস্কুট আর ডিম কিনে নিই। গরীবের ঘরে তো সবসময় খাতির করার মতো থাকে না জিনিস।

উনি আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আবারও হাটের ভিড়ে মিশে গেলেন।

খুশি হয়েছেন খুবই বুঝলাম।

গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বিকাশকে বললাম, দ্যাখো বিকাশ। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। আসল রাজা আজ ভিখারি আর আমার মতো নকল রাজারা হলো সত্যিকারের রাজা।

ওঁকে বাইরের সকলে 'রাজা' বলেন বটে কিন্তু ওঁর কাছের লোকেরা ওঁকে ডাকেন 'বাবা' বলে। প্রতি বছর শোনপুরের মেলাতে অগণ্য হাতি আসে (এখন সংখ্যা কমে গেছে। আগে হাজারে হাজারে আসতো)। কেনা-বেচার জন্যে। আগে তো হাতি ধরার উপরে বাধা-নিষেধ ছিলো না কোনো, সেই সময়ও সারা ভারতবর্ষের কেউই "বাবা"কে জিজ্ঞেস না করে, বা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে হাতি কিনতো না। এখনও তাই। তবে এখন ইদানীং হাতি আসে মাত্র তিন চারশ। আমাদের শিশুকালে রিলিজ-হওয়া প্রমথেশ বড়ুয়ার বিখ্যাত 'মুক্তি' ছায়াছবিতে যে প্রকাণ্ড দাঁতালকে দেখা গেছিল তার নাম ছিলো 'জং-বাহাদুর'। কিন্তু গৌরীপুরের রাজ পরিবারের "প্রতাপ সিং" ছিলো লালজীর সবচেয়ে প্রিয় হাতি। প্রতাপ সিং অসুস্থ হলে লালজী নিজের বুক চিরে রক্ত দিয়ে দেবী "মহামায়ার" কাছে তার আরোগ্য কামনা করে মানত করেছিলেন। পরে যখন "অ্যানথ্র্যাক্স" রোগে প্রতাপ সিং মারা যায় তখন নিজের মা-বাবার পিণ্ড দানের সময়ে গয়াতে গিয়ে লালজী প্রতাপ সিং-এর পিণ্ডও দিয়ে এসেছিলেন। প্রতাপ সিং লালজীর কাছে মানুষেরই মতো ছিলো।

বাজার শেষ করে এলেন লালজী। সঙ্গে একটি ছোট ছেলে। থলেতে অনেক বাজার। আমরা না এলে, নিজে হাতেই বয়ে নিয়ে যেতেন এই বাজার। গলা থেকে ছোট্ট একটি কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে। তারই মধ্যে টাকা-পয়সা সব। বিদেশি হিপি-হিপিনীরা যেমন ব্যাগে পাসপোর্ট এবং টাকা-পয়সা নিয়ে ঘোরে, তেমনই। থলেটি হাতে তৈরি। পুরনো ছাই-রঙা ফ্ল্যানেলের ট্রাউজার কেটে, পায়জামা বা মশারির দড়ি কেটে তার সঙ্গে সেলাই করে লাগানো। হাটের মধ্যে দিয়ে মস্ত মস্ত গাছের নিচ দিয়ে হেঁটে-আসা ছোট্ট-খাট্টো মানুষটিকে দেখে আমার হঠাৎ মনে হলো উনি যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আরণ্যকের" রাজা 'দোবরু পান্না'।

'মাটিয়াবাগ' প্যালেস অনেকবারই আমি দেখেছি গৌরীপুরে। ধুবড়ি থেকে গৌরীপুর হয়েই তামারহাট, রায়মানা, যমদুয়ারে যাওয়ার পথ ছিলো। হাতিশালে হাতির সার, গারাজ ভর্তি ঝকঝকে সব বিদিশি গাড়ি। আলমারিতে পৃথিবীর বাঘা-বাঘা সব অস্ত্র, শয়ে শয়ে। দাস-দাসী, পাইক-বরকন্দাজ, মাহুত, ড্রাইভার, বেয়ারা-আয়ায় গমগমে রাজবাড়ি। প্রমথেশ মারা গেছেন অনেকদিন। জঙ্গলের আর হাতির প্রেমে পড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে পঁয়ষট্টি বছর কাটিয়ে দিলেন এমনি করেই লালজী।

গাড়িতে যেতে যেতে বললাম, দিদি কেমন আছেন?

মুনীনের মৃত্যুর পর দিদির মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে।

মুনীন্দ্রবাবু হঠাৎ মারা গেলেন কি করে?

ঐ! হাতি মারতে গিয়েই। সেকেন্ড গানম্যান ভয়ে পালালো। ও রাইফেল রিলোড় করার সময়ও পেলো না। প্রাণ বাঁচাতে দৌড়েছিলো। দৌড়তে গিয়ে আলু-খোঁড়া খালে পড়ে গেল। পড়ে গিয়ে অবশ্য হাতির হাত থেকে বেঁচে গেল তখনকার মতো। কিন্তু মেরুদণ্ডে চোট পেল। শেষে বিছানাতে শুয়ে শুয়ে বেড-সোর্ হয়ে গেছিলো। দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যেতো না।

BanglaBook.org

কিছুটা যেতেই আমরা মূর্তী নদীর সামনে এসে পড়লাম। শেষ বিকেলের আলোতে গহনতম জঙ্গলের মধ্যে সাদা নুড়ি আর শিলাময়, মেমসাহেবের মতো গায়ের রঙের নদী টান টান হয়ে শুয়ে আছে। মধ্যে দিয়ে জলধারা চলেছে। জলের পাশের বালির রঙ কমলা। তার দু পাশে ফিকে গেরুয়া। যেন কোনো সুন্দরী, কোমল শরীরের সোনালি চুলের মেম সান বেদিং করছে নগ্না হয়ে।

বাজার টাজার সব নামানো হলে লালজী বললেন, চেয়ারগুলান্ নামান্ লাগেরে।

তারপর রেঞ্জারের কোয়ার্টারের পাশের প্রায় ঐ-রকমই দোতলা বাংলোর ঘরের আধো-অন্ধকারের দিকে মুখ তুলে অদৃশ্য কাউকে বললেন, চা বানাইবার লাগে।

কথাবার্তা সবই থার্ড-পার্সন সিংগুলার নাম্বারে। যাঁর সঙ্গে রাজবংশী ভাষায় কথা বলছিলেন তিনি যে কে তা বুঝলাম না।

দোতলার বারান্দা থেকে চেয়ার নামাতে নামাতে আলোও পড়ে এলো। শীতও জাঁকিয়ে এলো। চারধারে কী সুন্দর জঙ্গল। মূর্তি নদীর দিকে মোহাবিষ্টর মতো চেয়ে বসে রইলাম।

আমার মধ্যে যে ভীষণ বুনো, সভ্যজগতে সম্পূর্ণ বেমানান, সবসময়ই মিস্-আন্ডারস্টুড একটা মানুষ বাস করে, যে-আমি আমার আসল-আমি, সেই আমিটা আস্তে আস্তে জেগে উঠতে লাগল মাথা উঁচিয়ে। হাতে-পায়ে শিকল পরানো এয়ার-কণ্ডিশনড্, কাঁচ-ঘেরা-অফিস আর নীচ, বড় নীচ শহুরে, শিক্ষিত(?)দের বিষ-নিঃশ্বাসে, ঈর্ষায়, দ্বেষে বড়ই ব্যথিত, ক্লান্ত, তিক্ত সেই আমি, শিকল-পরানো বুনো হাতির মতো শিকল ছেঁড়ার জন্যে ছট্‌ফট্ করতে লাগলো।

লালজী বললেন, ভাবেন কি? গুহসাহেব?

নাঃ।

ভাবছিলাম, দিশি হাতিরা পোষ মানে। কোনো আফ্রিকান হাতিকে কখনওই পোষ মানানো যায় না। দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি।

ওঁকে বলে লাভ নেই। কারণ সব শিকল যে ছেঁড়া যায় তা তো নিজের জীবনে করে দেখিয়েছেনই উনি। আমি দিশি হাতি, উনি আফ্রিকান। আমার কথা শুনলে উনি হাসবেন। বলবেন, চলে আসুন একসঙ্গে থাকি বাকি জীবন। ওঁকে এই অভ্যেসের দাস হয়ে-যাওয়া, নগর-কীটের কথা শুনিয়ে কোনো লাভ নেই। উনি হাসবেন। শিকল নিজে হাতে ছিঁড়তে যে অপারগ তাকে বন্দীর জীবনই যাপন করতে হয়। শৈশব থেকে বার্দ্ধক্য। জীবনের পর জীবন।

গরুমারা স্যাংচুয়ারি তো কাছেই? তাই না?

বললাম আমি।

হ্যাঁ। ঐ তো।

বলেই, ঘুরে বসলেন ছোট্ট মোড়াটাতে।

আঙুল তুলে, মূর্তি নদীর দিকে দেখিয়ে বললেন, ওই যে সামনে ট্যাঁকটা দেখেন, ঐ ট্যাঁকের পরেই গরুমারা। গণ্ডার চলে আসে রাতের বেলায় চরতে চরতে নদী ধরে। তারপর আমার গণেশকে দেখে ফিরে যায়।

ওঁর কথা শেষ না হতেই গণেশ এলো। সত্যিই বিশাল হাতি। তবে, হাতি এর চেয়েও অনেক বড় হয়। গণেশ দশ ফিট তিন ইঞ্চি উঁচু। গণেশ মানে এক দাঁতের হাতি। গণেশের দিকে স্নেহের চোখে তাকিয়ে থেকে উনি বললেন, আসাম, বাংলা, বিহারের, পোষা-হাতিদের মধ্যে এখন এই একটি মাত্র গণেশ আছে। জঙ্গলে "বনুয়া" হাতিদের মধ্যে

BanglaBook.org

নিশ্চয়ই আছে। যোধপুরের মহারানীর জ্যান্ত গণেশ পুজো করার শখ হয়েছে। বার বার লোক পাঠাচ্ছেন। ষাট হাজার অবধি দাম দিয়েছেন। আমি বলেছি, লাখে উঠলে দেবো। মরা হাতিই যখন লাখ টাকা তখন আমার এমন গণেশকে লাখ টাকার কমে দেবো কেন ?

একটু চুপ করে থেকে লালজী বললেন, আসলে, ছাড়তেই মন চায় না তাই খালি খালি দামের বাহানা লাগাই।

একটু পরে অন্য হাতিটিও এল। মাক্না সেটি। তবে গণেশের চেয়ে অনেকই ছোট। ততক্ষণে চাও এলো। সঙ্গে বিস্কুট। এবং ওমলেট।

আমি বললাম, বামনপোখ্‌রি থেকে যে হাতির দল তাড়িয়ে আনলেন, কত বড় দল সেটা ?

বড় দল। সবশুদ্ধ তিয়াত্তরটা আছে। বামনপোখ্‌রিতে একটা রোগ ছিলো। সেটাক্ মারিছে পটা গুহ। ভালো নাম অমরেন্দ্র গুহ। ও আবার মুনীনের আত্মীয়ও হয়। পটা গুহ চা-বাগানের ম্যানেজার।

পটা গুহর কথা বিকাশের কাছে অবশ্য আগেই শুনেছিলাম। সব চা-বাগানের সঙ্গেই ওর ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে বলতে গেলে। ট্র্যাক্টর তো সব চা-বাগানেরই দরকার হয়।

এখানেও 'রোগ' ছিলো একটা।

লালজী বললেন, চঞ্চল আর রঞ্জিত আইস্যা মারিল্ সেটাকে কয়দিন আগে।

কলকাতার চঞ্চল সরকার আর রঞ্জিত আমার বহুদিনের পরিচিত। জঙ্গলের লেখার দারুণ ভক্ত ওরা। চঞ্চলের বাড়িতে হাতির দাঁতের আর পায়ের যা কালেকশন আছে তা খুব কম শিকারির কাছেই দেখেছি। সবই প্রায় 'রোগ'-এর। আমার আরেক বন্ধু জর্জ ট্রবও হাতি-শিকারি। তবে জর্জ, চঞ্চলের মতো অত হাতি মারেনি। খুব নামী ডেন্টিস্ট জর্জ, কলকাতার। আর চঞ্চল কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর বড় ঠিকাদার। জর্জ-এর শিকার ক্ষেত্র মুখ্যত আসাম। চঞ্চল যেখানেই "রোগ" "ডিক্লেয়ার্ড" হয় সেখানেই গিয়ে পৌঁছে যায় রোগ-নিধনে।

'রোগটা' একজন নেপালি মানুষকে মেরেছিলো। চঞ্চলরা আসার কদিন আগে। লালজী বললেন। খুব জোয়ান ছিলো নেপালি লোকটা। হাতি রাতে বস্তিতে এসে বদমাইসি করছিলো। বস্তির লোকগুলো টর্চ ফেলেছিলো। টর্চে ভয়টয় পায় না। তখনও চার্জ করেনি। হৈ হল্লা করতে শুরু করেছে যেই অমনি সে তেড়ে এলো। আর সকলে তো পালিয়ে গেলো ঐ লোকটাই আলে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো। আর যেমনি পড়া, অমনি ব্যাটা এসে সামনের পা চাপান দিলো তার গায়ের উপরে। ব্যস্‌স্ যেমন পড়েছিলো, তেমনই পড়ে রইলো। পুলিশ আসার পর সেখানে গিয়ে, উল্টে দিতেই দেখি নাক দিয়ে কালো রক্ত গড়াচ্ছে। তার মানে, পুরো হার্টটিই থেঁতলে গেছিলো। লাংস-এ গুলি বা চোট লাগলে রক্তের সঙ্গে ফেনা আসে আর হার্ট-এ লাগলে কালো রক্ত বেরোয়।

আরেক প্রস্ত খাওয়ার পর উনি হাটের পোশাক ছেড়ে আমাদের বললেন, "চলেন যাই। উপরত্ গিয়া বসি। ঠাণ্ডা এখানে।"

দোতলার খোলা বারান্দাতে মেঝের উপর আসন পেতে জোড়াসনে বসলেন উনি। আমরা রেলিং-ঘেঁষে। চেয়ারে। বাইরে প্রখর শীতের প্রথম রাতের নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় মূর্তি নদীর সাদা শরীরকে রহস্যময় দেখাচ্ছিলো। গণেশ আর মাকনাটি নদীর কাছেই একটু তফাতে তফাতে দাঁড়িয়ে খচরমচর করে কলাগাছ খাচ্ছিলো। সেই আওয়াজ আসছে নদীর রেখার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া রাত-পাখির সংক্ষিপ্ত ও চকিত আওয়াজকে ছাপিয়ে।

BanglaBook.org

স্বপ্নে-শোনা কোনো আওয়াজের মতো।

লালজীকে একটি রাম নজরানা দিয়ে অন্য রামটি খুললো বিকাশ। অজিতকে মুর্গি ও আরও ডিম এবং অন্য কিছুও যদি পায় তা খোঁজ করতে পাঠিয়েছিলাম।

অজিত এবং বিকাশ দুজনেরই হাতির বড় ভয়। একা যেতে চাচ্ছিলো না অজিত অবশ্য হাট ভেঙে গিয়ে থাকলে কোথায় ওসব পাওয়া যাবে তা ওর জানাও ছিলো না। তাই সঙ্গে 'রাজার' লোক গেলো দুজন।

রাম-এ চুমুক দিতে দিতেই গাড়ি ফিরে এলো। ডিম ভাজা এবং মুচমুচে আলু ভাজা করে দিলো অল্পবয়সী যুবতী মেয়েটি আবার। পরে জেনেছিলাম যে, যুবতী রাজার সঙ্গে স্ত্রীর মতোই আছেন বছর দেড়েক হলো। জাতে মুসলমান। অবশ্য মেয়েদের তো জাত থাকে না। লালন ফকির বলেছিলেন না, "যদি ছুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান, নারীর তবে কি হয় বিধান ?" কিন্তু লালন বোধহয় আফ্রিকাতে যাননি। এবং আফ্রিকার কথা জানেনও না। আফ্রিকার অনেক মুসলমান গোষ্ঠীর মেয়েদেরও ছুন্নৎ দেওয়া হয়। মেয়েদের ছুন্নৎ ব্যাপারটা হয়তো অবাক করবে অনেককেই, কিন্তু তার সম্বন্ধে বলা যাবে যখন আফ্রিকার জঙ্গলের পাহাড়ের কথা বলব। আমার "ইল্‌মোরাণদের দেশে" শীর্ষক বইয়েতে পূর্ব-আফ্রিকার মাসাই উপজাতিদের জীবনের চাল-চিত্র এঁকেছি। মাসাইদের মেয়েদেরও বাধ্যতামূলক ছুন্নৎ হয়।

লালজীর বয়স তখন ছিলো আটষট্টি। আর এখন তিয়াত্তর, মানে, বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে লেখার সময় আমার চেয়ে দু যুগের বড় বয়সে। কিন্তু গত চল্লিশ বছরে একদিনের জন্যেও অসুস্থ হননি। তামাক খেতে খেতে আগুন পড়ে পা একটু পুড়ে গেল অথবা একটু পেটের গোলমাল হলো, ব্যস্ ঐটুকুই। পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অরণ্যে বছরের সব ঋতুতে হাতি তাড়িয়ে এবং বিশেষ ঋতুতে হাতি ধরে অরণ্য-গভীরে ডেরা বেঁধে ষাট বছরের অরণ্য-অভিজ্ঞ লালজী দিব্যি বহাল তবিয়তে আছেন। প্রকৃতি এবং যুবতী নারীর সান্নিধ্যে যিনি থাকেন তাঁকে অসুখ অথবা জরা ছোঁয় এমন সাধ্য কি ?

কাল দীপাবলী। বাইরে শুধুই নক্ষত্র জ্যোৎস্না। চাঁদ একটুও নেই। একটি লণ্ঠন এনে সামনে রেখেছিলো কেউ। আমার অনুরোধে ভিতরে নিয়ে গেল। মূর্তী নদীর পাশে, অদূরের গরুমারা অভয়ারণ্যর দিকে চেয়ে তারাদের আলোয় লালজীর কথা শুনতে ভারি ভালো লাগছিল। নানারকম অসংলগ্ন গল্প করছিলেন উনি। কোনো প্রাগৈতিহাসিক মানুষের স্বগতোক্তির মতো। গল্প অবশ্য সবই মজার মজার। ভারি রসিক মানুষটি। প্রতিটি কথাতেই রস। অনেকটা সুন্দরবনের সর্বজ্ঞ গোপেন বাগচী মশায়েরই মতো। ঐ মানুষটির মতো রসিক বৃদ্ধও খুব কম দেখেছি।

লালজী বলছিলেন, পাঁচবছর গোয়ালপাড়া জেলার (আসামের) এম এল এ ছিলেন। বললেন, "জীবনে ঐ একটাই পাপ কাজ কইর‍্যা ফ্যালাইছি।" আর কখনই অমন পাপ করব না।

দেবকান্ত বড়ুয়া একদিন ডেকে বললেন, রাজা আপনি মন্ত্রী হন।

আমি বললাম, রাজা বলেই যখন ডাকলেন তখন মন্ত্রী হতে বলেন কেন ?

পশ্চিমবঙ্গর তিনজন এম· এল· এ· একদিন এসে আমাকে বললেন যে, হাতে মাত্র পনেরো মিনিট সময় আছে। আমাদের হাতি সম্বন্ধে কিছু বলুন। বাগডোগরাতে প্লেনে নেমে বন্যার অবস্থা দেখতে এসেছিলেন। ভাবলাম কি বলি ? পনেরো মিনিটের মধ্যে হাতিকে আর জীবনের সব অভিজ্ঞতাকে আঁটাই কেমন করে ?

গল্প শুনছিলাম যে, সীলেট থেকে আসা এক ভদ্রলোক হাতি দেখে বলেছিলেন 'তিতা তি তাতি ?' মানে, এটা কি হাতি ? সামনেও ল্যাজ পেছনেও ল্যাজ তা খায় কোথা দিয়ে ?

সীলেটের মানুষের উপর রাগ আছে এমন কোনো দুষ্টু লোকের বানানো গল্প নিশ্চয় । তা ঐ গল্পই শুনিয়ে দিলাম এম· এল· এ--দের । কী মনে করলেন কে জানে ? পনেরো মিনিটে 'তিতা তি তাতি' ছাড়া আর কীই-ই বা বলি ?

ওঁদের বললাম, বন্যায় দেশের লোক মারা গেলো । না খেয়ে আছে সকলে । তা আপনারা প্লেনে চড়ে বেড়িয়ে বেড়ান কেমন ? সরকারি টাকায় ? হাতি ধরে আমি এ বছর যা রোজগার করেছি তার সবই চলে গেল গ্রামের লোকদের চাল আর ফ্যান দিয়ে । আর আপনাদের লজ্জা নেই ?

আমাদের সময় খুবই দামী ।

এম· এল· এ--রা বললেন ।

আমি ভাবলাম, বলি যে, যারা ভোট দিয়ে আপনাদের এম· এল· এ· বানালো তাদের জীবনের দামই শুধু সস্তা ?

কিন্তু আমার প্রশ্নর কোনো উত্তর না দিয়ে 'তিতা কি তাতি' শুনে এম· এল· এ--রা প্লেন ধরতে চলে গেলেন ।

একটু পরে, গেলাসে একটু চুমুক দিয়ে বললেন, এইখানেই এক পোষা হাতি তার মাহুতকে মারলো সেদিন । বুঝলেন গুহসাহেব । মাহুত রিটায়ার করেছিলো । তারপরও কিছুদিন রয়ে গেলো । হাটে একদিন সকলকে বলেছে, বড় মায়া পড়ে গেছে হাতির ওপর । আমি ও ছাড়া বাঁচব না, ও-ও বাঁচবে না আমাকে ছাড়া । ঠিক তার পরের দিনেই শুঁড় দিয়ে হাতি এক ঠেলা মারলো তাকে । মাহুত হতভম্ব হয়ে, চটে উঠে হাতির দাঁত ধরে বললো, "কী । তুই আমাকে ধাক্কালি ?"

হাতি তার উত্তরে মাহুতকে আরেক ঠেলা দিয়ে ফেলে দিয়ে দাঁত দিয়ে তাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিলো ।

কোনো রাগ ছিলো কি মাহুতের উপর ? হাতির তো খুব বুদ্ধি শুনি ।

বিকাশ শুধোলো ।

লালজী বললেন, ওসব গাঁজাখুরি গল্প । হাতির যদি ততই বুদ্ধি থাকতো তবে তো ডি এফ ও--ই (মানে ডিভিশানাল ফরেস্ট অফিসার) হতো ।

আমরা হেসে উঠলাম ওঁর কথাতে ।

ওঁর দু চোখের কোণে, ঘর থেকে আসা লণ্ঠনের আলোয় একটু দ্যুতি ঝিক্‌মিক্ করে উঠলো ।

তারপর উনি বারবারই সেই পুরনো কথা বললেন, আমি যেন ওঁকে নিয়ে কিছু লিখি ।

কিন্তু তেমন করে লিখতে হলে দুজনের তো একসঙ্গে বেশ কিছুদিন থাকা চাই । উনি এমন এমন জায়গাতে থাকেন যে যোগাযোগ করাই মুশকিল হয়ে ওঠে । তাছাড়া আমারও যে অনেক হাতি নিয়ে কারবার । প্রচণ্ড অর্থবান, যশস্বী, প্রমত্ত, উদ্ধত, গর্বিত এবং অসভ্য সব হাতি । তাদের ধরতে হয় না । তবে নিরন্তর খেদিয়ে বেড়াতে হয় । তারা কেউই হাতির চেয়ে একটুও কম শক্তিধর নয় । একটু বেচাল হলেই ম্যাটিতে ফেলে দিয়ে দাঁত দিয়ে ফুঁড়ে দেবে । মাহুত-মারা ঐ হাতিরই মতো অকৃতজ্ঞ তারাও । সে হাতি-মহল ছেড়ে এই হাতি-মহলে আসি তার উপায় কি ?

লালজীকে নিয়ে এবারে সত্যি কিছু লিখব । এ বছরই দীর্ঘ সময় কাটাবো ওঁর সঙ্গে ।

BanglaBook.org

সবসময় সঙ্গে সঙ্গে থাকব। ওঁর ডেরায়, জঙ্গলে, হাতির পিঠে, জংলী হাতির মোকাবিলার সময়ে। তাছাড়া এরকম বিচিত্রবীর্য মানুষ তো বেশি নেইও। লালজী চোদ্দটি ভাষা জানেন। অসমিয়া, বাংলা, রাজবংশী, ইংরিজি, ("ভুলটুল নিয়ে", ওঁর ভাষায়) হিন্দি এবং অন্যান্য ভাষা। যেমন খাসি, রাভা, মেচ, গারো, সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, নেপালি এবং ভুটানী। অন্য দেশ হলে লালজীকে নিয়ে অনেকদিন আগেই ডকুমেন্টারি ছবি হতো। ভিডিও ফিল্ম হতো। প্রামাণ্য সব বই বেরোতো। 'মেডিয়া' তাঁকে লুফে নিতো। এ দেশের সরকারি এবং বেসরকারি মেডিয়াও পুরোপুরি কোটারি-চালিত। বিশেষ বিশেষ মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তারা ব্যবহৃত হয়। কী ভাবে যে ব্যবহৃত হয় তা না জানে সরকার না মেডিয়ার মালিকেরা। আজকে প্রকৃত গুণী মানুষের কোনোই সম্মান নেই এখানে। ধরাপাকড়া আর চামচেগিরির দিন এখন। দেখেশুনে লজ্জা এবং ঘৃণাও হয়। আত্মসম্মান-জ্ঞানহীন নির্গুণরাই প্রচার এবং প্রচার-বাহিত যশের অনেকখানি খামচে ধরে আছে। যশও আজ প্রচারবাহিতই। তবে একটা কথা তাঁরা সকলেই হয়তো ভুলে যান যে যেদিন মেডিয়া তাঁদের ফেলে দেবে, জনগণ হাতিরই মতো ঘৃণায় পায়ে মাড়িয়ে চলে যাবে তাঁদের। নিজের গুণপনা না থাকলে, চিরদিন কোনো আসনেই কেউ থাকতে পারে না। অবশ্য 'চিরদিন' ব্যাপারটাতে সেই সব মেঘনাদ-বধ বান সঞ্চারকারী অদৃশ্য বাঘ-সিংহর বিশ্বাসই নেই। আজকের দিনটাই তো সত্যি। খাও-পিও-পকেট করো। মওজ করো। ভালোত্ব, মান-সম্মান, শুভবোধ, ন্যায়-অন্যায় বোধ তো মূর্খদেরই ব্যাপার!

তবু, লালজীকে নিয়ে অনেক কাজ হবে তা এখনও আশা করব। এবং ওঁর জীবদ্দশাতেই হবে। এবং সেই কাজ করবেন ওঁর বিশেষ বিষয়ে যাঁরা প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ এমন সব মানুষই। আমি একজন "লে-ম্যান"। আমি কী আর পারব ওঁর গভীর জ্ঞানের সবটুকু তুলে আনতে!

হাতিদের দেবী 'সাহানীয়া দেবীর' কথা ওঠালো বিকাশ।

বললেন, শুনেছি কারো কারো কাছে, আপনার দেখা হয়েছে না কি তাঁর সঙ্গে? সত্যি?

আমি বললাম, পাঁচুগোপালবাবুর বইয়েও পড়েছি এ বিষয়ে।

বললাম, কথা তো কয় না। কেবলই হাসে। সুন্দরী, অল্পবয়সী নেপালি যুবতী। সাহানীয়া দেবীকে উনি সচক্ষে দেখেছেন। উনি নিজে একথা বললে অবিশ্বাস করি কি করে? অথচ ব্যাপারটা অবিশ্বাস্যও মনে হয়। বনে জঙ্গলে অনেক কিছু ঘটে যা শহরে বসে বিশ্বাস করা অসম্ভব।

রাজা বনে জঙ্গলে যেখানেই বেশিদিন থেকেছেন সেখানেই স্থানীয় একজন যুবতীকে সঙ্গে রেখেছেন। তাছাড়া তাঁর রানীও আছেন একাধিক। প্রকৃতির সান্নিধ্য মানুষকে যে এক অসাধারণ শান্তি দেয়, নির্জনতাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে শেখায়, ব্যাপ্তি ঘটায় মনের, ধৈর্য দেয়, আনন্দ দেয়, যে-আনন্দ শহুরে কোটিপতির কল্পনারও বাইরে, সেই সবেরই পূর্ণ প্রতিচ্ছবি লালজী। রাজা। 'আরণ্যকের' রাজা "দোবরু পান্নারই" মতো। রাজা প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া (লালজী) আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন কয়েকমাস আগে। অসুস্থ হয়ে গৌহাটিতে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। ওখানেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন।

BanglaBook.org

অন্য বনাঞ্চলে যাওয়ার আগে ওড়িশার চিল্কা হ্রদের পাখির রাজ্যের স্মৃতি একটু রোমন্থন করি।

চিল্কায় আমরা প্রায় প্রতিবছরই যেতাম উনিশশো উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে ষাট-বাষট্টি পর্যন্ত। তখনকার চিল্কাতে ভ্রমণকারীদের ভিড় ছিলো না। একেবারেই অন্যরকম ছিলো চিল্কা। পারিকুতের দ্বীপ। সমুদ্র আর চিল্কার মধ্যবর্তী ছড়পরিয়ার বালুবেলা। যেখানে কৃষ্ণসার হরিণের একটি বড় দল ছিলো। আর ছিলো খরগোশ।

চিল্কার কথায় আসার আগে কলকাতার উপকণ্ঠেই একদিনের পাখি শিকারের কথা বলে নিই। তখন উপকণ্ঠই ছিলো। এখন শহর। তখনও ডাঃ বিধান রায়ের উদ্যোগে কলকাতার দক্ষিণের বাদা এলাকা ডাঙ্গা হয়ে ওঠেনি। আদিগন্ত না হলেও বহুবিস্তৃত বিল ছিলো দক্ষিণে, পঞ্চাশের দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত তো বটেই।

শীতকাল এলেই, প্রতি রবিবারে সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া করে বাবা আমাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়তেন মল্লিকপুরের দিকে। ঢাকুরিয়া না হলেও, তখন যাদবপুর গড়িয়া এসব অঞ্চলের সঙ্গে গ্রামের বিশেষ তফাত ছিলো না। ঢাকুরিয়ার পথের পাশে তো বর্ষার দিনে পুকুর-পাড়ে ডাহুকও নেচে বেড়াত। এখন যেখানে যোধপুর-পার্ক, সেখানে ছিলো "যোধপুর ক্লাব"। গলফ্ খেলা হতো। তার পাশেই এখনকার ওভারব্রিজের গায়েই ছিলো বিস্তীর্ণ ধোবিখানা। ষাটের দশকে ঐ ক্লাব-হাউস ভেঙে ফেলে মাঠের উপরে গড়ে উঠেছিলো বিস্তীর্ণ যোধপুর-পার্কের এলাকা। অবশ্য খুবই আস্তে আস্তে। ক্লাব-হাউস ভাঙার আগে বিয়ে বা অন্য অনুষ্ঠানের জন্যে দিনকতক ভাড়াও দেওয়া হতো সেটি।

সোনারপুরের পথে "মালঞ্চ" ফাঁড়ির ঠিক উলটো দিকে একটি কাঁচা পথ চলে গেছিলো বিল অবধি। সেই পথে ঢুকে বেশ কিছুটা গ্রাম্য-পরিবেশের মধ্যে দিয়ে গিয়ে একেবারে বিলের পাশেই গাড়ি রাখতেন বাবা। জলের বোতল এবং গুলির ব্যাগ ও বন্দুক এবং পয়েন্ট টু টু রাইফেল ইত্যাদি নিয়ে ডোঙাতে উঠতাম আমরা। তারপর বেলা এগারোটা-বারোটা থেকে সূর্যাস্ত অবধি পাখি শিকার করে বিলের জলের রঙ যখন কালো, গভীর হয়ে উঠতো, তখন জোলো-অন্ধকারে, জলজ-আঁশটে গন্ধময় বিভিন্নরঙা মরা-পাখির স্তূপ হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে ডোঙা ছেড়ে গাড়িতে এসে উঠতাম।

পাখি বা অন্য কিছুও মারতে যে আমার ভালো লাগতো এমন নয়। কোনোদিনও লাগেনি। কিন্তু আমার শিকারে মারামারিটা গৌণ ছিলো। মুখ্য ছিলো পরিবেশ, সান্নিধ্য, সঙ্গী-সাথীর বৈচিত্র্য এবং আমার এই মস্ত দেশের বিভিন্ন মানুষদের খুবই কাছ থেকে দেখার সুযোগ। শিকারটা ছুতোই ছিল। নিছকই "বাহানা"। "অ্যালিবাই"।

আমাদের সঙ্গে বাবার বন্ধু-বান্ধবরাও যেতেন কখনও-সখনও। রবিবার বা অন্য ছুটির

দিনে মল্লিকপুরে। সেই সময় নানারকম পরিযায়ী হাঁস আসতো ওখানে। তবে বেশিই "টীল্", "কটন-টীল্", "হুইস্‌লিং টীল্", "কমোন-টীল্", "ম্যালার্ড", "নাকটা", "পোচার্ড", "গার্গনি", "গাড়ওয়াল" ইত্যাদি হাঁস খুব বেশি দেখা যেতো না। রাজহাঁস তো নয়ই : কালো শরীর আর সাদা ঠোঁটের গোলাপি-মাথার "মুরহেন"ও ছিলো অনেক। তাদের বাংলা নাম ছিলো "কাম"। রিপুর নামে পাখির নাম আর শুনেছি বলে মনে পড়ে না। অন্যান্য অঞ্চলে এই পাখিকে অবশ্য "কায়মা"ও বলতে শুনেছি। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলাতে। জাঙ্গীল, মাঝে মাঝে দেখা যেতো। নানারকম বক। ইগ্রেটস্। হেরনও। কর্‌মোরান্টস্, মাছরাঙা নানারকম ; নানারঙা।

এইসব বাদা-বিলের সৌন্দর্যও কিছু কম ছিলো না।

শীতের দুপুরের নিস্তরঙ্গ, শান্ত জলের শায়ীন আয়নাকে দুফালি করে কেটে জলের উপর মাথাটুকু উঁচিয়ে সাপ সাঁতরে যেতো প্রায় সরল রেখায়। দেখার চোখ বিধাতা দিয়েছিলেন তাই সেই সব দৃশ্য দেখেই মুগ্ধ হতাম। অবশ্য বাদায় পাখি শিকারের বিপদও ছিলো নানারকম। যদিও তেমন বড়-সর নয়। "বাদা" নামটির মধ্যেই কেমন যেন এক রহস্যময়, অস্পষ্ট জলজ জগতের ছবি ফুটে উঠতো আমার কিশোর মনে। যে জগতে আলেয়া জ্বলে, অশরীরী নারীরা যেখানে পুরুষদের ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে। অনেক সময় ঝাঁঝি বা কচুরিপানার স্তূপ সামনে রেখে, তার উপরে বন্দুকে কাদা-মাখিয়ে শুইয়ে নিয়ে, সেই স্তূপ ঠেলে ঠেলে পাখির কাছে যেতে হতো লুকিয়ে, যাতে পাখিরা দেখতে না পায়। জল বেশি থাকলে, ঝাঁঝিতে পা-জড়িয়ে ডুবে-যাওয়ার আশঙ্কাও ছিলো। সাঁতার সব জায়গায় কাটাও যেতো না। পাখি মারলে, বুক জলে, খালি-গায়ে দাঁড়িয়ে-থাকা অবস্থাতে সেই পাখি, শিকারির হাত থেকে ছিনিয়েও নিয়ে যেতো কখনও-সখনও দ্রুতগতি, ঘা-ঘিন্‌ঘিন্ বড় জলজ সাপ। একবার আমার কাছ থেকেও নিয়েছিলো। সে কথা মনে করলে এখনও গা ঘিন্‌ঘিন্ করে।

পাখি শিকারও, বাঘ শিকারের চেয়ে কম কিছু নয়। শিকারীমাত্রই তা জানেন। অ-শিকারীরা হয়তো বুঝবেন না একথা। বাঘ-মারা শিকারী আর পাখি-মারা শিকারীদের কৌলিন্যে কিছুমাত্রই তফাত করা হয় না শিকারী মহলে। 'স্মল-গেমস' ও 'বিগ-গেমস'-এর মর্যাদায় কোনো তারতম্য নেই।

আপনারা অনেকেই নিশ্চয়ই "ক্যানো" কাকে বলে জানেন। সিনেমাতে ও ভিডিওতে ক্যানো-রেসিং, রাবার র‍্যাফ্‌ট্-এ চড়ে সাহেব-মেমদের বিপজ্জনক সব নদী ও 'র‍্যাপিড্‌স' পেরুতে দেখেছেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে নিশ্চয়ই। আর ভেবেছেন, পৃথিবীর যাবৎ দুরূহ কর্ম শুধু সাহেব-মেমরাই করে থাকেন। কিন্তু আমি বাজি ফেলেই বলতে পারি, যদি আমাদের বঙ্গীয় "তালের ডোঙাতে" সেইসব বীরপুঙ্গবদের বসিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে পনেরো মিনিটের মধ্যেই তাঁরা 'পকাৎ', নয়তো 'কাপুৎ', নয়তো 'ফিনিতো' হয়ে যাবেনই ! গায়ের রঙ সাদা হলেও বাদাতে তাঁদের আদৌ কোনো জারিজুরি খাটবে না।

পাখি-শিকারের মধ্যে এক ধরনের বিশেষ নিষ্ঠুরতা আছে। অন্তত আমার তাই-ই মনে হতো চিরদিনই। হয়তো সব শিকারের মধ্যেই আছে। বিশেষ করে পাখি যদি না মরে, আহত হতো। "শুট টু কিল" এই-ই হওয়া উচিত সব শিকারীরই উদ্দেশ্য। বড়-ছোট সব শিকারেই। এই, নিয়ম শিকারের সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়া উচিত। তবু সব সময়ই তো তা আর হয় না। হয়নি অন্ততঃ। নিয়ম থাকলেই তার ব্যতিক্রমও থাকে। ঘটেও। তখন খুবই কষ্ট হয়।

BanglaBook.org

বাংলার শীতের দুপুরে বিলে-বাদায় ডোঙাতে বসে নল আর শর আর হোগলের পাশে পাশে, ভিতরে ভিতরে, নিস্তরঙ্গ আলো-ছায়ার খামখেয়ালিপনার নানা-রঙে রঙীন জলের উপরে ভেসে-যাওয়ার মধ্যে বড় অনাবিল আনন্দ ! যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেন। হালকা, নানা জলজ রঙের ছায়ায়-রাঙা জলের নিস্তরঙ্গ চাদর, যেসব রঙকে স্থলভূমি কোনোদিনও ধরার বা ছোঁয়ার সুযোগও পায়নি তার বুকে। কাঁচের চাদরেরই মতো পড়ে-থাকা রহস্যময় নিথর বিলকে চিরে দিয়ে দিয়ে ডোঙা এগিয়ে যেতে থাকে অস্ফুট এক সর্‌সরানি আওয়াজ তুলে। লগির সঙ্গে ডোঙার ঘর্ষণে ঘর্ষণে ঘসস্‌-ঘসস্‌ করে আওয়াজ ওঠে একটা। হাঁসেদের ক্বচিৎ অস্ফুট স্বগতোক্তি, স্বাদু মাছের স্বপ্নে তন্দ্রাতুর মাছরাঙার হঠাৎ-বিরক্ত ঝগড়াটি-গলার আরোহী এবং অবরোহী ধাতব স্বর, বড় মাছের ঘাই মারার গা-ছমছম শব্দ, ঝাঁঝির মধ্যে ছোট মাছের ছট্‌ফটানির আওয়াজ এবং মেছো-চিলের তীক্ষ্ণ আর্তিতে, কাশের তুঁতে রঙের হয়ে যাওয়া, এই সবকিছুই ভারী ভাল লাগতো।

এইসব সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া দুপুরের সমস্ত সময়টুকুতেই এই জলে এবং জলজ পরিবেশে নিবিড় নিস্তব্ধতা। গভীর এবং জলজ নিস্তব্ধতা। দূরে, জলের উপরের বিনা কারণেই খুশি হওয়া মাঝির গলার কাঁপা-কাঁপা গান, এক মাঝির সঙ্গে অন্য মাঝির আকারে ইঙ্গিতে একটু-আধটু ইচ্ছে অথবা কথা বলাবলি। আলোড়ন বলতে এইটুকুই। বাকি সময়টুকু ডোঙায়-বসা-নির্বাক শিকারীর সহজ সুখের আড়ালে যে গভীর একলা, দুঃখী মানুষটি বাস করে, প্রতিটি কিশোর, যুবক অথবা বৃদ্ধরও বুকে ; তাকে আগল-খুলে ভাসিয়েই দেওয়া শুধু। দশাশ্বমেধ ঘাটে মেয়েদের প্রদীপ ভাসানোরই মতো। বাদার একরকমের সৌন্দর্য। আর নদীর অন্যরকম। নারীরই মতো, জলেরও কত্ত রকম যে হয়।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় ঐ মল্লিকপুরের বাদায় ডিসেম্বরের একটি দিনের কথা মনে থাকবে অনেকদিন। সেদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ দেরি করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাবা, বাবার এক বন্ধু কাপুর সাহেব এবং আমি প্রায় পৌনে তিনটে নাগাদ ঐ অকুস্থলে গিয়ে পৌঁছলাম।

কাপুর সাহেব জাঁদরেল মানুষ। মস্ত ব্যবসায়ী। রসিক নানা রসের।

সেদিন অকুস্থলে পৌঁছেই বোঝা গেলো যে অত দেরিতে যাওয়াতে অসুবিধে অনেকই। ঘাটে ডোঙা মাত্র একটিই ছিলো। তাও খুবই ছোট। যে তালগাছটি কেটে ওটি বানানো, তার স্বাস্থ্য আদৌ ভালো ছিলো না। মাঝিও অতীব ছোট্টখাট্টো। ছিপছিপে। তখনকার আমার যা বয়স তার চেয়ে বয়সে সামান্যই বড়। প্রতি সপ্তাহেই রবিবারে যে যাবেন একথা তাদের আগেই পোস্ট-কার্ড লিখে জানিয়ে দিতেন বাবা। কিন্তু সেদিন না জানিয়ে এবং অবেলাতে যাওয়াতেই এই বিপত্তি। এদিকে "কার্গোও", অর্থাৎ আমার অসাধারণ বাবা এবং তাঁর বন্ধুর ওজন তখন আড়াই মন মাল্টিপ্লায়েড বাই টু ইজ ইকুয়ালটু পাঁচ মণ। আমিও তো কুলাঙ্গার হতে পারি না। লাইক-ফাদার লাইক-সান্‌ বলে কতা। পনেরো বছর বয়সে তখন আমার ওজনও তিন পনেরোং পঁয়তাল্লিশ সের।

কাঁচা বয়সের এঁচড়ে-পাকা মুখের মাঝি লুঙিটাকে হাঁটু অবধি তুলে কোমরের কষি বেঁধে, একটা বিড়ি ধরিয়ে বিরক্তির গলায় বাবার দিকে ট্যানজেন্ট চোখে চেয়ে রহস্য করে বললো, আজ শিকারি কে ? মানে কোন জনা ?

মুখ-চাওয়া-চাওয়ি-করা আমাদের কাছ থেকে কোনো সদুত্তর না পেয়ে বাবাকে বললো সে, আসুন বাবু। একা আপনি।

বাবাকে ওরা সকলেই চেনে। কিন্তু আগেই বলেছি যে, বাবার কম্‌রেডিয়ারে-ভরা

BanglaBook.org

সমুদ্র-হৃদয় এইসব ব্যাপারে কারো মনে একটু ব্যথা দিতে রাজি হতো না।

বন্ধু কাপুর সাহেব, বাবাকে এবং আমাকেও বিভিন্ন জায়গায় অনেকই শিকার করিয়েছেন। মায় বাঘ পর্যন্ত মারিয়েছেন। খেজুর রস, পাটালি-গুড়, ডায়মণ্ডহারবার থেকে আনানো ছটফটে ইলিশ, ন-ইঞ্চি-কই, সল্লি-হাঁস, কাউঠা এবং কুমীরও। এহেন বন্ধুকে ফেলে বাবা একা যাবেন এমন নিমকহারামী আমাদের বংশের রক্তে নেই। তাছাড়া তাঁকে সঙ্গে না নিয়ে গেলে তিনি মনেই বা কি করবেন ? এদিকে "লাইক-ফাদার লাইক-সান্" তাঁর প্রিনস অফ ওয়েলস্‌ও জেটিতে দাঁড়িয়ে "ব্রিটানিকা'য় ওঠার অপেক্ষায়। শিকার-পাগল কিশোর পুত্রকে কি একা ফেলে যাওয়া যায় ?

বাবা একমুহূর্ত ভেবে বললেন, সব্বাই যাবে।

মাঝি কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করলো না।

তারপরই হেসে ফেললো।

ফাজিল।

যাত্রীদের শরীরের বহর এবং তার ডোঙার ক্ষুদ্রতার কথা ভেবেই অবশ্য হেসেছিলো সে। তার ব্যালট-পেপার সে কোন বাক্সে ফেলবে তা যখন বোঝাই গেলো না তখন প্র্যাগম্যাটিক্ কাপুর সাহেব পকেট থেকে একটি একশ টাকার নোট বের করলেন। আজকের তো নয়। পঞ্চাশ সনের একশো টাকার নোটের আলাদা ইমপ্যাক্ট ছিলো। অনেকটা তিন হাত দূর থেকে, টুয়েলভ বোর শট্‌গান দিয়ে মারা এল· জি-র ইমপ্যাক্টেরই মতো। ঐ ইমপ্যাক্টে বাঘ-ভাল্লুকই উল্টে যেতো, তা সেই মাঝি তো এঁচড়ে-পাকা সিংড়ে-মার্কা তালপাতার সেপাই।

টাকার ছোঁয়া লাগতেই সেই কালো-ছোঁড়া নেতিয়ে গেলো একেবারে জল-ভেজা পানকৌড়ির মতো।

যুদ্ধে তার হার হতেই আমরা তিনজন অসীম সাহস এবং প্রচণ্ড কষ্ট করে ডোঙা টল্‌মলিয়ে তাতে আসীন তো হলাম। কিন্তু আমাদের ওজনে ডোঙার কান-বরাবর জল উঠলো। এর উপরে আবার মাঝি উঠবে। আমরা ওঠার সময়ে সে নেমে দাঁড়িয়ে অবাধ্য ডোঙাকে কান ধরে শাসন করেছিলো।

তীরে দাঁড়িয়ে-থাকা ভ্যাগাবন্ড এবং অত্যন্ত বাজে-টাইপের, অসভ্য, আন-কালচার্ড কয়েকজন দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন লাল লুঙি পরা লোক ফিচিক্ করে হেসে বলল, পাশে-দাঁড়ানো সাঁঙাতকে বললো, "ও রসুল ভাই ! চলো গিয়ে জাল ঠিক কইরে রাকি।"

রসুল ভাই যে, সে লোকটা প্রথম লোকটার চেয়েও আরও পাজী।

সে উত্তরে বলল, এইসব লাশ কি জালে উইঠবেন ? মোদের জাল তো মাছই ধইরবার জইন্যে গো। জলহস্তীর জইন্যে তো লয় মুনাব্বর।

লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গেলো আমার।

কাপুর সাহেব বললেন, কিছু মনে কোরো না লাল। যারাই খেতে না পায়, তারাই স্বাস্থ্যবান লোকদের অমন খোঁটা দিয়ে কথা বলে চিরদিনই। বিলেত-আমেরিকায় গেলে ওরা কি ওদের মাপের গেঞ্জী-আন্ডারওয়্যারও পাবে কোনো দোকানে ? বলো ? ইগ্‌নোর করো ওদের। ইগ্‌নোর করো।

মাঝি, "আল্লা"র নাম করে তো এক ধাক্কা মারলো লগির মাথা দিয়ে মাটিতে। ডোঙা অমনি গতিমান হলো।

বাবা বললেন, গেঞ্জী-আন্ডারওয়্যার না পাবার কি ? আট বছরের ছেলের সাইজ চাইলেই

BanglaBook.org

পাবে।

কাপুর সাহেব বাবার বুদ্ধি দেখে এবারে "থ" মেরে গেলেন।

আর কথা বাড়লো না।

কাপুর সাহেবকে এক মফস্বল শহরে নদীর পারের অফিসার্স-ক্লাবের হার্ড-কোর্টে আমি টেনিস খেলা শিখিয়েছিলাম। তখন এ· ডি· এম· ছিলেন অতিক্রম মজুমদার মশায়। লম্বা-চওড়া সুপুরুষ। তিনিও টেনিস খেলতেন। কাপুর সাহেব আর আমার মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিলো খুবই। খেলা-ধুলোর বন্ধুত্বে যেমন হয় আর কী। টলমলয়মান ডোঙাতে বসে ভাবছিলাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর পরীক্ষা হবে আজ।

বাবা বললেন, একটু নড়া-চড়া করলেই কিন্তু ডোঙা উল্টে যাবে। খুব সাবধান।

মনে মনে বললাম, সে আর বলতে। ভেরী ভেরী কেয়ারফুল হয়ে তো বেঁকেই বসে আছি।

রাতের বেলা যেমন সাপের বা ভূতের নাম মুখে আনতে নেই, আমার পিতৃদেবেরও জানা উচিত ছিলো যে, ডোঙা যে-কোনো মুহূর্তেই উল্টোতে পারে বলেই অমন আ-কথা কু-কথা বলা অনুচিত।

মনটাকে প্রাণপণে অন্যদিকে করার চেষ্টা করছিলাম। স্বেচ্ছায় মনোযোগী হওয়া সোজা। কিন্তু অমনোযোগী হওয়া ভারী কঠিন। এদিকে এসেছি তো পাখি-শিকারেই। একটুও নড়াচড়া না করে গোলাগুলিও চালানো হবে যে কি করে তাও ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

কাপুর সাহেব বললেন, ডোঙার বর্ণনা দিয়ে, দুঁদে ইকনমিস্ট-এর মতো ; বড্ডই আন্‌স্টেবল ইকুইলিব্রায়াম্। কি বলেন ? গুহ সাহেব ?

বাবা সংক্ষেপে বললেন, হুঁ। কিন্তু আর কোনো কথা নয়। সামনেই দূরে চেয়ে দ্যাখো।

মাঝি কোমর বেঁকিয়ে, বাঁ হাতের পাতা দিয়ে ডান চোখ আড়াল করে ভালো করে নিরীক্ষণ করে শরীরটাকে দ'এর মতো করে বললো, আই বাপ্। আজ পাকি এক্কেরে টিপ্পি মেইরে পইড়েচে গো ! আজ সকাল থে চোটও হয়নি মোট্টে। আজ এত্তো পাকি পইড়বে তিন-গাছিতে যে, তুলে নে-আনাই ঝামেলি হবে যে। খাদ্য-খাদকের ঝামেলি আর রইলোনি আজ। হিঃ হিঃ।

"তিন গাছি" মানে তিনটি বন্দুক। আর "খাদ্য-খাদক" মানে খাবার জিনিস। যেখানে যেমন ভাষা। ঐ আর কী !

সত্যিই দেখা গেলো সেদিন হাঁসেদেরও নিজেদের প্রাণের মায়া নিয়ে যেন মাথা-ব্যথা নেই কোনোই। একদিক দিয়ে ভালোই হলো। যেদিন আমাদের প্রাণের প্রচণ্ড মায়া সেদিন ওদের কম। শিকার হয়তো হবে আজ।

মাঝি এবারে একেবারে সোজা ঐদিকেই চলেছে। এক্কেবারে "নট্ নড়ন্ চড়ন্ নট্ কিচ্ছু" হয়ে বসে আছি আমরা। চোখে হাঁসের স্বপ্ন, নাকে হাঁসের রোস্টের গন্ধ। হাঁসেদের চেহারা ছবিও এবার বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেউ গা ঝাড়ছে। কেউ ঠোঁট দিয়ে ডানা পরিষ্কার করছে। কেউ ডুব মারছে আহ্লাদীর মতো। দুটি পা, লম্বা লেজ আর গোল-গোল ছাপু শূন্যে তুলে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করেই বসে আছি। তাতে ওজন বোধহয় আরোই বেড়ে গেছে প্রত্যেকেরই শরীরের। আমাদের "দম"-এর ওজনই কি কম ? "দম" বেরিয়ে গেলেই শুধুমাত্র "দম"-এর দাম সম্যক বোঝা যায়।

BanglaBook.org

নিজেদের চোখকে বিশ্বাসই হচ্ছে না। একি অলীক ? না মায়া ? এতগুলো হাঁসের হঠাৎ একই সঙ্গে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হলো কেন ? কীরে বাবা। "নট্-নড়ন্-চড়ন্-নট্-কিচ্ছু" হয়ে বসে আছেন তাঁরাও। একী খেলারে বাবা !

ডোঙা ক্রমশ এগোচ্ছেই। একটু পরেই পুরো ঝাঁকটাই বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যে এসে যাবে।

আরও একটু এগোবার পর ফিসফিসে গলায় বাবা বললেন, গুলি কিন্তু করতে হবে একই সঙ্গে।

একটু থেমেই আবার ফিস্‌ফিস্ করে স্ট্র্যাটেজিস্ট রোমেল্-এর মতোই বললেন, একটুও আগে পরে নয় কিন্তু। ওয়ান-টু-থ্রী বলব। আমি বললেই···। লাল তুই বরং ফ্লাইং মারিস। পটাপট। পয়েন্ট টু-টু দিয়ে।

বলতে বলতেই, বাবা বন্দুক সামনে ওঠালেন।

বাবা বসেছেন ডোঙার একেবারেই সামনে। আর একেবারে পেছনে মাঝি। মাঝির সামনে আমি। আমার সামনে কাপুর সাহেব।

বাবা সামনেই বন্দুক উঠোলেন কিন্তু আমরাও তাই করলে তো যে যার সামনের মানুষের হার্ট-ল্যাংসই ছেদ্‌ড়ে-ভেদড়ে দেব গুলিতে। আমার কনিষ্ঠতম ভাই বাবুয়ার দশা যেমন হয়েছিল দশ বছর আগে। ধাপার মাঠের ভেড়িতে পাখি শিকারে গিয়ে তার এক উদ্দীপ্ত বন্ধু ডোঙাতে তার ঠিক পেছনেই বসে উড়ো পাখি ভেবে ভায়ার পিঠেই দেগে দিয়েছিলো আড়াই হাত দূর থেকে গদ্দাম্ করে। ভাগ্য ভালো যে, "ইলী-কীনক" বা "রেমিংটন এক্সপ্রেসের" গুলি ছিলো না। ছিলো, ইন্ডিয়ান অর্ডন্যান্স কোম্পানীর চার নম্বর। যে গুলি খেয়েও নম্বরী-হাঁসেরা অবলীলায় হজম করে ডানা ঝেড়ে "ক্যাঁক্ ক্যাঁক্" করে হেসে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীকে আশীর্বাদ করে উড়ে যায়।

ভায়ার একটা লাং ডাঃ অজিত বাসুর কল্যাণে এখনও হাপর চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যটা হাপিত্যেশ করে থেকেও হাপিস হয়ে গেছে। সবশুদ্ধ মাস তিনেক হাসপাতালে থাকতে হয়েছিলো ভায়াকে। ডাঃ বাসু না থাকলে ওর প্রাণও থাকতো না।

ওয়ান-টু-থ্রী !

স্বপ্নাদেশের মতো নির্ঘোষ হলো।

আমি আর কাপুর সাহেব অঘটন এড়ানোর জন্যে আমাদের শরীর সামান্য বাঁদিকে বেঁকিয়েই ট্রিগার টানতে গেলাম। কিন্তু আড়াই মণ প্লাস পঁয়তাল্লিশ সের "মাস্‌স্" যদি কোনো চেরা-মুহূর্তে হঠাৎই নড়ে ওঠে এটুকু ডোঙার উপরে একটুও, তার এফেক্ট যে সঠিক কী হয় তা শুধুমাত্র ফীজিসিস্টরাই বলতে পারেন। কিন্তু "লে ম্যান" আমরা, সভয়ে দেখলাম যে ডোঙা একপ্রান্তে উৎক্ষিপ্ত হয়েই সংক্ষিপ্ত একটি "পকাৎ" আওয়াজ করেই পলকের মধ্যে নিমজ্জিত হলো জল ছল্‌কে। জলের নিচ থেকেও একটি আওয়াজ হলো "পকাৎ" কিছুমাত্র বোঝার আগেই। তারপর বুড়বুড়ি। আমরা সকলেই তখন আন্ডার-ওয়াটার ফোটোগ্রাফীর সাবজেক্ট হয়ে গেছি।

পরক্ষণেই কাপুর সাহেব বললেন, "ফিনিতো !" লাল, "ফিনিতো।" জলের নিচ থেকে সেই "ফিনিতো" শব্দ বিস্তর ফেনা তুলে এসে পৌঁছলো আমার কাছে।

বাবাও কী যেন একটা বললেন। বুঝতে পারলাম না।

আমি তখনও সাঁতার যাকে বলে তা ঠিক জানি না। যা জানি, তাকে সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, "গোয়ালন্দী স্টীমারের হরকৎ"। মানে,

BanglaBook.org

যে-পরিমাণ জল সরাই এবং ছিট্‌কোই চারপাশে এবং যে প্রকার হুস্‌-হাস, হাঁস-ফাঁস শব্দ করি সে তুলনায় জলের মধ্যে আদৌ সামনে এগোই না আর কী !

নিমজ্জমান অবস্থায় নিজের ভেজা বুদ্ধির টুকরো-টাকরা ঠিক-ঠাক কুড়িয়ে তুলেই বুঝলাম যে, ভাগ্যে অবধারিত মৃত্যুলিপি থাকলেও দিব্যি বেঁচে আছি তখনও। সেরখানেক পচা জল খেয়ে জলের নিচে বার তিনেক ঘুরপাক খাবার পর জলের নিচের দলদলি আর ঝাঁঝিতে পা ঠেকলো। পা দুটি তার উপরে ঠেকিয়ে কয়েকবার চেষ্টা করার পরই দাঁড়িয়ে উঠলাম। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই দেখলাম, জল আমার দুকান ভরে আছে। অথবা ধরে আছে। এবং ঐ জলীয় পৃথিবীতে আমিই একা। আর কেউই নেই আশে-পাশে। আমার অশেষ স্নেহপ্রবণ বাবা, তস্য-বন্ধু কাপুর সাহেব, "টিপ্পি-মেরে পইড্যে থাকা" পাখির স্বপ্নে বিভোর ছেলেমানুষ বেচারা মাঝি, কেউই আর ইহলোকে নেই।

স্তব্ধ হয়ে, হিমেল জলে দাঁড়িয়ে সিচুয়েশানটা সাইজ-আপ করার চেষ্টা করছি ঠিক এমন সময় তিনভাগ জলের পৃথিবীতে একভাগ স্থলের প্রতিভূ হয়ে আমার পিতৃদেব গোন্দ আদিবাসীদের মীথোলজির সিঙ্গার দ্বীপের মতো, আমার পাশে মাথা জাগিয়ে উঠলেন।

আজকালকার দিন হলে যেকোন চরেরই মতো বাবারও মালিকানা নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বিরোধ বেধে যেতো।

দেখলাম, বাবার কাঁধ অবধি জল। যদিও বাবা আমার চেয়েও অনেক লম্বা। উঠেই, বাবা বললেন, কাপুর কোথায় ?

চুপ করেই রইলাম, আমি কী করে জানব। যখন "হিজ্‌-হিজ্‌-হুজ্‌-হুজ" লাইফের সওয়াল তখন অন্যে কোথায় তা আমি ছাই জানতে যাবোই বা কেন ? বাবা যে বেঁচেছেন এই-ই ঢের !

ডিসেম্বর মাস। খুব দেরি করেই আসা হয়েছিলো সেদিন। এখন বিকেল চারটে বাজে। হু হু করে ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া বইছে। তাই হি হি করতে লাগলাম আপাদমস্তক ভিজে ন্যাতা হয়ে কান-জলে দাঁড়িয়ে।

এমন সময় মাঝিও উঠলো জল ফুঁড়ে সোজা। ডুবো-জাহাজ থেকে ছোঁড়া ব্যালিস্টিক মিসাইল-এরই মতো। উঠেই মাথাটা বার কয়েক ঝাড়ল। জলভেজা কালো কুচকুচে পানকৌড়ির মতো। জল ছিট্‌কে লাগলো আমাদের চোখেমুখে।

সে উত্তেজিত হয়ে জল খাওয়া নাকে নাকিসুরে বললো, "দিইচি শালাকে সাবড়ে।"

কাকে ? কাকে ?

বাবা আর্তনাদ করে উঠলেন।

দেবো না তো কী ! আমাকে জলের তলায় এমনই জাপটে ধইরেছিল যে, দিইচি এক নাতির মতো নাতি কষিয়ে শালার নাকে। জলহস্তী একনে জলের তলায় হাঁচোড়-পাঁচোড় কইরতিচে।

বলো কি হে তুমি তো খুবই খারাপ লোক।

বাবা দুঃখিত গলায় বললেন।

তোমাকে একশ টাকা বকশিস দিলেন ঐ সাহেব আর তাকেই···

হুঃ। মরেই তো গেস্‌লাম বাবু জল খেয়ে। তালে সে টাকা দিয়ে হতোটা কী। টাকাও তো গলেই গেলো জলে। নিকুচি করেচি শালার জলহস্তীর।

এমন সময় জলের নিচটা রীতিমতো তোলপাড় করে স্কটল্যাণ্ডের লক-লেমন্ড-এর মনস্টারের মতো কী যেন ধীরে ধীরে অন্য একটি দ্বীপের মতো ঠেলে উঠতে লাগলো

BanglaBook.org

আমাদেরই পাশে।

যা ভেবেছিলাম, তাইই। কাপুর সাহেব। নাক মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

জলের ওপরে উঠেই তিনিও নাকি নাকি গলায় বললেন, 'দিস্ ইজ্ মাই লাস্ট ডাঁক শুটিং।

প্রাণ তো বাঁচলো যাহোক সকলেরই। এখন আমাদের যান গেলো কোথায় ? জলযান ? ডোঙা ছাড়া তো আর পারে যাওয়া যাবে না। সবদিকেই পার প্রায় আধ মাইল টাক দূরে। যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা হি-হি করছিলাম শীতে সেখান থেকে আধমাইল সাঁতরানো সোজা কথা নয়। তার উপর বন্দুক রাইফেল হাতে সাঁতার তো কাটাও যাবে না।

বাবা আর মাঝি ডাইভ মেরে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই গন্ধমাদনের মতো ঘাড়ে করে ডোঙাকে তো ওঠালেন। সে গাত্রোত্থান করা মাত্র তিনজনেই তাকে একসঙ্গে পাশ বালিশের মতো সোহাগভরে জাপটে ধরে তার পেটের জল ছেঁচতে লাগলাম। জল ছ্যাঁচা হয়ে যাবার পরই আসল সমস্যাটা দেখা দিল। সে সমস্যার সমাধান হবার কোনো আশু সম্ভাবনাই আর দেখা গেলো না।

ডোঙা ভাসছিলো আমাদের নাকের লেভেল্-এ। এখন তাতে নাকজল থেকে ওঠা যায় কি করে ? অলিম্পিক গেম্স-এ এই ইভেন্টটা থাকলে কত মাস্তানই যে "কেলো" করে, তা বোঝা যেতো।

বাবা প্রথমে চেষ্টা করতে যেতেই ডোঙাটা মুহূর্তের মধ্যে জলে ভরে গিয়ে আবারও "পকাৎ" করে ডুবে গেলো। তখন তিনজনই তিনজনকে নিজের নিজের ভাষায় শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মতো নিঃশব্দে গালমন্দ করতে করতে ওঁরা তিনজন আবার অদৃশ্য হলেন জলের তলায়।

আমি একলা দাঁড়িয়ে রইলাম ক্যাসবিয়াংকার মতো।

আবারও ডোঙাকে উঠোনো হলো অনেকক্ষণের চেষ্টায়। জলও ছ্যাঁচা হলো নতুন করে। জল সব তোলা হলে মাঝিকে বলা হলো, প্রথমে উঠতে। সে-ই সবচেয়ে রোগা-পাতলা। এবং তারই ডোঙা। কথায়ই বলে, 'যিস্কা বাঁদরী ওহি নাচায়'।

সুতরাং···।

সে তো কোনোক্রমে বুক দিয়ে চেপে, পা দিয়ে ঠেসে, হাত দিয়ে খাম্চে উঠে গেল যা তার নিজস্ব, তারই উপর। সে ওঠার পর বাবা আর নির্বিকার কাপুর সাহেব আমার নিতম্ব ধরে আমাকে ঠেলে, হেঁচড়ে, টেনে, লালগোলা লাইনের বেলডাঙা স্টেশনে পাইকাররা যেমন করে কুমড়োর বস্তা উঠোয় ভেন্ডারস্ কম্পার্টমেন্টে প্রায় তেমনি করেই তুলে ডোঙার উপরে ধপ্পাস্ করে ফেললেন। পঁয়তাল্লিশ সের বস্তা। ডোঙাটি এবারে "পচাক্" আওয়াজ করে গুচ্ছের জল ছিটিয়ে আবারও ডুবে যাবার ভয় দেখিয়েও শেষে থিতু হলো। তখন আমি আর মাঝি বসলাম ডোঙার দু'মাথায়। বসে, ট্রাপিজের খেলারই মতো ব্যালান্স করতে লাগলাম ডোঙাকে। তারপর বাবা আর কাপুর সাহেব নিমজ্জিত অবস্থায় থেকেই ডোঙার দুদিকে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আর্মির টেক্নোলজিতে যাকে বলে, "সাইমাল্টেনাস্ স্পিনসার অ্যাসাল্ট" তেমনি করে চেষ্টা করতে লাগলেন বারংবার। ওঁদের তখন দেখলে, মিস্টার রবার্ট ব্রুস এবং সেই বিখ্যাত মাকড়সাটিও বিলক্ষণ লজ্জা পেতেন।

আমি আর মাঝি আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম ডোঙা যাতে আবারও না ডুবে যায় তা দেখতে। মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগাতার চেষ্টা করতে করতে তারপর অবশেষে অসাধ্য সাধন হলো। ততক্ষণে জলে থেকে আমাদের হাতে-পায়েও হাজা ধরে গেছে। এদিকে সন্ধেও হয়

BanglaBook.org

হয়। বাবা বললেন, মাঝি লগি ঠেলুক আর সকলে মিলে হাত দিয়ে জল কাটাই আমরা। নইলে নিওমোনিয়া ধরে নেবে নির্ঘাৎ।

আর নিওমোনিয়া! তখন কে কাকে ধরে তার ঠিক নেই। তবে মন বললো, বিপদ বোধহয় কাটলো এ-যাত্রা। স্থলচরেরা স্থলের দিকে চলেছি। তীরও দেখা যাচ্ছে। যারা জাল ফেলে আমাদের লাশ তুলবে বলেছিলো তাদের দেখা যাচ্ছে না। কারণ, আমরা "নিয়ারেস্ট শোরের" দিকেই চলেছি বাবার সিদ্ধান্ত মতো, নিওমোনিয়ারই ভয়ে; যে তীর থেকে ভবতরী রওয়ানা হয়েছিলো সে তীরের দিকে নয়। ডাঙায় একবার উঠতে পারলে সেখান থেকে দৌড়তে দৌড়তে গা-গরম করে গাড়ি যেখানে রাখা আছে সেখানে গিয়ে পৌঁছবো।

এখন আলো আর নেই বললেই চলে। চারদিকই আবছা-আবছা হয়ে গেছে। এমন সময় হঠাৎই কাপুর সাহেব হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতেই উল্লসিত হয়ে বললেন,"দেখুন, দেখুন। গুহ সাহেব। সামনে দেখুন। ওয়াইল্ড ডাকস্।"

এখনও শখ মেটেনি!

দাঁতে দাঁত টিপে হিঃ হিঃ রিঃ রিঃ করতে করতে মনে মনেই আমি বললাম।

বাবাকেও বলিহারি যাই! বাপ-ব্যাটায় একসঙ্গে ডুবে আমার ভালোমানুষ মায়ের এমন সর্বনাশ করছিলাম একটু হলেই। প্রাণে বেঁচে উঠে তবুও কি শিক্ষা হলো না?

বাবা উত্তেজিত হয়ে, একটু আগের সবকথা বেমালুম ভুলে গিয়ে বললেন, কোথায়? কোথায়? কাপুর কোথায়?

ঐ দেখুন না। সামনেই।

বাবা তাকালেন। আমিও তাকালাম।

অন্ধকার হয়ে-আসা জলের উপরে ভালো করে নিরীক্ষণ করে বাবা বলেন, "দূর। দূর। এ তো পোষা হাঁস। কী যে বলো তুমি! তোমার মাথাটাই..."

কাপুর সাহেব বললেন, "জলে ডুবে আপনারই চোখ আর ঘিলু ডাইলিউটেড হয়ে গেছে। পঁচা জল ঢুকছে ব্রেনে নিশ্চয়ই কানের ফুটো দিয়ে।

বলতে বলতেই, তিনি মাঝিকে কনফিডেন্টলি বললেন, ডোঙার মুখটা একটু ডানদিকে ঘোরাও তো ভাই। যাতে বাঁয়ে শট নিতে পারি।"

আমি ভাবলাম, ভাইই বটে। নাক দিয়ে এখনও পদাঘাতজনিত রক্ত গড়াচ্ছে।

মাঝিও বড় নির্লজ্জ। দেখি, খুশি খুশি মুখে দুহাতে লগি চেপে ডোঙার মুখ ঘোরালো। মুখটা ঘুরিয়েই হতবাক্ হয়ে সে আমাদের সাবধান করার গলায় কী যেন বলতে গেলো, বাবু-উ....বলে। কিন্তু মার্‌নেওয়ালারা কেউই শুনলেন না। আমি একা রাখ্‌নেওয়ালা কি আর করতে পারি?

আমি ভাবলাম এগুলোও মায়ার হাঁস। প্রায় হাত ছোঁয়ালেই গায়ে হাত দেওয়া যায়। এত কাছে, এত কথা-বলাবলি করা সত্ত্বেও তারা উড়ছে না? একেবারেই নিরুদ্বেগ? তাছাড়া সাইজেও বিরাট বড়। কী ব্যাপার? আবারও কোনো 'কেলো' ঘটতে যাচ্ছে নির্ঘাৎ।

বাবা!

বললাম, আমি।

কিন্তু আমার পিতৃনাম স্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই বাবা এবং কাপুর সাহেবের বন্দুকের ডান-ব্যারেল একই সঙ্গে গর্জে উঠলো।

BanglaBook.org

ইলী-কীনক্ কার্ট্রিজের বাহাদুরি দেখলাম। অতক্ষণ জলে ভেজার পরও ঠিকই ফায়ার হলো। গুলির শব্দর সঙ্গে সঙ্গেই চারটে হাঁস পেট উল্টে ভেসে উঠলো। অত কাছের মার!

বাবা এবং কাপুর সাহেবের উল্লাসের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক মানুষের গলা শোনা গেলো একইসঙ্গে। গ্রাম তাহলে লাগোয়াই।

একটি নারীকণ্ঠ বললো, ও হাঁদার বাপ! আমাদের হাঁসা-হাঁসীদের উপর গুলি পুটোলো কারা গা?

এবং ঐ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সমবেত ক্রুদ্ধ চিৎকার কানে এলো। "ও কেতো। ও পলান! মোতি রে! ধর্ তো শালাদের। ধর্ ধর্। মেরে চট্‌কে দে।"

আমাদের তরী, তীরে এসেও তীরে ভিড়লো না।

মাঝি লোকাল লোক। তার উপর হাইলি ইন্‌টেলিজেন্ট। মার খেলে, সে-ই খাবে সবচেয়ে বেশি। তড়িৎ গতিতে সে ডোঙার মুখ ঘুরোলো। আবার জলচর হলাম।

আমরা তিনজনেই 'ফ্রিজ' করে গেলাম ডোঙার মধ্যে। যাতে তার গতি একটুও ব্যাহত না হয় সে জন্যে এবং ভয়ে আর শীতেও বটে! ডোঙা, অন্ধকার ডিঙিয়ে ছুটতে লাগলো মুখ ঘুরিয়ে প্রায় অন্ধকারের মধ্যেই, যেদিকে গাড়ি রাখা ছিলো সেই দিকে।

BanglaBook.org

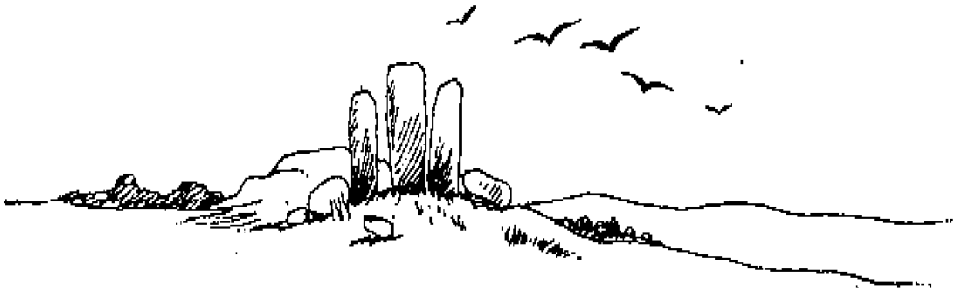

ওড়িশার চিলিকা হ্রদ দেখেননি এমন ভ্রমণার্থী এখন বোধহয় আজ বাংলাতে বেশি নেই। কিন্তু আমরা প্রায় প্রতিবছরই যে সময়ে চিলিকাতে যেতাম তখন শিকারি ছাড়া বিশেষ কেউই যেতেন না। কালুপাড়াঘাট বা বালুগাঁও স্টেশনে নামতে হতো। তারপর হ্রদ অবধি হেঁটে গিয়ে নৌকো ভাড়া করে যাওয়া হতো। কখনও তিন দিন কখনও বা আরও বেশি দিনের জন্যে। নৌকোতেই থাকা হতো। নৌকোতেই স্টোভে রান্না হতো। কখনও চিলিকা এবং সমুদ্রর মধ্যবর্তী স্থলভূমি ছরপড়িয়াতে নৌকো লাগিয়ে ডাঙাতেও রান্নাবান্না হতো। বড় বড় নৌকোর পাল ছিলো বাঁশের চাটাইয়ের। সেই পাল দিনের বেলায় পালের কাজ করতো আর রাতের বেলা তা পাঁচ-ডিগ্রীতে শুইয়ে রাখা হতো নৌকোর ওপর। ছই-এর কাজ করতো তখন। তারই নিচে আমরা পাটাতনের উপরে ঘুমোতাম।

বাবা কখনওই কোথাও একলা যেতেন না তাই কতবার যে কতজন সঙ্গী হয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। ক্যানিং অঞ্চলের মোটর বোট সার্ভিসের এবং মোটর বোট তৈরির কারখানার মালিক বাগচী বাবু, গোপেন্দ্র কিশোর বাগচী ; এক নম্বর চৌরঙ্গীর ইস্ট ইন্ডিয়া আর্মস-এর প্রশান্ত বিশ্বাস এবং তস্য ভ্রাতা অনন্ত বিশ্বাস (এ. বি.), অহীনকাকু (অহীন্দ্র চৌধুরী, অভিনেতা নন, ইনকামট্যাক্সের কমিশনার) এবং আরও অনেকেই বিভিন্ন সময়ে আমাদের সঙ্গে চিলিকাতে গেছিলেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া আর্মস কোম্পানী ছিলো আমাদের অর্ডন্যান্স ডিপো। ওঁরা না থাকলে আমাদের শিকার যাত্রার অনেকগুলিই বাতিল হতো হয়তো। বড় ভাই প্রশান্তকাকু ছিলেন বাবার 'লাইনের লোক'। মানে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে। খাওয়া নিয়ে এতোই পীড়াপীড়ি করতেন তিনি যে জনসন সাহেব তাঁর নাম রেখেছিলেন "মিস্টার আর একটু খান"।

এ. বি. কাকুও কম যেতেন না। টকটকে গায়ের রঙ। ছ'ফিট এক ইঞ্চি লম্বা। পরনে শীত-গ্রীষ্মে তাঁতের ধুতি এবং সস্তা ছিটের ফুল হাতা শার্ট। সত্যিকারের বড়লোকেরা কখনওই পোশাকে বড়লোকি দেখান না। সবসময় তাঁর হাতা অবশ্য গুটোনোই থাকতো। অল্পবয়সে ফ্লাইংক্লাবের মেম্বার ছিলেন। সকালে ফ্লাইংক্লাবের প্লেন নিয়ে পুরীর নির্জন সৈকতে নেমে চান সেরে বাড়ি ফিরে আসতেন কোনো কোনো দিন। এ. বি. কাকুর শ্বশুরমশাই ছিলেন রায়সাহেব নরেন্দ্রনাথ সুর। কটকের খুব নামী ঠিকাদার। ভুবনেশ্বর শহরের অনেকখানিই তাঁর একারই হাতে তৈরি। জঙ্গলের কাজও ছিলো ওঁর। মৃগাঙ্কমোহন সুরের ছোট ভাই ছিলেন তিনি। তাঁর এক ভাই ধীরেন্দ্রনাথ সুরও কটকেই থিতু হয়েছিলেন। এ. বি. কাকুর দুই শ্যালক প্রভাতকুমার সুর (ফুটুদা) এবং অশোককুমার সুর (হোঁদল) না থাকলে উড়িষ্যার প্রায় সবকটি করদ রাজ্যের বনে বনে ঘোরা এবং শিকার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভবই হতো।

BanglaBook.org

ওড়িয়াতে জামাইকে বলে 'জুঁই'। জুঁইবাবুর বন্ধু হিসেবে যা খাতির যত্ন পেয়েছি ওঁদের পরিবারের প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে তা এ জীবনে ভোলবার নয় ওড়িশার জঙ্গল-পাহাড়ের এবং বিচিত্র সব চরিত্র'র কথা হয়তো বলবো "বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারের" তৃতীয় খণ্ডে। দ্বিতীয় খণ্ডে বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের কথা বলব। তখন বিস্তারিত জানবেন তাঁদের সকলেরই সম্বন্ধে।

চিলিকা হ্রদ ছিলো পাখির স্বর্গ। কত বিভিন্ন পরিযায়ী পাখি যে আসতো সেই সময় তা লিখে বলার নয়। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হওয়ারও নয়।

পূব আফ্রিকার গোরোংগোরোর (পৃথিবীর সবচাইতে বড় মৃত আগ্নেয়গিরি) জ্বালামুখের গর্ভে যে হ্রদ আছে তা অতি ছোট কিন্তু সেই হ্রদে হাজার হাজার ফ্লেমিংগো পাখিদের কমলা রঙের আভা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, ছেলেবেলার দেখা চিলিকার কথা সবচেয়ে আগে মনে পড়েছিলো আমার।

চিড়িয়াখানাতে আপনারা অনেকে কালো অস্ট্রেলিয়ান সোয়ান এবং সাদা সাইবেরিয়ান সোয়ান দেখেছেন। সেইরকম অতিকায় সোয়ান আসতো তখন চিলিকাতে প্রতি বছর। ছাই-রঙা রাজহাঁসের তো লেখাজোখা ছিলো না। ফ্লেমিংগো, রেড হেডেড পোচার্ড, ম্যালার্ড, পিন-টেইল, গার্গানি, নাক্‌টা, ব্রাহমনি ডাকস্ (চখাচখি)এবং আরও কত জাতের পাখি।

বিস্ময়কর ছিলো তাদের সংখ্যা। যেদিকে ফ্লেমিংগোরা থাকতো জল কমলা রঙ হয়ে থাকতো। চখারা সোনালি আর বাদামির মাঝামাঝি রঙে জলকে ঢেকে রাখতো। সোয়ানরা কিন্তু দলে থাকতো না। দোকা বা একা। এবং অন্য পাখিদের থেকে আলাদা। ধূসর রাজহাঁসেরা যেদিকে থাকতো জল ধূসর দেখাতো। হাওয়ায় লক্ষ লক্ষ ভিনদেশি পাখির ডানার গন্ধ ভাসতো। তাদের ডাকে সরগরম হয়ে থাকতো চিলিকা তখন।

দিশি কায়দায় যথেষ্ট ভালোমতো শিকার হচ্ছে না বলে বাবার একবার ঝোঁক চাপলো যে আমেরিকানদের মতো আউট-বোর্ড এঞ্জিন লাগানো আনসিংকেবল্ অ্যালুমিনিয়ামের নৌকো চাই। মাথায় পোকা যেই ঢুকলো অমনি বাগচীবাবুর কারখানায় গিয়ে দুজনের মাথার পোকা একসঙ্গে কামড়াকামড়িকরত সেই বোট তৈরিও হলো। আমেরিকা থেকে আউটবোর্ড এঞ্জিনও আনানো হলো। নৌকো যাতে রোগা যাত্রীদের ভারে না ডোবে তার জন্যে তার সামনে পেছনে এয়ার-ট্যাঙ্ক বসানো হলো। নৌকো এমন সাইজের হলো যাতে নিদেনপক্ষে বারোজন রোগা শিকারি বসে যেতে পারেন। এবং মুহুর্মুহু বন্দুকের ঘোড়া দাবাতে পারেন।

এবং বন্দুকও কি আর একরকম? আট-দশ বোরের কামানের মতো সাইজের ডাক্-গানস্। একবার গদ্দাম্ করে দেগে দিলে পাখিদের চার পুরুষ একসঙ্গে শেষ। পয়েন্ট টু টু রাইফেল। বত্রিশ ইঞ্চি ব্যারেলের লং-রেঞ্জের বারো বোরের ইংলিশ গ্রীনার। চার্চিল্। পার্ডি। বেলজিয়ান্ গান। চেকোস্লোভাকিয়ার জেকো গান।

যে-সব শিকারির পক্ষে এক গুলিতে পাখি মারা সম্ভব নয় তাদের জন্যে রিপিটার। আমেরিকান। উইনচেস্টারের। কড়াক-পিং, কড়াক-পিং, কড়াক-পিং করে লাগাতার গুলিবর্ষণের বন্দুক।

টোয়েন্টি বোরের টলী গান। আমার মায়ের একটি ছিলো। স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় তা দিয়েই আমার শিকারে হাতে-খড়ি হয়।

কাস্টম-বীল্ট, এনগ্রেভিং করা সব বাঘা-বাঘা আমীর-ওমরাহদের বন্দুক। গুলিও করতে হতো না। ঐ সব বন্দুকের দাম জানতে পেরেই দুর্বল-চিত্ত পাখিদের অনেকেই অক্কা

পেতো। এবং সেইরকম চিকেন-হার্টেড পাখিদেরই কায়দা করতে পারতাম আমাদের মতো শিকারিরা। নইলে চিলিকার পাখিরা ছিলো ভারী ঝানু। গুলি খেয়ে তারা এমনই গুলিখোর হয়ে গেছিলো যে প্রত্যেক বন্দুকের নলকে রোদে চিকচিক করতে দেখেই তারা সেই বন্দুকের পাল্লা এবং দামও বুঝে নিতো। এমন বুঝদার পাখ-পাখালি অন্যত্র আর দেখিনি বললেই হয়। ফলে হতো কী, চারধারে পাখির সমুদ্র দেখা গেলেও নৌকো একহাত এগোলে তারাও একহাত এগিয়ে গিয়ে সবসময়ই রেঞ্জের বাইরে রাখতো তাদের ওয়াটার-প্রুফ এবং বুলেট-প্রুফ সুন্দর পালকগুলিকে। গুলির শব্দে যদি বা উড়তোও তবুও সবসময়ই তাদের ফ্লাইট-লাইন বন্দুকের রেঞ্জের বাইরে থাকতো। এমন শিকারি-হয়রান করা পাখি তারা যে আর বলার নয়।

দোষও দিতাম না। ডাক-ব্যাক অক্ষুণ্ণ না-রাখলে শীত শেষে আবার হাজার হাজার মাইল উড়ে বাড়িই বা ফিরতো বেচারারা কি করে?

চিলিকার পাখিদের এইরকম অ-খেলোয়াড়সুলভ ট্যাকটিকস দেখেই বিরক্ত হয়ে বাবা ঐ নৌকো বানিয়ে ফেললেন অর্ডার দিয়ে।

নৌকো তো বানানো হলো কিন্তু সেই গন্ধমাদনকে বাগচীবাবুর ট্যাংরার কারখানা থেকে সুদূর চিলিকা হ্রদে নেওয়া যায় কি উপায়ে সেইটেই হলো সমস্যা!

এই সব অসমসাহসিক এবং প্রায় অসাধ্য কাজের ভার পড়তো বাবার বড় পুত্র এই অধমের উপর।

সেই নৌকোকে চার ভাগে ভাগ করা যেতো। কিন্তু চারভাগে ভাগ করেও এই তিনভাগ জল ও একভাগ স্থলের পৃথিবীতে তাকে কাজে লাগানো মুশকিল ছিলো। যাই-ই হোক, পিতৃ-আজ্ঞা বলে কথা! প্রকাণ্ড ট্রাক ভাড়া করে তো হাওড়া স্টেশনের গুডস্-ইয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে মাড্রাস মেলের ব্রেক-ভ্যানে তাকে লাদা হলো। কালুপাড়াঘাট স্টেশনে ভোর রাতে যখন মাড্রাস মেল থেকে সে মাল নামালো তখন তাকে এবং তার ভাবী বাহনদের চেহারা দেখে স্টেশন মাস্টার ইস্তক পানওয়ালা পর্যন্ত সকলেরই চক্ষুস্থির। শিরঃপীড়া। চিলিকাতে শিকারে-আসা অনেক রাজা-মহারাজাই তারা দেখেছেন এ পর্যন্ত কিন্তু এমন রাজাধিরাজ দেখেননি।

দুটি গরুর গাড়ি ভাড়া করে তো সেই জগঝম্পকে চিলিকার তীর অবধি নেওয়া হলো। তারপর তাকে জোড়াও লাগানো হলো। আমাদের এই সব হরকৎ দূর থেকে পাখিদের ইন্টেলিজেন্স-উয়িং তীক্ষ্ণ চোখে নজর করছিলো। আমেরিকান আউট-বোর্ড মোটর যখন স্টার্ট করা হলো তার ভট্‌ভটানিতে দু-চারটে বেজাতের আনকোরা হাঁস তো মূর্চ্ছাই গেলো। কিন্তু বাবার সেই কিম্ভূতকিমাকার ভীমাকৃতি জলযান যতই প্রলয়ংকরী আওয়াজে পৃথিবীর তাবৎ হাঁসেদের সমুদয় প্রজাতি নির্মূল করার অভিলাষে রকেটের মতো জলের এবং শাক্ত শিকারিদের মনে আশার ফোয়ারা ফুটিয়ে এগোতে লাগলো, হাঁসেরাও ততোধিক বেগে রেঞ্জের বাইরে পায়ে-জলছাড়া দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো।

বাবা এবং প্রশান্তকাকু আটারলী ফ্রাস্ট্রেটেড্ হয়ে কেরোসিনের টিনের সাইজের এক টিন কে. সি. দাশের রসগোল্লা দুজনে মিলেই খেয়ে ফেললেন। বাগচীবাবু ক্ষীণ আপত্তি জানিয়ে বললেন, করেন কী! গুহসাহেব, করেন কী!

বাবা রেগে বল্লেন, কিছু তো একটা করতে হয়ই!

চিলিকার পক্ষীসমাজ আমরা সে-যাত্রা অথবা সেই "যাত্রা" সমাপন করে ফিরে আসার পর কতদিন যে আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করেছিলো তা পাখিদের ভাষা জানলে জানা

BanglaBook.org

যেতো। হয়তো সালিম আলি সাহেবকে তলব করলেও জানা যেতো। কিন্তু তারপর (বোধহয় উনিশশ চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি হবে) আর চিলিকাতে যাওয়া হয়নি।

বাবা বলেছিলেন এরকম ইন্‌কন্‌সিডারেট অপোনেন্টদের সঙ্গে আর যাই হোক কোনোরকম স্পোর্টস্‌-এর প্রশ্নই ওঠে না। স্পোর্টসম্যান স্পিরিটই নেই। দু-একটা গুলি তো ছুঁড়তে দিবিরে তোরা! কতদূর থেকে শিকারিরা কত কষ্ট করে এলো।

চিলিকার মধ্যেই ছিলো পারিকুতের রাজার স্বপ্নের মতো সবুজ নিজস্ব দ্বীপ। চারধারে জল, মধ্যিখানে স্থল। আর তাতে ছিলো পারিকুতের রাজার শুটিং-লজ। একবার তাঁর নিমন্ত্রণেও যাওয়া হয়েছিলো।

বঙ্গোপসাগর আর চিলকার মধ্যের স্বপ্নপ্রস্থর বালিয়াড়ির নাম ছিলো ছর্‌পড়িয়া। সমুদ্রতীর ধরে হেঁটে গেলে পুরী খুব দূরে ছিলো না। আজকের পুরী-কোনারক হাইওয়েও এই জায়গা থেকে কাক-উড়ান্‌-এ গেলে বেশি দূর হবার কথা নয়।

ছর্‌পড়িয়াতে অনেকই খরগোস ছিলো সেই সময়। ছিলো চিতল হরিণ। এবং মস্ত একঝাঁক কৃষ্ণসার হরিণও। বালির মধ্যে ঘুরে ঘুরে বালি ছিটিয়ে শিং-এ শিং-এ খট্‌খটি আওয়াজ তুলে বড় বড় পুরুষ হরিণেরা লড়াই করতো। তাদের রঙ ছিলো সাদা-কালো। আর মেয়ে হরিণগুলোর রঙ ছিলো সাদা আর ধূসর।

একবার অনেক কসরত করে রোদে-তাতা বালিয়াড়ির উপরে উপোসী কুমীরের মতো নট-নড়ন-চড়ন-নট-কিচ্ছু হয়ে পাক্কা তিন ঘণ্টা শুয়ে থাকার পর একটি দ্রুত-ধাবমান হরিণকে থার্টি-ও-সিক্স্‌ রাইফেল দিয়ে ধরাশায়ী করে বাগচীবাবুর হ্যান্ডশেক পেয়েছিলাম। জীবনে আমি ঐ একটিই ব্ল্যাক-বাক্‌ মেরেছিলাম। চিংকারাও একটিমাত্র। সেটি মেরেছিলাম উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুর জেলায়। বিন্ধ্যাচলের পাহাড়ে।

এই সব জাতের হরিণ পূর্ব ভারতে বেশি দেখা যায় না।

BanglaBook.org

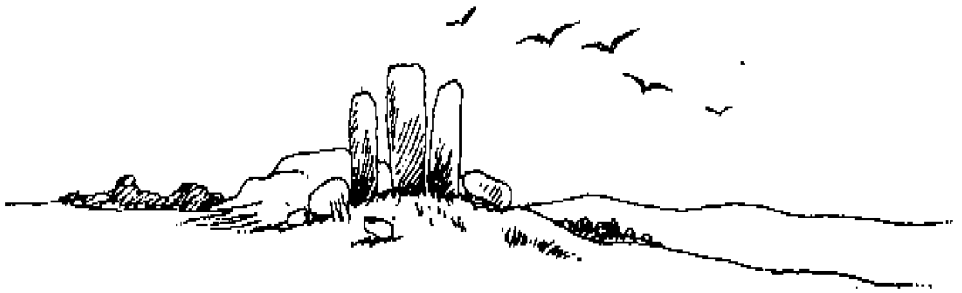

বাগচীবাবুর সঙ্গে আমাদের যখন প্রথম পরিচয় তখন তাঁর বড়ছেলে গামাবাবু ইংল্যান্ডে এঞ্জিনীয়ারিং পড়ছেন। অত্যন্ত সুদর্শন, মিতভাষী, ভদ্রলোক গামাবাবু। দেশে ফিরে আমাদের সঙ্গে বহু জায়গাতে শিকারও করেছেন একসঙ্গে।

বাগচীবাবুর মতো অমন রসিক, ভালো গল্প-বলিয়ে এবং সুন্দরবনের অথরিটি কলকাতার শহুরে-শিকারিদের মধ্যে বেশি ছিলেন বলে জানা নেই আমার। ওঁর সূত্রেই সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে এক একবারে তিন থেকে পাঁচদিন করে অসংখ্যবার কাটিয়েছি আমরা। ভাঙাডুনি আইল্যান্ড, মায়া আইল্যান্ড, লোথিয়ান্ আইল্যান্ড, বড় চামটা, ছোট চামটা, বড় বালি, ছোট বালি, কত জায়গাতেই না থেকেছি। মাতলা, হেড়োভাঙা, বিদ্যা, গোসাবা কী সব নদী! কত আশ্চর্য সব সূর্যাস্ত! পূর্ণিমার আর নক্ষত্রজ্যোৎস্নার মোহময় সব রাত।

সুন্দরবনের মতো গা-শিউরানো ভালোলাগা পৃথিবীর খুব কম বনেই আছে। এমন ভয়াবহতাও অন্য কোনো বনের নেই। কালাহাণ্ডীতেও শিকার করেছি, যেখানের মানুষখেকো বাঘেরাও পৃথিবী বিখ্যাত। কিন্তু সুন্দরবন, সুন্দরবনই। সুন্দরবনের কোনো প্রতিযোগী নেই, নেই সৌন্দর্যে; নেই ভয়াবহতাতেও। অমন শান্তি আর ভীতি কোথাওই অনুভব করিনি। অমন নিথর নিস্তব্ধতাও।

সারেঙের ঘরে স্টীয়ারিং-এ বসে মাইলের পর মাইল মোটর বোট চালিয়েছি। এঞ্জিন ঘর নিচে। দড়ি-বাঁধা ঘণ্টা বাজিয়ে এঞ্জিন রুমকে জানাতে হয় কোন গীয়ার দেবে এঞ্জিনম্যান। সারেঙ যে, তার হাতেই থাকে স্টিয়ারিং। গোন-বেগোন্ জোয়ার-ভাঁটা, খাল-সুঁতিখালের হদিস রাখা তারই কাজ। ছাদের উপরের ঘর সারেঙের। সারেঙই সারথী। রাতের বেলা সার্চ-লাইট জ্বেলে বোট চলে। পুরো বোটের দায়িত্ব তারই হাতে থাকে। সারেঙ-এর দড়ির টানের মধ্যেই থাকতো তার সংকেত। একবার দড়ি টানলে ফার্স্ট গীয়ার। দুবার টানলে টপ্ গীয়ার। তিনবার টানলে ব্যাক গীয়ার এইরকম আর কী!

যতবড় একটি কুমীর সুন্দরবনে একবার দেখেছিলাম তত বড় কুমীর দুঃস্বপ্নে ছাড়া বেশিলোকে দেখেছেন বলে জানি না। অবিশ্বাস্য, অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বলে মনে হয়েছিলো। নওবাঁকির খালে উঁচু ডাঙায় বসে সে ডিসেম্বরের বেলা এগারোটায় রোদ পোয়াচ্ছিলো। দূর থেকেই বোটকে আসতে দেখে সে যেমনভাবে কাদায় লেজ নাড়িয়ে নেমে এসে জলে পড়েছিলো ঝপাং করে সেই ছবিটি মস্তিষ্কের ভাঁড়ারে সযত্নে তোলা থাকবে আমৃত্যু।

ধানী ঘাসের বনে, পেকে কালো-হয়ে-যাওয়া চামড়ার অতিকায় চিতলের দল। কেওড়ার শুলোর মধ্যে দিয়ে দ্রুততার সংজ্ঞার মতো দৌড়ে-যাওয়া। লাল-কালো ডোরা বাঘের ঝলক্। সাদা বালিতে মিষ্টি জল নিতে-যাওয়া হাসান মিঞার বারো বছরের ছেলের

বাঘে-চর্বিত শব। ছায়াচ্ছন্ন, গা-ছমছম্ শীর্ণ সুঁতিখালের পাশে কাদার মধ্যে সরু গাছের ডালের সঙ্গে নোংরা ফালি-কাপড়ের মৃত্যুর নিশানের মতো ওড়া। বাগচীবাবু যাকে বলতেন "ঝামটি"। যেখান থেকে মানুষ নিয়েছে বাঘে সেখানে বাউলে জেলে মৌলেরা ঐরকম "ঝাম্‌টি" পুঁতে অন্যদের সাবধান করে দিয়ে যায়।

কত গরীব মানুষের প্রাণ, কত তাদের কতো শোকার্ত আত্মীয়ের স্তব্ধ ভয় এই সুন্দর সুন্দরবনের নগ্ননির্জন অমোঘ নিথর নিস্তব্ধতায় যে প্রোথিত হয়ে আছে যুগযুগান্ত থেকে তা প্রকৃতিই জানেন!

আমাদের কিসের সাহস? দশ হাজার টাকা দামের ইংলিশ, কী জার্মান, কী অস্ট্রিয়ান বা আমেরিকান রাইফেল হাতে নিয়েও শুলো আর প্যাত্‌প্যাতে, থিক্‌থিকে কাদা-ভরা, সাপ আর স্যালাম্যান্ডারের গা-ঘিন্‌ঘিন্ বুকে-হেঁটে-চলা সেই আন্‌জান্ আজীব দুনিয়াতে পায়ে হেঁটে যখনই ঢুকেছি তখনই ভয়ে আধ-মরা হয়ে গেছি। আর সেই বনে, শুধু পেটেরই জ্বালায় লুঙি অথবা ধুতিকে মালকোঁচা মেরে, বনবিভাগের অভয়মন্ত্র আছাড়ি-পট্‌কাতে কোঁচড় ভরে, শুধুমাত্র মন্ত্রজ্ঞ "দেয়াসির" অভয়বাণীর ভরসায় যেসব গরিব-গুব্‌রোরা প্রতি বছর মধু পাড়তে এসে, কাঠ কাটতে এসে, বা মাছ ধরতে এসে এখানে হেঁটে বেড়ায় তাদের পায়ে মাথা নোয়াতে ইচ্ছে করে।

পেটের ক্ষিদের মতো জ্বালা বোধহয় আর নেই। নইলে এই বনে দুমুঠো অন্নসংস্থানের দুর্মর আশায় এই অতিমানবরা কি করে আসে? নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে কি করে পাঞ্জা লড়ে বছরের পর বছর?

সুন্দরবনের মতো ভয়াবহ আর কোনও জঙ্গলই আমি এ পর্যন্ত দেখিনি। এখানে নিজের পা কোথায় ফেলব তাই-ই এক সমস্যা। বাঘের দিকে নজর রাখা তো অসম্ভব ব্যাপার। আর্জান-সর্দারের মতো শিকারিরা পৃথিবীর সাহসীতমদের মধ্যে নিশ্চয়ই অন্যতম।

বড়বালিতে বাঘের পায়ের দাগের প্রসেশান দেখেছি বহুবার। গাছের গুঁড়িতে নখ আঁচড়ানোর দাগ অসংখ্য। সেটা বিশেষ কিছু নয়। সব জঙ্গলেই তা দেখা যায়। কিন্তু সুন্দরবনের গভীর বনে, সাইক্লোনে লণ্ড-ভণ্ড হওয়া অভিশপ্ত বেলাভূমিতে পায়ে হেঁটে যেতে সত্যিই সাহস লাগে। অন্য কোনও জঙ্গলের সঙ্গেই এই বনের তুলনা চলে না।

জোয়ারের সময় সমস্ত এলাকাই একটি ভাসমান উদ্যানে পরিণত হয়। ভাঁটার উড়াল শিকড়-বের করে শিরা-বের-করা প্রাচীন বৃদ্ধর মতো প্রতীয়মান করে সে নিজেকে। তখন সুতীখাল থেকে জোরে জল বেরিয়ে আসে বড় খালে। হাজার হাজার খাল। পথ ঠিক রাখা দুঃসাধ্য। পার্শে মাছ ধরার জন্যে ছোঁ মারে বহুবর্ণ মাছরাঙা সুতী খাল যেখানে বড় খালে মিশেছে সেখানে। বুকের মধ্যের বিধুর ব্যথাগুলি চারিয়ে দিয়ে উড়ে যায় ক্বচিৎ কার্লু, ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে ডাকতে ডাকতে। শিঙাল চিতল ডেকে ওঠে টাঁউ টাঁউ করে। হেড়োভাঙ্গা নদীর পার থেকে গর্জন করে ওঠে বাঘ। বোটের মধ্যের ক্রকারী তাতে ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে।

শান্ত হেমন্তর কৃষ্ণপক্ষর তারাভরা আকাশের নিচে সারেঙ্গ নোঙর-করা বোটের ছাদে বসে গল্প করে "বুঝলেন কি না লালবাবু, ইখানে খাদ্য-খাদকের বড়ই অভাব।"

সত্যিই সুন্দরবনের মতো এতো সুন্দর, এতো ব্যথাতুর, এতো বেদনার ইতিহাসে ভরা বনভূমি পৃথিবীতে বিরল। এই বনে যারা জীবিকার সন্ধানে আসে তাদের প্রত্যেককে মহাবীরচক্র দেওয়া উচিত। তাদের তুলনায় আমাদের নিজেদের ভীরুতার প্রতিমূর্তি বলেই মনে হয়েছে, যতবারই গেছি ততবারই। ব্যাঘ্র-প্রকল্প চালু হওয়ার পর সুন্দরবনে যাইনি আর। অনেককেই নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয় শুনি। তবে যে সব "অ্যাডভেঞ্চারাররা"

BanglaBook.org

সুন্দরবনের প্রারম্ভিক সীমানার বাদার এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে তুরীয় অবস্থাতে গিয়েই মনে করেন সুন্দরবনের সবই জেনে এবং দেখে ফেলেছেন তাঁদের প্রতি আমার অনুকম্পা ছাড়া আর কিছুই নেই।

সুন্দরবনে একসময় বুনো মোষ এবং শুয়োরও অনেকই ছিলো বলে শুনেছি। কিন্তু পঞ্চাশের দশকেও কখনও শুয়োর অথবা বুনোমোষ চোখে পড়েনি আমাদের। জানি না, এখন বনবিভাগের উদ্যোগে যদি শুয়োর বেড়ে থাকে! শুনেছি পিগারি-টিগারিও হয়েছে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ব্যবধানে সব কিছুই বদলে গেছে হয়তো!

বড় বড় লেজওয়ালা ফিশ-ক্যাট, যারা জলের ধারে বসে মাছ ধরে খায় এবং বাঘ ছাড়া অন্য মাংসাশী প্রাণী দেখিনি ওখানে। শেয়ালও নয়।

ফিশ-ক্যাট এবং বাঘ যেমন ভাবে মাছ ধরে তা খুব মজার। জলের পাশে বসে জোয়ার অথবা ভাঁটার সময় সূতী খালের মধ্যে থেকে থাবার ঝট্‌কায় মাছকে ডাঙায় তুলে ফেলে চিবিয়ে খায়। ফিশ-ক্যাট্‌রা অবশ্য সরাসরিও মাছ তুলে নেয় জল থেকে মুখে করে।

যে কোনো বনেরই মতো সুন্দরবনেরও বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রূপ। চৈত্রর প্রথমে সুন্দরবন ফুলে ফুলে সেজে ওঠে। শীতে এলে সে রূপ চোখে পড়ে না।

চৈত্রে কেওড়া, ওড়া, গেঁয়ো, গরান সব গাছই ফুলে ভরে ওঠে। ফুলপটি তলার লাল নীল হলুদ রঙা ফুল। মৌমাছি আর প্রজাপতির দল উড়ে উড়ে মধু খায়। চঞ্চল পাখনায় ঘুরে বেড়ায়। এই সময়ই মউলেরা মধু পাড়তে ঢোকে বনে। নৌকো ভিড়িয়ে মন্ত্রজ্ঞ বা দেয়াসি, বাবা দক্ষিণ রায়, বনবিবি, গাজী পীর বা অন্য দেবদেবীর পুজো দেয় কবুতর বা মুরগী বলি দিয়ে। তারপর মন্ত্র পড়ে দিয়ে বলে, যা, আর ভয় নেই।

তবু ভয় থাকেই। পুরোটাই থাকে। গরান ফুলের মধু খেয়ে যেমনি মৌমাছি ওড়ে অমনি সেই মৌমাছিকে অনুসরণ করে ওরা মৌচাকের দিকে এগোতে থাকে উপরে মুখ তুলে, হামাগুড়ি না দিলে কিছু দেখা যায় না এমনই নিরন্ধ্র বনে। যে বনে রাইফেল হাতে ঢুকতেও ভয়ে আমার বুক চিরদিনই কেঁপেছে। বাঘের সহজ খাদ্য হয় তারা। যারা ফেরে, তারা বলে দেবতা বা দেবীর দয়াতে বেঁচে গেলো। যারা ফেরে না, মন্ত্রজ্ঞ বলে, ওরা নিশ্চয়ই বনে থুথু ফেলেছিল বা হিসি করেছিলো তাইই বাঘের কবল থেকে মন্ত্র তাদের বাঁচাতে পারেনি।

এই নিষ্ঠুর বাস্তব সত্যের অমোঘতা জেনেও সুন্দরবনের বাদার বিধবা-পল্লীর বিধবারা এবং সন্তানহারা মায়েরা তাদের পুরুষদের পরের বছর আবারও পাঠায় এই বনে। আজকেও এই নরহত্যা ঘটে চলেছে। একে আমি নরহত্যাই বলব। টাইগার প্রোজেক্টের কোটি কোটি টাকার কিছু অংশও যদি অনুদান দিয়ে এই হতভাগ্য ক্ষুধিত মানুষদের বাঁচাবার চেষ্টা হতো তাহলেও বোঝা যেত জনদরদী রাজনৈতিক দলের নেতারা দেশের মানুষদের সম্বন্ধে ন্যূনতম দরদও রাখেন। ওদের আর কটা ভোট? ওদের বাঘে খেলেই বা কি আসে যায় কার?

আলেকজান্ডারের সেই বহুশ্রুত কথা এই ভারতে আজও সমানভাবে প্রযোজ্য। সত্যই সেলুকাস! কী বিচিত্র এই দেশ!

কাঁকড়া ধরতে আসে বহু জেলে। সুন্দরবনের কাঁকড়া আর কাছিমের স্বাদ দারুণ। কতরকম যে রঙ তাদের। খুব বড় থেকে ছোট নানারকম কাঁকড়া পাওয়া যায় এখানে। কী মিষ্টি শাঁস তাদের! পেঁয়াজ রসুন লঙ্কা দিয়ে রাঁধলে তা পৃথিবীর উপাদেয়তম খাদ্যের মধ্যে গণ্য হয়। ব্যাঙেরও কত রকম। কালো ব্যাঙ, রূপো ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ, হলুদ-রেখা ব্যাঙ, পাতাসি ব্যাঙ। অবশ্য বর্ষাকালেই এদের বেশি দেখা যায়। কাঁকলাস মাছ, ট্যাংরা, কুচো

BanglaBook.org

চিংড়ি, ভেটকি, খয়রা, ভাঙন, কানমাগুর।

মেনি মাছগুলো ভাঁটা দিলেই কাদার উপরে তিড়িং বিড়িং করে লাফায়।

কুচো চিংড়ি দিয়ে কেওড়া ফলের টক রাঁধে সুন্দরবনের বাসিন্দারা। খুব ভালো খেতে হয়। হ্যাঁতালের মাথা কেটে বড়াও ভেজে খায় কেউ কেউ। বেশ খেতে। খয়রা মাছ ভাজা, ভেটকির কাঁটা-চচ্চড়ি, ট্যাংরার ঝাল, বড়-চিংড়ির মালাইকারী, কচ্ছপের মাংস। মাছের আসল বাহার বর্ষায়। রেখা, রুচো, দাঁতনে, ভাঙন, কাল-ভোমরা, পান-খাওয়া, পার্শে,তোপ্‌সে আরও কতরকম মাছ। বর্ষার মাছই শুধু নয়, বনের শ্যামলিমাও মন ভুলিয়ে দেয়। এই সৌন্দর্যর আড়ালে যে মৃত্যুভয় থাকে তা সেই সৌন্দর্যকে এক আলাদা গাম্ভীর্য দেয়। এখানে গাছের মধ্যে কেওড়া, হ্যাঁতাল, গেঁয়ো গরান, সুঁদরী ছাড়াও আছে পশুর, আমুর, ধোঁদল, বাইনন্। অপ্রধান গাছেদের মধ্যে গোলপাতা, লোহাগড়া, ভাতকাটি, শিউড়ে, টক-সুঁদরী।

গেঁওর লতা বর্ষায় লাল টুকটুকে হয়ে ওঠে। সিঁদুর-রঙা। দেখতে কী ভালো যে লাগে!

টক-সুঁদরির বন খুব ছোট ছোট কিন্তু নিবিড়। এর মধ্যে দিয়ে বাঘ হরিণকে যখন ধাওয়া করে নিয়ে যায় তখন কিছুক্ষণের মধ্যেই হরিণের শিং যায় এতে আটকে। তখন বাঘের পোয়াবারো।

খয়েরী গোলফলের কাঁদিগুলো যখন নুয়ে পড়ে জলের উপর তখন দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। খেতেও খারাপ লাগে না। তালশাঁসের মতো মিষ্টি। কেমন একটা বুনো গন্ধ তাতে।

গভীর রাতে এবং দিনেও জোয়ারি পাখিরা ডাকে পুত্-পুত্-পুত্-পুত্। বাউলে-মাউলেরা যখন জোয়ারি পাখির এই পুত্-পুত্ ডাকের রহস্যর গল্প বলে রাতের বেলা লণ্ঠন লগির মাথায় বা ছইয়ের উপরে রেখে, দুহাতে ধরা হুঁকোয় গুড়ুক-গুড়ুক শব্দ করতে করতে তখন মনে হয় ঠাকুরমার ঝুলির ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর দেশেই বুঝি চলে গেছি। জোয়ারি পাখির জুওলজিকাল নাম পক্ষীবিশারদেরাই জানেন। তার ইংরিজি নামটা আমা-হেন অশিক্ষিতও জানে। কিন্তু এই সুন্দরবনে 'জোয়ারি' পাখিকেই মানায় ভালো।

গল্পটা হচ্ছে এইরকম। একটি মেয়ে নাকি তার ছেলেকে নদীর খোলে ভাঁটার সময় শুইয়ে কী কাজ করছিলো। এমন সময় জোয়ার এসে তার ছেলেকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ছেলে-হারানোর শোকে সে পাখি হয়ে গিয়ে সেই দিন থেকে নদী আর খালের তীরে তীরে দিনে রাতে ডেকে ফেরে পুত্ পুত পুত পুত করে। পুত্‌কে তবু ফিরিয়ে দেয় না নোনা জলের ঢেউ।

নোনা জলের রাজ্য সুন্দরবনে যাঁরাই যান, সে নৌকোতেই হোক কী মোটর বোটেই হোক খাবার জল সঙ্গে বয়ে নিয়ে যেতে হয়ই। খাবার দাবার তো বটেই। এখন তো ঢোকা মানা। অনেক লোককেই তাঁরা মহাসমারোহে নিয়ে যান শুনি। আমাকে কখনও ডাকেননি।

কতবার যে জেলে এবং বাউলে মৌলেরা আমাদের কাছ থেকে খাবার জল, নুন,তরি-তরকারি চেয়ে নিয়েছে বোট থামিয়ে। বাঘের খবর দিয়েছে। কবে কোথায় নতুন ঝামটি পড়েছে তার খবরও। সেই সব মর্মন্তুদ মৃত্যুর কথা এই অসহায় মানুষেরা এমন ভাবাবেগহীন মুখে বলে চলে, কারো ভাইয়ের মৃত্যুর কথা, কারো বাবার, কারো বা ছেলের যে বিশ্বাসই হয় না। ওদের ভাবটা এমনই যেন "ইটস্ ওল ইন্ দ্যা গেম।" স্পোর্টসম্যানশিপের শেষ কথা। দুঃখ হয় এই ভেবে যে, এই কুরবানী দুমুঠা ভাতের

জন্যেই।

সাহসের অনেকই রকম থাকে। শারীরিক সাহসটা কোনো সাহসই নয়। রাইফেল দিয়ে বাঘ মারাকে আমরা সাহসের কাজ বলে মনে করেছি। অন্যরাও অনেক কিছুকে সাহসের সমতুল বলে মনে করেছেন কিন্তু আমার সুন্দর দেশের এই সরল নিপীড়িত বড় গরীব এইসব মানুষদের সম্বল বলতে শুধুমাত্র তাদের বুকের দুর্জয় সাহস। এদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার সুযোগ থাকলে গুর্খা, বা জাঠ বা শিখদের চেয়ে কোনো অংশে কম বড় যোদ্ধা হতো না এরা। সাহেবরা বলে গেছিলো বিদ্রোহী-ভাবাপন্ন বাঙালীরা 'মার্শাল রেস্' নয়। এখনকার কেন্দ্রীয় সরকার কি বলেন কে জানে!

ওদের সঙ্গে হাতিয়ার বলতে দা বা কুড়ুল। দুএকটি বেপাশী বন্দুক যে থাকে না এমন নয়। তবে তার হনন-ক্ষমতা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। এদের দেখে, সেনাবাহিনীর কমিশনড্ অফিসারদের শিক্ষণক্ষেত্রে খাড়াক্‌ভাসালাতে বা অন্যত্র যে কথাটা বার বারই শেখানো হয়ে থাকে সেই কথাটাই মনে পড়ে যায়। "ফিজিক্যাল কারেজ ইজ দ্যা লিস্ট ফর্ম্ অফ কারেজ"। এই মনের সাহসে সাহসীদেরই সত্যিকারের সাহসী বলে। এরা যুদ্ধক্ষেত্রে পরমবিক্রম দেখানো মানুষদের চেয়ে অনেকই বেশী সাহসী।

সুন্দরবনে একবার জনসন সাহেবও গেছেন আমাদের সঙ্গে। অহীনকাকু, প্রশান্তকাকু এবং আরও অনেকে আছেন। সবে সন্ধে হয়েছে। বোট সার্চলাইট জ্বালিয়ে চলেছে রাতের খালে আলোর বন্যা বইয়ে। সামনের ডেকে বসে গল্পগুজব হচ্ছে। একটু পরই জালিবোট নামিয়ে তাতে জেলের পোশাকে অর্থাৎ খালি গায়ে নোংরা ধুতি মালকোচা মেরে সুতীখালে সারারাত ঘুরব বলে তৈরি হচ্ছি বাঘের দেখা পাওয়ার আশায়। এমন সময় গুড়ুম্ করে অহীনকাকুর বন্দুক অ্যাকসিডেন্টালি ফায়ার হয়ে গেল। 'বল' পোরা ছিলো ব্যারেলে। ডেকের মোটা কাঠের পাটাতন ভেদ করে সে গুলি এঞ্জিন রুমে গিয়ে সেঁধিয়ে গেল। অহীনকাকু একেবারে হতভম্ব হয়ে ফ্যাকাশে মুখে মুহ্যমান হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। শিকারে এরকম দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে। এই সমস্ত কিছুকেও 'ওল্ ইন দ্যা গেম' বলে মেনে নিতে হয়।

অহীনকাকুর চেহারা দেখে কেউই শিকারি বলে বিশ্বাস করবেন না। রোগা, ছোটখাটো চেহারা। অবশ্য আমার দেখা প্রকৃত ভালো শিকারিদের অধিকাংশরই চেহারা কবির বা ডিসপেপ্‌টিক রোগীর মতো। শিকারির সাহস থাকে মনে। শরীরে নয়। কিন্তু অহীনকাকুর মতো ওইরকম উৎসাহী, কষ্টসহিষ্ণু এবং ভালো শিকারি খুব কমই দেখেছি। এতো ভালো আয়কর কমিশনারও কম দেখেছি। এ দেশের আমলাশাহীতে সচরাচর সততা এবং দক্ষতার রাজযোটক মিল দুর্লভ। যাঁদের সাহস আছে, যাঁরা কাজ জানেন ; তাঁদের মধ্যে সকলেই পুরোপুরি সৎ নন। আর যাঁরা সৎ, তাঁরা মনে করেন কোনোক্রমে চাকরি বাঁচিয়ে রিটায়ার করে নির্বিঘ্নে পেনসান্-এর মোক্ষে পৌঁছতে পারাই জীবনের মূল লক্ষ্য। তাঁরা অন্যায় করছেন জেনেও অন্যায় করেন। অহীন্দ্র চৌধুরীর মতো সরকারি আমলা এদেশে আরো বেশি থাকলে দেশের চেহারাই আজ অন্যরকম হতো।

জলপাইগুড়ির রায়কত রাজ্যের রাজকুমারী প্রতিভা দেবী, রাজা প্রসন্ন দেব রায়কতের এবং রানী অশ্রুমতী দেবীর একমাত্র কন্যা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বড়দাদা ডঃ কিরণ বোসের। উনি আমেরিকা থেকে দাঁতের ডাক্তার হয়ে এলেও বিশাল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ায় পেশা ভালো করে করবার সুযোগই পাননি। প্রতিভা দেবীর এবং ডঃ বোসের সঙ্গে পেশাগত সম্পর্ক ছিলো আমাদের

BanglaBook.org

এবং রাজকুমারী আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তাঁদের কথাতে আসব পরে।

সুন্দরবনের প্রসঙ্গে জলপাইগুড়িরই নবাব মুশারফ্ হোসেন-এর এক বংশধর (জব্বার সাহেব নন) একবার আমাদের সঙ্গে সুন্দরবনে শিকারে গেছিলেন। তাঁর নাম ভুলে গেছি আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর, কিন্তু তাঁকে মনে আছে তাঁর সুন্দর চেহারা আর রইসীর জন্যে। তাঁর সঙ্গে যে খিদ্‌মদগারটি গেছিলেন তার কাছে আজকের হিন্দী ফিল্মের বাঘা বাঘা হীরোদেরও নিছক 'বান্দা' বলে মনে হবে। যেমন চেহারা, তেমনই পোশাক। নবাবজাদা সঙ্গে একটি হোল্ডঅলও এনেছিলেন। সে হোল্ডঅল আমার পিতৃদেবের হোল্ডঅলকেও লজ্জা দিতে পারতো। এবং সেই হোল্ডঅল-এর মধ্যে থেকে একটি প্রকাণ্ড পেটমোটা দুগ্ধফেননিভ কোলবালিশ যখন বেরিয়ে পড়লো তখন বুঝতে আর বাকি রইলো না 'রইসীর' নমুনা। নবাব হো তো অ্যায়সা! বোট চলেছে রাতের অন্ধকারে। ফিকে জ্যোৎস্নায় নবাবজাদা সামনের ডেকে সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরে শাহ্-তুষষ্ জড়িয়ে বসে স্কচ খাচ্ছেন। খিদমদগার ঢেলে দিচ্ছে হুইস্কি। স্কচ-হুইস্কির গন্ধ আর তাঁর গায়ের অম্বর আতরের গন্ধ নোনা হাওয়ার গন্ধর সঙ্গে মিশে মাতলা নদীকেও মাতাল করে তুলেছিলো। ভাবছিলাম, অভাব ঘটেছে শুধু একজন তওয়াফের। বাঁ কানে হাত দিয়ে হাঁটু মুড়ে ঘাগড়া ছড়িয়ে বসে হিনা ঈত্বরের গন্ধ ছড়িয়ে সে পূর্বী রাগে ঠুমরী ধরে দিলেই আর কোনোই খুঁত থাকতো না সেবারের জলীয় শিকার যাত্রায়।

কত সব বিচিত্র মানুষই না দেখলাম এই শিকারের শখ-এর কারণে। কত মজার এবং দুঃখের ঘটনার শরিক হলাম। অথচ বেশির ভাগ স্বল্প-পরিচিত মানুষের স্মৃতিই মুছে গেছে। ঐ নবাবজাদার মতো কিছু কিছু মানুষই স্পষ্ট হয়ে আছেন স্মৃতিতে। স্মৃতি কাকে রাখে আর কাকে যে ফেলে তা স্মৃতিই জানে।

BanglaBook.org

চামটা ব্লকে একবার বাঘের অত্যাচারে সুন্দরবনের ঐ এলাকার বনবিভাগের সব কাজকর্ম মাথায় উঠছিলো। জেলেরা মাছ ধরতে পারে না, মউলেরা মধু পাড়তে পারে না, বাউলেরা কাঠ কাটতে পারে না।

বাগচীবাবু একদিন ফোন করে বললেন ডি. এফ. ও. সাহেব বাঘ মারবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। আমার বয়স হয়ে গেছে। হাতের উপরও ভরসা পাই না এখন। আপনি সঙ্গে যদি যান তাহলেই 'হ্যাঁ' করি।

আমি তো সঙ্গে সঙ্গেই রাজি। বললাম, কী নেব আমি ?

বললেন, রাইফেল। আর কি ?

আর কিছু ?

আর কি নেবেন ? বুড়ো হয়েছি। ঠাণ্ডাটাণ্ডা লাগে যদি একবোতল কনিয়াক্ নিয়ে যেতে পারেন। সঙ্গে থাকবে। বিপদে মধুসূদন।

ওঁর জন্যে ভি. এস. ও পি কনিয়াক্ নিলাম। আমি তখনও জনসন সাহেব ও ভাল্লিভয় সাহেবের যমদুয়ারের সঙ্গ গুণেও পুরোপুরি কনভার্টেড হইনি। বাগচীবাবুর, এক সিগারেট ছাড়া অন্য কোনো নেশাই ছিলো না। খুবই সরল জীবন যাপনে বিশ্বাসী ছিলেন উনি।

ঐ প্রজন্মের মানুষেরা বেশিরভাগই অমন প্লেইন-লিভিং হাই-থিংকিং-এ বিশ্বাসী ছিলেন। আমাদের প্রজন্মর ওপর চালিয়াতি তাঁদের কারোই ছিলো না বললেই চলে। কোনোদিন ইস্ত্রি-করা জামাও পরতে দেখিনি ওঁকে। ফুলহাতা খাকি জামা পরতেন ধুতির উপর। শিকারে গেলে ধুতির বদলে খাকি ট্রাউজার। গরমে খাকি শর্টস। ঐ বয়সেও নিজে গাড়ি চালাতেন। বোটও চালাতেন বিশেষ বিশেষ ক্রাইসিস্-এর সময়ে।

গরম পড়ে গেছিলো। গরমের সময় সুন্দরবন মোটেই সুখবহ স্থান নয়। তাছাড়া মার্চের শেষ এবং এপ্রিলের প্রথমে কালবৈশাখির কারণে অত্যন্ত বিপজ্জনকও বটে।

বাগচীবাবুর একটি পার্সোনাল মোটর বোট ছিলো। ছোট্ট। কাউকেই দিতেন না সেটি। নাম ছিলো 'লীলা'। নিচে একটি কেবিন। তাতে দুদিকে দুটো বার্থ। পুরোনো দিনের ট্রেনের ফার্স্টক্লাস কামরার বার্থ-এর মতো। লাগোয়া একটি ছোট্ট বাথরুম। তাতে কমোড, শাওয়ার ইত্যাদি লাগানো। পেছনের দিকে এঞ্জিন রুম এবং ক্রুদের কোয়ার্টার। ছাদে সারেঙ্গের ঘর। সে ঘরেও জনাদুয়েক লোক শুতে পারে। ক্যানিং এ গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ভরদুপুরে তো "লীলা"র ইঞ্জিন স্টার্ট করে লঞ্চ ছাড়া হলো। বিকেলের মুখে এমনই হাওয়া উঠলো মাতলা নদীতে যে লীলার লীলাখেলা প্রায় সাঙ্গ হওয়ার উপক্রম হলো। ঢেউ-এর এক এক ধাক্কাতে বোটের মাথা এমন ভাবে উঠতে নামতে লাগলো যে প্রপেলার জল না কেটে হাওয়াই কাটতে লাগলো। স্রোত বয়ে যেতে লাগলো তার মাথা নত হতেই ডেক-এর

BanglaBook.org

উপর দিয়ে প্রবল বেগে। সেই ছোট বোট এখন ডোবে কী তখন ডোবে এমনই অবস্থা। ভয়ে তো আমার মুখ শুকিয়ে গেলো। একে তো সাঁতারে মিহির সেন। তার উপর সবে বিয়ে করেছি এবং একটি মেয়েও হয়েছে। তার বয়স তখন মাত্র দেড় মাস। এমতাবস্থায় হাঙর-কুমীরে ভরা জলে সমাধি হলে বিধবা তো না খেয়েই থাকবে। নিজের চিন্তার চেয়ে হবু-বিধবার চিন্তাই বেশি করে পেয়ে বসলো সেই মুহূর্তে।

কিন্তু বাগচীবাবু সুন্দরবনের সমস্ত এলাকাই জানতেন তাঁর নিজের হাতের রেখারই মতো। প্রত্যেকটি নদী, খাল এমনকি সুঁতিখালও। 'ট্যাঁক'। 'বালি'। কোথায় কোথায় মিষ্টি জলের জায়গা, সব।

মিনিট পনের অবস্থা নিরিখ করে জরীপ করে নিয়েই শান্ত গলায় সারেঙ্গকে মাতলা ছেড়ে বাঁদিকের একটি সরু খালে ঢুকিয়ে দিতে বললেন বোটটাকে। সেই সরু খালও যে মাতাল নয় এমন কোনো গ্যারান্টি ছিলো না। যাক, সে যাত্রা প্রাণটা বাঁচলো।

সন্ধের মুখে একটি বড় খালের মুখে এসে নোঙর করা হলো সেই রাতের মতো। কী অসহ্য হিউমিড্ গরম আর কতরকম যে পোকামাকড় তা কী বলব!

খালি গায়ে শুধুমাত্র শর্টস পরে ডেকে বসে আছি। একটি বই নিয়ে গেছিলাম সঙ্গে। জি. এল. নন্দার লেখা। গান্ধীজীর জীবনী। বসে বসে বইটি পড়ছি বিকেলের মরা আলোয়।

বাগচীবাবু শুধোলেন, কী পড়েন?

বইটা দেখালাম।

উনি খুবই মনমরা হয়ে গেলেন।

বললেন শিকারে এসে গান্ধীর জীবনী! আপনি ডোবালেন মশাই। শিকার তো হবেই না উল্টে বাঘই না খায় আমাদের এ-যাত্রা। আপনার মা-বাবাকে গিয়ে বলবটা কি কিছু অঘটন ঘটে গেলে?

এমন সময় কুক এসে জিগগেস করলো, রাতের রান্না কি হবে?

উনি বললেন, মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত।

যে-কদিন ছিলাম সে যাত্রা চামটার বাঘের হদিসে সে কদিন রোজই এবেলা মাগুর মাছের ঝোল ও বেলা মাগুর মাছের ঝোল। মাগুর মাছ সদ্য-প্রসূতীদের সুখাদ্যর মধ্যে গণ্য বলেই জানতাম। রোজ যে আমাকেও মাগুরের মুগুর হজম করতে হবে তা দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি।

আমারও বলতে ইচ্ছে গেল, ডোবালেন মশায়। কিন্তু পিতৃ-বন্ধু পরম স্নেহশীল গুরুজনকে যে সে কথা বলা চলে না। বয়সে ওঁর ছেলের চেয়েও ছোট হলেও আমাকে 'আপনি' বলে উনি মজা পেতেন।

রাতের খাওয়া দাওয়ার পর ডেকে বসে বাগচীবাবু সবিস্তারে বললেন, এই প্রথমবার কেন ডি এফ ও সাহেব তাঁকে স্মরণ করেছেন এবং চামটায় যাবার অনুরোধ করেছেন।

সবিস্তার বর্ণন শুনে তো মন বলল উল্টোদিকের ট্রেনে চাপি। পাছে না পালাতে পারি তাইই বোধহয় আগে বলেননি কিছু।

উনি বললেন, অনেকদিন ধরেই বাঘের অত্যাচারে জেলে বাউলে মৌলেরা চামটার বিশেষ করে বড় চামটার জঙ্গলে নামতে পর্যন্ত পারছিল না। অনেকগুলো 'কিল' হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। কাজ প্রায় বন্ধ হবারই জোগাড় হয়েছে দেখে ডি এফ ও সাহেব রেঞ্জার সাহেবকে খবর পাঠালেন। তাঁর 'পিটেল' বা পেট্রল বা পাহারাদারী বোট নিয়ে সেখানে

BanglaBook.org

ডিউটিতে যেতে এবং গোলপাতা কাটতে যে সব নৌকো গেছিলো তাদের 'মরাল সাপোর্ট' দেওয়ার জন্যে তাঁর বোট এবং বন্দুক নিয়ে ঐ নৌকোদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে।

গোলপাতা কাটার নৌকোগুলি বিরাট মহাজনী নৌকোর মতো দেখতে হয়। মস্ত মস্ত ছই থাকে তাদের। বিরাট পাল। তবু ছইটি নৌকোর দারুণ দৈর্ঘ্যের সামান্যই ঢাকে। অনেক লোক থাকে এক এক নৌকোতে। সেই সব নৌকোর ভিতরে রান্না-বান্না করলে পাছে আগুন লেগে যায় তাই প্রত্যেক নৌকোর সঙ্গেই থাকে একটি করে ছোট্ট নৌকো। বড় নৌকোর সঙ্গে দড়িবাঁধা। স্টীমারের পালে বাঁধা ছোট গাধাবোটেরই মতো।

এক সন্ধেতে দিনের কাজের শেষে বড় চামটার চওড়া খালের প্রায় মাঝবরাবর গোলপাতার নৌকোগুলি পাশাপাশি নোঙর করে রয়েছে। তাদেরই মধ্যে রেঞ্জার সাহেবের মোটরবোটও। চৈত্র মাসের পূর্ণিমার রাত। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। বাঘের হামলার ভয়েই খালের প্রায় মাঝামাঝিই নোঙর করেছে সকলেই। ঘেঁষাঘেঁষি। কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে। কেউ গান গাইছে। কেউ হুঁকো খাচ্ছে গুড়ুক্-গুড়ুক্ শব্দ করে। ছোট নৌকোগুলিতে শিল-নোড়ায় মশলা বাটার গাবুক-গুবুক্ আওয়াজ উঠছে। ঐ রান্নার নৌকোগুলি এতই ছোট যে শিলনোড়াতে মশলা পেষার ঝাঁকুনিতেই তা দুলে দুলে কুপুত-কুপুত করে মৃদু ছন্দোবদ্ধ আওয়াজ তুলছে জলে। নৌকোর খোলের নড়াচড়াতে ক্ষুদে-ক্ষুদে ঢেউ উঠে ছড়িয়ে যাচ্ছে কাঁপতে কাঁপতে খালময়। নোনা জলের মাঠের উপর চৈতি পূর্ণিমার রাতে আকাশ থেকে নেমে আসা লক্ষ লক্ষ চাঁদের সাপ ঝিলমিল করছে। যতদূর চোখ যায় ছায়া-আলো, সাদা-কালো। খিল্ খিল্ করে চাপা-হাসি হেসে ছুটে যাচ্ছে নাগিনী কন্যার দল। ভেঙে পড়ছে এ ওর গায়ে, ব্রীড়াভঙ্গী করে। যেন অনূঢ়া সব পল্লীবালা, কোনো গোপন মেয়েলি কথায় ফুটে উঠছে সারে সারে সন্ধ্যামালতীর মতো, জলের উছল জমিতে।

রেঞ্জার সাহেব ডেকের উপর ডেকচেয়ার পেতে বসে বাড়ির কথা ভাবছেন। অনেক দিন ছুটি পান না। এই টেনসানের কাজ আর ভালো লাগে না। মাঝে মাঝেই ক্লান্ত বোধ করেন। যারাই বারোমাস বনে জঙ্গলে থাকেন, বিশেষ করে সুন্দরবনে, তাঁদের একঘেয়েমি আর আতঙ্কমিশ্রিত ক্লান্তির একঘেয়েমির কথা তাঁরাই জানেন। বন নিয়ে কাব্য করা তাঁদের আসে না।

যদিও তাঁর নিজের কোনো বিপদ নেই কারণ আজ অবধি সুন্দরবনের ভয়াবহ মানুষখেকো আর যাইই করুক মোটর বোটে উঠে একজন মানুষও নেয়নি। কিন্তু কোনো নৌকোই নিরাপদ নয় অভ্যন্তরের রাতের সুন্দরবনে।

চারদিকে এখন বড় শান্তি। এই বিপদসংকুল চামটাতে আজকের দিনটি বাউলেদের নির্বিঘ্নেই কেটেছে। বনবিবি, গাজী পীর এবং অন্যসব দেবদেবীর কাছে কৃতজ্ঞ ওরা। সকলেই খুশি তাই। জেলে নৌকো থেকে নানারকম মাছ কিনেছে ওরা সকলেই। মশলা পেষার গন্ধেই যেন রান্না করা মাছের ঝোলের গন্ধ পাচ্ছে ওরা হাওয়ায়। ধনে, আদা, শুকনো লংকার মিশ্র গন্ধে নাক ভরে যাচ্ছে সারাদিন পরিশ্রম করা ক্ষুধার্ত মানুষগুলির। কোনো নৌকো থেকে ভাতের ফেন গালার গন্ধ বেরুচ্ছে। ভাত বড় মিষ্টি। দুটি ভাতের জন্যেই তো সব। এত কষ্ট করা।

একটি রান্নার নৌকোতে ঝপাং করে একবার আওয়াজ হলো। খুব জোরে নয়। অনেকে শুনতেই পেলো না লোকজনের কথাবার্তায় এবং নানা মিশ্র শব্দে। যারা শুনলোও তারাও গা করলো না।

BanglaBook.org

পা পিছলে কেউ কি পড়ে গেলো ?

রেঞ্জার সাহেব একবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন চেয়ারে। তারপর আবার আধশোয়া হলেন। ক্ষিদে তাঁরও পেয়েছিলো। তাঁর বোটেও খানসামা রান্না করছিলো। রান্না হলেই খেয়ে শুয়ে পড়বেন তিনিও।

এমন সময় হঠাৎই একটি আর্ত চিৎকারে চমকে উঠলেন তিনি। স্তব্ধ হয়ে গেলো অতগুলি নৌকোর জীবন, গলার স্বর ; অত মানুষের। মুহূর্তের জন্যে। প্রায় সকলেই একসঙ্গে সভয়ে দেখল সেই চন্দ্রালোকিত রাতে একটি কালো, অতিকায় কাকতাড়ুয়া হাঁড়ির মতো গোল কি একটা জিনিস ক্রমশঃ একটি নৌকো থেকে পারের দিকে চলে যাচ্ছে আর তার মুখে একজন মানুষ। তার ডান কাঁধ আর ঘাড় কামড়ে ধরে অবলীলায় সাঁতার কেটে বাঘ চলেছে অনেক দূরের পারের ঘন জঙ্গল লক্ষ্য করে।

কয়েক মুহূর্ত কারো মুখেই কথা সরলো না। তারপরই সকলেই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল।

রেঞ্জার সাহেব গুলিও করতে পারলেন না বাঘকে। রাতের বেলা ঢেউয়ের মাথায় ঢেউ ভেঙে এবং নতুন ঢেউ তুলে কাঁপতে কাঁপতে যাওয়া বাঘকে গুলি করতে গিয়ে মানুষটির গায়েও গুলি লেগে যেতে পারে ! কিন্তু ভয় দেখানোর জন্যে তিনি শূন্যে বার কয় গুলি ছুঁড়লেন পর পর। কিন্তু বাঘ, একেবারেই 'আনডন্টেড' ! তারও বোধহয় খুবই ক্ষিদে পেয়েছিল। নইলে এরকম বেপরোয়া কাজ সে করতো না।

তবুও অত চিৎকার চেঁচামেচি এবং বন্দুকের আওয়াজে বিরক্ত হয়ে ডাঙ্গায় উঠেই মানুষটিকে নদীপারেই ফেলে রেখে সে ওপারের ছায়াঘেরা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

রেঞ্জার সাহেব এবং অন্যান্যরা বোট থেকে জালিবোট নামিয়ে নিয়ে সেখানে পৌঁছে দেখলেন গ্রামের শেয়ালে যেমন করে কইমাছের মাথা চিবিয়ে দেয় সেইভাবেই মানুষটির মাথা চিবিয়ে দিয়ে ফেলে রেখে চলে গেছে বাঘ।

নিস্পন্দ মৃতদেহ তুলে আনলেন ওঁরা। সুন্দরবনের বাদার কোনো গ্রামে বিধবাদের সংখ্যা বাড়লো একজন।

বাগচীবাবু এই কাহিনী শেষ করে সিগারেট ধরালেন একটা। আমি তখন পাইপ খেতাম। আমিও ভালো করে তামাক ঠেসে লাইটার জ্বেলে আগুন ধরালাম আমার পাইপে। বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দেওয়ার প্রয়োজনও হয়েছিল। ওই গল্প শোনার পর।

ভাবছিলাম, এবারে কলকাতার বিধবার সংখ্যাও বাড়বে একটি।

উনি বললেন, কী করে বাঘকে কায়দা করা যায় তাই ভাবছি।

বাগচীবাবু সঙ্গে এনেছেন একটি 'প্যারাডক্স'। পায়ে হেঁটে শিকারের জন্যে এমন অস্ত্র আর হয় না। শর্টরেঞ্জ-এ শটগানের ইমপ্যাক্ট অনেকই বেশি রাইফেলের চেয়ে। স্টপিং পাওয়ারও বেশি। তাই 'প্যারাডক্স'-এর মধ্যে শটগান এবং রাইফেলের গুণাবলীর যেমন সংমিশ্রণ তেমন সংমিশ্রণের কোনো তুলনাই নেই অস্ত্রজগতে। অবশ্য প্যারাডক্স রাজা রাজড়াদের অস্ত্র। আমার বাবারও ছিলো না একটিও। তবে দেখেছি অনেক। প্যারাডক্স সঙ্গে থাকলে একটা বিপদও অবশ্য ঘটে। সব সমস্যাকেই 'প্যারাডক্সিকাল' বলে মনে হয়।

উনি বললেন, ভেবেছিলাম, জালিবোট নিয়ে আসি।

জালিবোট ছোট নৌকো। দুটি দাঁড়-এ বাইতে হয়। রোয়িং বোট-এর টাবপেয়ারের মতো। বোটের সাইজ অনুযায়ী জালিবোটের সাইজ হয়। কারণ জালিবোট থাকে বোটের মাথায়। নিজেদের বিপদে আপদে অথবা অন্যদের বিপদ-আপদ ঘটানোর জন্যে তাকে

BanglaBook.org

জলে নামানো হয়। যেখানে বোটের যাওয়ার উপায় নেই অথবা যেখানে এঞ্জিনের শব্দ না করে নিঃশব্দে যাওয়া দরকার সেখানে জালিবোট নামানো হয় বোট ডুবে গেলেও জালিবোটই লাইফ র‍্যাফ্‌ট-এর কাজ করে।

বললাম, কিন্তু আনেননি তো।

আনিনি চিন্তা করেই। চামটার বাঘেদের কথা এবারে যা শুনছি তাতে জালিবোটে এদের কায়দা করা যাবে না। চামটাতে পৌঁছেই কোনো জেলে বা মৌলে নৌকো নেবো একটা। তাতে করে ঘুরতে হবে। "কিল" ছাড়া কোথায় আন্দাজে মাচা করে বসবেন?

বললাম, আপনি যেমন বলবেন। সুন্দরবন সম্বন্ধে আমি আর কী বলব!

অনেক রকম পোকা মাকড়ের কামড় খাওয়ার পর মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে পুরোনো চালের ভাত খেয়ে খালি গায়ে শর্টস পরে বার্থে শুয়ে পড়লাম। আমি পোর্ট সাইডের বার্থে। বাগচীবাবু স্টার-বোর্ড সাইডের।

বাগচীবাবু বললেন, আজ ভালো করে ঘুমিয়ে নিন। কালকে চামটা পৌঁছনোর পর দিনে ঘুম, রাতে জাগা।

ঘুমিয়ে নিন বললেই ঘুমনো যায় না। ছোট বোটের খোল এবং দুপাশ ছুঁয়ে জল যাচ্ছে কুলকুল করতে করতে। শুকনো ডাল, পাতা ফুল সড়সড় শব্দ করে বোট ছুঁয়ে ভেসে চলেছে। এরা অবিরত যাত্রী। জোয়ারে ভিতরে আসে, ভাঁটায় বাইরে যায়। এই শব্দ অনেক কিছু বয়ে আনে। অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানও। সুন্দরবনের জঙ্গলে বোটে যারা রাত না কাটিয়েছেন তাদের এই অনুভূতির কথা বুঝিয়ে বলা খুবই মুশকিল।

পরদিন ঘুম ভাঙলো বাঁদরদের চেঁচামেচিতে। সুন্দরবনে পাখি কিন্তু হাইল্যাণ্ডের জঙ্গলের চেয়ে অনেকই কম। কেন যে কম তা পক্ষীতত্ত্ববিদরাই বলতে পারবেন। সে কারণেই নিস্তব্ধতাটা বুকের উপরে চেপে বসে।

সজনেখালিও সুন্দরবনের সীমাতেই অবস্থিত। আসল সুন্দরবনে নয়। অনেকে নৌকো করে এই প্রাথমিক সীমার আনাচে কানাচে ঘুরেই অথবা সজনেখালি অবধি গিয়েই এমনই ভাব করেন যেন তাঁরাই সুন্দরবনের "অথরিটি"। জ্ঞানের সীমা চিরদিনই ছিল। কিন্তু অজ্ঞানতা অসীমও হতে পারে। মূর্খরা নিজেদের চিরদিনই সর্বজ্ঞ বলে জানে। সুন্দরবনের "অথরিটির" সংখ্যা সাম্প্রতিক অতীতে খুবই বেড়ে গেছে।

অথরিটি আমিও আদৌ নই। সামান্যই দেখেছি। তবে যতটুকু দেখেছি তা ঐ সব সর্বজ্ঞদের অনেকের চেয়ে বেশি এটুকু সবিনয়ে বলতে পারি।

সকালের চা খেয়েই বোট ছাড়া হল। আর থামাথামি নেই। দুপুরের পরই চামটাতে পৌঁছে যাব। বাগচীবাবু বললেন।

বোট চললো যতখানি জোরে পারে তত জোরে। আমি নন্দাসাহেবের লেখা গান্ধীজীর জীবনী পড়ছি ডেকে বসে পিছনের কেবিনের দেওয়ালে হেলান দিয়ে। বাগচীবাবু কেবিনের ভিতরে নিজের বার্থে জোড়াসনে বসে আছেন। মাঝে মাঝে একটি সিগারেট ধরিয়ে কত কী ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে টানছেন। দুজনের মধ্যে কোনোই কথাবার্তা হচ্ছে না। বৃদ্ধরা মহীরুহর মতো হয়ে যান। মেহগনি অথবা বাওবাব। মহীরুহরা মুখ দিয়ে কথা বলেন না। তাঁদের ভাষা হচ্ছে নীরবতা। যাঁরা বোঝার তাঁরাই বোঝেন।

আমরা পাঁচদিন ছিলাম সেবার চামটাতে। যেদিন হঠাৎ ফিরে আসা মনস্থ করে বাগচীবাবু বোটের মুখ ক্যানিং-এর দিকে ঘুরিয়েছিলেন সেই দিনটি এক বিশেষ দিন ছিলো। আগে না জানানোতে ক্যানিং-এ গাড়িও আসেনি। ফেরার কথা ছিলো আরো দুদিন পরে।

BanglaBook.org

বালীগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে দেখি না-রিকশা, না-ট্যাক্সী, না-কিছু। বাড়িতে ফোন করে গাড়ি আনাবার সময় জানতে পারা গেল যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মারা গেছেন।

বোট চলেছে। দু পাশের হ্যাঁতাল, গেঁয়ো, সাদাবাণীর বন সরে সরে যাচ্ছে। দু পাশের উথ্‌লে-ওঠা ঢেউ কিছুক্ষণ ফোঁসফোঁসিয়ে দুই পারে সরে যাচ্ছে বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করতে করতে। রোদের তেজও বাড়ছে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। গরম লাগায় আমি ভিতরের কেবিনে গিয়ে বসলাম।

বাগচীবাবু বললেন, আসেন।

ব্যস ঐটুকুই।

'আসেন'টুকুও স্বগতোক্তিরই অন্যরকম।

সব মানুষই যদি নীরবতার বাঙ্ময়তার মূল্য জানতো! দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর সত্তাকে এক ধরনের স্থবিরতা দিয়েছিলো যার চেয়ে বেশি চলমান খুব কম সত্তাই হয়। তাই যখনই উনি কথা বলতেন, উৎকর্ণ হয়ে শুনতাম। একজন বৃদ্ধের কাছে যুবকদের যে কতকিছুই শেখার থাকে তা যৌবন যতদিন থাকে ততদিন বোঝা যায় না। চল্লিশ বছর অবধি সব মানুষই ভাবে, জীবন নিরবধি। চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ পেরুলেই যেন পারের আভাস অনুভূত হয়। মন উদাস হয়ে যায়। হাতের রাইফেল, লেখার টেব্‌ল, লনের নিমগাছ সবই থেকে যাবে। চলে যেতে হবে শুধু আমাকে যে-কোনো মুহূর্তে বিনানোটিসে এ কথাটাই বার বার মনে হয়। এখন মনে হয়। তখন হতো না। যৌবন ও জীবনের যে শেষ আছে তা বিশ্বাস পর্যন্ত করতাম না।

এখন শীতের বিকেলের মরা আলো, রুখু উত্তুরে হাওয়ার-ওড়া ঝরাপাতা, ঘরে-ফেরা পাখির কলকাকলী হঠাৎ-ই মনে পড়িয়ে দেয় এখানের এই দুদিন দিয়ে ঘেরা ঘরের মেয়াদ ফুরিয়ে আসার সময় হয়েছে। ঠিক কবে কোন্ মুহূর্তে যে এই রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ ভরা পৃথিবীকে ছেড়ে চলে যেতে হবে তা শুধু সৃষ্টিকর্তাই জানেন। দুঃখ হয় না এই কথা ভেবে। কারণ যেতে তো হবেই সকলকে। আসাই তো যাওয়ার জন্যে। তবে মন যে উদাস হয় না তা বলব না। কত কিছু করার ছিলো, কতো সুন্দর লেখা লেখার ছিলো, কতো ছবি আঁকার, গান গাওয়ার সময়, সময় দিলো না দেবে না। জীবনটা সত্যিই বড় ছোট। পঞ্চাশ পেরিয়ে এই সত্যকে স্তব্ধ হয়ে মেনে নিতে হয়ই।

বাগচীবাবুর মুখে স্মিতহাসি ফুটে উঠলো। বুঝলাম এবার ফ্ল্যাশব্যাক হবে।

বললেন, আপনি অনেকবারইতো বড় বালিতে গেছেন। তাই না?

গেছি। আপনারই আনুকূল্যে। আপনার অনেক বোটের যে-কোনো একটিকে স্বল্প নোটিশে আমাদের সব সময়ই দিয়েছেন বলেই পাঁচ দশ জন অথবা পনেরো কুড়ি জন মিলেও অসংখ্যবার সুন্দরবনে গেছি। অবশ্য প্রায় সব কবারই আপনিও সঙ্গে ছিলেন।

সে কথা ছাড়ুন। আমি তো মক্কেল। উকীল সাহেবকে খাতির করা আমার ধর্ম।

হেসে বললেন, উনি।

কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা মানে বাবার এবং আমার আজও ওঁদের পরিবারের সঙ্গে উকীল-মক্কেলের হলেও বাগচীবাবু বাবার বন্ধুস্থানীয়ই ছিলেন। যদিও বাবার চেয়ে বয়সে অন্তত পনেরো বছরের বড় ছিলেন উনি। উনি যেমন বছরের পর বছর সুন্দরবনের আনাচে-কানাচে আমাদের ঘুরিয়েছেন তেমন উনি এবং গামাবাবুও আমাদের বন্ধু হিসেবে বিহারের হাজারীবাগ এবং ওড়িশার একাধিক জায়গাতে শিকারে গেছেন। আসামের যমদুয়ারেও গেছিলেন একবার। খুবই রসিক মানুষ ছিলেন তো! বাবার সংহারক দলের

BanglaBook.org

সভ্য অথবা অসভ্য হিসেবে ঝুড়ি-ভর্তি কমলালেবু খেতে খেতে অসংখ্য লোক ট্রাকে করে যমদুয়ারের দিকে চলেছি যখন তখন সন্ধের মুখে মস্ত এক লেপার্ড অতি আস্তে এবং ঝাঁকতে ঝাঁকতে চলা ভারাক্রান্ত ট্রাকের সামনে দিয়ে ডাইনে থেকে বাঁয়ে গদাই-লস্করী চালে রাস্তা পেরিয়ে গেলো। কিন্তু গুলি করা হবে কি দিয়ে ? সার সার বন্দুক রাইফেল, তাদের উপর ক্ষণ পরেই বেদম ধকল যাবে বলে রেস্টপীরিয়ডে তখনও বাক্সবন্দী হয়ে নানারকম খাদ্যসম্ভার এবং বিভিন্নাকৃতি হোল্ডঅল্-এর নিচে চাপা পড়েছিলো।

অহীনকাকু আঙুল কামড়েছিলেন।

সেবারে বিখ্যাত আর্কিটেক্ট এবং ব্যালার্ডি, থমসন এন্ড ম্যাথুজ আর্কিটেক্ট ফার্মের অংশীদার, সাহিত্যমনস্ক এবং সাহিত্যিক ভূপতি চৌধুরী মশায়ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

চিতাবাঘটা এমনভাবে ভোগলা দিয়ে চলে যাওয়ায় অহীনকাকুর মুখে তাকিয়ে ছাত্তার প্রবোধ দিয়ে বলেছিলো খোন্‌তো ! চিতাবাঘ আবার বাঘ নাকি ? কত গুলা মারবেন বলেন ?

আমি বললাম, বাগচীবাবুকে, বড় বালির কথা বলছিলেন বলুন।

হ্যাঁ। মনে পড়ে গেলো, গ্রেগরী বলে এক ইংলিশ সাহেবকে নিয়ে এসেছিলাম শিকারে একবার। সঙ্গে তার বৌও ছিলো। এবং আরও তিনজন ইংরেজ। শুয়োর, সুন্দরবনের বাঘে খুব পছন্দ করে বেইট হিসেবে। সুন্দরবনের বাঘ শুয়োর প্রায় খেতেই পায় না বলেই। কিন্তু আমার ক্যানিং-এর লোকজনদের শুয়োর জোগাড় করতে বললে কি হয়, তারা পাঁঠা এনে তুললো বোটে। তখন না-রওয়ানা হলেই নয়, নইলে ভাঁটি পড়ে যাবে। বহু দূর হেঁটে গিয়ে বোটে উঠতে হবে। একসময় সুন্দরবনে কিন্তু শুয়োর ছিল। এমনকি বুনো মোষও ছিলো। সে সব বহুদিন আগের কথা। বড়বালিতে পৌঁছে বাঘের পায়ের দাগের আর গাছে নখ-আঁচড়ানোর রকম দেখে গ্রেগরী তো জেদ ধরল যে পাঁঠা বেঁধেই বসবে। শেষে অতিথিকে বাঘে খাবে, তাই আমাকেও তার সঙ্গী হতে হলো।

মার্চ-এপ্রিল মাস ছিলো। একাদশী-দ্বাদশী হবে। মিচে পাঁঠা বেঁধে তো উঠলাম দুজনে ঝাঁকড়া দেখে একটা কেওড়া গাছে বেলায় বেলায়ই গিয়ে। মশার কামড়ে প্রাণ যাবার জোগাড়। অবশ্য মশা লাগছিলো হাওয়া মরে গেলেই।

প্রহরের পর প্রহর পেরুলো এদিকে একটি বাঘেরও সাড়া শব্দ নেই। পাঁঠারও নয়।

অমন ইন্টেলিজেন্ট পাঁঠা আগে কখনও দেখিনি। তাকে বাঁধা হয়েছিলো আমরা মাচায় বসার পর। সে জানতো না যে শিকারিরা তার প্রাণ রক্ষা করলেও করতে পারে। জানলে, না হয় তার স্বচ্ছন্দ নীরবতার মানে বোঝা যেত। অথচ না জেনেও সে একবারও ডাকলো না। পাঁঠা না চেঁচালে বাঘ জানবে কি করে যে সে আছে ? এবং যে-কোনো মুহূর্তে বাঘ এসে যে তাকে সাবড়ে দেবে সেই আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে আছে ? এদিকে রাত নটা বাজলো। সেই ইন্টেলিজেন্ট পাঁঠার হরকৎ দেখে গাছ থেকে নেমে বোটে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে ঘুম লাগাবার ইচ্ছা ক্রমশই প্রবল হচ্ছিলো আমার। এমন সময় ধানী ঘাসের বনে একদল চিতল হরিণ চরতে চরতে এসে পৌঁছলো। ফিকে জ্যোৎস্নায় তারা চরেবরে ঘাস খেতে লাগলো। মিনিট পাঁচেকও হয়নি এমন সময় হঠাৎ হাঙ্গরে তাড়া-করা মাছের ঝাঁকেরই মতো পুরো দলটা ছত্রখান হয়ে চারদিকে ছিটিয়ে গেল। শিঙালটা বার বার টাঁউ টাঁউ করে ডাকতে লাগলো। বাঘ দেখেছে। বা গন্ধ পেয়েছে।

আমি গ্রেগরীর পায়ে চিমটি কাটলাম। বাঘ নিশ্চয়ই ধারে কাছে পৌঁছেছে এসে। পরক্ষণেই হ্যাঁতাল-এর জঙ্গল ভেদ করে বাঘও এসে দাঁড়াল ধানীঘাসের বনে। বাঘের মতো

BanglaBook.org

বাঘ বটে। পরে গ্রেগরী বলেছিল বোটে ফিরে, "মাই। মাই! দ্যা গ্র্যান্ড ড্যাড অফ অল ড্যাডস!" বাঘটা ডানদিক বাঁদিক মুখ ঘুরালো। দূরে আলো জ্বলা মোটর-বোটটাকে দেখল। জলের উপর আলো বহু দূর অবধি নিঃশব্দে হেঁটে যায়

মেমসাহেব ট্রানজিস্টারে মোৎজার্ট শুনছিলেন বি বি সি'র প্রোগ্রাম। বাঘ সেদিকে দু এক পা এগিয়ে গিয়েও আনকালচারড্ আমারই মতো মোৎজার্টকে বিশেষ সুবিধা না করতে পেরে এক পা এক পা করে পেছিয়ে এলো। তারপর আমাদের কেওড়া গাছের দিকে চাইলো।

কেওড়াতলা নামটির তাৎপর্য নিয়ে নিশীথরঞ্জন রায়, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত বা পূর্ণেন্দু পত্রী কোনো গবেষণা করেছেন বলে জানা নেই আমার। তবে অধুনা কেওড়াতলা হয়তো একসময় সুন্দরবনের মধ্যে ছিলো। সুন্দরবনের কেওড়াতলা আর গঙ্গার খালপাড়ের কেওড়াতলায় তফাৎ বিশেষ নেই। দাহ করার যা অপেক্ষা।

মাচা এমনই করে করা হয়েছিলো এবং আমরা দুজনেই এমনই অনড় ছিলাম যে আমাদের সে ব্যাটা মোৎজার্ট-অবুঝ বাঘের দেখার কথা নয়। ভাবলাম গান-বাজনা ভালো যে না বাসে সে তো খুনী হবেই! সে দু এক পা করে তবু আমাদের দিকেই আসতে লাগলো। তবে কি সে নির্বাক পাঁঠাকে দেখেছে? নিশ্চয়ই তাই হবে।

গ্রেগরীকে আগেই বলা ছিলো যে বাঘ পাঁঠার কাছে এলে, এক গুলিতে তাকে পট্‌কাতে পারবে বলে নিশ্চিত হলেই যেন গুলি করে। পাঁঠাকে ধরলে যখন বাঘের মনোযোগ পাঁঠার দিকেই থাকবে তখন ভালো করে নিশানা নিয়ে ধীরে-সুস্থে যেন মারে। কোনোক্রমেই বাঘকে আহত করা চলবে না। নিহত করার জন্যেই গুলি ছুঁড়তে হবে। গ্রেগরীর হাতে ছিলো একটি পয়েন্ট ফোরটুয়েন্টি-থ্রী ম্যাগাজিন রাইফেল। অত কাছ থেকে ঐ রাইফেলের মার খেলে বেজায়গায় লাগলেও বাঘের অবস্থা কাহিল হবেই। কিন্তু বেজায়গায় না লাগলেই মঙ্গল।

বাঘ সাবধানে এগোচ্ছে। গ্রেগরীর দুটি হাতও রাইফেলের উপরে শক্ত হয়ে আসছে। হাত বেশ ভালোই ছিলো গ্রেগরীর। আগের দিন জলের মধ্যে একসঙ্গে একাধিক খালি বীয়ারের বোতল দূরে ছুঁড়ে দিচ্ছিলো তার বন্ধু কেউ এবং গ্রেগরী র‍্যাপিড শুটিং করছিলো। ওরকম হেভী রাইফেলে, আকণ্ঠ বীয়ার পান করেও যে উড়ন্ত ভাসন্ত এবং ডুবন্ত বোতলে পটাপট গুলি লাগাতে পারে তার হাত ভালো বলতেই হয়। তাছাড়া হাত ভালো না হলে সুন্দরবনে তাকে নামিয়ে বাঘ মারাতে নিয়েও যেতাম না।

তারপর কি হলো?

আমি শুধোলাম।

বাঘ ততক্ষণে বেশ কাছে এসে গেছে। গ্রেগরী একবার রাইফেল তুলতেও গেল। আমি ওর হাঁটুতে আস্তে করে হাত ছোঁয়াতেই গ্রেগরী রাইফেল আর ওঠালো না।

কী মনে করে বাঘ পেছিয়ে গেল। তারপর গাছটার চারপাশে চক্কর লাগিয়ে ইনভেস্টিগেট্ করবে বলেই বোধ হয় অদৃশ্য হয়ে গেল। তবুও হতভাগা পাঁঠা চুপ। দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টাও করে না মোটে। দিব্যি হাঁটু মুড়ে বসে পাতা চিবোচ্ছে। এ ব্যাটা বোকাপাঁঠা জন্মে কোনোদিনও জামাইবাবুর অথবা শালীর সঙ্গে চিড়িয়াখানায় গিয়েও বাঘ দেখেছে বলে মনে হলো না তার ভাবগতিক দেখে। বাঘের সঙ্গে চিনেবাদামের তফাৎও সে জানে না।

মিনিট খানেক বাদেই বাঘকে আবার শোনা গেল। খশস্ খশস্। ফুরফুরে হাওয়া ছেড়েছে ততক্ষণে। চাঁদের আলোয় চারিদিকের হ্যাঁতালের পাতা কেওড়ার বড় বড়

শাখাপ্রশাখা, ধানীঘাসের তৃণভূমি, দূরের জলরেখা সব চক্‌চক্ করছে বেশ লাগছে গ্রেগরী এখন বাঘটাকে সাবড়ে দিলেই একটা সিগারেট ধরাতে পারি অনেকক্ষণ সিগারেট খাইনি।

আবারও বাঘকে দেখা গেল এবার গুঁড়ি মেরে পাঁঠার দিকে এগোচ্ছে। এখন বেশ কাছেই এসে গেছে। রাইফেলে টর্চ লাগানো না থাকলেও গ্রেগরীর মতো শিকারির গ্রীষ্মর এমন চাঁদের রাতে এই টার্গেট মিস্ করার সম্ভাবনা কম। এবারে আমার সংকেতের অপেক্ষা না করেই গ্রেগরী আস্তে, অতি আস্তে রাইফেল তুলতে লাগলো। এতই আস্তে যে, তুলছে বলে পাশে-বসা আমারও মনে হলো না।

আমিও এবার আমার ডাবল-ব্যারেল চার্চিলটা উঠাতে লাগালাম কাঁধে। যদি গ্রেগরীর গুলিতে বাঘ না-পট্‌কায় তবে তার পট্‌কাবার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা প্রয়োজন।

সুন্দরবনের জঙ্গলে আহত বাঘকে ফেস্ করার অভিজ্ঞতা বার কয়েক হয়েছিলো আমার। সে অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি মোটেই সুখকর হবে না। তাই কোনোরকম ঝুঁকি নিতেই চাইনি আমি।

গ্রেগরীর রাইফেল ততক্ষণে ডান বাহু আর কাঁধের সংযোগস্থলে পৌঁছে গেছে। ট্রিগারে এবার ফারস্ট-প্রেসার লাগাবে। আমার বন্দুকের কুঁদোও ডান উরু আর কোমরের সংযোগস্থলে পৌঁছে গেছে। ট্র্যাপ শুটারের মতো মারব মুহূর্তের মধ্যে। প্রয়োজন হলেই।

ঠিক সেই সময়ই সেই বঙ্গীয় অজপুঙ্গব তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে শুদ্ধ স্বরে ন্যাচারাল 'বি'তে মুদারাতে বললো ব্যাঁ-এ-। সঙ্গে সঙ্গে "সি শার্প"-এর তারায় বাঘ বললো, ভ্যাঁ-এ-এ। বলেই, এক লাফে পগার পার।

তার লেজের চুলও আর দেখা গেলো না।

আমরা তো হতভম্ব পাঁঠার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে। পাঁঠাও ইকুয়ালি হতভম্ব অমন গোলমুখ সাদা দাড়িওয়ালা বোঁটকা গন্ধের ডোরাকাটা জামা পড়া জীবটিকে দেখে। বাঘও হতভম্ব কালো কালো চারঠ্যাঙ্গের আজীব জীবকে দেখে ও তার জাঁবাজ আওয়াজ শুনে।

গ্রেগরী গেল বেজায় চটে পাঁঠাটার উপর। চটে গিয়ে কেষ্টর জীব, কালিঘাটে বলিযোগ্য অজপ্রবরকে কুকুরীর বাচ্চা বলে গাল দিলো।

হাসি চাপতে না পেরে আমি হো হো করে হেসে উঠে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর দুজনে নামলাম মাচা থেকে। গ্রেগরী তার রাইফেলটা আমার জিম্মাতে দিয়ে পাঁঠার দড়ি খুলে দড়ির শেষ প্রান্ত হাতে নিয়ে বোটের দিকে চললো। তখন পাঁঠাকে আর পায় কে?

পাঁঠাদের ইতিহাসও মানুষদের ইতিহাসেরই মতো পয়সা দিয়ে পেটোয়া লোককে দিয়ে লেখানো হলে, ঐ পাঁঠা ভিক্টোরিয়া ক্রশ থেকে আরম্ভ করে পরমবীর চক্র সবই পেতে পারতো এবং পাঁঠাদের ইতিহাসে পরম দেশপ্রেমী বলেও বিবেচিত হতো।

কিন্তু পরক্ষণেই সে ব্যাটা চালাক-পাঁঠার গলার জুয়ারীই অন্যরকম বলতে লাগল। "তারা"তে সে সমানে ভয়-কম্পিত গলায় চেঁচিয়ে চলেছে। মনে হলো, সে আগে বাঘ কখনও না দেখলেও হয়তো ঠাকুমার মুখে গল্প শুনেছিল।

পুরুষমানুষ বিয়ের সময় যেমন পাঁঠারই মতো আনন্দে হাসে এবং তারপর যতই দিন যায় ততই ঘটনাটার ভয়াবহতা সম্বন্ধে অবহিত হয় এই পাঁঠাও তেমনি বাঘ পালাবার পরে নিজেই ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল তার পরিণতি কি হতে পারতো ভেবে।

গ্রেগরী একবার দাঁড়িয়ে পড়ে তার মীরশ্যাম্ পাইপে ভাল করে গোল্ড-ব্লক তামাক

BanglaBook.org

ঠুসতে লাগলো। আমি একবার পেছন ফিরে দাঁড়ালাম। সুন্দরবনের বাঘ! আমাকে দেখে গ্রেগরী বললো, বাঘের জুজুবুড়ি আমাদের সঙ্গে আছে। বাঘ আর এসেছে এদিকে! বাঘ তো আর জানে না যে এখন পাঁঠা নিজস্বতা ফিরে পেয়েছে।

আমি হাসলাম ওর কথা শুনে।

ব্যাপারটা হলোটা কি?

গ্রেগরী শুধালো আমাকে।

বলেই তো ছিলাম যে পাঁঠা বাঁধলে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের বাঘ তাকে ছোঁবে না।

ছুঁক কী নাইই ছুঁক, বাঘের এতো ভয় পাবার কি ছিলো?

বাঃ। অচেনা জন্তু দেখে ভয় পাবে না?

সুন্দরবনের গভীর বনের বাঘের কাছে পাঁঠাও যা, ডায়নোসরও তা। ধারে কাছে মানুষের বসতি তো নেই। পাঁঠা দেখবে কি করে?

গ্রেগরী বললো, যাইই বল আর তাইই বলো, নেভার সীন সাচ্ আ ডেয়ার ডেভিল পাঁঠা!

আজকে বাগচীবাবুকে গল্পে পেয়েছে। কখনও সখনও পায়। পেলে, আমি তার পুরো ফায়দা উঠিয়ে নিই।

গ্রেগরীসাহেবের ঐ ইন্টেলিজেন্ট পাঁঠার প্রসঙ্গ ওঠায় আমার মনে পড়ে গেলো যে ওড়িশার কুখ্যাত কালাহাণ্ডীর মানুষখেকো বাঘে ভরা জঙ্গলে দেখেছিলাম যে স্থানীয় শিকারিরা 'বেইট'-হিসেবে পাঁঠাকে বাঁশের মাচা বানিয়ে তার উপরে বেঁধে রাখেন। এমনটি আর কোনো জঙ্গলেই দেখিনি। সেখানের বাঘেরা হয়তো পথ চলতে চলতে অনেক শহুরে যুবকের মতোই দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে-থাকা সুন্দরী মেয়েদের দেখার অভ্যেসে অভ্যস্ত। সে কারণেই তাদের চোখ যাতে সহজে পাঁঠার উপরে পড়ে তাই পাঁঠাদের মাচার উপরে বাঁধার বন্দোবস্ত সেখানে। মাচা অবশ্য খুব উঁচু হয় না। এক কোমর মতো। এবং সেই মাচায়-বসা পাঁঠার কাছেই গাছের উপরের মাচায় শিকারি তার অপেক্ষায় থাকে। ঐ জঙ্গলে আন্ডারগ্রোথ খুবই বেশি। বিশেষ করে শীতকালে। তাতে জমিতে দূর থেকে নজর চলে না, যেমন চলে না সুন্দরবনেও। তাই-ই হয়তো ঐ ব্যবস্থা কালাহাণ্ডীতে। সুন্দরবনে কেউ এই কায়দা করে ফল পেয়েছেন কি না তা জানা নেই অবশ্য।

বড় চামটাতে গিয়ে যখন পৌঁছনো হলো তখন দেখি জনমানব তো দূরের কথা পাখ্-পাখালি পর্যন্ত নেই। বাগচীবাবু ভেবেছিলেন জেলেদের কি মৌলেদের কোনো নৌকো নিয়ে নেবেন জালি-বোটের বিকল্প হিসেবে কিন্তু সে তল্লাটে কোনো নৌকো আদৌ থাকলে তো!

সুন্দরবনে বহুবারই গেছি কিন্তু সে বারের মতো অমন নির্জনতাকে কখনও প্রতিভাত দেখিনি বিশেষ করে বছরের ঐ সময়ে যখন মৌলেদের মরশুম। নগ্ন নারীর গা-ছমছম ভয়ানক সৌন্দর্যরও নগ্নতম সত্তা থাকে। এই সুন্দরবন যেন সেই সত্তাতেই প্রতিভাত হয়েছে এবারে।

সারা দুপুর ধরে ম্যাপ খুলে বসে পাইপ আর সিগারেট ধরিয়ে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া হল। তারপর বিকেলে বোট পাড়ে লাগিয়ে নামা গেল। ম্যাপে, কোথায় কোথায় কিল হয়েছে তা চিহ্ন দেওয়া ছিল। আমরা যাওয়ার অল্প কিছুদিন আগেই চামটাতে একদল শিকারির যা অবস্থা হয়েছিলো সে খবরও আমাদের অজানা ছিলো না। শিকারিও তাঁরা আমাদের চেয়ে ভালোই ছিলেন। এবং তাঁরা ছিলেন সুন্দরবনের পোকা।

বাঘের পায়ের দাগ দেখে চলাচলের হদিস করে তাঁরা মাচা বাঁধতে নেমে ছিলেন ডাঙ্গাতে। তিন চারজন শিকারি সঙ্গে দুজন মাল্লা নিয়ে নামলেন। কাঠের তক্তা মাথায় করে এগোচ্ছিলেন মাল্লারা। এমন সময় বাঘ একজন শিকারিকে 'পেড়ে' ফেললো। একেবারে অতর্কিতে। সিংপল্ ফাইলে যাচ্ছিলেন তাঁরা অন্য শিকারিরা সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতি, দুঃসাহসী সেই বাঘকে গুলি করলেন। বাঘ আহত হলো কিন্তু একটুও দমলো না।

ঐ ব্যাপার দেখে তক্তা-মাথায় করেই একজন মাল্লা প্রাণের ভয়ে বোটের দিকে ছুট লাগালো। বাঘ তার পেছনে উড়ে এলো টাইগার-মথ প্লেনের মতো আওয়াজ করে। সে বেচারী ততক্ষণে প্রায় বোটের কাছে পৌঁছে গেছিলো। বোটের লোকজন ডেক্-এর উপরে দাঁড়িয়ে গুলির শব্দ শুনে এবং তাকে এবং বাঘকে আগুপিছু দৌড়ে আসতে দেখে জোর হল্লা করে উঠলো। দূর শালা! মর্ শালা! ইত্যাদি অনেক ডেরোগেটরী মন্তব্যও বর্ষিত হতে লাগলো সেই হারামজাদা বাঘের প্রতি।

অতলোকের সান্নিধ্যে পৌঁছে মাল্লা ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলো। ধপ্পাস্ করে তক্তা ফেলে বোট আর ডাঙ্গার মধ্যে সাঁকোর মতো যে তক্তাটি পাতা ছিলো তার দিকে প্রাণপণে দৌড়ে এলো সে। কিন্তু বোটে ওঠার আগেই অতজন অসহায় মানুষের অস্তিত্ব এবং গলার জোরকে অগ্রাহ্য করে চোখের সামনে বাঘ সেই মাল্লাকে পেড়ে ফেলে তার দফা রফা করে দিলো। অতক্ষণ যারা চিৎকার করছিলো তারা হঠাৎই বোবা হয়ে গেলো।

শুধু তাই-ই নয়,সেই শিকারিদেরও একজনকে মেরে ফেলেছিলো এবং দু'জনকে আহত করেছিলো সে সাংঘাতিক ভাবে। যমে আর সুন্দরবনের বাঘে কোনোই তফাৎ নেই। সে যাকে ধরবে বলে মনস্থির করে তার আর নিস্তার নেই কোনো।

এখন রোদ পড়ে এসেছে। বোট থেকে নেমে ধীর পায়ে এবং অস্থির মনে আমি আর বাগচীবাবু আলাদা হয়ে গেলাম। আমার হাতে আমার বহুদিনের বিশ্বস্ত ও প্রিয় সঙ্গী থ্রী-সিক্স্টি সিক্স ম্যানলিকার শুনার রাইফেলটি। কোনো জানোয়ার চেহারা দেখালে পাঁচ-সাত সেকেন্ডের মধ্যে তাকে ধরাশায়ী করতে যে পারব সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ সেই বয়সে ছিলো না সেই রাইফেলটি হাতে থাকলে। কিন্তু আমি তাকে দেখার আগে সে যদি আমাকে দেখে পেছন থেকে কোণাকুণি লাফ মেরে ঘাড় আর কাঁধের মধ্যে কামড়ে পেড়ে ফেলে তাহলে করার বিশেষ কিছু ছিলো না।

অন্য যে-কোনো জানোয়ারকেই দেখামাত্রই গুলি করা চলে। কিন্তু পায়ে হেঁটে শিকার-করা শিকারি মাত্রই জানেন যে বাঘকে গুলি করার আগে অনেক ভাবাভাবি করতে হয়। তার শরীরের ভাইটাল অংশ দেখা না গেলে গুলি আদৌ করা উচিত নয়। বাঘ তো বাঘই! তবুও গুলি-না-খাওয়া বাঘ আর গুলি-খাওয়া বাঘে তফাৎ বিস্তর।

একা হয়ে যেতেই চারদিকের হ্যাঁতালের ঝোপের মধ্যে হাজার হাজার বাঘ দেখতে লাগলাম। মিথ্যে বলব না, ওসব গল্প শুনে শুনে মনের মধ্যে ভয় সেঁধিয়ে গেছিলো।

কোনো পাখি নেই, কোনো প্রাণী নেই, জলের পাশের কাদার উপরে টাটকা দাগ বাঘের পায়ের থাবার। তখনও তাতে জল চুঁইয়ে ঢুকছে। বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ নোনা-নোনা। জন্মের গন্ধর মতো মৃত্যুর গন্ধ নোনা। ভাবছিলাম।

জায়গাটাকে ভালো করে নিরিখ করে অন্ধকার হবার আগেই বোটে ফিরে আসব দুজনেই এমনই কথা ছিলো। কিন্তু সামনে দেখব না পেছন সামলাবো এই হলো সমস্যা। সুন্দরবনে যা চিরদিনের সমস্যা। একবার মনে হলো 'কু' দিয়ে বাগচীবাবুকে ডাকি। দুজনে একসঙ্গেই থাকা ভালো। কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে। বাগচীবাবুকে তখন আর দেখা যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

হঠাৎ একদল বাঁদর-এর আওয়াজ কানে আসায় সেই মৃত্যুপুরীর অসহনীয় নির্জনতার মধ্যে আশ্বস্ত হলাম। তারা পুবে মুখ করে ঝাঁপাঝাঁপি ডাকাডাকি করছিল। তারা যে গাছে ছিলো তার ঠিক নিচে গিয়ে যেই দাঁড়িয়েছি ঠিক সেই সময় বাগচীবাবুর 'কু' শুনলাম পুব থেকে। মানে, যেদিকে মুখ করে বাঁদররা ডাকছিলো

সাবধানে ঐ দিকে এগোতে লাগলাম। শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং প্রত্যেকটি স্নায়ুকে সজাগ করে। চারদিকেই বাঘের পায়ের দাগ। একটি মদ্দা বাঘ ও একটি মাদীর। বোট থেকে নামার সময় যে বাঘের পায়ের থাবার দাগ দেখেছিলাম এখানের দাগগুলোর সঙ্গে সেই দাগের মিল নেই। বাঘেরা যে প্রক্রিয়ায় তাদের এলাকা হাইল্যান্ডস্ ফরেস্টে ডিমার্কেট্ করে হুবহু সেই প্রক্রিয়ায় সুন্দরবনে করে কী না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। ম্যাংগ্রোভ ফরেস্ট-এর নিয়ম-কানুন আলাদাও হতে পারে। নইলে, অত স্বল্প দূরত্বের মধ্যে দুটি পৃথক মদ্দা বাঘের পায়ের দাগ চোখে পড়ার কথা ছিলো না। জানি না,আমার এই অনুমান ভ্রান্তও হতে পারে। সুন্দরবনে এখন 'টাইগার-প্রোজেক্ট' হয়েছে, সেখানকার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিত অভিজ্ঞ অফিসারদের সুন্দরবনের বাঘকে অনেক ভালোভাবে লক্ষ্য করার মতো যথেষ্ট সময় ও আধুনিকতম প্রযুক্তিও আছে। তাঁরা আমার এই মত ভ্রান্ত কি না তা বলতে পারবেন।

বাগচীবাবু যেখান থেকে 'কু' দিয়েছিলেন সেখানে পৌঁছে দেখি উনি সদ্য-নিহত একটি মস্ত চিতল শিঙালের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। বাঘেই মেরেছে শিঙালটিকে। তার সারা গা গরম রক্তে ভেজা। রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে তখনও। বাঘ যে বাগচীবাবুকে দেখে একটু আগেই সরে গেছে তা বোঝা গেল। শিকারির পোশাক ও হাতের আগ্নেয়াস্ত্র অন্য জঙ্গলের বোকা বাঘেরাও ভালোই চেনে। আর এদের তো কথাই নেই।

চোখে চোখে ইসারা হলো আমাদের। আমরা আবারও দুদিকে সরে গিয়ে একলা হয়ে গেলাম তারপর বাগচীবাবুর নীরব নির্দেশমতো দুজনে সেই নিহত শিঙালের তিরিশ চল্লিশ গজ দুপাশে দুটি গাছ দেখে দশ ফিট মতো উপরে উঠে বসলাম।

বাঘ হয়তো আড়াল থেকে আমাদের দেখছে। কিন্তু সুন্দরবনের বাঘের দুঃসাহসের কোনো সীমা পরিসীমা নেই বলেই আমরা একটা চান্স নেবার জন্যে তৈরি হলাম। অন্য কোনো জঙ্গলের বাঘ হলে সে আর ধারে কাছেই থাকতো না কিন্তু এখানের বাঘ আছাড়ি-পট্‌কার আওয়াজ বা রাইফেলের নির্ঘোষ শুনে দূরে না গিয়ে কাছে আসে। পৃথিবীর আর কোনো জায়গার বাঘই এমন করে বলে জানা নেই আমার।

আমি যে গাছে উঠলাম সেটি সুন্দরী গাছ। বেশ ঝাঁকড়া। ওখানে বসে চারদিক দেখতে অসুবিধাই হচ্ছিলো কিন্তু ভাবছিলাম, আমাকে যদি গাছে উঠতে না দেখে থাকে বাঘ, তাহলে বাঘের আমার গাছের নিচ দিয়ে যাওয়া বা আসা অসম্ভব নয়।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। আশ্চর্য এক বিধুর গা-ছমছম্ অতীন্দ্রিয় নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে চারদিকে। বাঁদরগুলোও আর ডাকছে না। চামটার এই জঙ্গলে যম ছাড়া আর কেউই যে আছে তা মনে হচ্ছে না এখন। কী আশ্চর্য সুন্দর যে দেখাচ্ছে চারদিক আসন্ন-সন্ধ্যার আগে তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই।

জোরে সুঁতিখালে জল ঢুকছে। এখন জোয়ার দিয়েছে। আমরা বড় জোর ঘণ্টা খানেক বসে থাকতে পারব মনে হয়, নইলে জল এসে পৌঁছে যাবে গাছ-গোড়াতে। এসব বাগচীবাবুই ভালো জানেন। তাঁর সঙ্গে জোয়ার-ভাঁটার চার্ট থাকে। সুন্দরবনের আনাচ-কানাচ যেমন তাঁর জানা, তেমন জানা জোয়ার-ভাঁটার নাড়ি-নক্ষত্র। বোধহয় একবারই মাত্র তাঁর ভুল হয়েছিলো এবং সেই ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছিলো প্রায় আমাদের

BanglaBook.org

জীবন দিয়েই। সে কথা একটু পরেই বলছি।

এই আমার দোষ এবং এই দোষেই কোনোদিনও পুরোপুরি শিকারি হয়ে উঠতে পারলাম না। নিসর্গ সৌন্দর্য আমার মতো একজন বেরসিক মানুষকেও এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে যে আমি কবি বা চিত্রকর হলে হয়তো মানিয়ে যেত। কেবলই ভুলে যাই বিপদের কথা, স্থান কালের কথা। শুধু মনে হয় কী সৌভাগ্য আমার! এই আশ্চর্য সুন্দর ঐশ্বরিক সব মুহূর্তের ভাগীদার হতে পারলাম! সেই আনন্দর তুলনায় নিজের জীবন-হারানোর ভয়টাকে ভয় বলেই মনে হয়নি কখনও। সাহসী বলে নয়; মূর্খ বলেই।

হঠাৎ উত্তরের ঘন হ্যাঁতালের ঝোপ থেকে একদল চিতল ডাকতে লাগলো উত্তেজিত স্বরে। তারপরই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে দলছুট হয়ে দক্ষিণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েই আবার দলবদ্ধ হলো। এবং ঠিক সেই সময়েই দেখা গেলো বাঘকে। শেষ সূর্যের আলো পড়েছিলো তার লাল-সাদা-কালো শরীরে। সুন্দরবনের বাঘের চেহারার সঙ্গে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশের বা আসামের বাঘের চেহারার অনেকই অমিল আছে। সুন্দরবনের বাঘ অনেক ছিপছিপে, চটপটে এবং প্রায়ই কাদা জল মেখে থাকাতে তারা মোটেই সুদৃশ্য নয়।

বাঘ আমার গাছের দিকেই আসছে মনে হলো। একমুহূর্তই দেখলাম। পরমুহূর্তেই সে হ্যাঁতালের ঝোপের আড়ালে পড়ে গেল।

আস্তে করে রাইফেল তুললাম। হ্যাঁতালের ঝোপ নড়লেই তার উচ্চতার আন্দাজ নিয়ে গুলি করব ঠিক করলাম। আমার ম্যাগাজিন রাইফেল। প্রথম গুলি লাগাতে পারলে তারপর তাকে দেখা যাবে। কিন্তু আশ্চর্য! সেই যে এক লহমা দেখা দিল তার পরই যেন সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভাবলাম, হয়তো নিহত হরিণটির কাছে ওঁড় মেরে আসছে। তাই মনোনিবেশ করলাম যেখানে হরিণটি পড়ে ছিলো সেখানে। এদিকে গাছের ছায়ারা দ্রুত দীর্ঘতর হয়ে আসছে। প্রতিমুহূর্তে অন্ধকার নেমে এসে ছেয়ে ফেলছে এই যমপুরী, এক প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় কালো বাদুরের ডানারই মতো। রুদ্ধশ্বাসে বসে আছি। জোয়ারের উপচোনো জলের মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এখানে জোয়ার আসে প্রেমিকের মতো। তার পায়ের শব্দ শোনা যায় না। গর্ভাধানের মতো নিঃশব্দ নিভৃত কটুগন্ধ তার জলজ পদসঞ্চার। নিঃশব্দ শব্দময়তায় দ্বিধাগ্রস্থ স্নিগ্ধ বিস্তার তার। বড়ে গুলাম আলী খাঁ সাহেবের আলাপের মতো। এই সব ভাবছি যখন ঠিক তখনই আমারই গাছের কাছ থেকেই হঠাৎ 'কু' শোনা গেলো। চমকে তাকিয়ে দেখি, জঙ্গল ফুঁড়ে উঠে বাগচীবাবু দাঁড়িয়ে আছেন মাটিতে "প্যারাডক্স" হাতে আমার গাছের থেকে দশ গজ সামনে। এবং ঠিক তাঁর পেছনেই বাঘ! বাগচীবাবুরই লাইনে। গুলি করা অসম্ভব। বাগচীবাবুকে না মেরে বাঘকে মারা অসম্ভব। রাইফেল কাঁধে তুলেই চেঁচিয়ে বললাম, পেছনে বাঘ!

সঙ্গে সঙ্গেই উনি অ্যাবাউট-টার্ন করলেন। ঐ বয়সেও ওঁর শারীরিক ত্রস্ততা ও ক্ষিপ্রতাতে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার "পেছনে বাঘ"! বলার সঙ্গে সঙ্গে এবং ওঁর ঘুরে দাঁড়াবার আগেই বাঘ আবার আলো-আঁধারীর হ্যাঁতাল ঝোপ হয়ে গেল।

বাগচীবাবু আমাকে নেমে আসতে বললেন। তাড়াতাড়ি নেমে আসতেই উনি বললেন, জোয়ার একটু পরেই ভরা হবে। এরপর আর ফেরা যাবে না। এখানে কোনো 'ট্যাঁক'ও নেই। খুব সাবধানে আপনি আগে আগে বোটের দিকে এগোন। আমি পিছনে দেখছি।

'ট্যাঁক' হচ্ছে বনের মধ্যের উঁচু জায়গা যেখানে জোয়ারের জল পৌঁছয় না এবং

BanglaBook.org

জানোয়ারেরা জোয়ারের সময় 'ট্যাঁক' থাকলে সেখানেই আশ্রয় নেয়। খাদ্য ও খাদক নির্বিশেষে। কথা না বলে, রাইফেলের স্মল অফ দ্যা বাট মুঠোয় শক্ত করে ধরে ট্রিগার গার্ডে আঙুল এবং সেফটি-ক্যাচে ডান হাতের বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে আমি এগোতে লাগলাম ভূতেরই মতো সেই ছায়া ঘেরা যমভূমিতে। তখন বাঘ মারার ইচ্ছে সম্পূর্ণ উবে গেছিলো। মন বলছিলো, কখন গিয়ে বোটে উঠব। পারব তো উঠতে ? যেখানে দিনের আলোতেও যম স্বচ্ছন্দ সেখানে অন্ধকারে তো কথাই নেই। গুলি-ভরা রাইফেল-বন্দুক হাতে ধরা অবস্থাতেই কত শিকারির শেষ নিঃশ্বাস যে পড়েছে এখানে তার হিসেব নেই।

বোটের ডেক-এর উপরে হ্যাজাক জ্বলছিলো। বোট অবধি তো প্রাণ নিয়ে ফেরা গেল। বোটে উঠে আমি বললাম, অমন চান্স আর পাওয়া যাবে না। প্রথমবার আরেক সেকেন্ড যদি চেহারা দেখাত আর দ্বিতীয়বার যদি ঠিক আপনার পেছনেই না থাকতো····।

বোটের ডেকে বালতি করে তোলা জলে পায়ের কাদা ধুতে ধুতে বাগচীবাবু বললেন, ভি. এস. ও. পি. না কি এনেছেন দ্যান তো দেখি গেলাসে একটু ঢেলে।

তারপরই বললেন, সে ব্যাটা বাঘও এখন এই কথাই বলছে।

কি কথা ?

অমন চান্স আর পাওয়া যাবে না। আরেক সেকেন্ড যদি···।

যাই-ই বলেন, জালিবোটটা না এনে বড় ভুলই হয়েছে। এখন যা হলো। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে এমন ঝুঁকি আমি আর নেবো না। আমার কী। আই হ্যাভ লিভড মাই লাইফ। আপনার মা-বাবাকে গিয়ে কি বলব ?

আমি বললাম, বাঃ। ওঁরা তো জানেনই যে বাঘ শিকারেই এসেছি, মানুষখেকো।

তা ঠিক। তবে আপনি যখন বাবা হবেন, বয়স হবে, তখন বুঝবেন পুত্রস্থানীয় কারো ডেড-বডি নিয়ে বন্ধুর কাছে যেতে কেমন লাগে। আমার একবারের অভিজ্ঞতা আছে। তাছাড়া এখানে ডেডবডিও যে ফিরে পাবো তেমন কোনো গ্যারান্টিও তো নেই। কাল থেকে অন্য বুদ্ধি করতে হবে।

কি বুদ্ধি ?

দাঁড়ান। একটা সিগারেট ধরাই। ব্র্যান্ডিটা আস্তে আস্তে খাই। তারপর দেখি ভেবে।

বাগচীবাবু বললেন, চলেন তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে সারারাত বোট নিয়ে ছোট ছোট খালে ঘুরি সার্চলাইট জ্বেলে। জালিবোট বা জেলেদের বোট থাকলে সারাটা দিন জেলেদের মতো সেজে বৈঠা বেয়ে ঘোরা যেত। নৌকো লাগিয়ে ভালো করে দেখা যেত। সুযোগ হয়তো পেলেও পাওয়া যেতো। নৌকো না থাকায় কী যে করি, ভেবেই উঠতে পারছি না।

তারপর বললেন, এক কাজ করা যাক। কাল সকালেই আপনি একটা খুব বড় শিঙাল হরিণ মারেন। সেইটাকে বেইট্ করে দুজনে দুপাশের গাছে বসে থাকব সারা দিন। বাঘের ইচ্ছে হলে সে আসবে। তবে বসতে হবে চামটার অন্য দিকে। সীরিয়াসলি চেষ্টা না করলে বিবেকই····

বিবেক কে ?

আমি শুধোলাম। ডি এফ ও সাহেবের নাম কি বিবেক নাকি ?

দূর। তা নয়। বিবেক মানে আমার বুকের বিবেক। এত ভরসা করে ডি এফ ও আমাকে ডাক পাঠালেন। বিবেকের কাছেও তো জবাবদিহি করতে হয়।

ভালো ভালো শিকারিদেরও এখানের বাঘে যে "ট্রিট" দিয়েছে তাই কোনো শিকারিই আর এমুখো হচ্ছেন না।

BanglaBook.org

আমি বললাম, আমাকে আপনি কাল সকালে নামিয়ে দিন। সন্ধেবেলায় আবার তুলে নেবেন। দেখি আমি একবার চেষ্টা করে।

না তা হয় না। আপনাকে একটা কথা বলি। সাহস খুব বড় গুণ। আপনার হাত ভালো। সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। সাহস সম্বন্ধেও নেই। কিন্তু আপনার বয়স তো তিরিশও হয়নি। আপনি লেখেন টেখেন, গান টান গান। একটাই জীবন নিয়ে একজন মানুষের কত কী করার থাকে, যাদের করার মতো কিছু থাকে। জেদ করে বাহাদুরী করে বাঘ মারতে গিয়ে আপনি মারা গেলে অনেক কাজই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। জীবনে পারস্পেকটিভ, প্রায়রিটি এসবের খুব বড়ই ভূমিকা আছে। জীবনের শেষে পৌঁছে এখন বুঝি। যে ক্ষেত্রে আপনি বেঁচে থাকলে এই ক্ষেত্রে মৃত হওয়ার চেয়ে অনেক বড় কিছু করতে পারার সম্ভাবনা আছে সেই ক্ষেত্রের জন্যে আপনাকে জীইয়ে রাখা দরকার। অন্ততঃ আমার হেপাজতে যতক্ষণ আছেন। আত্মহত্যা আর সাহসিকতা সমার্থক নয়। বড় চামটার একটি বাঘ মারতে গিয়ে আপনি মারা গেলেও সুন্দরবনের নরখাদক বাঘেদের অগণ্য সংখ্যার কিছুমাত্র হেরফের হবে না। বনবিভাগের সব কাজ বন্ধ হয়ে গেছে এই অঞ্চলে। আমরা স্পোর্টসম্যান। সেইভাবেই ব্যাপারটাকে নিতে হবে। ক্যালকুলেটেড রিস্ক নিয়ে যদি বাঘ মারা যায় তো ভালো। যদি না মারা যায়, তবে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দেব। তাতে আমার ইজ্জৎ-এর কোনো হানি হবে না। এই বয়সে ইজ্জৎ নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথাও আমার নেই। নেমন্তন্ন তো ওঁরা আমাকেই করেছেন। আপনাকে এনেছি আমিই বুড়ো হয়েছি বলে। এই বুড়োর জন্যে আপনি খামোখা আত্মহত্যা করার জন্যে লাফালাফি করছেন কেন?

আমি চুপ করে ছিলাম। তখন রক্ত গরম। সাহসকেই জীবনের সবচেয়ে বড় গুণ বলে জানি। বাগচীবাবুর মতো পরিণত ভাবনা চিন্তার ক্ষমতা তখন ছিলো না। বাগচীবাবু বললেন, লালবাবু। আপনি ছেলেমানুষ। আপনাকে একটা কথা বলি। এই সুন্দরবনের কাছে থেকে শেখার অনেক কিছুই আছে। জীবনেরই আরেক নাম সুন্দরবন। যে সংসার, যে সমাজ ও যে শহুরে সংস্কৃতির মধ্যে আপনি বেঁচে থাকবেন তার সঙ্গে এই নরখাদকে ভরা সুন্দরবনের অনেকই মিল। আপনারা বড় অভাগা। আমরা আর কদিন! ঐ সমাজে ক্যানিবালস্‌রা ঘুরে বেড়াবে। বাঘের চেহারা তবু সহজে চেনা যায়, চেনা যায় তাদের পায়ের থাবার দাগ। শহরের মানুষখেকো বাঘেরা ধুতি-পাঞ্জাবি প্যান্ট-শার্ট পরে আপনারই মতো জুতো পরে সর্বক্ষণ আপনাকে 'পেড়ে' ফেলার চেষ্টা করবে। সবসময় অদৃশ্য রাইফেলের বাটে হাত রেখে ঘুরবেন। কখনও দুর্জনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবেন না। তা ভীরুতা, মেরুদণ্ডহীনতা। ঐ মানুষগুলোকে অনুকম্পা করবেন। চৈনিক ফিলসফার কনফ্যুসিয়স্ কি বলেছিলেন জানেন? বলেছিলেন, "ইফ উ্য পে ইভিল উইথ গুড, হোয়াট ড্যু উ্য পে গুড উইথ?" ভালোর সঙ্গে ভালো হবেন খারাপের সঙ্গে খারাপ। এই সুন্দরবনেরই মতো যমপুরীতে শত্রুপুরীতে আরো অনেকদিন বাঁচতে হবে যে আপনাকে। মরার এতো তাড়া কিসের? আর মরবেন যখন, তখনও মেরে মরবেন। এই বুড়োর এই কথাকটি ভুলে যাবেন না। গান্ধীবাদে আমার বিশ্বাস নেই মশাই। কোনোদিনও ছিলো না। ঐ ছাগলের দুধ-খাওয়া চরকা-কাটা উপোসকরা পথে স্বাধীনতা পেয়েছিলাম বলেই স্বাধীনতার দাম বুঝলাম না আমরা। যারাই বুকের রক্ত না দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছে তাদের স্বাধীনতা থাকেনি। পৃথিবীর ইতিহাস তাই বলে।

বলেই, বললেন, আপনি মশাই ঐ গান্ধীর জীবনীটা এনেই গোল বাধালেন। নইলে

BanglaBook.org

দেখতেন এতক্ষণে বাঘের চামড়া ছাড়াচ্ছি ডেক্-এর উপরে বসে। অহিংসার বড়াই যারাই করে তারাই দুর্বল আসলে। মানুষের মতো শেয়াল আর তৈরী করেননি ব্রহ্মা। কামড়াকামড়ি না করে শালারা বাঁচতেই শেখেনি। বন্দুকের নলই সব ক্ষমতার উৎস ও আপনার গান্ধী যাই-ই বলুন।

ক্ষিদে পেয়েছিলো। সেই পুরোনো চালের ভাত এবং জীয়োনো মাগুর মাছের ঝোল। রীপিট অর্ডার। আমারই তখন হিংসার আশ্রয় নিতে ইচ্ছে করছিলো। পিতৃবন্ধু যথার্থ কারণেই সম্মানের মানুষ। তাঁকে রাগ দেখাই কি করে? অনেক মেয়েরাই যেমন জানেন যে কাকু-জেঠু মাত্রই লোক ভালো হন না, জোর করে চুমু খেতে চান, একবার মাত্র, একবারের জন্যে ন্যাংটা বা বুক দেখতে চান, তেমনই ছেলে হিসেবেও আমি জানি যে কাকু-জেঠু মাত্রই সম্মানের নয়। আমার উদার পিতার প্রচুর অশ্রদ্ধা-যোগ্য পরিচিত ছিলেন। বন্ধু বলব না তাঁদের। কারণ প্রকৃত সফল এবং কৃতী সততই একলা। বন্ধু থাকে সাধারণের। একজন মানুষ যতই উপরে উঠতে থাকেন ততই স্পেস্-ক্র্যাফ্ট লঞ্চিং প্যাড থেকে ওঠার পর যেমন তাকে জড়িয়ে থাকা মোড়কেরা একে একে খুলে পড়ে যেতে থাকে বন্ধুরাও তেমনই। তাকে নিঃসীম শূন্যে দিন রাত একাই ঘুরে বেড়াতে হয়। জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে বড় হওয়াও 'স্টার-ট্রেক্'-এর সমার্থক। উপায় নেই কোনোই। তেমন বড় কিছু চাইতে হলে অনেক ছোট কিছুই ছাড়তে হয়ই। আত্মীয়তা, সামাজিকতা, অর্থহীন সময়-নষ্ট করা আড্ডা। 'তথাকথিত' বন্ধুদের পরিমণ্ডল। তবে বাগচীবাবু বাবার বন্ধুই ছিলেন বলব না। যেমন, ওঁর পরিচিত অনেকেই ছিলেন না। গুণবানতো বটেই অর্থবান লোকের বন্ধুভাগ্যও বড়ই মন্দ হয়। তাঁদের চারধারে ঘিরে থাকে মোসাহেব, সুযোগসন্ধানী এবং 'ফস্‌লি-বটেররা'।

BanglaBook.org

পরদিন সকালে একটি প্রকাণ্ড শিঙাল মারলাম বাগচীবাবুর কথামতো। বাঘেরই বেইট হিসেবে। সে এতই প্রাচীন যে তার গায়ের হলুদ রঙ পেকে কালো হয়ে গেছিলো। দলটা বেশ দূরে ছিলো। বোটটাও দুলছিলো। দোদুল্যমান নৌকো বা বোট এবং দোলায়মান হাতীর পিঠ থেকে নল-নিঃসৃত গুলিকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছনোর অভ্যেস সকলের থাকে না। বলা-বাহুল্য আমারও ছিলো না। পায়ে হেঁটে অথবা মাচায় বসে বা হাঁকোয়ার সময় জমিতে বসে গুলি ছোঁড়া অন্যরকম। নিশানা নিয়েছিলাম হৃদয়ে। কিছু কিছু অভাগা থাকে, আমারই মতো, যাদের জীবন দীর্ঘরোমা বা সূচীরোমাদের হৃদয় সন্ধান করেই কেটে যায়, কুচযুগশোভিত সুন্দরীদের হৃদয় ছোঁবার কোনোরকম যোগ্যতা নিয়েই যারা জন্মায় না।

ট্রিগার টানার সময়ে বোট ঢেউয়ে ঠেলে উঠলো। গুলি গিয়ে লাগলো শিঙালের গলাতে। একেবারে গলগ্রহরই মতো। গলা আর কাঁধের সংযোগস্থলে লাগলেও বা কথা ছিলো। রাইফেলের থাপ্পড় খেয়ে শিঙালতো চিৎ-পটাং হয়ে পড়ে গেলো। বাগচীবাবুর লেফটেন্যান্টরা সঙ্গে সঙ্গে ধুতি-লুঙি গুঁজে বডি-থ্রো করে দিলেন। আমি আর উনি বোটের ছাদে দাঁড়িয়ে তাদের 'কভার' করে থাকলাম। কখন বাঘের উদয় হয় কে জানে! চারজন লোককে সমানে চাঁট মারতে মারতে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে সেই সুন্দর শিঙাল যখন জলের কাছে এসে পৌঁছলো তখন এক ঝাঁপ দিয়ে তাদের হাত থেকে মুক্ত হবার অভিপ্রায়ে সে জলে নামলো চারজনকে চারদিকে কাদার মধ্যে পটকে দিয়ে। কিন্তু জলে পড়তেই রাইফেলের গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় হওয়া গলা আর কাঁধের সংযোগস্থলে নোনা জল যেই ঢুকলো, বেচারীর দু'চোখ যন্ত্রণায় বিস্ফারিত হয়ে গেলো। জলের মধ্যে সে উথাল-পাথাল হতে লাগলো। সে কষ্ট চোখে দেখার নয়। আমি চেঁচিয়ে বললাম, সরুন। সরে যান আপনারা। আরেকটা গুলি করে প্রাণটা বের করে দিই। এমন সময় সারেঙ্গ চেঁচিয়ে বললেন, মাথা খারাপ। বাঘে খাওয়ার জন্যে মারা, তাও যদি বুঝতাম নিজেরা খাবো তার জন্যে এই বাজারে আবারও আঠারোটা টাকা নষ্ট করবেন? বড়ই ভোগ্‌লা দিল হারামী!

আর দেরী না করে আমি এবার তার ঘাড় আর কাঁধের সঙ্গমস্থলে একটা গুলি করে সে বেচারীকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলাম। রাইগর-মর্টিসে যতক্ষণ কাঁপলো তো কাঁপলোই। ঠিক সেই সময়ই জলের মধ্যে শিঙালের চারধারে দাঁড়ানো চারমূর্তি হঠাৎই শুশুকের মতো ভেসে উঠে "কুমীর কুমীর" করে চেঁচিয়ে উঠলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে শিঙালকে অদৃশ্য কে যেন জলের তলায় টেনে নিয়ে গেলো হতবাক আমাদের চোখের সামনেই। জলে একটু হিল্লোল উঠলো শুধু। চারমূর্তিকে তখন দেখলে হাসি চাপা মুশকিল ছিলো সকলেরই। কাদা-জল মেখে অতিকায় স্যালাম্যান্ডারদের মতো তাঁরা আধো-জলে আধো-ডাঙ্গায় কন্টিন্যুয়াস্‌লি হাঁচোড়-পাঁচোর করছিলেন। একবার ওঠেন তো দুবার আছাড় খান।

বাগচীবাবু বললেন, ফেলান তো দেখি আপনার ঐ বইখানরে এবার জলে। এবারে বাঘ তো বটেই অন্য কোনো কিছুই শিকার হবে না। এমন কাণ্ড কখনও দেখিনি। ভাগ্যিস হরিণটাকেই নিলো। হরিণের রক্তে জল ভেসে যাচ্ছিলো তাই-ই হয়তো হরিণটাকে দেখেই এসেছিলো।

ব্যাপারটার অভাবনীয়তাতে আমরা সকলেই স্তম্ভিত হয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। বড়-চামটা ছোট-চামটা আমাদের কাছে বাঘের জন্যেই কুখ্যাত ছিলো এতোদিন। একটি কুমীরও আমি এই অঞ্চলে দেখিনি এর আগে। অবশ্য আমি তো দুদিনেরই চিড়িয়া। বাগচীবাবু বললেন, উনিও নাকি দেখেননি।

এ তো মহা বিপদ হল! নোঙর তোল্ রে। আরেকটা স্ট্যাগ মারুন। এখন কোথায় আবার পাই দেখি। বাঘকে কায়দা করার তো আর কোনো উপায়ই দেখি না।

বাগচীবাবু বললেন

শিকারের মজাই হচ্ছে এই যে যখন যা দরকার তা কখনওই পাওয়া যায় না। এবং যখন যা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, তা সে কুমীরই হোক, বাঘই হোক, কী বাইসনই হোক কিংবা রোগ-এলিফ্যান্ট তা ঠিক তখনই শিকারিকে হতচকিত করে উদিত হয়।

দুপুর অবধি ঘুরে ঘুরে হন্যে হয়েও কোথাওই আর স্ট্যাগ্ পাওয়া গেলো না। এক জায়গায় হরিণীর দল দেখা গেলো একটি। শিঙাল একটিও ছিলো না। স্পোর্টস্‌ম্যানদের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। মানুষের মধ্যে মেয়ে জাতের যে-কাউকে মারা যেতে পারে নানাভাবেই, কিন্তু জানোয়ারের মেয়েদের নৈব নৈব চ। ব্যতিক্রম শুধু বাঘ, ভাল্লুক আর শুয়োরের বেলায়। এই তিন প্রাণীর স্ত্রীলিঙ্গে দোষ নেই কোনো। অবশ্য আন্দামানে এবং ভারতের বিভিন্ন বনাঞ্চলে হরিণের অত্যাচারে যখন চাষ-বাস মাথায় উঠেছিলো তখন ঐ অঞ্চলের যে-কোনো হরিণের (যেমন ভাগলপুরের সুপুলে 'হগ ডিয়ারের') দুটি কান কেটে বনবিভাগের দপ্তরে জমা দিলেই দুটি টাকা এবং একটি বন্দুকের কার্তুজ পাওয়া যেতো। সেই সময় বহুত্‌ই কান-কাটা শিকারীরা বহুত্‌ই হরিণের কান-কেটে পয়সা লুটেছেন প্রকৃত শিকারীদের বে-ইজ্জত করে। একসময় আন্দামানেও এই ব্যবস্থা চালু ছিলো হরিণের অত্যাচারে চাষ-বাস করা যখন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিলো।

মনটা খারাপ লাগছিলো বড়। শিঙালটার জন্যে। বোট চলছে। হু হু হাওয়া। গরম হাওয়া। রোদও বেশ গরম। মাথা তেতে উঠেছে টেনিসের টুপির নিচে। এখন ক্যাবিনের ভিতরে ঢুকে গেছি। খালি গা। শর্টস্-পরা। পাশে রাইফেল। শিঙালটার কষ্ট দেখে বুকের মধ্যে তখনও সত্যিই বড় কষ্ট হচ্ছিলো। যে-আমি ট্রিগার টানি সে-আমি অন্য আমি। আমার মধ্যে যে কতগুলো আমি আছে আজ অবধি বুঝতে পারলাম না। এই বহু আমির কথার কিছুটা বলতে পেরেছি 'মাধুকরী' উপন্যাসে। সব হয়নি বলা। যার জন্যে আমার কষ্ট, সেই শিঙালের, আমার হাতের গুলি খাওয়ার কষ্ট যখন নিভিয়ে ছিলাম তখন তাকে অন্য এক তীক্ষ্ণ দাঁতের কালো জলজ কষ্ট অবলীলায় গ্রাস করে নিলো। সে বেঁচে থাকলে তার কষ্ট আরও বাড়তো। সব রকম মৃত্যুর চেয়ে জলে-ডুবে আর আগুনে পুড়ে মৃত্যুর কষ্টই বোধহয় সবচেয়ে বেশি। জীবন অথবা মৃত্যু তাদের খণ্ড ভূমিকায় প্রচণ্ড দামী। অথচ সামগ্রিকভাবে বিচার করতে বসলে আমার মতো সাধারণ একজন মানুষ অথবা ঐ শিঙালটির মতো অসাধারণ একটি হরিণের জীবন অথবা মৃত্যু কতই না মূল্যহীন। ডাইরীতে লিখতে দেখে, বাগচীবাবু বললেন, ডাইরী লিখছেন না কি?

বললাম, নাঃ।

লিখছিলাম অন্য কিছু ! নিজস্ব কবিতা বা গান বা আত্মরতি, তা উচ্চারিত বা নিরুচ্চারিতই হোক না কেন, প্রকাশ্য বা গোপনই হোক না কেন, তার কোনো প্রকৃত শরিক থাকে না। সাক্ষী রাখা যায় না। ভাগ দেওয়া যায় না কাউকেই তা সৃজন বা দানের সময়। পরে, তাই-ই হয়তো তা সকলেরই হয়ে যায়। একজন লেখকের মতো, গায়কের মতো, শিল্পীর মতো রিক্ত খুব কম মানুষই আছেন। অন্যদের ভরিয়ে দিতে গিয়ে নিজেদের এমন করে রিক্ত করার এই প্রক্রিয়াটা মহাত্যাগী বা সন্ন্যাসীদেরও অজানা।

গুট্-গুট্-গুট্ করে বোট চলে। দুপাশে নিথর অরণ্য গ্রীষ্মর দাবদাহে জ্বলে। ধোঁয়া-ধোঁয়া লাগে চোখে। ধোঁয়া-ধোঁয়া লাগে মনে। শর্টস্ পরে খালি গায়ে ক্যাবিনে বসে চেয়ে থাকি গরাদহীন প্রকাণ্ড জানালা দিয়ে। বোট যখন চলে তখন বনের মনের কথা, জলের গোপন কথা, বোটের এঞ্জিনের শব্দে চাপা পড়ে যায়। ছলাৎ-ছলাৎ করে বোটের পেছনে দুপাশে জলে ঢেউ ওঠে। দূর-পেছনে তা দুই পারের অরণ্যে গিয়ে দোলা লাগায়। অরণ্যর স্পর্শে জল, জলের স্পর্শে অরণ্য প্রেমিক-প্রেমিকার চুম্বনের মতো আনন্দে শিহরিত হয়ে ওঠে। ছল্‌ছল্ করে তাদের অদৃশ্য চোখ ভালো লাগায়। কান্নারও কতো রকম হয় ! আনন্দও কাঁদায় মানুষকে কখনও কখনও।

সারা দিন ঘোরাঘুরি করেও যখন একটিও শিঙাল পাওয়া গেলো না। আমি তখন প্রস্তাব দিলাম একটা হনুমান মারি বড়সড় দেখে। বাগচীবাবু হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। বললেন, করেন কি ? করেন কি ? রামভক্ত হনুমানদের দেশে হনুমান নিধন আর মানুষ-নিধন সমতুল্য অপরাধ। ও কম্মোই করবেন না।

আমার এক শিকারের সাঙাৎ ছিলো, চিতে। তার ছিলো হনুমানের উপর জাতক্রোধ। বহরমপুরে থাকতো সে। বাংলার বহরমপুরে। তার প্রেমিকার শাড়ি খুলে নিয়ে গেছিলো একটা হনুমান। অন্য অসভ্যতাও করেছিলো। আমাদের লেজও তো খুব বেশিদিন খসেনি তাই পূর্বপুরুষদের আমাদের অসভ্যতার কিছুকিছু তো থাকা স্বাভাবিকই। চিতে শিকারী ছিলো না। অথচ সে সময়ে বহরমপুরে হনুমানের অত্যাচার ছিলো খুবই। হনুমানের গুষ্টি সে প্রায় নাশ করে দিয়েছিলো অন্য প্রক্রিয়াতে, প্রেমিকার অপমানের শোধ নিতে। এখন আর পাওয়া যায় কী না জানি না তখন 'ব্রুকলাকস্' বলে চকোলেট রঙের চারকোণা দেখতে ছোট ছোট এক ধরনের পারগেটিভ্ পাওয়া যেতো। রঙও চকোলেটের মতো, তার এফেক্টও ছিলো চকোলেট বম্ব-এরই মতো। ঐ সস্তার বাজারে দশ টাকার ব্রুকলাকস কিনে গুঁড়ো করে এক কাঁদি পাকা কলা কিনে প্রতিটি কলার মধ্যে স্টাফ্ করে দিয়ে রেখে দিয়েছিলো। তারপর সে কী করুণ দৃশ্য ! ওদের বাড়ির পাশের মস্ত অশ্বত্থগাছে গালে হাত দিয়ে বসে থাকা, ডাল জড়িয়ে শুয়ে-থাকা নীরব, অনুতপ্ত, নট-নড়ন্-চড়ন্ নট কিচ্ছু হনুমানদের অবস্থা দেখতে সারা শহর ভেঙে পড়েছিলো।

ওর মাথার বাঁদিকে হাত ছুঁইয়ে চিতে বলেছিলো বাঙালী ব্রেন্-গানে বিশ্বাস করে না, ব্রেইনে করে। বুঝলি ! হনুমানদের দেখতে বহরমপুর শহরের মানুষ তো বটেই লালগোলা, জলঙ্গী, গোকর্ণ থেকেও মানুষ এসেছিলো। হনুমানেরা তারপর থেকে চিতেদের পাড়াতে আর কখনও মাস্তানী করতে আসেনি।

বাগচীবাবু কেবলই স্বগতোক্তি করেন, জালি বোটটা না এনে যে কী ভুলই করলাম। চামটার যে এমন অবস্থা তা কি করে জানব বলুন ?

সত্যিই ! আমরা তিনদিন হলো এসেছি। অগণ্য পোকামাকড়ের কামড় খেয়ে খেয়ে সর্বাঙ্গ লাল হয়ে উঠেছে। তার উপর এবেলা ওবেলা পুরনো চালের ভাত আর মাগুর

BanglaBook.org

মাছের ঝোল খেয়ে মেজাজ সবসময়েই তিরিক্ষি। কোনো জনমানব তো সুন্দরবনের ডাঙ্গাতে দেখা যায় না কিন্তু জলেও একটি নৌকোও নেই। মৌলে বাউলে জেলে গোলপাতা কাটা নৌকো সবই ভোজবাজীর মতো অদৃশ্য। অরণ্যে নির্জনতা ভালো লাগে কিন্তু ভয়াবহ সুন্দরবনের নির্জনতা অসহ্য। এদিকে বাগচীবাবুর এমনই বয়স হয়েছে যে তাঁর পক্ষে পায়ে হেঁটে চামটার মানুষখেকোদের মোকাবিলা করার মতো শারীরিক সামর্থ্য নেই। আর আমার সাহস নেই। নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি সুন্দরবনের কেওড়ার গুলো ভরা পিছল ভূমিতে মানুষখেকো বাঘের সঙ্গে ইয়ার্কি মারতে যাওয়ার মতো ভালো শিকারী বলে নিজেকে আমি কোনোদিনই মনে করিনি। চিরদিন হাই-ফরেস্টেই শিকার করেছি। শক্ত জমিতে। সুন্দরবনের শিকারীদের লুঙি-ধুতি পরে খালি পায়ে নামতে হয়। অনেক বছরের শিক্ষানবিশী লাগে ওখানে পায়ে হেঁটে বাঘ মারতে। সেদিন তো কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে ফেরা গেছে।

বাগচীবাবু বললেন নোঙর ফ্যাল্‌রে। তারপর বললেন, খেয়ে দেয়ে ভালো করে ঘুম লাগান। আজ সারারাত এমন একটা খালে ঢুকে ঘোরাঘুরি করব যে বোটের সার্চলাইটে বাঘের চোখ ধরা পড়বেই। আপনার হাত ভালো। সার্চলাইটের নিচে রাইফেল নিয়ে বসে থাকবেন। চোখ দেখলেই গুলি করবেন। পরদিন নেমে বাঘ যদি না মরে আহতও হয় তবে তাকে খুঁজে বার করে মারা কঠিন হবে না।

চোখ দেখতে পেলে গুলি লাগাতে যে পারব সে সম্বন্ধে সন্দেহ ছিলো না আমারও। এন সি সিতে আর্ল রবার্ট ক্যাডেট ট্রফিতে আমি পশ্চিমবঙ্গকে রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম থ্রী-ও-থ্রী রাইফেলে। অল ইন্ডিয়া রাইফেল শুটিং কম্পীটিশনেও সিলেক্টেড হয়েছিলাম কিন্তু ইন্টারমীডিয়েট পরীক্ষার টেস্ট-এর আগে পড়াশুনার ক্ষতি হবে বলে বাবা যেতে দেননি। কিন্তু মার্কসম্যান আর শিকারির মধ্যে তফাত আছে। বড় বড় মার্কসম্যানকেও দেখেছি শিকারে গিয়ে পাঁচ হাত দূর থেকে খরগোশ বা হরিণের গায়ে গুলি লাগাতে পারেননি। সেটা দোষের নয়। শিকার যতটা নার্ভের ব্যাপার, যতটা অভিজ্ঞতার, ততটাই মার্কস্‌ম্যানশিপের। বনের মধ্যে প্রথম খরগোশ দেখারই যা উত্তেজনা তা প্রশমিত করতে বাঘা-বাঘা মার্কসম্যানদেরও অনেকদিন শিক্ষানবিশী করতে হয়। শিকারও একধরনের যোগাভ্যাস। মনকে, নিজের সমস্ত কনসেনট্রেশনকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করতে অনেক বছরের শিক্ষানবিশী লাগে। তবু কারো কারো পক্ষে যোগী হয়ে ওঠা হয় না সারাজীবনেও।

ঘুম তো হলো না। ঐ ভ্যাপসা গরম। কাল সন্ধের দিকে ঝড় উঠেছিলো। সুন্দরবনের গ্রীষ্মের ঝড়ের অভিজ্ঞতা এক অভিজ্ঞতা। ঝরা পাতা আর ওড়া পাখি, জলের উপর ঢেউয়ের তাণ্ডব, ঝড়ের পরের শান্ত স্নিগ্ধ সমাহিত ধ্যানী-মৌন প্রকৃতির বিধুর রূপ যে কী অপরূপ তা বলার নয়। কালকে ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিলো বলেই আর্দ্রতা আরো বেড়ে গেছে। গরম এবং পোকামাকড় দুইয়েরই অত্যাচার তুঙ্গে। তবু মাগুরমাছের প্রজাতির শ্রাদ্ধ করতে করতে চোখ বুঁজে ঘণ্টাখানেক শুয়ে নিলাম।

বিকেলে চা আর দুটি করে থিন-অ্যারারুট বিস্কিট খেয়েই বোট খুলে দেওয়া হলো নোঙর তুলে। আজকে নো-মীল রাতে। খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলার সময় আজ হবে না। সন্ধে লাগার মুখে মুখে ঘণ্টাখানেক বোট চলবার পর একটি সরু খালে বোট ঢোকাতে বললেন বাগচীবাবু। খালটির দুপাশে কিছুটা অবধি শুধুই গোলপাতার ঝোপ। নিশ্ছিদ্র জঙ্গল। বাগচীবাবু বললেন এই খালে বাঘে নিয়মিত মাছ ধরে। অন্ধকার হতেই সার্চলাইট জ্বালানো

হলে আমি তার নিচে বসলাম রাইফেল নিয়ে। বাগচীবাবু সারেঙ্গের সঙ্গে বোটের মাথার ক্যাবিনে। একজন সার্চলাইটকে একবার এপাশ একবার ওপাশ করে ঘুরিয়ে যাচ্ছিলো। আস্তে আস্তে। আর আমাদের মাথাও ঘুরছিলো এ-পাশ ও-পাশ আলোকে অনুসরণ করে। সময় বেশি পাওয়া যাবে না, চোখ-দেখা গেলেও, জলের পাশে অথবা গোলপাতার বনের ভিতরে।

এইসব সময়ে সময়ের গতি যে আলোর গতির চেয়েও বেশি তা বোঝা যায় কিছুক্ষণ পর ঘড়িতে চাইলে। যখন মনে হয় মিনিট পনেরো কাটলো তখন ঘড়ি বলে তিন ঘণ্টা। ঘড়িকে বিশ্বাস হয় না। নিজের জীবনের স্বল্প-মেয়াদ সম্বন্ধে মন হঠাৎ করে অবহিত হয়েই বিষণ্ণতায় ডুবিয়ে দেয়। এত ছোটো কেন জীবন ? একটা জীবন ? কতো, কতো কী করার ছিলো, পাবার ছিলো কতজনের কাছ থেকে, দেবার ছিলো কতকিছু কতজনকে, ভাবার ছিলো কতকিছু। সময় নেই। সময় নেই।

খালের শেষ প্রান্তে যখন পৌঁছলাম তখন দশটা বেজে গেছে। বাগচীবাবু বললেন সারেঙ্গকে, বোট ঘুরিয়ে আবারও এই খালে খালেই চল্ ফিরি। সারেঙ্গ কী যেন বলতে গেলেন।

বাগচীবাবু বললেন, বেশি বুঝিস। যা বলি তাই-ই কর।

ওঁকে দেখে মনে হলো যে আজ রাত অবধি দেখেও যদি বাঘকে কাবু করা না যায় তবে বোধহয় কাল ক্যানিং-এর দিকে রওয়ানা হবেন। আমারই এই গরমে আর পোকার কামড়ে প্রাণ অতিষ্ঠ যদি হয় তবে পিতৃ-তুল্য বাগচীবাবুর তো হবেই। বয়সে উনি বাবার চেয়েও বছর দশেকের বড়ই ছিলেন।

আবারও সেই রকম। সার্চ লাইটের নিচে বসে আছি। মাঝে কে যেন দয়াপরবশ হয়ে একটু কফি করে দিয়ে গেলেন। ঘণ্টাখানেক যাওয়া হলো। কোথায় বাঘ ? ফিশ-ক্যাটও দেখা গেলো না। তাছাড়া বোটের আওয়াজ আর দূর থেকে আলো দেখে বাঘ থাকলেও সে যে আমার সঙ্গে শুভদৃষ্টি বিনিময়ের জন্যে বসে থাকবে এমন সুন্দরী নারী তো আমি নই। কত সামান্য বস্তুর আড়ালে যে বড় বাঘ বা চিতা নিজেকে লুকোতে পারে, অতবড় শরীরকে গুটিয়ে সিঁটিয়ে যে কতটুকু করে দিতে পারে প্রয়োজনে তা শিকারি মাত্রই জানেন। সে বা তারা থাকলেও গোলপাতার দুর্ভেদ্য আস্তরণের আড়ালে মুহূর্তের মধ্যে নিজেদের লুকিয়ে ফেলা কোনো ব্যাপারই নয়।

এমন সময় সারেঙ্গ বললেন, আপনাকে বইলেচিলাম কর্তা।

বলেই, বোটের গতি কমিয়ে দিলেন দড়ি-বাঁধা ঘণ্টা বাজিয়ে নিচের এঞ্জিন-রুমে গীয়ার চেঞ্জ করার সংকেত দিয়ে। বোটের গতি আস্তে আস্তে কমে এলো। বাগচীবাবু জোয়ার-ভাঁটার বইটি খুলে বসলেন। সারেঙ্গের কেবিনের আলো জ্বেলে। তারপরই বললেন, এঞ্জিন বন্ধ করে দে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, কী হল ?

সর্বনাশ হয়ে গেছে। জীবনে এমন ভুল কখনও করিনি।

কি ?

ভাঁটা দিয়েছে অনেকক্ষণ কিন্তু খেয়াল ছিলো না আমার। এখন তো এই সরু খালের মাথাতে বড় খালে গিয়ে পৌঁছতে পারব না। এখানেই নোঙর করতে হবে। ভোরের সময় জোয়ার দিলে, জল বাড়লে তবেই এগোনো যাবে।

আমি বললাম, তাতে অতো চিন্তার কি ? মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে ঘুম

লাগাবো।

না। বাঘ হয়তো আলোতে ধরা দেয়নি কিন্তু পুরো চামটা অঞ্চলে এমন ভয়াবহ খাল আর নেই। এমনি সময়েই এই খাল এড়িয়ে যায় সকলে। এ বছরের কথা তো ছেড়েই দিলাম। এবং খালটা যে আসলে কত সরু তা ভাঁটা পুরো হলেই শুধু বোঝা যাবে। বোটের তলাতে জলই থাকবে না। মাটিতে পেট ঠেকিয়ে বসে থাকবে বোট। তাই আজ রাতে আমরাই বাঘের মাগুর মাছ হতে পারি। বাঘের খাদ্য।

উৎসাহিত হয়ে আমি বললাম, বাঃ। তাহলে তো ভালোই। বাঘের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটাতেই তো আসা এখানে। বাঘ যদি নিজে আসে তো অসুবিধে কিসের?

এ সুন্দরবনের বাঘ লাল বাবু। ওরা যখন আসবে আপনার ঘুমন্ত অথবা ঝিমুনি-পাওয়া অবস্থায়, তখন জানতে পর্যন্ত পারবেন না। প্রথম রাতে আমিই জাগব। তারপর রাত দেড়টা নাগাদ আপনাকে তুলে দেব।

বললাম, আমি ঘুমোব না। আপনি একটাতে শুয়ে পড়বেন। কোনো অসুবিধা নেই। আমি আর আপনিই তো নই। সঙ্গে চারজন নিরস্ত্র লোক আছে। তাদের দায়িত্বও আমাদেরই। বোট যদি মাটিতেই বসে যায় তখন বাঘ তাকে আর বোট বলে সমীহ আদৌ নাও করতে পারে।

'লীলা' বলেই এই বোটকে নিয়ে এই খালে ঢুকবার সাহস করেছিলাম। কোনো বড় বোটই এই খালে ঢুকতে পারে না। এখানে শেষ এসেছিলাম জালি-বোটে করে আমি আর হ্যামন্ড বলে এক স্কট্‌সম্যান। হ্যামন্ড ওর ফোর-ফিফটি-ফোর হান্ড্রেড রাইফেল দিয়ে এই খালপাড়েই একটা বড় বাঘ মেরে ছিলো। বাঘ নয়, বাঘিনী। খালটার নাব্যতা মনে হয় আরও কমে গেছে এই কুড়ি বছরে।

খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা করা হলো না। অকারণ শব্দ হবে। যদি বাঘের সঙ্গে দেখা হয় এই আশায় আমি উদগ্রীব হয়ে রইলাম। একটু পরেই বোটের সব আলো নিবিয়ে দিতে বলা হলো। সারেঙ্গ এবং অন্যান্যদেরও বলা হলো যে সবাই উপরের কেবিনে শোবেন। বাগচীবাবু সামনের ডেক্-এ এবং আমি পিছনের এক চিলতে ডেক্-এ পাহারায় থাকব।

আরেক কাপ করে ব্ল্যাক কফি খেয়ে নেওয়া হলো। তারপর বোটের সব বাতিও নিবিয়ে দেওয়া হলো। সুন্দরবনের খালে সারা রাত লণ্ঠন জ্বেলে রাখে মাঝিরা কেরোসিনের আকাল না থাকলে। বাঘেরই জন্যে। কিন্তু আমরা তো বাঘকে আকর্ষণ করতেই এসেছি, বাঘ যাতে আসে তাই-ই তো চাই। আমার থ্রী-সিকস্‌টি-সিক্স রাইফেলের ব্যারেলেই ক্ল্যাম্পে ছোট্ট টর্চ ফিট করা ছিলো যাতে ফ্রন্ট আর রিয়ার সাইডে আলো পড়ে। রাইফেলে বাঁ হাতটি যেখানে থাকে তারই নাগালের মধ্যে সুইচটি ছিলো যাতে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ছোঁয়ালেই আলো জ্বলে ওঠে। তাছাড়াও হাতের কাছে রাখা ছিলো পাঁচ ব্যাটারীর 'বল্ড'-এর টর্চ। অ্যামেরিকান। বাগচীবাবুর রাইফেলে আলো ছিলো না। কিন্তু টর্চ ছিলো পাশে।

চারদিক নিস্তব্ধ। ভাঁটায় জল নেমে যাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু। বোটের খোলের দু পাশে সড়সড় আওয়াজ করে জল আর পাতা আর কুটোর আওয়াজটা তেমন স্পষ্ট শোনায় না, বোটের মধ্যে শুয়ে না থাকলে।

রাত এগারোটা নাগাদ চাঁদ উঠলো এক ফালি পাকা কুমড়োর মতো। সেই ম্লান বিধুর চাঁদের আলোতেই গোলপাতারা চক্‌চক্ করে উঠলো। সতত সঞ্চরমান জলের উপর সাদা সরের মতো পাতলা আস্তরণ পড়লো আলোর। সারেঙ্গের কেবিনে কেউ বিড়ি ধরিয়ে ছিলো। বিড়ির আগুনের লাল ফুটকি বাড়তে কমতে কমতে বাড়তে নিভে গেলো। এক

BanglaBook.org

দমক্ হাওয়ায় বিড়ির গন্ধ ভেসে এলো নাকে।

বাগচীবাবু কাশলেন একবার। সিগারেট ধরালেন দেশলাই জ্বেলে। এমন নিরুপায় অসহায় ইম্‌মোবাইল অবস্থাতে কমই পড়েছি জীবনে। শিকারীর ভূমিকা হলো অ্যাকটিভ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, পুরুষেরই মতো। যদিও মাচায় বসে, বা ছুলোয়াতে বসে থাকার সময় ভূমিকা এরকম প্যাসিভই হয়। কিন্তু তবু সেই প্যাসিভ রোলের মধ্যেও, সঙ্গমে, আমাদের প্রজন্মর ভারতীয় নারীর ভূমিকারই মতো কিছু ভূমিকা তবু থাকে, তা যতই দ্বিধাগ্রস্ত পাপবোধ-জড়িত এবং অন্য-তাড়িত হোক না কেন। কিন্তু এই আধো-অন্ধকার রাতে ক্রমশঃ জলের সঙ্গে বিযুক্ত হতে থাকা ছোট্ট জলযানের উপরে বসে থেকে একই সঙ্গে প্যাসিভ ও অ্যাকটিভ ভূমিকার এমন পরাকাষ্ঠার কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না।

রাত বাড়ছে। জল কমছে। বোটের পেটের তলা থেকে ক্রমশ জল কমে যাওয়াতে এক ধরনের ভারী অনুভূতি, ভাসমানতার অনুভূতিকে ক্রমশই ক্ষয়িষ্ণু করছে। মাঝে মাঝে দু'পাশ এবং বোটের পেছনে চাইছি। ভারী রাগ হয়ে যাচ্ছে বাগচীবাবুর উপরে। এমন শিকার যাত্রাতে আসার সময় জালি-বোটটা ফেলে এলেন বলে।

রাত একটার আগেই লীলা মাটিতে থেবড়ে বসে পড়লো। এখন দু'পাশে আট দশ হাত কাদা খালের খোলে তারপরই খাড়া পাড় দু'পাশে। নিশ্ছিদ্র গোলপাতার বন। ভাঁটা সম্পূর্ণ হলে মনে হলো যেন হঠাৎ একটা লম্বা গর্তের মধ্যেই পড়ে গেলাম আমরা, কোনো সুড়ঙ্গরই মধ্যে। বড় অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা। কোনো পাখির ডাক নেই, প্রাণীর আওয়াজ নেই। এ যেন কোনো প্রেতপুরীতে এসে পড়েছি। যেখানে যুগ-যুগ ধরে হাজার হাজার ঝাম্‌টি উড়ছে। হাজার হাজার মানুষ খুন হয়েছে নৃশংসভাবে বাঘের হাতে, সামান্য দুটি পেটের ভাতের সংস্থানে এসে। সেই সব বুভুক্ষু অশরীরী যক্ষরা যেন আমাদের চারদিকে নিঃশব্দ পায়ে চলাফেরা করছে। আমাদের বলছে, হাওয়ার দোলায় সামান্য আন্দোলিত গোলপাতাদের ফিস্‌ফিস্ করা হাতছানিতে যে, প্রতিশোধ নাও অসহায় আমাদের এই মৃত্যুর, নয়তো আমাদেরই একজন হয়ে গিয়ে মিশে যাও এই মৃত্যুনিথর যক্ষপুরে।

গা-ছম্‌ছম্ করে উঠলো একবার। ভূত-প্রেতে আমার বিশ্বাস নেই। তবু বড় বড় নাস্তিক সাহসী এবং বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের গাও ছম্‌ছম্ করেই কোনো না কোনো সময়ে এমন পরিবেশে যেখানে মৃত্যু-ভয় অসম সাহসী সব জেলে-মৌলে-বাউলেদের স্তম্ভিত করে এই অঞ্চলকে এক অবিশ্বাস্য নির্জনতার নির্মোকে মুড়ে রেখেছে।

ক্যাবিনের মধ্যে থেকে কে যেন শব্দ করে মশা মারলো। মৃত্যু ভয় শিয়রে জেগে থাকলে ঘুম আসা মুশকিল। এমন অবস্থাতে তো কোনো নৌকোও চোখে পড়ে না চামটার সুন্দরবনে। হাওয়াটা হঠাৎ থেমে যেতেই মশা বাড়তে লাগলো। কিংবা মশার মতো অন্য কোনো পোকা। ক্যাবিন থেকে চটাপট্ মশা-মারার আওয়াজ আসছিলো।

বাগচীবাবু ডেকের সামনে থেকে বললেন, বাজে কটা?

ফস্‌ফোরেন্ট-লাগানো হাত-ঘড়িতে চেয়ে বললাম, একটা।

এবার আপনি গিয়ে ঘুমোন। উনি বললেন।

আমি ঘুমোলে সামনেটাতে কে থাকবে? যদি চান্স পাই, দেখিই বসে।

বলেই, সারেঙ্গের কেবিনের মানুষদের উদ্দেশ্য করে বললেন, ওরে তোরা একটু গান-টান গা তো দেখি। ঘুম তো এমনিতেই আসছে না। মানুষের গলার আওয়াজ শুনে যদি বড় মিঞারা কেউ ঘটনাটা কি তা দেখতে আসে তবে তো ভালোই।

এই আদেশে যেন সকলেই খুশি হলো। একে গুমোট হয়েছে। হাওয়া নেই একটুও।

BanglaBook.org

তার উপর চরম অস্বস্তিকর বিপজ্জনক পরিবেশ। তায় আবার আধো-অন্ধকার রাত। তার উপরে মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকা।

ইঞ্জিনম্যান নটবর এবং অন্যান্যরা ক্যাবিনের বাইরে এসে উদোম জায়গায় বসে গান ধরলো। "সুন্দর জারিনারে, তোমারে না দেখলে মোর অঙ্গ যায় জ্বলে। তোমারে কইরব বিয়া এই তো মনের বাসনা, সুন্দর জারিনারে..."

নটবরের খোলা গলার গান তির্‌তির জল বয়ে-যাওয়া কাদার উপরে এবং দু'পাশের জঙ্গলে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে গেলো। আমি পাইপটা ধরালাম, ভালো করে তামাক ঠুসে। তারপর জ্বালিয়ে, ধুঁয়ো ছাড়লাম প্রাণ ভরে। এমন সময় হঠাৎ মনে হলো গোলপাতার ঝোপের আড়াল থেকে কে যেন আমাকে দেখছে পেছন থেকে। চট্ করে ঘুরে গেলাম। কই কিছু না তো! হাওয়াটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সব স্তব্ধ নিথর। শুধু কল্পনার ঘুম নেই। নিজ-গতিতে সে গতিমান। অন্য কিছুরই উপরে সে নির্ভরশীল নয়। কিছুক্ষণ পেছনে চেয়ে আবার পাইপ খেতে লাগলাম। কী করে সময় গেলো জানি না। বড় ঘুমও পাচ্ছে। গরম, নোনা-হাওয়া আর এই অসহায় অপেক্ষাতে শরীরের সব ক্লান্তি জমে জমে পাহাড়-প্রমাণ হয়েছে। এমন সময় বাগচীবাবু বললেন, আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি। নামলাম ক্যাবিনে।

ক্যাবিনে আর ডেকে তফাৎ কিছু নেই। তফাতের মধ্যে এই যে বার্থগুলো একটু নিচে নামানো। ত্রিপলের পর্দা আছে শিকবিহীন প্রকাণ্ড খোলা জানালাতে। দু'দিকেই কিন্তু ত্রিপল তোলা থাকাতে একাধিক বাঘের ঐ জানালা দিয়েও বোটে প্রবেশ করার কোনো বাধা নেই। জল সাঁতরাবারও তো কোনো প্রয়োজন নেই। জোয়ারে ভেজা কাদায় হেঁটে এলেই হলো নিঃশব্দ পায়ে। সুন্দরবনের টোপোগ্রাফীর কারণেই এমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারী বাঘ পৃথিবীর আর কোথাওই নেই। জঙ্গলের মধ্যের উঁচু টাঁকে যেখানে জোয়ারের জল ঢুকতেই পারে না সেখানেই শুধু অসাবধানী বাঘের পায়ের শব্দ শোনা যেতে পারে।

বাগচীবাবু ভিতরে যাওয়ায় এবং আমারও ঝিমুনি লাগাতে আমি মাঝে মাঝে এবার টর্চ জ্বেলে এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম। আমার যেন বীর শিকারির ততক্ষণে চামটার মানুষ-খেকো বাঘ মেরে বাহাদুর হবার সব সখ অন্তর্হিত হয়েছে। তখন নিজের চামড়াটা অক্ষত রাখার উৎসাহই বেশি। ততক্ষণে চারটি শিশুরই মতো এলেবেলে হয়ে এ ওর গায়ে পা-তুলে-দিয়ে নটবর এবং অন্যান্যরা ঘুমের দেশের ঘোমটা-পড়া ছায়ায় স্তূপীকৃত হয়ে গেছে সারেঙ্গের ক্যাবিনের মধ্যে। এখন এই জেগে-থাকা ঘোর বনে জেগে আছি আমি একা। সবাইই যখন ঘুমোয় তখন শহরেই হোক কী বনেই হোক আমার একা জেগে থাকতে বড় ভালো লাগে। একা-আসা এই পৃথিবীতে, ফেরার সময়ও সেই একাই। অথচ মাঝের সময়টুকুতে শিশুকাল থেকে বার্ধক্য অবধি একা থাকার সুযোগ বড় কমই মেলে। একা হয়ে গেলেই, আকাশের তারা, পাকা কুমড়োর ফালির মতো চাঁদ, চর্তুদিকের নিথর নিস্তব্ধতা এমন অনেক কিছু ভাবনার শরিক করে তোলে আমাকে, যা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। এই ধর্ম হচ্ছে চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতা, কেন এখানে মানুষ হয়ে এলাম, জানোয়ার না হয়ে ; অথচ এখনও মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠা হলো না সেই ভাবনা বড় পীড়িত করে তোলে। আহারনিদ্রাভয়মৈথুনং চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্। ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

এই ধর্মই মানুষের ধর্ম। সৎসাহস, মানবিক গুণাবলীর অনুশীলন, হাল-হীন নৌকোর মতো শুধুমাত্র ভালো-খাওয়া, ভালো-পরার সংস্কৃতিতে সামিল হওয়া তথাকথিত-শিক্ষিত অগণ্য "ভদ্রলোকের" একজন হয়ে বেঁচে না থাকার জেদ এই সবই মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারী

BanglaBook.org

একজন জানোয়ারের সঙ্গে একজন মানুষকে পৃথক, স্বতন্ত্র করে তোলে। নির্ভেজাল নির্জনতার মতো বড় সঙ্গী মানুষের আর হয় না যে মানুষের মধ্যে নির্জনতার কোনো প্রভাব নেই তাঁর মনুষ্যত্ব সম্বন্ধেই প্রশ্ন জাগে স্বাভাবিক সময়কে 'কিল' না করে সময়কে নিংড়ে নেওয়ার আরেক নামই হয়তো জীবন, একজন মানুষের কাছে।

মাঝে মাঝেই টর্চ ফেলে দেখছি চারপাশ। কোনো পরিবর্তন নেই পটভূমির। কোনো রাত পাখির স্বর নেই। মাঝে মাঝে কাদার মধ্যে উভচর স্যালাম্যান্ডারদের এঁকে বেঁকে গা-ঘিন্ ঘিন্ করে চলার মৃদু প্যাতপ্যাতে আওয়াজ। ডাইনোসররাও উভচর ছিল। সময় তাদের নিশ্চিহ্ন করলে তাদের সম্মান বাড়তো কিন্তু সময় তাদের প্রজাতিকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম করে ফেলে নানা ধরণের হাস্যকর লজ্জাকর বর্তমান প্রজাতিতে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনো লজ্জা নেই, কিন্তু ছোট হয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে লজ্জা নিশ্চয়ই আছে! আমাদের প্রজন্মর মানুষেরাও এই গা-ঘিন্-ঘিন্ ওদেরই মতো হয়ে গেছি। অনেক কিছুই হারিয়েছি আমরা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে হতে। সবচেয়ে বেশি করে যা হারিয়েছি তা লজ্জা বোধ, গন্তব্যর দিক নির্ণয়ের ক্ষমতা। স্যালাম্যান্ডাররা তবু জানে কখন ডাঙায় আছে, আর কখন জলে। আমরা তাও জানি না। কুয়োর ব্যাঙেরই মতো নিজের মাথার উপরের একটু আকাশকেই মহাবিশ্ব বলে মনে করে নিজেদের স্ত্রী কন্যা-পুত্রদের নিয়ে কুয়োর মধ্যের পোকা মাকড় শ্যাওলা খেয়ে বেঁচে আছি।

এবারে চাঁদ দিগন্তের দিকে এগোচ্ছে। রাতের চাঁদের গতিপথ পশ্চিমে। পশ্চিমের দিগন্তে যখন চাঁদ লীন হয় তখন পূবের দিগন্তে সূর্যর প্রকাশ।

এখন আমারও বড় ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু এ ঘুম তো কালঘুমও হতে পারে। ঘড়িতে চেয়ে দেখলাম, তিনটে বাজে।

আবার পাইপটাতে তামাক ঠেসে জম্পেস্ করে ধরালাম। সাড়ে চারটে পৌনে পাঁচটার মধ্যেই আলো পরিষ্কার হবে। জোয়ারও শুরু হবে ঐ সময়ের সামান্য আগে থেকেই। ভাবলাম, রাত তো প্রায় পুইয়েই এসেছে। এটুকু সময় সামনের ডেকে বসে, রাইফেলটা কোলের উপর আড়াআড়ি করে রেখে ক্যাবিনের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে ভারতে ভাবতেই আলো ফুটে যাবে। ডান হাতের কাছেই বড় টর্চটাকেও রাখলাম। এমন সময় বনের গভীর থেকে যেখানে ঝুপড়ি জঙ্গল ; প্রায় পাঁচশ গজ গভীরে, একটি বাঁদর ডেকে উঠল। ওদিকে তাকালাম। তারপর ঘুরে বসলাম ওদিকে মুখ করে কিছুক্ষণ। কিন্তু আর কোনো আওয়াজ হলো না। যেমনটি ছিলো সব তেমনই রইলো। ঠিক সেই সময়েই হঠাৎই ঘুমে আমার দু চোখ জুড়িয়ে এলো। যাঁরা নিজেরা হাইওয়েতে গাড়ি চালান রাতে অথবা দুপুরে ভাত খাওয়ার পর শুধুমাত্র তাঁরাই বুঝতে পারবেন এই ঘুমের রকম। তখন মনে হয় হোকগে হলে অ্যাকসিডেন্ট যা হবার তা হোক্ দু চোখের পাতা একবার বন্ধ না করলেই নয়। তখন যে গাড়ি বন্ধ করে দিয়ে পথ পাশে রেখে একটু ঘুমিয়ে নিলেই প্রাণটা বাঁচে সে কথাটাও মনে থাকে না কারও। হয়তো যম নিজে এসে তখন মৃত্যু-পথযাত্রীর চোখের পাতায় বসে।

রাইফেলের বোল্টটা খুলে ম্যাগাজিন থেকে একটি সফট-নোজড গুলি চেম্বারে ঢুকিয়ে দিয়ে, সেফটি ক্যাচে বুড়ো আঙুলটি রেখে দু কানকে যথাসম্ভব সজাগ রেখে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। ভোরের তো দেরী নেই আর। সামান্য সময়। এবং সামান্য শব্দতেই চোখ খুলব। রাইফেলও তো তৈরিই আছে।

কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না। হঠাৎ বাগচীবাবুর ধাক্কাতে চমকে উঠে চোখ মেললাম।

BanglaBook.org

তখনও ভোর হয়নি। তবে অন্ধকার ফিকে হয়ে গেছে। পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই আলো হবে।

কি হল ?

আমি বললাম।

বাগচীবাবুর ডান বগলে প্যারাডক্স্। খাকি হাফ প্যান্টের সামনের বোতামগুলো খোলা। বন্ধ করতে ভুলে গেছেন উত্তেজনায়। উনি ছোট বাথরুম করতে ডেকে এসেছিলেন। কাল সকাল থেকেই আমাদের বাথরুমের কমোডের ফ্লাশ কাজ করছিলো না বলে দিনের বেলা সারেঙ্গদের বাথরুমেই যাচ্ছিলাম, বোটের একেবারে পেছনে। সেখানে লম্বা লোকের মিনিবাসে চড়ার চেয়েও কষ্ট অনেকই বেশি। তবু নিরুপায় হয়েই যেতে হতো। দিনে ছোট বাথরুম বোটের পেছনে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে করতে কোনো অসুবিধা ছিলো না। রাতের বেলা এবং বিশেষত বোট নোঙর করা থাকলে লোডেড রাইফেল বগলে করে সামনের ডেকে দাঁড়িয়েই ঐ নিরুপায় কর্ম করতে হতো।

আমি তখনও 'ডেজড্' হয়ে বসেছিলাম। বাগচীবাবু আঙুল দিয়ে বোটের পাশে নদীর খোল দেখালেন। তাকিয়েই আমি লাফিয়ে উঠলাম। 'লীলা' বোটের চতুর্দিকে কাদার উপরে বাঘের পায়ের টাটকা দাগ। তাতে জল ছুঁইয়েও আসেনি তখনও। ডানদিকে গিয়েও দেখি তাই। একটাই বাঘ। কিন্তু চক্রাকারে ঘুরেছে বোটের চারধারে। পেছনের দু পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে ঘুমন্ত আমাকে সামনের দু থাবায় জাপটে ধরতে কোনোই অসুবিধা ছিলো না, বোটে না উঠেও। কারণ বোটের ডেকের বাঁ-দিকের কোণাতেই ক্যাবিনের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলাম আমি।

ততক্ষণে নটবর এবং অন্যান্যরাও সব উঠে পড়েছেন। সবাই মিলে বোটের সামনে পেছনে গিয়ে চারপাশ দেখে হতভম্ব।

বললাম, বাগচীবাবুকে, আপনার শর্টস্-এর বোতাম।

ছাড়ান্ দ্যান্ তো। আপনার বাবা-মাকে গিয়ে কি যে বলতাম। বউকে ? সবাই বলতো ছিঃ। ছিঃ। কী নির্লজ্জ বুড়ো শিকারী।

বলেই বললেন, লালবাবু, বাবা-মা আর তরুণী স্ত্রীর কাছে তাঁদের ছেলের আর স্বামীর শিকারের দুর্ঘটনায়-মৃত শব নিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার একবার হয়েছিলো। ঈশ্বর করুন। আর যে-ক'দিন বেঁচে আছি সে অভিজ্ঞতা যেন রীপিটেড্ না হয়।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে চেম্বারে ঢোকানো গুলিকে বের করে ম্যাগাজিনে দিয়ে বোল্ট আটকে সেফটি-ক্যাচ্ তুলে দিলাম। বললাম, আমি যদি ঘুমিয়েও থাকি তো বড় জোর পনেরো মিনিট থেকে আধ ঘণ্টা। না হয় পঁয়তাল্লিশ মিনিটই হবে। কিন্তু আমার থেকে দেড় হাত দূর দিয়ে সে ঘুরে গেলো এতোবার তবু নিলো না কেন আমাকে। বোটে ওঠার তো দরকারও ছিলো না।

বাগচীবাবু উত্তেজিত গলায় বললেন, বোট খোল্‌রে।

জল কই ? জোয়ার অন্তত মাঝামাঝি না হলে তো একচুলও এগোনো পেছোনো যাবে না। থেবড়ে বসে আছে যে বোট।

তাহলে চা কর। আর জোয়ার এলেই, মানে বোট, চলবার মতো জল হলেই সোজা চল ক্যানিং। এবারের যাত্রাটাই বাজে হয়েছে। বলেছিলাম না, প্রথম দিনেই ঐ গান্ধীর জীবনী। আমি মশায় শাক্ত মানুষ। সত্যিই বলছি, গান্ধীজীর জীবনী হাতে করে কেউ শিকারে আসে ? ঐ শিঙাল হরিণটার যা হলো তেমন কাণ্ড তো পঞ্চাশ বছর ধরে সুন্দরবনে প্রতি

BanglaBook.org

বছর অসংখ্যবার এসেও দেখিনি।

আমি বললাম, চলুন। আর আরেকটা শিঙাল মেরে দিচ্ছি। তারপর তাকে বেইট দিয়ে যুৎসই দুটি গাছ দেখে বসি সারা রাত, এমন জায়গায় যেখানে বড় গাছ আছে। বোটে ওঁরা গান-বাজনা করবেন, ট্রানজিস্টার বাজাবেন। বাঘ ঠিক আসবে। আমার মা যতদিন বেঁচে আছেন বাঘের মাথার মধ্যে মুখ ঢোকালেও আমার কিছু করতে পারবে না।

বাগচীবাবু প্রচণ্ড উত্তেজিত অবস্থাতে ছিলেন। বললেন, কে বলেছে?

আমার মায়ের জ্যোতিষী।

কলকাতা ফিরেই তাঁর ঠিকানাটা আমাকে দেবেন তো। কোনো কিছু দৈব বলেই বেঁচে গেলেন আপনি আজ। নইলে এ আমার বুদ্ধির বাইরে।

বাঃ। আপনিই তো বলেছেন যে এ পর্যন্ত সুন্দরবনের বাঘ কখনও মোটর বোট থেকে মানুষ নেয়নি। সব সময়ই নিয়েছে নৌকো থেকে। নাদুস-নাদুস বড়লোকের মাংসও যারা বড়লোকদের ভয় করে বলে ছোঁয়না তারা আবার কিসের মহাবল?

সে কথা নয়। মানে, কথাটা ঠিক। কিন্তু বোটে উঠতে তো হতো না। এক থাপ্পড়েই নামিয়ে নিতো আপনাকে।

হুঁঃ। থাপ্পড় মেরেই দেখতো! চেম্বারে গুলি ঢোকানো ছিলো আমারও। মরলে ওকে নিয়েই মরতাম।

তাতে আমার কি ঘণ্টা হতো? মরা বাঘ দেখলেই কি আপনার বাবা-মায়ের মরা ছেলে বেঁচে উঠতো। না মশায়! অনেক হয়েছে। এবারে চাম্‌টার যাত্রাটা সত্যিই গোলমেলে হয়ে গেছিলো। সেই জালিবোট না-আনা থেকেই এর শুরু। এমন শ্মশান হয়ে রয়েছে যে পুরো এলাকা তাই-ই বা জানব কী করে বলুন!

প্রথমে চা। তারপরে ব্রেক-ফাস্ট এবং আবার চায়ের পালা শেষ হতে হতে জল বেড়ে এমন হলো যে বোটের নোঙর তুলে বোট স্টার্ট করা গেলো।

বাগচীবাবুর মুখ তখনও থম্‌থম্ করছিলো। হলুদ-রঙা মুখটি, বরেন্দ্রভূমের শীলমোহর দেওয়া তীক্ষ্ণ নাকটি উত্তেজনায় এবং সকালের রোদেও লাল দেখাচ্ছিলো।

আসলে ওঁর কী দোষ। দোষ তো পুরোই আমার। বয়সে ওঁর পুত্রবৎ হয়েও একটা রাত শেষ অবধি জেগে থাকতে পারলাম না আমি। আমার মতো শিকারিদের সুন্দরবনের চাম্‌টার মানুষ-খেকোর মোকাবিলা করতে আসাটাই অন্যায়। এখানে সুন্দরবন অঞ্চলে যাঁরা থাকেন, তেমন আর্জান-সর্দার বা বেদে-বাউলেদেরই মানিয়ে যায়। আমাদের জায়গা এ নয়।

শিবশংকর মিত্রর লেখা 'আর্জান-সর্দার' আর 'বেদে-বাউলে' বই দুটি আমি আপনাদের প্রত্যেককেই পড়তে অনুরোধ করব। 'আর্জান সর্দারের' মতো সাহিত্যকর্মও বেশি হয়নি বাংলাতে। পারলে, অবশ্যই পড়বেন।

এখন বারোটা বাজে। তবু টুপি-মাথায় দিয়ে ডেকের উপরই একা বসে আছি। খোলা হাওয়ায় টুপি উড়িয়ে নিচ্ছে। রুমাল থুতনির নিচ থেকে নিয়ে মাথায় বেঁধে রেখেছি। বাগচীবাবুর আদেশে আমরা ফিরেই যাচ্ছি। আমার মায়ের মুখটি মনে পড়ছে। টক্‌টকে রঙ। মুখে হাসি ছাড়া অন্য প্রসাধন নেই। সিঁথিতে চওড়া দাগের সিঁদুর। কপালে টক্‌টকে লাল বড় গোল সিঁদুরে টিপ। আমার প্রশ্রয়-দাত্রী মা, অনুক্ষণ আমার বিপদাশংকায় চিন্তিত মা, বিনিময়ে ছেলের কাছ থেকে কোনোরকম প্রত্যাশাহীন মা। বাঙালী মা। আজকাল বাঙালী মায়েরা কি সবাই মেমসায়েব হয়ে গেছেন? জানি না, হয়তো এই মেমসাহেবি শুধু

BanglaBook.org

বহিরাবরণেই। অথবা বাঙালী মায়েরা এবং স্ত্রীরা অনেকেই বদলে গেছেন বলেই বোধহয় বাঙালী জাতের এমন অবক্ষয় ঘটেছে। তবু আজকেও অনেক বাঙালী স্ত্রী এবং মাকে আমি জানি যাঁরা ইংরিজি তো নিশ্চয়ই, ফ্রেঞ্চ, জার্মানও অনর্গল বলতে পারেন, স্বামীর সঙ্গে যখন পার্টিতে যান। কিন্তু ঘরে, পোশাকে এবং মননে তাঁরা পুরোপুরিই বাঙালী। দেখে ভালো লাগে খুব। খুবই ভালো লাগে। আধুনিকতা একটা মানসিক অবস্থা। তা জোর করে পোশাকে-আশাকে এবং ব্যতিক্রমী ব্যবহারে প্রকাশ না করলেও হয়তো চলে।

আমার মা মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে প্রথম হার্ট-অ্যাটাকেই অকস্মাৎ চলে গেছিলেন। মাকে কষ্টই দিয়েছি শুধু। নানারকম কষ্ট। আনন্দ দিতে পারিনি কিছুই। তাই আমার মায়ের মতো বাঙালী মা বা বাঙালী স্ত্রী চোখে পড়লে মন এখনও বড় দ্রব হয়ে যায়।

সেই সময়ে মা ছিলেন। এখন তো মা নেই। আজ বাঘের মুখে মাথা ঢোকালে বাঘ আমার মাথা নিশ্চয়ই গ্রামের শেয়ালে যেমন করে কইমাছের মাথা চিবিয়ে খায় তেমন করেই চিবিয়ে খাবে।

কিন্তু মানুষ-খেকো বাঘ তো শুধু সুন্দরবনেই থাকে না। তাও সেই ক্ষুধার্ত বাঘেরা তো শুধু মাংসই খায় মানুষের। নানা ধরনের বাঘের মধ্যেই তো শহুরে আমাদের প্রত্যেকেরই নিরন্তর বাস। তাঁরা সবাই মানুষখেকো বাঘের মতোই খল, ধূর্ত, কিন্তু নর্ম্যাল বাঘের মতো মহৎ উদার-হৃদয়ের, সামনাসামনি সাহস দেখাবার মতো মহাবল আদৌ নন। তাঁরা মানুষের মাংস খান না, খান ভালোত্ব, ভালোবাসা, হৃদয়ের উষ্ণতা, বন্ধুত্ব, প্রেম এবং যা কিছুই ভালো তাইই। স্বভাবে অনবরত তাঁরা দাঁত-চালানো ইঁদুর, কিন্তু দন্ত-নখরে এবং চরিত্রে, ক্ষমতাতে মানুষখেকো বাঘের চেয়েও তাঁরা অনেকই বেশি ভয়ংকর। তাঁদেরও অনেকের মুখ থেকে ব্যাদান-করা ছুঁচোলো দাঁত থেকে যে বেঁচে এসেছি, বেঁচে যাই, বেঁচে আছি সে জন্যেও হয়তো আমার মায়ের মুক্ত-আত্মার আশীর্বাদই কাজ করে। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী!

কটায় পৌঁছবে? ক্যানিং? নটবর?

বাগচীবাবু শুধোলেন।

বেলা সাড়ে-তিনটে চারটে তো হবেই কর্তা।

ঠিক আছে। ফুল স্পীডে চালা বোট ক্যানিং বলে।

সুন্দরবন থেকে পৈতৃক প্রাণ নিয়ে ফিরে এসে এবার একটু উত্তরবঙ্গে যাওয়া যাক স্মৃতিমন্থনে। এবং ওড়িশার কালাহাণ্ডিতেও, আরও একটি কুখ্যাত মানুষখেকো বাঘেদের অঞ্চলে। যে কালাহাণ্ডীর করদ-রাজ্যের রাজার অতিথি হয়ে বাঘ শিকারে গিয়ে বিখ্যাত শিকারী ও ব্যারিস্টার এবং শিকার কাহিনীকার কুমুদনাথ চৌধুরী মাচা থেকে বাঘকে গুলি করে মাচার নিচে নেমে বাঘের হাতেই নিহত হয়েছিলেন।

BanglaBook.org

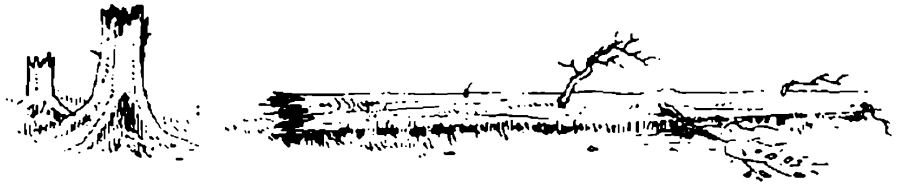

পশ্চিমবঙ্গর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর বড়দাদা ডঃ কিরণ বোসের কথা আগেই বলেছি। ওঁকে কিরণকাকু বলেই ডাকতাম। জ্যোতিবাবুর ডাক নাম যে 'গণা', সে কথা তাঁর কাছেই প্রথমে শুনি। ভালো হুইস্কী এবং ফুটবলের মাঠ ছিলো কিরণকাকুর প্রিয়। সুদর্শন এবং ভালো মানুষ ছিলেন। রাজার জামাই হবার যোগ্যতা না থাকলে রাজার জামাই হতেনই বা কি করে? মাছ ধরার সখও ছিলো ওঁর খুব। রায়কত-রাজাদের রাজবাড়ির পুকুরও ছিলো মস্ত। খুব ভালো রান্নাও করতেন। আমাকে একবার রাজবাড়িতে বর্ষাকালে নিজে হাতে রান্না করে এমন ইলিশ মাছ খাইয়ে ছিলেন যে তার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।

রাজকুমারীর আদর যত্নরও কোনো কমতি ছিলো না। একবারই রাত কাটিয়ে ছিলাম রাজবাড়িতে। অত বড় খাটে অত বড় বালিশ-কোলবালিশ এবং অত উঁচু মশারীর নিচে শুয়ে একদিন অন্তত রাজা-রাজা মনে হয়েছিল নিজেকে। রাজবাড়িতে একটি বাস্তু সাপ ছিলো। তার গল্প রীতিমতো অলৌকিক। এখানে তা বলতে বসলে আসল সব গল্পই বলা হয়ে উঠবে না। পরিসর বড় স্বল্প। শিকারের সখও ছিলো না তাও নয় কিরণকাকুর তবে শিকার তাঁকে বড়ই বিপদে ফেলে ছিলো একবার। সে কথা বলব। থুরি! একবার নয় দু'বার। আমার জ্ঞাতসারে।

কিরণকাকু এবং তাঁর স্ত্রী জলপাইগুড়ির রায়কত রাজা প্রসন্নদেব রায়কত এবং রানী অশ্রুমতী দেবীর একমাত্র কন্যা রাজকুমারী প্রতিভা দেবীর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয় শিলিগুড়ির দুর্গা রায়ের মাধ্যমে। ওঁরা সকলেই মক্কেল ছিলেন আমার বাবার। দুর্গাকাকুর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সম্পর্কটা ছিলো অনেকটা সাপে-নেউলের সম্পর্কেরই মতো।

আদতে এই রায়কত রাজাদেরই সম্পত্তি ছিলো বিখ্যাত ও ভয়ংকর দুর্গম বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল। তারই প্রান্তে জলপাইগুড়ি শহরের দিকে ওঁদের দুটি চা-বাগানও ছিলো। শিকারপুর আর ভাণ্ডাপুর অথবা ভাণ্ডাগুরি, এতোদিন পরে দ্বিতীয় বাগানটির নাম সঠিক মনে পড়ছে না। শিকারপুরের বাগানের ঠিক পাশেই ছিলো বঙ্কিমচন্দ্রর "আনন্দমঠ"-এর 'সন্ন্যাসীকাটা' হাট। জমিদারী বিলোপ হবার আগে পর্যন্ত ঐ জঙ্গলে দুর্গাকাকুর ছিলো প্রচণ্ড প্রতাপ। শিকারপুর চা-বাগানের বাবুর্চির নাম ছিলো মঙ্গল। তার যেমন ছিলো রান্নার হাত, তেমনই বন্দুকের। দুর্গাকাকু এক শীতের সকালে মঙ্গলের হাতের বানানো আটটি ডিমের একটি ওমলেট দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শিলিগুড়ির পথে সেভোক্ রোডের দিকে আসছেন। আগেই বলেছি, শীতের সকাল। ফ্যাকাসে-রঙা মাটির পথে মোড় ঘুরতেই দেখেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগাছের নিচে যেখানে ছায়ার ডোরাকাটা রোদের গালচে

BanglaBook.org

পাতা রয়েছে তারই উপর এক ব্যাটা বিরাট কেঁদো বাঘ দুর্গাকাকুর হাতে আত্মহত্যা করে মরবে বলে বসে আছে। জানি না, তার বউ-এর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিলো কি না, অথবা সদ্য-লেখা আধুনিক কবিতা কোনো পত্রিকা থেকে ফেরত এসেছিলো কি না!

দুর্গাকাকু জীপকে স্টার্টে রেখেই রাইফেল তুলে গদ্দাম্ করে দেগে দিলেন। বাঘও ধন্য হলো বিনাবাক্যব্যয়ে মরে।

আমাদের আগের প্রজন্মর শিকারিরা দুর্গাকাকুদের মতো যেমন আকছার বাঘ মেরেছেন এবং অনেকসময় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার গল্প শুনলে বড়ই হীনমন্য লাগতো নিজেদের। আমাদের সুধন্য করবার জন্যে বাঘেরা কখনও প্রেমে ব্যর্থ হতো না। তবে শিকারী হিসেবে ডুয়ার্সের বিভিন্ন বাগানের সাহেব ম্যানেজারদের কাছে শুনেছি এক সময় দুর্গাকাকু অসীম সাহস দেখিয়ে একাধিক বাঘ মেরেছিলেন।

তিস্তার চরে প্রতি শীতে চা-বাগানে সাহেবদের শিকারের ক্যাম্প পড়তো। চা-বাগানের হাতি, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হাতি, পুলিশের হাতি এসে জমা হতো তিস্তার চরে কোনো পূর্ব-নির্দ্ধারিত জায়গাতে। সার সার তাঁবু পড়তো। খাদ্য-পানীয়র সুবন্দোবস্ত থাকতো। বেয়ারা-বাবুর্চি-আব্দার।

তখন উত্তরবঙ্গের ডিভিশনাল কমিশনার ছিলেন আইভান সুরিটা এবং পুলিশের ডি আই জি ছিলেন রঞ্জিত গুপ্ত। বাঙাল। ওরিজিনাল। ঢাকাইয়া ভাষাতেই কথা বলতেন সব সময়। তাই মানুষটি সম্বন্ধে এক ধরনের শ্রদ্ধা ছিলো আমার। যাঁরা বাঙাল হয়েও বাঙাল ভাষাতে কথা বলতে লজ্জা পান তেমন মানুষ অনেকই দেখেছি বলে।

হাতি দিয়ে তিস্তার চরে খেদা করে বাঘ মারা হতো। একবার দুর্গাকাকু হাতীর পেট-কামড়ে ঝুলে থাকা আহত একটি বাঘকে অসীম সাহসের সঙ্গে একহাতে দড়ি ধরে ঝুলে-পড়ে অন্য হাতে রাইফেল ধরে মেরে সাহেব ম্যানেজারদের এবং তাঁদের মেম-সাহেবদের কাছে "হীরো" হয়ে গেছিলেন। এখন বেঙ্গল ল্যাম্প কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেকটর তপনকুমার রায়ও তখন উত্তরবঙ্গের চা-বাগানেরই ম্যানেজার ছিলেন। কিরণকাকুর বড়-জামাই অনির্দ্য বোসও (সাহেবরা 'অনিন্দ্য' উচ্চারণ না করতে পেরে বলতো, 'অ্যান্ডি' বোস) তখন উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের ম্যানেজার ছিলেন।

রঞ্জিত গুপ্ত এবং তার সুন্দরী ও অ্যাকমপ্লিশড্ শিল্পী স্ত্রী মীনা গুপ্তর সঙ্গে জলপাইগুড়ির ডি আই জি'র বাংলোতে আমার প্রথম আলাপ হয় দুর্গাকাকুরই মাধ্যমে। তারপরে ব্যারাকপুরে এবং কলকাতায় যখন পুলিশ কমিশনার ছিলেন এবং পরে আই জি তখন আমাদের বাড়িতে ওঁদের নিত্যই যাওয়া-আসা ছিলো। রঞ্জিত গুপ্তকেও কাকুই বলতাম। পুলিশ অফিসার হিসেবে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন শুনেছি। কিন্তু আমার সঙ্গে তিনি একবার যে "প্র্যাক্টিকাল জোক" করেছিলেন তাতে অমন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আমার মা-বাবার অত দহরম-মহরম করার কোনো মানে আমি অন্তত খুঁজে পাইনি।

মা-বাবা একবার দিল্লী যাচ্ছেন। আমি অফিস থেকে তাঁদের তুলে দিতে গেছি হাওড়া স্টেশানে। তখন আমার একটা স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড গাড়ি ছিলো। কী কুক্ষণে ঠিক সেইদিনই তার ডাক সাইটে জামাইবাবু কলকাতার বাইরে যাওয়ায় দিদিকে পটিয়ে-পাটিয়ে জামাইবাবুর গাড়িতে গার্ল-ফ্রেন্ডকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরুনো বেসামাল এক ছোঁড়া পেছনে এসে দড়াম করে মেরে দিলো আমার গাড়িকে। আমি তাকে বকব বা তার গাড়ির নাম্বার নেবো কি, সে বেচারী কেঁদেই বাঁচেনা। কেবলই বলে, জামাইবাবু এসে পিঠের চামড়া তুলে নেবে। ও দাদা। আমি কি করি? ও দাদা। বাঁচান। বাঁচান। আপনার পায়ে পড়ি আমাকে

বাঁচান। দিদিকে বের করে দেবে বাড়ি থেকে।

মহা বিপদেই পড়লাম। তখনও এ দেশে এমন ভদ্রতার পরিবেশ ছিলো যে অন্যায়কারী স্বীকার করতো যে, সে অন্যায় করেছে তখনকার কলকাতার ছেলেরা সকলেই 'তালেবর' ও 'দুর্বিনীত' হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া, কলকাতা শহরটা বাঙালীদেরই শহর ছিলো তখনও। একটি হেড-লাইট ভেঙে গেছিলো বেচারার গাড়ির। থুড়ি, জামাইবাবুর গাড়ির। রেডিয়েটরের গ্রিলও চুরমার। রেডিয়েটর থেকে জল ঝরছে ঝরঝর করে তার চোখের জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। ভীড় জমে যেতেই তার হাইলী ইন্টেলিজেন্ট গার্লফ্রেন্ড বেগতিক দেখে একটি আট নম্বর বাসে উঠে, "কেঁদো না মান্তু। লক্ষ্মীটি! ফোন করব পরে।" বলেই, হাওয়া হয়ে গেলো। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে ধরলো আমাদের। তখনকার কলকাতার পুলিশও ধরাধরি করতো। বলল, থানায় চলুন। ডাইরী করুন। ছেলেটি ছাপড়া জেলার বিহারী পুলিশের নৌকোর সাইজের জোড়া বুটে-ঢাকা পায়ের উপর শুয়ে পড়লো। কেঁদে বলল, ও দাদা। ও পুলিশ-দাদা! জামাইবাবুর হাত থেকে বাঁচান। আমাকে বললো, আপনি ডাইরী করলে ইনস্যুরেন্স কোম্পানী জাম্বুর উপরে ক্লেইম করবে। করলে, আমি মারা যাবো। জাম্বুর গাড়ি আর আপনার গাড়ি দুই-ই আমি আমার যথাসর্বস্ব বেচে মেরামত করে দেবো।

আমি ওকে আশ্বস্ত করে বললাম যে, ডাইরী করবো না এবং আমার গাড়ি আমিই সারিয়ে নেবো।

কোনো কোনো জামাইবাবু যে চাম্‌টার মানুষখেকো বাঘের চেয়েও ভয়াবহ হতে পারেন এমন ধারণা আমার ছিলো না। আমার কোনো আপন দিদি নেই তাই জামাইবাবুদের সম্বন্ধে ধারণা অস্পষ্টই ছিলো।

পুলিশ লাইসেন্স দেখতে চাইলো। লাইসেন্স সঙ্গে ছিলো না। সেই সময়ে গাড়ির মালিকদের লাইসেন্স সঙ্গে রাখার নিয়ম চালু হয়নি। ছেলেটি তার লাইসেন্স দেখালো। ছেলেটির লাইসেন্স দেখে পুলিশ তাকে ছেড়ে দিলো। ছেড়ে দিলো মানে, পথের-মাঝেই হাতে হ্যারিকেন ধরিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিলো। কিন্তু আমার লাইসেন্স সঙ্গে ছিলো না।

পুলিশ বললো, গাড়ির বাঁ-দিকের দরজা খুলুন। বসব আমি। থানায় যেতে হবে আপনাকে।

কেন? সবিস্ময়ে বললাম আমি।

আমি তো মারিওনি। ওই তো মারলো আমাকে আচ্‌মকা পেছন থেকে এসে।

সে যাইই হোক। কেস্ হবে আপনার এগেইনস্টে। কে মেরেছে সেটা বড় কথা নয় ধাক্কা লেগেছে সেটাই যথেষ্ট।

মহা বিপদেই দেখি পড়লাম আমি শালা! আনজান অন্যর শালাকে বাঁচাতে গিয়ে।

থানাতেই যেতে হলো। থানা থেকে বলা হলো "গাড়ি এখানে রেখে যান। বাড়ি থেকে লাইসেন্স এনে দেখিয়ে তার পর গাড়ি ফেরত নিয়ে যাবেন।"

ট্যাকসি করে বাড়ি ফিরে লাইসেন্স বের করেই দেখি সর্বনাশ! দেড় মাস আগে এক্সপায়ার করে গেছে। ভুলেই গেছিলাম। তখন অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন এ সব ব্যাপারে মনেটনেও করাতো না। কী করি। পরক্ষণেই মনে পড়লো, আরে! রঞ্জিত কাকুই তো পুলিশ কমিশনার। সপ্তাহে দু তিনদিন আসেন। খান-দান বাবা-মায়ের সঙ্গে গল্প করেন। আমাকে 'লাল' বলে নাম ধরেই ডাকেন। সামান্য একটা ব্যাপারে একটুসাহায্য করবেন না?

BanglaBook.org

ফোন করলাম ওঁকে।

উনি বললেন, কও লাল ? কী ব্যাপার ? কও ?

কাঁচুমাচু হয়ে বললাম, খেয়াল ছিলো না, ড্রাইভিং লাইসেন্সটা এক্সপায়ার করে গেছে দেড় মাস আগে। কালই রিনিউ করতে দেবো। ভবানীপুর থানাতে গাড়ি রেখে দিয়েছে কিছু কি করা যাবে ?

ইতে করনের আছেটা কি ?

উনি আমাকেই প্রশ্ন করলেন।

তারপরই উপদেশ দিলেন, এক কাম করো। থানার ও· সি, রে যাইয়া এক্ষুনি কও যে তোমারে যেদিন মোটর ভেহিকলস্ লাইসেন্স দিছিলো ; অনেক বছর আগেই তো দিছিলো, না কী কও ?

হ্যাঁ।

তবে ? তখন তো মুখ দেইখ্যা দেয় নাই। গাড়ি চালাইতে জানো, তাইই তো দিছিলো। লাইসেন্স এক্সপায়ার কইরা গ্যাছে তো হইছে টা কি ? তুমি গাড়ি চালাইতে তো আর ভুইল্যা যাও নাই ?

আমাকে নীরব থাকতে দেখে ও প্রান্ত থেকে আবার বললেন, কী হইলো ? কথা কও না ক্যান ?

কথা আর কি বলব। পুলিশ কমিশনার কাকুর বাক্য শুনে তখন তো আমি নিবার্কই।

বোঝলা লাল যা কইলাম তোমারে, তুমি যাইয়া ও সি-রে ঠিক তাইই কও।

ততক্ষণে পুলিশ-কমিশনার কাকুর উপরে আমার ভক্তি চটে গেছিলো।

বললাম, ঠিক আছে।

উনি বললেন, হ। পারফেক্টলি ওল্-রাইট। যাও যাইয়া কও। তারপরেও যদি কোনো কমপ্লিকেশন হয় তো জানাইও আবার আমারে।

লাস্ট বাট নট দ্যা লিস্ট আপীল করলাম : আপনার পক্ষে থানার ও সি-কে কিছু বলা···

আরে আমার কওনের দরকারডা কি ? ফর-নাথিং। তুমি যাইয়াই কও। অ্যাডমিনিস্ট্রেশানে এমন ইন্টারফিয়ারেন্স ঠিক না। বোঝলা না !

বললাম, আচ্ছা।

বলেই, ফোন নামিয়ে রেখে দিলাম। ফোনও নামালাম আর আমার এক মাসতুতো ভাই ঠিক তখনই এসে হাজির। সে সব শুনে বললো দে দেখি। লাইসেন্সটা দে। রাখ্ তোর পুলিশ কমিশনার। মাসীমা দিল্লী থেকে ফিরলেই বলব যে এমন পুলিশ কমিশনার বন্ধু থেকে লাভটা কোন্ ঘণ্টার ?

আধ ঘণ্টা মধ্যেই সে থানা থেকে গাড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে এসে প্রচণ্ড জোরে হর্ন দিতে লাগলো। তার বিজয়োল্লাস জানাতে। বললো, দেখলি তো। আমি হচ্ছি তোর পুলিশ কমিশনারের বাবা।

অবাক হয়ে বললাম, ছাড়ালি কি করে গাড়ি ?

অতো কথার দরকার কি তোর ? রাবড়ি আনা। ও বললো।

দুর্গাকাকুর কথা আগেই বলেছি। বহু ভাষায় পারঙ্গম। পাঁচ মিনিটে যে-কোনো মানুষকে ইমপ্রেস্ করতে পারতেন। চমৎকার ইংরিজি বলতেন এবং লিখতেন। বাংলাও তাই। ভালো রান্না করতেন। গাড়ির কাজ জানতেন চমৎকার। পশ্চিমবঙ্গের চিফ সেক্রেটারী, শিকারী, সখের তীরন্দাজ রণজিৎ রায়, ছিলেন দুর্গাকাকুর দাদা-স্থানীয়। দুর্গাকাকুর মতো

BanglaBook.org

রসিক সঙ্গী পাওয়া সত্যিই দুর্লভ ছিলো। সব বয়সের এবং সব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে অবাধে মেলামেশার ক্ষমতা ছিলো তাঁর।

কিন্তু দুর্গাকাকুর চোখের বালি ছিলেন বন-বিভাগের তৎকালীন চিফ্ কনসার্ভেটর দক্ষ ও কৃতী কনক লাহিড়ী মশায়। বলা বাহুল্য, লাহিড়ী সাহেবও যে দুর্গাকাকুর প্রতি প্রেম পুষতেন তাও নয়। যাকে বলে ভগবানের মার। দুর্গাকাকুকে একবার বড়ই বে-কায়দায় ফেলেছিলেন লাহিড়ী সাহেব। দুর্গাকাকুও যে মাঝে মাঝেই তাঁকে বে-কায়দায় ফেলার চেষ্টা করতেন তা বলাই বাহুল্য।

জনসন সাহেব তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান আয়কর কমিশনার। তাঁকে নিয়ে কিরণকাকু আর দুর্গাকাকু উত্তরবঙ্গে গেলেন একবার। যখন গেলেন তখন কোনো খবর দেননি আমাকে কেউই। ভাবটা, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। একদিন অফিসে কাজ করছি, জনসন সাহেব ফোন করে বললেন, আর উ্য ভেরী বীজী লাল ?

নো। হোয়াই ?

ক্যুড উ্য প্লীজ কামটু মী ফর ফাইভ মিনিটস ? যখন পৌঁছলাম গিয়ে আয়কর ভবনে জনসন সাহেবের ঘরে, দেখি প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে জনসন সাহেব পাইপে তামাক ঠুসছেন। যেন, কারো মুণ্ডুই ঠুসছেন পাইপের ভিতরে।

আমি যেতেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন উত্তেজিত গলায়, লুক্ অ্যাট দিস্। বলেই একটা চিঠি এগিয়ে দিলেন। দেখি কে· এন· লাহিড়ীর লেখা অফিসিয়াল চিঠি। ইংরিজিতেই লেখা। জনসন সাহেবকে লিখেছেন আমি শুনতে পাচ্ছি যে আপনি উত্তরবঙ্গে শিকারে গিয়ে নোটোরিয়াস পোচার দুর্গা রায়ের সঙ্গে বিনা পারমিটে একটি স্ট্যাগ্ মেরেছেন। তাও রাতের বেলা। এবং স্পটলাইটে হাতির পিঠ থেকে। প্লীজ এক্সপ্লেন এন্ড প্লীজ লেট মী নো হু অ্যারেঞ্জড দ্যা শুট ফর উ্য এন্ড অ্যাকম্প্যানীড উ্য ?

বললাম ব্যাপারটা কী ! কবে গেছিলেন ? কার সঙ্গেই বা গেছিলেন ?

আরে দুর্গা, মাই গুড ফ্রেন্ড এন্ড ডক্ বোস টুক্ মী দেয়ার। পারমিট ছিলো না তা আমি জানব কি করে ? দুর্গার যে খামার বাড়ি আছে শালমাড়ায়, সেখানে গিয়ে উঠেছিলাম, তিনধারিয়ার পথে হিল-কার্ট রোড-এর উপরে। রাতের বেলা দুর্গার হাতিতে আমি আর ডক্-বোস্ গেছিলাম মাহুতের সঙ্গে। জঙ্গলের মধ্যে মাইলখানেক গিয়েই একটি ভালো স্পটেড ডিয়ারের স্ট্যাগ দেখে গুলি করতেই তো সে পড়ে গেল। তখন হাতিকে বসানো হলো। ডক্ বোস নিচে নেমে হরিণের পেটে দড়ি বেঁধে দিলেন। তার পর নিচ থেকে উনি ঠেলতে লাগলেন আর আমি আর মাহুত হেঁইও হেঁইও করে টানতে লাগলাম দড়ি ধরে। হাতির পিঠেই বসে। উদ্দেশ্য, হাতির পিঠে শিকারকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরব। কিন্তু ঐ প্রক্রিয়া চলাকালীন হরিণের শিং পুরুষ হাতীর শরীরের কোনো সংবেদনশীল জায়গাতে হঠাৎ খোঁচা দেওয়াতে হাতি তো তড়াক্ করে উঠে দাঁড়ালো। আর দাঁড়িয়েই ক্যাম্প বলে সোজা দৌড়। লীভিং পুওর ডক্-বোস বাহাইন্ড্ ইন দ্যা ডার্ক ফরেস্টস্। আমি আর মাহুত তো হাতীর পিঠের দড়ি ধরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম হাতির পিঠে। তবুও কি বাঁচোয়া ? ডালপালার ধাক্কাতে মাথা ফেটে না গেলেও সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলো। হাতি সোজা এসে থামলো দুর্গা রায়ের খামারে। দুর্গা আতঙ্কিত গলায় বললো, কিরণ ? কিরণ কোথায় ?

আমি বললাম, সে জঙ্গলে। মৃত-শিঙালের সঙ্গে।

তখন জীপ আর স্পট-লাইট নিয়ে মাহুত এবং অন্য দুজন লোককে নিয়ে দুর্গা

BanglaBook.org

ডক্-বোসকে খুঁজতে বেরুলো।

কিরণকাকু কি করলেন ? রাইফেল ছিলো না ? নিরস্ত্র ছিলেন ?

না না ! রাইফেল ছিলো বই কী ! হল্যান্ড এন্ড হল্যান্ডের থ্রী সেভেনটি ফাইভ ম্যাগনাম ডাবল-ব্যারেল রাইফেল ছিলো তাঁর সঙ্গে। থাকলে কী হয় বেচারী ডক্ বোস একা অন্ধকারে ভয় পেয়ে একটা গাছে চড়তে গেলেন। শেষবার গাছে চড়েছিলো পঞ্চাশ বছর আগে। তাছাড়া ভাল রাইফেল হাতে থাকলে কি হয় ? এসব তো চর্চার জিনিস। চর্চা তো ছিলো না ডক্-বোস-এর।

তারপর ?

ঐ গাছে চড়তে গিয়ে পড়ে গিয়ে তো তাঁর মেরুদণ্ডে চোট লাগলো ভীষণ। তখন আরও ভয় পেয়ে বেচারী আরেকটি গাছে চড়তে গেলেন। এবং চড়তে না পেরে হাত দুয়েক উপরে উঠে একটি ডাল জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলেন। এদিকে দুর্গা রায় সমস্ত জঙ্গল জীপের হেডলাইট আর স্পটলাইটের আলোয় ভাসিয়ে কিরণ ! কিরণ ! করে ডাকতে ডাকতে জঙ্গল তোলপাড় করে ফেললো। অনেকক্ষণ পর যখন আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে দুর্গা এমন সময় হঠাৎ জমি থেকে দু হাত উপর থেকে ডক্ বোস করুণ স্বরে বলে উঠলেন "অ্যাঁই যে ! আমি এখানে !"

ডক্ বোস্‌কে নামিয়ে এনে পরদিনই প্লেন ধরে কলকাতায় ফিরলাম আমরা। উডল্যান্ডস্ নার্সিং হোমে ভর্তি হলেন তিনি। কিন্তু ব্যাপারটাকে এতোই পাব্‌লিসাইজ করলেন যে দ্যাখো। জাস্ট সী। দিস লাউজী ইরেসপনসিব্‌ল সান-ই-ল অফ আ রাজা। এক ভাই কম্যুনিস্ট আর অন্যজন হাইট অফ ক্যাপিটালিস্ট !

হতভম্ব আমি বললাম, এখন কি জবাব দেবেন ? চিফ কনসার্ভেটরকে ?

জবাব দিলে তো দুর্গা আর ডক্ বোসের কথাও বলতে হয়। আই ক্যান্ট লেট-ডাউন মাই ফ্রেন্ডস। দুর্গা ইজ আ গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন। সো ইজ ডক্।

তাহলে কি করবেন ?

আই উইল পুট দ্যাট লেটার ইন্ মাই পাইপ এন্ড স্মোক ইট অফফ্। হোয়াট এল্‌স্ ক্যান আই ড্যু ? কিন্তু যা বললেন তা না করে, চিঠিটিকে কুঁচি-কুঁচি করে ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে ফেলে দিলেন জনসন সাহেব।

কনক লাহিড়ী সাহেব তাঁর পুরোনো শত্রুর ওপরে একহাত নিতে পেরে নিশ্চয়ই খুব মজা পেয়েছিলেন।

শিকারী আর বনবিভাগের মধ্যে এরকম খেলা সব সময়ই চলে এসেছে। দুঃখের বিষয় এই যে সব বনরক্ষকই কনক লাহিড়ী নন। কনক লাহিড়ীর মতো দক্ষ বনরক্ষক খুব বেশি হননি পশ্চিমবঙ্গে। উত্তর বাংলার হলং ফরেস্ট রেস্ট হাউস তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি। প্রত্যেকটি ঘর বিভিন্ন কাঠের তৈরি। এরকম সুদৃশ্য মনোরম বন-বাংলো পৃথিবীর কম জায়গাতেই আছে। ভারতের বিভিন্ন বনবিভাগে এমন অনেক মানুষ আছেন, বিশেষ করে অধস্তন মহলে, তাঁরা যাঁরা পারমিট নিয়ে আইনত শিকার করতে যান, তাঁদের উপরেই নানারকম হয়রানি করেন। অমন অনেকানেক ঘটনার কথা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আছে যা সময়মতো বলা যাবে।

BanglaBook.org

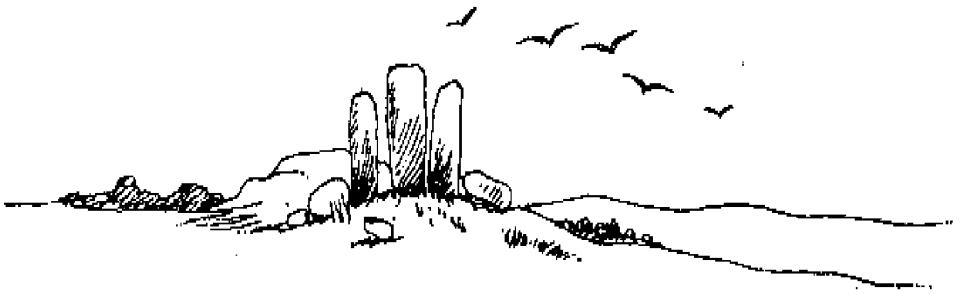

পরের বছর আর্য ভৌমিক সাহেব (উনি তখন ওড়িশার গঞ্জামের বহরমপুরে পোস্টেড) কালাহাণ্ডীতে শিকারের বন্দোবস্ত করে জনসন সাহেবকে নেমন্তন্ন পাঠালেন। দুর্গাকাকুও যাবেন। সদাই সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত খাঁটি বাঙালি অকৃতদার ভৌমিক সাহেব আজ পরলোকে। আমি তাঁকে ভৌমিককাকু বলেই ডাকতাম। দুর্গাকাকুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিলো উনি যখন জলপাইগুড়িতে ছিলেন সেই সময় থেকেই। আমাদের সঙ্গে আলাপ বহুদিনের। ভারত সরকার এদেশে এস্টেট-ডিউটি মৃত্যু-কর আইন প্রবর্তিত করার পর ওঁকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিলেন ঐ আইন সম্বন্ধে বিশারদ হয়ে আসার জন্যে। যখন ফিরলেন তখন এস্টেট-ডিউটি সার্কল-এ পোস্টিং না করে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন বড়কর্তারা ওড়িশার বহরমপুরের (গঞ্জাম, "গোপালপুর-অন-সী" ঐ স্টেশনে নেমেই যেতে হয়) মতো ছোট্ট একটি জায়গায় অ্যাপীলেট কমিশনার করে। এই হলো ভারত সরকারের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পলিসি। এবং এফিসীয়েন্সীও বটে।

জনসন সাহেব আমাকেও তো ডেকে পাঠালেন। কালাহাণ্ডীর শিকারের বন্দোবস্তর কথা বলে বললেন, তোমাকেও যেতে হবে।

আর কে যাবে?

জনসন সাহেব বললেন, কলকাতার ব্রিটিশ হাই কমিশনের সেকেণ্ড সেক্রেটারী জিম্ ক্যালান। আমার বিশেষ বন্ধু। স্কটস্‌ম্যান সে।

আর?

আর কেউ নয়। দুর্গা অবশ্য যাবে।

পরদিন দুর্গাকাকু আমাকে ফোন করে বললেন, লাল, কিরণ খুবই ধরেছে কালাহাণ্ডী যাবে বলে। ও কালাহাণ্ডীতে কখনও যায়নি। কুমুদ চৌধুরীর মতো শিকারিকেও যেখানে বাঘে খায় সেই জঙ্গল দেখার ওর খুবই ইচ্ছে। কোনো কারণে জনসন সাহেব ওঁকে নিয়ে যেতে রাজী হচ্ছেন না। তুমি বললে হয়তো রাজী হবেন। একবার বলে দেখো।

আমি জনসন সাহেবের বাড়ি গেলাম ফোন করে। উনি ডিনার খেয়ে যেতে বললেন। সেদিন ওঁর বড় ভাই লেস্‌লি জনসনও ওঁর কাছে এসেছিলেন ডিনার খেতে। উঠেছিলেন অবশ্য গভর্নরস্ হাউসে। তৎকালীন গভর্নর ধরম্‌ভীরা সাহেব লেস্‌লি জনসন-এর বন্ধু ছিলেন। ওঁরা একই ব্যাচের আই· সি· এস·।

জনসন সাহেব হুইস্কী দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। লেস্‌লী জনসনের মতো আন-অ্যাসুমিং আই· সি· এস· অফিসার খুব কমই দেখেছি।

জনসন সাহেবের কাছে কিরণ কাকুর অর্থাৎ ডক্ বোস্-এর কথাটা তুলতেই তিনি পাইপের ছাই ঝেড়ে বললেন, লুক লাল। ডক্ বোস ক্যান জয়েন আস্ অন ওয়ান

কন্ডিশান। ওন্‌লী অন্‌ ওয়ান্‌ কন্ডিশান্‌।

হোয়াটস্‌ দ্যা কন্ডিশান ?

আমি শুধোলাম

জনসন সাহেব বললেন, আই উইল টাই হিম আপ্‌ অ্যাজ অ্যা বেইট্‌ ফর দ্যা টাইগার

আমি তো কথা শুনে হো হো করে হেসে ফেললাম।

তখন চিফ্‌ মিনিস্টার জ্যোতিবাবু এই জ্যোতিবাবু ছিলেন না ! তাঁর পুরোনো মডেলের ছোট্ট কালো ফিয়াট গাড়িখানা কম্যুনিস্ট পার্টির অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো আর উনি সারাদিন পার্টির কাজ করতেন যখন বিধানসভা বন্ধ থাকতো। জনসন সাহেব আজকের জ্যোতিবাবুর দাদাকে অমন তাচ্ছিল্য করতে পারতেন কি না সন্দেহ।

কিরণকাকুও গত হয়েছেন অনেকদিন হলো। শেষ দিকে শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন বেশ কিছুদিন। দেখে কষ্ট হতো। অসুস্থ থাকাকালীন জলপাইগুড়িতেও দেখতে গেছিলাম তাঁকে একবার।

যাই হোক, এ শর্ত মেনে কিরণকাকুকে সঙ্গে নিয়ে কালাহান্ডী যাওয়া সম্ভব ছিলো না। তাই এক বিকেলে তো চার মূর্তি মাড্রাস মেইলে চেপে বসলাম। সকলে জিম্‌-এর বাড়ি গেলাম। জিম্‌ ক্যালানের স্ত্রী একটি মেরুন রঙের ফোর্ড-কার্টিনা গাড়ি করে আমাদের সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

ট্রেন ছাড়বার একটু আগে মিঃ ক্যালান বললেন ড্যু উ্য হ্যাভ এনি গ্লাসেস মিঃ গুহা ?

বললাম, ইয়েস। কিন্তু আমার রীডিং-গ্লাস। প্লাস-পাওয়ার।

জিম্‌ হেসে ফেললেন।

বললেন, আই মীন গ্লাসেস ফর হুইস্কি।

তাড়াতাড়ি প্লাটফর্মে নেমে প্লাস্টিকের গ্লাস কিনলাম, ট্রেন ছাড়ার দেরি ছিলো না বেশি। জিম্‌, হোয়াইট হর্স্‌ স্কচ-হুইস্কীর একটি কেস্‌ বের করে তা থেকে একটি বোতল বের করে এক গ্লাস হুইস্কী ঢেলে ডান হাতের তেলো দিয়ে তা ঢেকে রেখে চুমুক দিতে লাগলেন। দেখলাম, জল বা সোডার ভেজালে উনি আদৌ বিশ্বাসী নন।

আমরা ভদ্রলোকের মতো একটু একটু নিয়ে সোডার বদলে পানি দিয়েই খেলাম।

খড়গপুর আসার আগেই ক্যালান সাহেব তো দু গ্লাস নীট-হুইস্কি উড়িয়ে দিলেন। তারপর খড়গপুরে ডিনার শেষ করে কফির পেয়ালাতে কফির একটু তলানি রেখে বাকিটা আবারও হুইস্কি দিয়ে পুরিয়ে "গুডনাইট্‌" বলে উপরের বার্থে উঠে শুয়ে পড়লেন।

আমিও আমার বার্থে উঠে শুয়ে পড়লাম "গুডনাইট" বলে। মনে মনে প্রমাদ গুনতে গুনতে।

ওঁর জন্যে জনসন সাহেব আমাকে একটি একস্ট্রা রাইফেল নিতে বলেছিলেন। বাবার একটি অর্ডিনারী থ্রী-সেভেন্টি-ফাইভ সিঙ্গল ব্যারেল রাইফেল সঙ্গে নিয়েছিলাম সেই কারণেই। সে রাইফেলের রাইফ্‌লিং বলে আর কিছু অবশিষ্ট ছিলো না। জলের কলের মতো মসৃণ হয়ে গেছিলো। তা দিয়ে পালামৌতে গত শীতে দশ হাত দূর থেকে একটি বড়কা-চিতল শিঙালকে গুলি করাতে সে হরিণ পা-ঝাড়া দিয়ে গুলি ঝেড়ে ফেলে দৌড়ে চলে গেছিলো। বার্থে শুয়ে ভাবছিলাম যে ঐ রাইফেল এনে ভালোই করেছি। কারণ আগে তিনি কখনও শিকার করেননি, এমনকি ইংল্যান্ডের ফক্স্‌ বা র‍্যাবিট্‌ বা পার্ট্রিজ-হান্টিংও নয়, এহেন বিপজ্জনক মদ্য-প্রীতির এক রংরুট শিকারীকে কালাহাণ্ডীর মতো জায়গায় নিয়ে গিয়ে যথাযথ রাইফেল হাতে দিয়ে আমাকে খুনের দায়েই পড়তে হতো। অবশ্য এনেও কম

BanglaBook.org

বিপদে পড়িনি। কারণ আমার পিতৃদেবের ঐ অযান্ত্রিক-যন্ত্র দিয়ে এই রকম শিকারী বাঘকে গুলি করলে বাঘ তো তাঁকে খাবেই উপরন্তু ব্রিটিশ হাইকমিশনের সেক্রেটারীকে জেনেশুনে খুন করানোর অপরাধে আমারও নির্ঘাত ফাঁসি হবে।

ভাইজাগ্ স্টেশনে মাড্রাস মেল পৌঁছল পরদিন লাঞ্চের সময়ের একটু আগে। ওখানের মিঃ রায় নাইডু এবং ভৌমিক কাকু স্টেশানে ছিলেন। সার্কিট হাউসে গিয়ে বীয়ার সহযোগে জব্বর লাঞ্চ খেয়ে দুখানি গাড়িতে হাত-পা ছড়িয়ে আমরা রওয়ানা হলাম রায়গড়ার দিকে। রায়গড়ায় পৌঁছে স্ট্র-প্রডাকটস্ কোম্পানির গেস্ট-হাউসে রাত্রি বাস করে অন্ধকার থাকতে থাকতে রওয়ানা হবো কালাহাণ্ডীর দিকে। বহরমপুর (গঞ্জাম) থেকে রায়গড়ার পথটির নিসর্গ দৃশ্য ভারী সুন্দর। পথে শ্রীকাকুলাম্ পড়ে। পরে, ওই জায়গায় বাংলার নকশাল বাড়ির মতো নকশালপন্থীদের ঘাঁটি হয়েছিলো।

রায়গড়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে গেলো। চমৎকার এয়ার-কন্ডিশান্ড গেস্ট হাউস। ডিসেম্বর মাস, তাই এয়ার-কন্ডিশনার চালাবার দরকার পড়লো না। প্রীমিয়াম্ স্কচ্ হুইস্কী পান করার পর পুরোদস্তুর ইংরিজি খানা খেয়ে শুয়ে পড়া গেল।

অন্ধকার থাকতেই দুটি জীপ নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। রায়গড়া থেকে সঙ্গে একটি ট্রাক চললো খাবার দাবার এবং খিদ্‌মদ্‌গারদের নিয়ে। সঙ্গে ধোবা-নাপিতও ছিলো। কুক-বেয়ারারা। একেবারে ভাইস্‌রয়ের শুট্-এর মতোই বন্দোবস্ত। বেলা দশটা নাগাদ কশিপুর নামের একটি বন-বাংলোতে গিয়ে অবশেষে পৌঁছলাম আমরা অনেক মাইল ধুলিধূসরিত পর পেরিয়ে। ঐখানেই ক্যাম্প হবে। তেজপুর থেকে একজন ইনকামট্যাক্স অফিসার এবং একজন ইনস্‌পেক্টরও এসেছিলেন আমাদের তত্ত্বাবধান করতে। ইনস্‌পেক্টরের নাম ছিলো মণ্ডল সাহেব। বছর কুড়ি পরে তিনি শিলিগুড়ির চার্জ আই-টি-ও হয়েছিলেন। অফিসার যিনি ছিলেন, চমৎকার ভদ্রলোক কিন্তু নাম এতোদিন পরে আর মনে নেই।

এবারের আইভান্ সুরিটার ফোর্-সেভেন্টি-ফাইভ ডাবল ব্যারেল রাইফেলটি আমি সঙ্গে নিয়ে গেছিলাম। কালাহাণ্ডীর মানুষখেকো বাঘ তো কোন্ ছার হাতিও ঐ রাইফেলের মার খেলে কাটা কলাগাছের মতো ধপ্পাস্ করে পড়বে। কিন্তু রাইফেলটি আইভান্ ভালোবেসে আমাকে দিয়ে যাওয়ার পর ট্রাই করার সুযোগও হয়নি। "জিরোরিং" করার কথা তো দূরস্থান! আইভানের কাছেও রাইফেলটি বহুদিন অব্যবহৃত অবস্থাতেই পড়ে ছিলো। সেন্টজেভিয়ার্স স্কুলের পেছনের রাস্তায় সুরিটাদের পুরোনো বাড়ির চওড়া আলোকিত বারান্দায় গোল টেবিলে নানা বর্ণের পানীয়র বোতল সাজিয়ে আইভান মেঝেতে বসে খালি গায়ে লুঙি পরে চুল কাটতে কাটতে আর ডেস্‌মন্ড ডয়েগের সঙ্গে গল্প করতে করতেই আমাকে একদিন বলেছিলেন লুক্ লাল। ইটস্ মাই লাভ। লু আফটার হার ওয়েল।

রাইফেলটির গায়ে যে এনগ্রেভিংস ছিলো, তাতে সন্দেহ ছিলো না যে, কোনো রাজা-মহারাজা "কাস্টম্-বীল্ট" করে তৈরি করিয়েছিলেন ওটি প্রস্তুতকারককে দিয়ে। ভালোবাসার মতো রাইফেলই বটে। কশিপুর বাংলোতে পৌঁছবার একটু পরই বাংলোর হাতার মধ্যেই এক সুপ্রাচীন আম গাছের ডালে ঐ রাইফেল প্রথম ছুঁড়ে পরীক্ষা করতে গেলাম দু ব্যারেলের দুটি গুলি পুরে নিয়ে। গুলি তো নয়, যেন গোলা। হাজারীবাগের শিকারী টুটু ইমামের আমেরিকান মক্কেলদের দিয়ে আনিয়ে আমাকে ফোর-সেভেন্টি-ফাইভের বেশ কিছু ঝক্‌ঝকে নতুন গুলিও আনিয়ে দিয়েছিলেন আইভান্।

BanglaBook.org

কিন্তু ডান দিকের ব্যারেল ফায়ার করতে যেতেই দেখি সর্বনাশ ! স্ট্রাইকিং পিনই কাজ করছে না। বাঁ দিকের ব্যারেল ফায়ার করে দেখলাম গুলি, যেখানে নিশানা নিচ্ছি তার দু হাত বাঁ দিকে মারছে। পর পর আরো দুটি গুলি বাঁ ব্যারেলে ফায়ার করলাম। আমার নিশানাতেই ভুল হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে। তারপর একেবারেই হতাশ হয়ে পড়লাম আমি। নিজের ব্যবহারের অন্য কোনো রাইফেল বন্দুকও আনিনি। মানুষখেকো বাঘে ভরা জঙ্গলের পক্ষে ঐ রাইফেলই নিরাপদতম বলে মনে করে মাত্র একটি রাইফেলই নিয়ে এসেছিলাম। এবং সেটি আইভান্ সুরিটার রাইফেল।

জনসন সাহেবের ফোর-টু-থ্রী সিংগল ব্যারেল ম্যাগাজিন রাইফেল। দুর্গাকাকু সেবার তাঁর ফোর-ফিফটি-ফোর-হান্ড্রেড ডাবল্-ব্যারেল রাইফেলটি নিয়ে গেছিলেন।

ব্যাপার দেখে আমি ওদের বললাম, আই অ্যাম আউট অফ দ্যা শুট্। বাঁ দিকের ব্যারেলে একটি গুলি পুরে রাইফেল নিয়ে তোমাদের সঙ্গে থাকবো যদিও জাস্ট টু কীপ উ্য কোম্পানি। আর কিছু নয়। যদি কোনো জানোয়ার আমার গা ঘষাঘষি করতে আসে তবেই মাজলটি তার গায়ে ঠেকিয়ে ঠুকে দেব। ডান ব্যারেল তো মারছেই না, বাঁ ব্যারেলও তো দু হাত বাঁদিকে মারছে। তাই এই রাইফেলে আর লাঠিতে এখন কোনো তফাতই নেই। কলকাতায় গিয়েই ইস্ট ইন্ডিয়া আর্ম্স-কোম্পানীতে দিয়ে দেখতে হবে এর কতটা উন্নতি করা যায়।

আসামের সেই ভোজবাজী-দেখানো বাঘটি মিস্ করার পর জনসন সাহেব একটি লেপার্ড মেরেছিলেন। তোপচাঁচীর কাছে। বদি রায়ের ভাইপো, আমাদের বন্ধু এবং ওলিম্পিকে শুটিং-এর প্রতিযোগী প্রণব রায় নিয়ে গিয়ে মারিয়েছিলো। এইবারে যদি বড় বাঘ মারানো যায় তাঁকে একটি !

আমাদের গাইড হিসেবে ভৌমিককাকু একজন ভালো ওড়িয়া শিকারিও দিয়েছিলেন। তার নাম রামচন্দ্র দণ্ডসেনা। কাজ চালানোর মতো ওড়িয়া আমি বলতে পারি এবং ঐ ভাষা আমার খুব প্রিয়ও। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে জানা গেলো যে, সে দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টের অফিসিয়াল শিকারি ছিলো যখন লেস্‌লি জনসন দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টেস্-এর চেয়ারম্যান ছিলেন।

দণ্ডসেনা লোকটি ভারি ভালো। বিনয়ী। ধর্মভীরু। প্রকৃত সাহসী মানুষরা সকলেই বিনয়ী হন। সাহস ব্যাপারটা বাহ্যিক আস্ফালনের নয়। অন্তর্জগতের ব্যাপার। এবং আগেই বলেছি, ফিজিক্যাল কারেজ ইজ্ দ্যা লিস্ট ফর্ম অফ কারেজ।

আমি ওড়িয়া বলতে পারি বলে দণ্ডসেনার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেলো। তাকে বললাম যে, তোমার পূর্বতন সাহেবের ছোট ভাই এসেছেন, তাকে একটা বাঘ মারিয়েই দিতে হবে।

সে বললো, আপ্রাণ চেষ্টা করব। আমার সাহেবের "সাম্ব" ভাই বলে কথা !

যে-গ্রামেই যাই সেখানেই শুনি যে বাঘে মানুষ নিয়েছে। কোথাও সাতদিন আগে, কোথাও একমাস, কোথাও তিনমাস। পঞ্চাশ বর্গমাইল এলাকা চষে বেড়ালাম জীপে করে প্রথম দিনেই। কিন্তু সদ্য-কিল্ হয়েছে এমন কোনো গ্রামই পেলাম না। এদিকে সবশুদ্ধ থাকা হবে কুল্লে চারদিন। চারদিনের অর্ডারে ভালো কেস পাওয়া যায় না আর মানুষখেকো বাঘ পাওয়া যাবে কোত্থেকে।

পরদিন সকালে একটি গ্রামে গিয়ে জানা গেলো গত রাত্রে বাঘে একটি গরু মেরেছে। মানুষখেকো কেন, গরুখেকো বাঘও অমন শর্ট-নোটিসে মারা যায় না। সে গভর্নরই চান আর জনসন সাহেবই চান। তবু জীপ ছেড়ে প্রায় আধ মাইল জঙ্গলের মধ্যে নদী পেরিয়ে

BanglaBook.org

হেঁটে গিয়ে অর্ধভুক্ত গরুর খোঁজ পাওয়া গেলো। অতি ধুরন্ধর বাঘ। ভুক্তাবশেষ একটি পুটুসের (ল্যানটানা) ঝোপের মাঝখানে নিয়ে রেখেছে লুকিয়ে। এবং জায়গাটার চারদিকেই প্রায় হাজার বর্গগজ ঘাসের বন। তারপরে গাছ আছে যেখানে মাচা বাঁধা যায়। সেই গাছেদের এক বা একাধিক গাছে মাচা বেঁধে বসলে বাঘের যাওয়া ও আসার সময় গুলি করার সুযোগ পাওয়া গেলেও যেতে পারে। কিন্তু সুন্দরবনেরই মতো এখানের সব বাঘই প্রায় মানুষখেকো বলে মাচায় বিকেলে উঠলে সারারাতই বসে থাকতে হবে। যে-বাঘেরা কুমুদ চৌধুরীকেও প্রাণে-মারার হিম্মৎ রাখে তাদের পক্ষে আমাদের মতো শিকারিদের চেটেপুটে খেয়ে ফেলা তো বাচ্চোঁকা খেল্।

ঐখানে মাচা বাঁধতে দিতে দুর্গাকাকুর প্রবল আপত্তি ছিলো। এবং তা আমারই কারণে। চেয়ারে-বসে সারাদিন কাজ-করা লোকেদের পক্ষে বিকেলে মাচায় উঠে অনড় হয়ে প্রচণ্ড শীত আর মশার কামড় অগ্রাহ্য করে পরদিন ভোর অবধি বসে থাকা সহজ কম্মো নয়। একসময় পারতাম, যখন বয়স আরো কম ছিলো, নিয়মিত শিকারে বেরোতাম। ঘাসী বনের মধ্যে রাতের অন্ধকারে কালাহাণ্ডীর মানুষখেকো বাঘেদের রাজ্যে মাচা থেকে নেমে জীপ অবধি অতখানি পথ হেঁটে আসার কথাটা উনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। আমার একারই নয়, অন্য সকলেই বয়সে আমার চেয়ে অনেকই বড় বলেই পারছিলেন না।

অনেকেরই জীবনে অনেকই কন্‌জেনিটাল্ ডেফিসিয়েন্সী ও ডিফেক্ট থাকে। তা নিয়েই তাঁদের অম্লানবদনে বাঁচতে হয়। আমার ঐ ডেফিসিয়েন্সী ছিলো বাবার বন্ধুস্থানীয়দের আমার প্রতি স্নেহের প্রাবল্য। এই "কাকু-জেঠুরা" আমার পরিণত বয়স অবধি আমার ওপর এমনই "গার্জেনী" করে এসেছেন যে আমার চরিত্র কখনই নিজস্বতা পেলো না। বাবা-মায়ের একমাত্র আদুরে সন্তানের মতো এই "কাকু-জেঠুরা" বুহ্ আমাকে অনুক্ষণ ঘিরে থাকতো। তাঁদের পরিমণ্ডল ভেদ করে এ কথা প্রমাণ করা একেবারেই দুঃসাধ্য ছিলো যে আমার সাহস আছে। এবং নিজের দায়িত্ব নেবার মতো যথেষ্ট বয়সও আমার হয়েছে। সেইন্ট অগাস্টিনের একটি বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে যেতো আমার ঐ সব সময়ে। উনি বলেছিলেন যে "The sufficiency of my merit is to know that my merit is not sufficient." এই উক্তিটি অবশ্য কাকু-জেঠুদের প্রতি প্রযোজ্য না আমার নিজের প্রতি তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার অবকাশ ছিলো। কাকা-জেঠুদের হরকৎ দেখে আমি অনবধানে প্রায় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলাম যে "The sufficiency of my courage is to know that my courage is not sufficient."

এখানে মাঁচা বাঁধতে দিতে দুর্গাকাকুর আপত্তি করার কারণ নিশ্চয়ই ছিলো এবং তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ ছিলো ওই যে উনি আমাকে অকৃত্রিম স্নেহ করতেন।

যাই হোক জনসন সাহেব আসামের সেই বাঘটিকে মারতে না পারার পর থেকেই "ক্যা বদ্‌নসীবী হামারা, শের আয়া নেহী মারা।" এই বাক্যটির বদলে "ক্যা খুস্‌নসীবী হামারা, শের আয়া ওর ঝট্ মারা" বলবার জন্যে উন্মুখ হয়েছিলেন। মুখ্যত তাঁরই পীড়াপীড়িতে দুটি যুৎসই গাছ দেখে মাচা বাঁধা হলো। কি গাছ তা এতো বছর পরে আজ আর আমার মনে নেই। সম্ভবত শিশু অথবা বন্ধন গাছ ছিলো। মাচা বাঁধবার ভার রামচন্দ্র দণ্ডসেনার উপরে দিয়ে আমরা দূরের বাংলোয় ফিরে গেলাম লাঞ্চ এর জন্যে। দণ্ডসেনা গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে খেয়ে নেবে বললো। ঐ গাঁয়ের লোকেরা মাচা বাঁধতে সব রকম সাহায্যই করবে দণ্ডসেনাকে।

কালাহাণ্ডীর বাঘেদের যেমন রেকর্ড দেখলাম তাতে মনে হচ্ছিলো এও বুঝি এক

BanglaBook.org

উঁচু-ডাঙার শুকনো সুন্দরবন। এমন একটিও গ্রাম নেই যেখান থেকে বাঘে মানুষ নেয়নি। গভীর পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা ছোট ছোট গ্রামের অভ্যন্তরের মানুষেরা মানুষখেকো বাঘের কবলিত হলে, তখন তাদের উপরে সর্বক্ষণ যে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় তা অনুমান করাও কষ্টকর আমাদের পক্ষে। কত স্ত্রী-পুরুষ এই চাপ সহ্য না করতে পেরে মানসিক ভারসাম্য সম্পূর্ণই হারিয়ে ফেলে।

বাঘের খাদ্যও হতে পারি ভেবে দুপুরের লাঞ্চটা একটু বিশেষই হলো। ব্যবস্থাপকরাও নইলে দুঃখিত হতেন।

চারজন মানুষের জন্যে এমন এলাহি বন্দোবস্তর কথা আজকের দিনে ভাবা পর্যন্ত যায় না। জিম্ ক্যালান শুধু হোয়াইট-হর্স্ হুইস্কীর দুটি কেসই সঙ্গে নিয়ে যাননি সঙ্গে বাক্স-ছয়েক ইংলিশ বেকস্-বীয়ারও নিয়ে গেছিলেন। তাই লাঞ্চ খাওয়ার পর ঘন্টাখানেক গড়িয়ে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। দুর্গাকাকু বললেন, আমি যাবো না। তোমরাই যাও। তবে বাঘকে গুলি করো আর না-ই করো রাতে মাচা থেকে নেবো না।

সেবারে আমার শিকারে যাওয়া-না-যাওয়া একই কথা ছিলো। মাচায় বসে ঐ বিবাগী রাইফেলের উদাসী বাঁ-ব্যারেলের সাহায্যে বাঘ কেন, বিড়ালও মারার প্রশ্ন ওঠে না। মাচায় নয়, সমতলভূমিতে যদি কোনো দাদওয়ালা-বাঘ অথবা শিকারী-সোহাগী বাঘিনী আমার গায়ে গা ঘষতে আসে তবেই তার গায়ে নল-ঠেকিয়ে তাকে ধরাশায়ী করা সম্ভব। কিন্তু দাদের চুলকুনিতে উত্যক্ত পুরুষ অথবা প্রেমরসে দ্রবীভূত নারীকে গুলি করার কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না। এমন নিষ্ঠুর আমি অন্ততঃ নই। সে পুরুষ ও নারী যে-যোনি উদ্ভূতই হোন না কেন।

তবু যেতেই হলো। কারণ বাঘ জনসন সাহেব অথবা তার বান্ধব ক্যালান সাহেবকে দিয়েই মারাতে হবে। আসামের জঙ্গলে আবু ছাত্তার তার বন্দুকটা সেদিন অকুস্থলে নিয়ে যায়নি বলেই বাঘ অক্ষত চামড়া নিয়ে ফিরে গেলো। জনসন সাহেবের হল না। তাই এবারে দণ্ডসেনাকে আড়ালে ডেকে বলে দিলাম যে জনসন সাহেব গুলি করা মাত্র সেও যেন গুলি করে। জনসন সাহেবের গুলি বাঘের গায়ে লাগলেও করে এবং না লাগলেও যেন করে। প্রথমে যার গুলিতে রক্তপাত ঘটে শিকারের অলিখিত আইনে সে বাঘ সেই শিকারীরই। সে রক্তপাত লেজে-লাগা গুলির কারণে হলেও আইন বদলায় না। এই আইন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রর কমলাকান্তর দপ্তরে উল্লিখিত আইন নয় যে, এ "আইন শুধুমাত্র বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া দেখিতে পারে।" শিকারের আইন গরীব-বড়লোক শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের বেলাই সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে ব্যতিক্রমও ঘটে। যদি, যাকে দিয়ে বাঘ মারানোর কথা, কোনো ত্র্যহস্পর্শ যোগে তাঁর গুলি কেবলই ভুল পথে চলে যেতে থাকে, এবং সে গুলি বাঘের দর্শনমাত্রই আমি 'খেলবো না ভাই' বলে আনস্পোর্টস্ম্যানের মতো ব্যবহার করে তখন বাঘাকাঙ্ক্ষী শিকারির রাইফেল বন্দুক দিয়ে একটি শব্দ করিয়ে নিয়েই, পাঁঠাকে মন্ত্রপূত করাবার মতো করে ; যিনি অন্যকে দিয়ে বাঘ মারাবার দায়-চাপা পড়ে আছেন তিনি নিজে সে বাঘ মেরে দিয়ে বাঘাকাঙ্ক্ষী শিকারির মনোবাঞ্ছা সহজে পূর্ণ করতে পারেন।

আসলে, শহুরে দিশি স্বামীরা তাঁদের স্বামী সম্বন্ধে ক্রমশ উদাসীন হতে-থাকা স্ত্রীদের এবং জামাইবাবুরাও তাঁদের সুন্দরী শালীদের উঃ। আঃ। সত্যি আই ডোন্ট বিলিভ ইট্।" শুনে নিজের হৃত-যৌবন এবং হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্যে খিড়কির দরজা দিয়ে এমন বাঘ প্রচুর মেরে থাকেন। এমন শিকারীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। আসলে তাঁদের বাঘ

BanglaBook.org

মেরে দেয় ছাত্তার, খ্যাঁদা, কালুয়া, কাড়ুয়া এবং কে বলতে পারে ? দণ্ডসেনাও, কিন্তু জনসন সাহেবের শরীরে ভালো রক্ত বইতো তাঁর হাত যেমনই হোক, অথবা বাঘ দেখে তিনি ঘাবড়ে যান আর নাইই যান জঙ্গলের স্বাভাবিক বাঘ দেখে (অভয়ারণ্যর শেয়াল-বনে-যাওয়া বাঘ নয়) ঘাবড়ে যান না এমন শিকারী খুব বেশি নেই। নিজে না মারলে সে বাঘ জনসন সাহেব তাঁর বলে স্বীকারই করবেন না। কার হাত কত ভালো, কে কত বাঘ মেরেছেন এ দিয়ে স্পোর্টসম্যানশিপ্-এর বিচার হয় না। স্পোর্টসম্যানশিপ এক ধরনের মানসিক অবস্থা, উচ্চতর অবস্থা, যে অবস্থা থেকে আজকাল ভূপতিত হয়েছেন শুধু শিকারীরাই নন, আজকের ফুটবলার ক্রিকেটাররাও অনেকেই। স্পোর্টস-এর মুখ্য উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতিযোগীকে শিকারের নিয়ম মেনে, ভদ্রতা বজায় রেখে কোমর-বন্ধনীর নিচে ঘুঁষি না-মেরে, দুর্ধর্ষ উইঙ্গারকে ল্যাং মেরে তার পায়ের হাড় না-ভেঙে দিয়ে যিনি প্রতিযোগিতায় জিততে পারেন তাঁকে স্পোর্টসম্যান বলে জানতাম আমরা। সমসময়ে ও সমকালে সেই সব নিয়ম, শালীনতা, ভদ্রতা 'নর্মস্' সব উধাও হয়ে গেছে দেখি জীবনের সব ক্ষেত্র থেকেই। সভ্য মানুষের জীবনে স্পোর্টস্ কখনই এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিলো না। একজন মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে মূর্ত করে তোলার ব্যাপারে স্পোর্টসম্যানদের প্রভূত দায়িত্ব কর্তব্য ছিলো। সুস্থ প্রতিযোগিতাতে হেরে যাওয়ার পর সেই হারকে প্রসন্ন মনে মেনে নিয়ে দৌড়ে এসে জয়ীকে যখন বিজেতা আন্তরিকভাবে করমর্দন করেন তখনই জীবনে স্পোর্টস্-এর প্রকৃত ভূমিকার আভাস আমরা পাই। আজকে খেলার মাঠে, অথবা জীবনের যে কোনো প্রতিযোগিতার মাঠেই প্রকৃত স্পোর্টসম্যান খুব কমই দেখা যায়। এখন চারধারে শুধু কামড়া-কামড়ি, মারামারি, নির্লজ্জ আত্মপ্রচার এবং যেন তেন প্রকারেণ জয়ী অথবা যশস্বী হওয়ার সাধনা।

এই কথাটাই আমরা মূলমন্ত্র করে নিয়েছি এতো ভালো ভালো কথা থাকা সত্ত্বেও। জয়ী যে, তার যথার্থ বিকাশের জন্যে, তার সার্থকতা সঠিকভাবে আভাসিত করার জন্যেই যে বিজেতার ভূমিকা সবচেয়ে জরুরি এই কথাটা এই অসুস্থ সমাজ, অসুস্থ মানসিকতার মানুষেরা আজ ভুলে গেছি। মানুষ হিসেবে আমরা বোধহয় তাই আর গণ্যও নই। পশুরও অধম হয়ে গেছি।

বেলা পড়ে আসছে দ্রুত। "এলো যে শীতের বেলা/ বাহিরে কাজের পালা হইবে সারা/ আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যাতারা/ আসন আপন হাতে পেতে রখো আঙিনাতে/ যে সাথি আসিবে রাতে তাহারি তরে ?"

যে "সাথির" জন্যে আজ রাত জাগা সে-সাথি 'যে সে সাথি নয়। তবু শীতের বনের মধ্যে যখনই সন্ধে নেমে আসে তখনই এক অনামা কোনো বিশেষ কারণহীন বিষণ্ণতা আমাকে গ্রাস করে। দ্রুতপক্ষে নীড়ে-ফেরা পাখির ডানার শব্দ মনকে কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে যায়। গাছের ডালে, ঘাসে-পাতায়, পাহাড়তলিতে ছোট্ট গোলাকৃতি সবুজ কোনো নাম-না-জানা ঘাসফুলে সব শিল্পীর যিনি জনক, সব রঙের সব সুরের যিনি স্রষ্টা তাঁর হাতের তুলি গাঢ় কমলা থেকে ফিকে কমলা, ফিকে কমলা থেকে পাণ্ডুর অফফ্-হোয়াইট হয়ে উঠে হঠাৎই ফেড্-আউট করে যায়। সমস্ত দিন-পাখির স্বর ডুবে গিয়ে রাত পাখিদের স্বর একে একে ভেসে আসতে থাকে। যা কিছু এতক্ষণ স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, সহজে প্রতীয়মান ছিলো তা-ই হয়ে ওঠে অস্পষ্ট, অপ্রত্যক্ষ, গভীর এবং হালকা কালোয় ভরা। রাত নামলেই এক অন্ধকার, ক্লাউডেড-লেপার্ডের মতো বসে থাকে মাঠের মধ্যে কোথাও পুঞ্জীভূত হয়ে অন্ধকার অন্ধকারতর হয়, আদিগন্ত পাহাড়তলি মিশ্র প্রত্যাশা এবং এই পৃথিবীর আদিমতম অধিবাসী

কোনো ঘোরকৃষ্ণা বনজ নারীর বাহুমূলের কটু ও মিষ্টি উগ্র গন্ধ ভরা নিশ্চল নিশ্চুপ অন্ধকার অন্ধকারতম ডানা মুড়ে কোনো প্রাগৈতিহাসিক বাদুড়েরই মতো বসে থাকে তখন। অন্ধকার যদিও আমাদের দৃষ্টিকে ব্যাহত করে, কিন্তু তার নিজের চোখ সবই দেখতে পায়। এই আলো-ফুরোনো, অন্ধকার-নামা মুহূর্তে আমার মনে থাকে না আমি কে? কি করতে আমি এসেছি প্রকৃতির এই গহীন প্রত্যন্ত প্রদেশে? এতদিন কোথায় ছিলাম আমি? কোথায় যাব শেষ নিঃশ্বাস ফেলার পরে? আমি তখন এই শীতার্ত, স্তব্ধ, নির্বাক অথচ প্রচণ্ড বাঙ্ময় শীত-সন্ধ্যার স্থবির সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে অথবা তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের ভিতরের আলো এবং অন্ধকারের বিভাজক রেখার খোঁজ করি। কখনও দেখি, আমার হৃদয়ের আলোর সমুদ্রে অন্ধকারের হিমবাহ ভেসে চলেছে। কখনও দেখি, অন্তরের বিপুল অন্ধকার জলরাশির মধ্যে একঝাঁক আলোর পাখি যেন উড়ে চলেছে নিরুদ্দেশ দিগন্তর দিকে, নোনা-গন্ধ মাখা কলুষহীন নির্মল প্রসন্নতার শ্বেতা দূতী, প্রেমিকার শ্রীঅঙ্গরই মতো মসৃণ পেলবতায় সুস্নিগ্ধ। এই আলোর আর অন্ধকারের সঙ্গম, এদের বিচ্ছেদ, এদের কাছে-আসা, দূরে-যাওয়া, এদের নম্র আশ্লেষ, এদের তীব্র দ্যুতি এবং প্রতিফলন এই সবকিছুই প্রত্যেক চিত্রকর, প্রত্যেক স্থপতি, প্রত্যেক চলচ্চিত্রকার, গায়ক এবং প্রত্যেক লেখকেরই মূল অনুপ্রেরণা। যিনি এই আলো-ছায়াকে তাদের প্রকৃত ভূমিকায় প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর শিল্পী জীবনে, শিক্ষা তাঁরই সম্পূর্ণ হয়েছে। বড় বড় মানুষের কথা ছেড়েই দিলাম! আমাদের মতো সাধারণ নগণ্য সব মানুষের জীবনও তো এই আলো-ছায়ারই দোলনাতে দুলছে।

জীবনের সঙ্গে সন্ধ্যা ও সকাল যে এক অবিচ্ছেদ্যতার নিরুপায় বন্ধনে বাঁধা আছে সৃষ্টির আদি থেকে এটা বোঝার ব্যাপার, হৃদয়ের অনুভূতির ব্যাপার। মানুষ যে হয়ে উঠতে পেরেছে, বড় মানুষ নাইই বা হলো, সে-ই তার জীবনের প্রান্তরে এই আলোছায়ার প্রকৃতি এবং সাযুজ্যর কথা বোঝে। এবং শুধু জীবনেই নয়, হয়তো মরণেও।

পুটুস ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে-রাখা গরুটাকে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিলো দণ্ডসেনারা কাছেরই একটা গাছের সঙ্গে। জীপ যতটুকু যেতে পারে সে জায়গা থেকে মাচা দুটি বেশ দূরেই। আমরা নিঃশব্দে হেঁটে এলাম মাচা অবধি। এবং জীপের শব্দ শোনামাত্রই গাঁ থেকে দণ্ডসেনা অ্যাণ্ড কোম্পানী এসে পৌঁছলো। জনসন সাহেবের সঙ্গে দণ্ডসেনাকে থাকতে বললাম। আর আমি ক্যালান সাহেবকে নিয়ে অন্য মাচায় উঠলাম। আমাদের প্রত্যেকের কাছেই পাঁচ-ব্যাটারীর টর্চ আছে। জলের বোতল। এবং ক্যালান সাহেবের কাঁধে একটি রহস্যজনক ব্যাগ। ক্যালানকে নিয়ে আমার বসার উদ্দেশ্যর পেছনে যতটা বাঘ শিকার-করানো ছিলো তার চেয়েও বেশি ছিলো না-করানোর উদ্দেশ্য। ওঁর হাতের যন্ত্র সম্বন্ধে আমার মতো ওয়াকিবহাল আর কেউই ছিলেন না সেখানে। এবং ক্যালানের "অ্যান্টিসিডেন্টস্" মানে, শিকারি হিসেবে, আমরা বুঝে নিয়েছিলাম তাঁর কথাবার্তা এবং রাইফেলের নল-নির্গত গুলির মনমৌজী গন্তব্য কশিপুর বাংলোর প্রাচীন আমগাছের ডালে ডালে দেখে। তবে এ কথা ঠিক যে এ পর্যন্ত তাঁর সাহসের কোনো খামতি দেখিনি। সাহেবমাত্রই সাহসী এমন একটা ভুল ধারণা আমাদের অনেকেরই আছে। ধারণাটা ভুল। কিন্তু ক্যালান সাহসী। অজ্ঞতাও অনেকসময় সাহসের জন্মদাতা হতে পারে।

কশিপুর থেকে জীপে করে মাচার দিকে আসার পথে জনসন সাহেবের ও আমার দ্বিস্তর জ্ঞানের অথবা অজ্ঞতার উচ্চতা থেকে নিরবধি বহমান স্রোতে তিনি যে মনে মনে প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছেন আমাদের উপরে তা বোঝা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

আমি আর ক্যালান সাহেব একটি মাচায় উঠলাম। আমি তখন নিয়মিত টেনিস ও স্কোয়াশ খেলতাম। আজকের মতো এমন জমিদার-সুলভ চেহারা ছিলো না তখন। কিন্তু ক্যালান সাহেবের চেহারা ছিলো কাপুরথালার মহারাজেরই কাছাকাছি। মহীশুরের মহারাজার সঙ্গেও তুলনা করা চলে ক্যালান সাহেব মাচায় উঠতেই মাচার পাটাতন "কেরে ? কেরে ?" করে আর্তনাদ করে উঠলো। অন্য মাচায় আঁট-সাঁট শক্ত-পোক্ত চেহারার কাঁচা-পাকা চুলের জনসন সাহেবের সঙ্গে ছিপছিপে দণ্ডসেনা প্রায় নিঃশব্দে উঠে বসলো।

আমাদের মাচায় চড়িয়ে দিয়ে আক্ষরিকভাবেই মই সরিয়ে নিয়ে গাঁয়ের লোকেরা চলে গেলো শোরগোল তুলে, যাতে বাঘ ভাবে, যদি সে ধারে কাছেও থাকে, যারা এসেছিলো তারা সবাই চলে গেলো।

শীতের শেষ-বিকেল। রোদের হাত-পা-শরীর ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। দিন মরে যাচ্ছে আমাদের চোখের সামনে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত প্রিয়জনেরই মতো। অসহায় আমাদের কিছুমাত্রই করণীয় নেই। উষ্ণতা মরে যাচ্ছে। মরে যাচ্ছে প্রাণের প্রাণ। এই জঙ্গলে ময়ূর-মুরগী বিশেষ আছে বলে মনে হলো না। থাকলে, এই সময় তারা তাদের অস্তিত্ব জানান দিতোই। কালাহাণ্ডীর এই অঞ্চলের মতো এমন আশ্চর্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভারতেরও খুব কম জায়গাতেই দেখেছি। বিরাট বিরাট সব কালো ও বাদামী রঙের কাছিম-পেঠা পাহাড় মাথা উঁচিয়ে আছে। কিন্তু তাদের বেশির ভাগই ন্যাড়া। দেখলে মনে হয় তাদের বুকে অনেক রকম খনিজ পদার্থ আছে। অবশ্য প্রকৃত তথ্য ভূতত্ত্ববিদেরাই বলতে পারবেন। এই জেলার বিশেষ বিশেষ অংশ বোধ হয় ক্রমশ ঊষরও হয়ে উঠেছে।

পাহাড়গুলির প্রস্তরময়তাই বৃক্ষহীনতার কারণ, না বৃক্ষহীনতা প্রস্তরময়তার ; তা ঠিক বোঝা গেলো না। আধো-অন্ধকারে এবং চাঁদনী রাতে এ সব পাহাড়গুলিকে মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক সব ডাইনোসররাই যেন থম্ মেরে দাঁড়িয়ে বা গুড়ি মেরে বসে আছে। গহন জঙ্গল অবশ্য আছে উপত্যকায়। কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে অগণ্য গুহায় ছিদ্রিত অসংখ্য পাহাড়, ঘন বন এবং তার মাঝে মাঝে ছোট্ট ছবির মতো গ্রামের সীমানাতে বাসন্তী রঙা সর্ষে-খেত। অমন খেত দেখলেই মনে পড়ে যায় "সুখ নেইকো মনে নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে হলুদ বনে বনে।" হলুদ কালো আর সবুজের যে কী শালীন সমারোহ তা বর্ণনা করি এমন ভাষা আমার নেই। এই জঙ্গলেই 'বাঘ-ডুম্বার' কথা প্রথমবার শুনি শিকারী দণ্ডসেনার কাছে। যে সব মানুষকে বাঘে খায় তারা নাকি ভূত হয়ে যায়। সেই ভূতদের এখানে বলে "বাঘ-ডুম্বা"। পেঁচার ভূতুড়ে দুরগুম্ দুরগুম্ ডাকে গা ছম্‌ছম্ করা গভীর অন্ধকারে-ভরা নিথর বনের মধ্যে অথবা চাঁদের আলোর বন্যাতে ভাসমান পোল্‌কা-ডট্-এর বুটি-কাটা গাল্‌চেতে বাঘ-ডুম্বা নাকি শিকারীর হৃৎপিণ্ডে দামামা বাজিয়ে মধ্য রাতে ডেকে ওঠে উঁচু গাছের মগডাল থেকে, কিরি-কিরি-কিরি-কিরি- ধুপ্-ধুপ্-ধুপ্-ধুপ্ আওয়াজ করে। দণ্ডসেনাদের এরকমই বিশ্বাস।

এইসব আদিম অঞ্চলে, আদিবাসীদের প্রাচীন বাসস্থানে, এই রকম ভয়াবহ পরিবেশে, মন অনেক কথাই বিশ্বাস করতে তৈরি থাকে। কলকাতার মতো শহরের বুকে বসে এই সব গরীব-গুরবো সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন ভারতীয়দের অনুকম্পা করা হয়তো সহজেই যায় কিন্তু এই পরিবেশে থাকলে, ঘুরলে, নিজে বিশ্বাস না করলেও ওদের বিশ্বাসকে আঘাত করার মতো ঔদ্ধত্য আর থাকে না।

ক্যালান বললেন, উইল দ্যা টাইগার কাম রোরিং ওল্ দ্যা ওয়ে ?

আমি ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, একদম কথাবার্তা নয়। নড়াচড়াও নয়। নড়াচড়া করার অবশ্য উপায়ও ছিলো না। ক্যালান নড়লেই মাচা আবারও "কেরে ? কেরে ?" করে উঠবে।

এবারে রাতের অন্ধকার পুরোপুরি নেমে এলো। গ্রামের বাড়ির মাটির রান্নাঘরে যেমন চুপিসারে বেড়াল এসে ঢোকে। বেশ শীত এবং সঙ্গে ফাইটার প্লেনের মতো মশার আক্রমণ। এখানকার মশাদের বিক্রম দেখেই হয়তো এই স্থানের কাছাকাছিই ভারত সরকার মিগ্-প্লেন তৈরির কারখানা খুলেছিলেন কিছুদিন পরে।

অনড় হয়ে বসে থাকায় শীতে হাত-পা জমে যাচ্ছিলো। খুব ইচ্ছে করছিলো যে, পাইপটা ধরাই। পাইপ ধরালে হাত দুটিও গরম হয়ে ওঠে। উষ্ণতার, তা যত সামান্যই হোক না কেন, মূল্য বোঝা যায় শুধুমাত্র শীত করলেই। সে শীত বনেরই হোক, কী মনের। কিন্তু পাইপ খাওয়া চলবে না কোনোমতেই। সামান্য মুভমেন্ট হলেই সব ভেস্তে যাবে। বাঘের সাধনা শব-সাধনারই মতো। ধৈর্য ও তিতিক্ষার পরাকাষ্ঠা একেবারে।

আমাদের মাচা থেকে জনসন সাহেবদের মাচা কিছুক্ষণ আগেও দেখা যাচ্ছিলো। ঘনান্ধকারে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। উৎকীর্ণ হয়ে দুটি চোখকে মড়িটা যেখানে ছিলো সেদিকে নিবদ্ধ করে চেয়ে আছি। অন্ধকার হবার আগে দিনের আলোতেই মড়ির কাছের কোনো সাদা জিনিসকে ল্যান্ডমার্ক করে নিতে হয়। সাদা গ্রানাইটের চাঁই বা গাছের গুঁড়ির সাদা অংশ। মড়ি দেখা গেলে, তা যদি গরুর হয়, তবে সেই অর্দ্ধভুক্ত সাদা গরুর অবশিষ্টাংশের প্রতি নজর রাখা সোজা। পাখি বা হনুমানদের দেওয়া নির্দেশ ছাড়া বাঘ কখন যে আসে মড়িতে, কোন্ দিক দিয়ে আসে তা বোঝা ভারী মুশকিল। গহন অন্ধকার নৈঃশব্দের মধ্যে অন্ধকারতর হয়ে ওঠে। গাছেদের পাতা বেয়ে শিশির পড়ে বনকন্যার অশ্রুর মতো ঘাসী বনে। ফিস্‌ফিস্ করে। চোখের দৃষ্টিপথে চাঁদের আলোয় কালো ফুটে ওঠে। অন্ধকারে কোনো অন্ধকারতর স্তূপ নড়ে চড়ে। অতি আস্তে। বোঝা পর্যন্ত যায় না।

বাঘ বনের রাজা। একাধিক স্ত্রীর রোজগারে বসে-খাওয়া আত্মসম্মানজ্ঞানহীন স্বামী নয় সে সিংহর মতো। সিংহ বা সিংহীরা দৌড়ে ধরে তাদের শিকার। ইতরের মতো তারা দলবদ্ধ আক্রমণ করে। বাঘে বা বাঘিনীর মতো আত্মসম্মানজ্ঞানী, মহান ও প্রকৃত সাহসী জন্তু পৃথিবীতে খুব কমই আছে। আর অনেক দেশের জঙ্গলই তো দেখলাম কিন্তু আমার এই সুন্দর স্বমহিম বিরাট বিচিত্র দেশের মতো সুন্দর বন-জঙ্গল আর কোথাওই দেখলাম না, গ্রামগঞ্জের মানুষের মতো এমন ভালো মানুষও নয়। আমাদের স্বাভাবিক কারণে গর্বিত হওয়ার কথা ছিলো এই দেশে জন্মেছি বলে। অভয়ারণ্যর পশুদেরই মতো আমরাও যদি এই গদী-লোভী আর ক্ষমতা-লোভী নির্লজ্জ রাজনৈতিক দল আর নেতাদের হাত থেকে বাঁচাতে পারতাম নিজেদের কোনোক্রমে তবে এ দেশে সোনা ফলতো। বড় কষ্ট হয়, চোখ ফেটে জল আসে আমার এই সুন্দর দেশের কথা ভাবলে, এর ভবিষ্যৎ ; আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ-এর কথা ভাবলে।

হঠাৎ ক্যালান সাহেব ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, হে লাল্। আই ক্যান সী আ টাইগার। লুক্।

আমি কিছুই দেখতে পাইনি। তবুও চেয়ে রইলাম। আমি এমন কোনো তালেবর নই যে, সবই জানি। সবই দেখতে পাই। ক্যালান এমন কিছু দেখে থাকতে পারেন যা আমার চোখ এড়িয়ে গেছে। তবু, অনেক লক্ষ করেও যখন কিছু দেখতে পেলাম না, তখন ক্যালান উত্তেজিত গলায় বললেন, "লুক্ লাল। আই সী মেনি আ টাইগার প্রাওলিং অ্যারাউন্ড।

রিয়্যালি। আই মীন এভরী ওয়ার্ড অফ ইট।"

বলেই, সঙ্গের ব্যাগ থেকে হুইস্কীর বোতল বের করে বোতল থেকে ঢকঢকিয়ে তরলিমা ঢাললেন মুখে। বললেন, মে বী, আই অ্যাম টায়ার্ড। লেট মী পেপ্-আপ্-আ লিটল বিট্। আই রিয়ালি অ্যাম এনজয়িং মাইসেল্ফ।

ওদিক থেকে দণ্ডসেনার বিরক্ত চাপা গলা শুনলাম। "হেল্বা কঁড় ? এত্বে পাট্রি করিলেই ঈ ঠণ্ডারে রাতিরে এটি বসিকি কঁড় হেবব ? ফিরিবা। চালন্তু আঁইজ্ঞা।

আমি যথাসম্ভব আস্তে বললাম, "যীবী । আউ টিকে বসন্ত।"

শুনলাম, জনসন সাহেব চাপা গলায় শুধোলেন হিন্দিতে, কেয়া বোলা গুহা সাবনে ?

দণ্ডসেনা, মনে হলো, তাঁকে থামিয়ে দিলো। কথা বলতে মানা করলো।

গাছ থেকে নেমে জীপ অবধি হেঁটে যাওয়া ব্যাপারটাকে দুর্গাকাকু যতটা বিপজ্জনক বলছিলেন ততটা বিপজ্জনক হবে বলে আমার মনে হচ্ছিলো না। যত বড় মানুষখেকোই হোক না কেন কোনো বাঘেরই নিজের গায়ের সাধের চামড়াটির উপর কিছু কম মায়া থাকার কথা নয়। তাছাড়া আমাদের পোশাক, হাতের রাইফেল, ভাষা ইত্যাদিও স্থানীয় মানুষদের থেকে আমরা যে আলাদা তা প্রমাণ করবে। জোরালো টর্চের আলো এবং চারজন শিকারি অথবা স্বীকারি একসঙ্গে থাকলে বাঘ যে খামোখা ঝামেলা করতে আসবে তা আমার মনে হয় না। এমন আহাম্মক বাঘ নেই। দুঃসাহসীও নয়। সুন্দরবনের বাঘ অনন্য। এখানের বন সুন্দর হলেও বাঘ অত সাংঘাতিক নয়।

খুবই রাগ হতে লাগলো। শিকার যা হবে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তবে এই জায়গাতে পরে নিজে কখনও একা আসতে হবে অথবা সাহেব-সুবোদের সঙ্গে নয়, শিকারের দিশি-দোস্তদের সঙ্গে যাদের সঙ্গে বহুবছর বিভিন্ন জঙ্গলে একসঙ্গে শিকার করেছি, প্রথম যৌবনের দিন থেকে। হাজারীবাগের গোপাল সেন, সুব্রত চ্যাটার্জী, নাজিম সাহেব, কাড়য়া, অথবা কটকের চাঁদুবাবু, ফুটুদাদের মুহুরী রাজেন অথবা দুর্গা কিংবা আসামের আবু ছাত্তার। এই সব যখন ভাবছি, ঠিক সেই সময়েই ক্যালান হুইস্কীর বোতল আধখালি করে দিয়েই নিস্তব্ধ গীর্জার মধ্যের ধর্মযাজকের একক সুগম্ভীর স্বরে বললেন, "মিঃ গুহা, ডোন্ট উ্য থিংক দ্যাট ইটস্ আ নাইস প্লেস ফর কন্‌টেমপ্লেশান ?"

ফিস্‌ফিসে গলায় অবাক হয়ে বললাম, কন্‌টেমপ্লেশান ?

ইয়েস। কনটেমপ্লেশান। নো ওয়াণ্ডার দ্যাট ইন্ডিয়া হ্যাড প্রড্যুসড্ সো মেনি ফিলসফারস্"। নিস্তব্ধ রাতের বনে জিম ক্যালানের গম্‌গমে গলার স্কটিশ অ্যাক্‌সেন্টের ইংরিজি শুনে ক্ষুধাতুর বাঘ ধারে কাছে থাকলেও সে যে ভুলেও এ মুখো হবে তার আর কোনো সম্ভাবনাই রইলো না।

ওপাশের জমাট-বাঁধা অন্ধকার থেকে বিরক্ত দণ্ডসেনা গলা চড়িয়ে বললো, চালন্তু আইজ্ঞা। ফিরি যিবা। আঁও কঁড়ব করিব্বি এটি ? এ মানে শিকার কেব্বে করিথীবে কি ? আমি কী আর উত্তর দেব ? ক্যালানকে বললাম, লেটস গো। আমরা নামলেও নামতে পারি। কিন্তু মই ছাড়া ক্যালান সাহেবের পক্ষে নামা সম্ভব। ততক্ষণে দণ্ডসেনা নেমে পড়েছে। এক হাতে বন্দুক অন্য হাতে টর্চ ধরে সে মই-এর সন্ধানে গেলো। মইটা রাস্তার কাছেই নাকি গাঁয়ের লোকেরা রেখে গেছিলো।

আমিও নামলাম। তারপর এ পাশে ও পাশে আলো ঘুরিয়ে ফেলে ঘাসবনে দাঁড়ানো জনসন সাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। জনসন সাহেব নিচু গলায় বললেন, আই অ্যাম সরী লাল্। আই অ্যাম ভেরী সরী ইনডিড্। হী ওজ সো কীন্ অন কামিং। আই শ্যুড হ্যাভ

BanglaBook.org

ব্রট পুওর ডক বোস্ ইনস্টেড। ডুর্গা ইজ আউট অফ মুড বিকজ অফ দ্যাট। আই নো ফর সার্টেইন। দ্যাটস হোয়াই হী ইজ আউট অফ দ্যা গুট অ্যাজ ওয়েল। ডক ইজ আ ভেরী গুড ফ্রেন্ড অফ হিজ্।

কী আর বলব

দণ্ডসেনা মই জোগাড় করে ফিরে এসে ক্যালান সাহেবকে নামালো। আমরা তাঁর অবতরণের পথে একজন আলো ধরে রইলাম, দণ্ডসেনা মই ধরে রইলো দুহাতে আর জনসন সাহেব চারধারে আলো ফেলে ঘাসের বনে আলোকের ঝরনাধারা বইয়ে দিলেন।

যত সমারোহে মিস্টার জিম ক্যালান মাচা থেকে নামলেন তত সমারোহে গঙ্গাও স্বর্গ থেকে মর্তে অবতরণ করেননি।

জীপ অবধি হেঁটে এসে আমিই স্টীয়ারিং-এ বসলাম। মানুষখেকোর জঙ্গলে ড্রাইভারকে চারধার-ফাঁকা জীপে একা ছেড়ে যাওয়া যায় না। তাছাড়া গাড়ি চালাতে যখন তিনজনই জানি সে বেচারীকে সারা রাত এই শীতে ও মশাতে কষ্ট দেওয়ার মানেও হতো না। জীপে বসেই, জনসন সাহেব ক্যালান সাহেবকে বললেন, প্লীজ, লেন্ড ইওর বটল টু মী জিম। উইল উ্য ?

ইয়া! টেক ইট্। থ্যাঙ্ক উ্য ভেরী মাচ কেন্। আই হ্যাড আ ফীল্ অফ...

ফীল অফ হোয়াট ? ফীল অফ টাইগার-গুটিং ফ্রম আ মাচান। আই থিংক আই নো ওল্ অ্যাবাউট ইট ন্যাউ! ড্যু উ্য থিংক সো ? বলেই, জনসন সাহেব বোতল উপুড় করে একসঙ্গে চারপেগ ঢেলে দিলেন মুখে। দিয়েই, বোতলটা ক্যালান সাহেবকে ফেরত না-দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, দিস ইজ ফর উ্য লাল্। গুয়াম-আপ্ ইওরসেল্ফ।

ক্যালান সাহেব বললেন, হোয়াট গেমস্ মে উই কাম অ্যাক্রস অন আওয়ার ওয়ে ব্যাক টু দ্যা বাংলো ?

জনসন সাহেব পাইপে তামাক ঠুসতে ঠুসতে মুখ নিচু করে বললেন ডোন্টো। মে বী, আ হোয়াইট-হর্স। বলেই, শেষ করে দেওয়া হোয়াইট-হর্স-এর বোতলটাকে আমার হাত থেকে নিয়ে সশব্দে পথের বাঁদিকের একটা পাথরে ছুঁড়ে গুঁড়িয়ে দিলেন।

হুইস্কীটা এক গাল্-এ গিলে বেশ তুরীয় ভাব এলো। জীপের বনেট, সীট সব শিশিরে ভিজে গেছিলো। স্টীয়ারিংটাকে মনে হচ্ছিলো বরফ দিয়ে তৈরী। হেড লাইট জ্বেলে শিশির-ভেজা লাল মাটির পথে জোরে জীপ ছোটালাম। পরদিন দণ্ডসেনা সকালেই জীপ নিয়ে গিয়ে একটি গ্রামের কাছের ঘন শাল জঙ্গলে বীটিং-এর বন্দোবস্ত করলো। এ গ্রাম থেকে সাতদিন আগে মানুষ নিয়েছিল বাঘে। মানুষখেকো বাঘ যেখানে থাকে সেখানে বীটিং করানো খুবই বিপজ্জনক। বাঘ সে অঞ্চলে তখনও থাকলে যে-কোনো বীটারকেই মুখে করে তুলে নিয়ে যেতে পারে। বীটিং করতে রাজীও হয় না সেইসব গ্রামের মানুষে। কিন্তু গ্রামবাসীরা এমনই হতভম্ব ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলো বাঘের উপরে যে সাহেব-শিকারি এসেছে শুনে অসমসাহসী হয়ে তারা রাজী হয়ে গেলো। আমার চিন্তা হতে লাগলো যদি বাঘ কোনো মানুষ মারে তাহলে কি হবে ? যত টাকাই ক্ষতিপূরণ দিই না কেন আমরা তাতে একজন মানুষের জীবনের তুল্যমূল্য হবে না।

দুপুরের খাওয়া সেরে আমরা গিয়ে পৌঁছোলাম। ক্যালানকে মাচায় তুলে দিয়ে বলা হলো যেন বাঘের চেহারা স্পষ্ট দেখলে এবং বাঘ খুব কাছে আসলেই তবেই যেন গুলি করে এবং জঙ্গলের মধ্যে নড়া-চড়া দেখে যেন গুলি আদৌ না করে। বীটারদের গায়ে গুলি লাগতে পারে তাহলে। এবং গুলি যদি করেও তাহলে যেন মাচা থেকে না নামে। গুলি

BanglaBook.org

খেয়ে বাঘ না পড়লে, চেঁচিয়ে আমাদের যেন বলে, বাঘ কোন্‌দিকে গেছে।

আমরা তিনজনে পাথরের উপরেই বসব, জঙ্গলের আড়াল নিয়ে। একটি পাহাড়ী নদী উপত্যকাটির তিনদিক ঘুরে গেছে। এখন জল আছে। তবে সামান্য। নদীরেখায় বড় বড় কালো পাথর। বীটাররা পাহাড় থেকে বীট করে নামবে এবং বাঘ এবং অন্য প্রাণীদের হাঁকা করে ঐ নদীর দিকে নিয়ে আসবে। যে জানোয়ারই থাকুক না কেন তাদের ওপাশের জঙ্গলে যেতে হলে নদী পেরিয়েই যেতে হবে। নদী পেরোতে হলে তাদের আড়াল ছেড়ে ফাঁকা জায়গাতে বেরোতেই হবে। নদী পেরুবার সময়, সামান্যক্ষণের জন্যে হলেও চেহারা দেখা যাবে তাদের। তবে তাড়া-খাওয়া জানোয়াররা তো গদাই-লস্করী চালে চলে না, চলে ঝড়ের বেগে। তবে বীটিং-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বাঘ কিন্তু গদাই-লস্করী চালে চলে, মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে। কিন্তু এই অঞ্চলের বাঘ সব ঝানু-বাঘ।

দুর্গাকাকু আজও আসেননি। আমি আজ দুর্গাকাকুর ফোরফিফটি-ফোরহান্ড্রেড রাইফেলটি নিয়ে এসেছি। ডাবল-ব্যারেল। দণ্ডসেনা বাঘের পায়ের দাগ দেখেই ঐ অঞ্চলে বীটিং-এর বন্দোবস্ত করেছিলো। প্রত্যেক বীটারকে মজুরী বাবদ দশটাকা করে দেবো আমরা। প্রায় জনা-তিরিশেক বীটার যোগাড় হয়েছে।

বীটিং শুরু হলো। টাঙ্গী, লাঠি, কাঁসি শিঙের ও মাদলের আওয়াজে সরগরম হয়ে উঠলো পাহাড়-চুড়ো। আমি বসেছি সবচেয়ে বাঁদিকে। আমার থেকে পঞ্চাশ ষাট গজ দূরে জনসন সাহেব। তাঁরও ডানদিকে সমপরিমাণ দূরত্বে দণ্ডসেনা। নদীটা ঘোড়ার খুরের মতো বাঁক নিয়েছে বলে গুলি করার সময় খুবই সাবধানে করতে হবে। বীটারদের গায়ে তো বটেই, যেন অন্য শিকারির গায়েও গুলি না লাগে। সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। স্টপারদের উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে গাছে গাছে। যাতে বাঘ নদীরেখা ধরে ডাইনে অথবা বাঁয়ে গেলে তাদের চেঁচামেচি ও আওয়াজে আবার আমাদের সামনের নদীরেখায় ফিরে এসে তা পেরোতে চেষ্টা করে। আওয়াজ ক্রমশই জোর হচ্ছে। রক্তচাপ বাড়ছে ধীরে ধীরে। ধমনীতে ধমনীতে দ্রুত দৌড়োদৌড়ি করছে রক্ত। পাখি এ অঞ্চলে কম। খরগোশ এবং শজারু প্রথমে পেরিয়ে গেলো নদী। বাঘের শিকার। তাই অন্য জানোয়ারের উপর গুলি চালালে বাঘ সাবধান হয়ে যাবে বলে আমরা অন্য জানোয়ার গুলি করবো না বলেই ঠিক করা হয়েছে। ক্যালানকে মাচায় বসিয়ে দণ্ডসেনা আমাকে নিশ্চিন্ত করে ওড়িয়াতে বলেছিলো, ওদিকে কোনো প্রাণীরই যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এমন জায়গা দেখেই ও ক্যালানের মাচা বেঁধেছে। যে পাহাড় থেকে জানোয়ার তাড়া করে নামাবে বীটাররা তাতে প্রচুর গুহা আছে। বিভিন্ন আকৃতির। দেখে মনে হয় বাঘের আদর্শ বাসস্থান। বীটাররা এগিয়ে আসছে। উত্তেজনা বাড়ছে। দু হাতের মধ্যে রাইফেল শক্ত করে ধরা আছে যাতে মুহূর্তের মধ্যে গুলি করতে পারি। একদল মাদীশম্বর খুব জোরে তাদের খুরে খুরে খটাখট আওয়াজ তুলে বুনো ঘোড়ার মতো নদী পেরিয়ে মুহূর্তের মধ্যে চলে গেলো। তারপর আমার আর জনসন সাহেবের মাঝখান দিয়ে এক বিরাট ভাল্লুক নেমে এলো। তারপরই তাকে দেখলাম আমার দিকে না এসে জনসন সাহেবের দিকে ঘুরে যেতে। এদিকে বীটারদেরও দেখা যাচ্ছে। বাঘ বা চিতা বেশির ভাগ সময়ে বেরোয় একেবারে বীটারদের পায়ে পায়ে। সব শেষে। অবশ্য এমনি বাঘ ও চিতার কথাই বলছি। মানুষখেকো বাঘের হরকৎ সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। ভালুকটাকে জনসন দেখেছেন কি না সে কথা ভাবছি এমন সময় গদ্দাম্ করে গুলি হলো। শব্দ হতেই ভাল্লুকটিকে আমার দিকে দৌড়ে আসতে দেখা গেলো। চারপা তুলে লাফাতে লাফাতে। ভালুক এরকম করেই দৌড়য়, হাসি পায়

BanglaBook.org

দেখলে। গুলি লেগেছে কি না বুঝলাম না। কিন্তু আমাকে সে দেখে ফেলল অনড় হয়ে বসে থাকা সত্ত্বেও। গুলি যখন জনসন সাহেব করেইছেন তখন একে যেতে দেওয়া ঠিক নয়। আমি রাইফেল তুললাম। তাছাড়া আহত হয়ে থাকলে আক্রমণও করতে পারে। না হলেও পারে। ভাল্লুকের মতো এমন বদমেজাজী আনপ্রেডিকটেবল্ জানোয়ার ভারতের জঙ্গলে আর নেই। আমি রাইফেল তুললাম। আমার রাইফেল তোলাও তার নজর এড়ালো না। সে ততক্ষণে আমার খুবই কাছে চলে এসেছে। এবারে সে পেছনের দু'পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দু হাত বাড়িয়ে আমাকে আলিঙ্গনের জন্যে ধেয়ে এলো। উঠে দাঁড়াতেই দেখলাম উচ্চতায় সে সাত ফিটেরও বেশি। মুখ দিয়ে থুথু ছিটোতে লাগলো। দাঁড়াতেই তার বুকের সাদা "ভি" চিহ্ন চওড়া হয়ে ফুটে উঠলো। ওর যেন দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু তখন ভাবার সময় আর ছিলো না। আমি বাঁদিকের বুকে নিশানা নিয়ে ডানদিকের ব্যারেল ফায়ার করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভাল্লুকটা পড়ে গেলো নদীর বালিতে। পড়ে গিয়েই, মানুষের মতো কাঁদতে লাগলো। ভীষণ কষ্ট হতে লাগলো আমার। ভালুকের কান্না সহ্য করা যায় না। ওর কান্না থামাবার জন্যে ওর পিঠে গলার কাছে নিশানা নিয়ে বাঁদিকের ব্যারেলও ফায়ার করলাম। ততক্ষণে বীটাররাও সকলে দৌড়ে এসেছে। ওরা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে বলতে লাগলো "সে ষড়া রক্তখিয়া ভালুটারে মরিলা। ভাল হেম্বা।"

ততক্ষণে জনসন সাহেব ও দণ্ডসেনাও চলে এসেছে। বীটারাও নেমেছে নদীতে। ঠিক এমনি সময়ে আমার পিতৃদেবের জলের-কল রাইফেল থেকে ফাটা-বাঁয়ার আওয়াজের মতো ধ্বপ্ করে আওয়াজ হলো ক্যালানের মাচার দিক থেকে। গাদা বন্দুকের আওয়াজও হতে পারে। যদি ক্যালান গুলি করে থাকে তো সর্বনাশ! আমাদের সকলেরই মুখ শুকিয়ে গেলো। দণ্ডসেনাকে সবচেয়ে বেশি নার্ভাস দেখালো। তবে কি বাঘ? বীটারদের নদীর খোলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বললো দণ্ডসেনা। ওদের মধ্যে দুজনের হাতে গাদা-বন্দুক এবং কম করে পনেরোজনের হাতে তীর-ধনুক ছিলো। আমরা তিনজনে দৌড়ে গেলাম একই সঙ্গে ক্যালানের মাচার দিকে। দৌড়তে দৌড়তেই রাইফেলের দুটি ব্যারেলই রি-লোড করে নিলাম। এ ম্যাগাজিন রাইফেল তো নয়। দু ব্যারেলে দুটি গুলিই যায়। মাচার কাছে গিয়ে আমাদের চক্ষুস্থির। একটি অতিকায় শিঙাল শম্বর মেরেছে ক্যালান ঐ জলের কলের মতো মসৃণ রাইফেল দিয়ে প্রায় গাছের নিচেই। গুলিটা লেগেছে একেবারে ডান-কানের ফুটোতে। কানের ফুটোয় গুলতি দিয়ে মারলেও হয়তো মরতো। তবু, ধন্য ক্যালান। কাটা-কলাগাছের মতো পড়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে শম্বরটা।

দণ্ডসেনা খুব জোরে 'কু' দিয়ে গ্রীন সিগন্যাল দিলো বীটারদের। তারা ভাল্লুক ওখানেই ফেলে রেখে পড়ি-কি-মরি করে দৌড়ে এলো। ততক্ষণে উত্তেজিত ক্যালান নিজ চেষ্টাতেই অর্ধেক ছেঁচড়ে অর্ধেক থেবড়ে বসে গাছ থেকে নেমে এসে শম্বরের পিঠে উঠে তাঁর ব্যাগ থেকে হুইস্কীর বোতল বের করে বললেন ইটস্ ওলমোস্ট সানডাউন। টাইম ফর আ ড্রিঙ্ক। হোয়াট ড্যু উ্য সে, লাল?

সফল শিকারির যে তাৎক্ষণিক উত্তেজনা তা গুলিবিদ্ধ-বাঘের উত্তেজনার চেয়েও কোনো অংশে কম নয়। ভাবছিলাম শম্বরের এমন ভালো স্পেসিমেন বড় একটা দেখা যায় না। আমি আর জনসন সাহেব হ্যান্ডসেক করে কনগ্রাচুলেট করলাম ক্যালানকে। 'বিগিনারস লাক্' একেই বলে। আর ক্যালানকে নিয়ে ঠাট্টা করা চলবে না। অ্যাকাউন্ট ওপেনই করলো একটি ম্যাগনিফিসেন্ট শম্বর দিয়ে। আমরা তো শিশুকালে কাগা-বগা দিয়ে

BanglaBook.org

শুরু করেছি। জনসন সাহেবকে বললাম, তুমি যে গুলি করলে, তা কিসের উপরে? ভাল্লুকের উপরেই তো?

হ্যাঁ। ব্যাটা পাস থেকে এসে আমাকে প্রায় পেড়েই ফেলেছিলো একটু হলে। আমি ওকে দেখতেই পাইনি। শুনতেও না

গুলি লেগেছে?

লাগাতো উচিত। তবে এইম করার সময় পাইনি। "আই ফায়ার্ড অ্যাট দ্যা জেনারেল ডিরেকশন্।"

ভালুকটার কাছে ফিরে গিয়ে দেখি জনসন সাহেবের গুলি লেগেছে ভাল্লুকটার বাঁ পায়ের উরুতে। ঐ জন্যেই দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। উরু ভেঙে যাওয়ারই কথা হেভী রাইফেলের গুলিতে। ভাল্লুকের মতো জীবনীশক্তিও এক বাঘ আর বুনো শুয়োর ছাড়া কম বন্যপ্রাণীরই আছে। প্রথম গুলিতেই রক্তপাত ঘটিয়েছিলেন অতএব ভাল্লুকটা জনসন সাহেবেরই। গাঁয়ের লোকেরা বললো এই ভাল্লুকটাকে ওরা মাংস খেতে দেখেছে। বাঘে মেরে অর্ধেক খেয়ে ফেলে যাওয়া একটি মেয়েকে খেয়েছিল এ। বাঘটি নাকি মেয়েটির দুটি স্তন এবং নিতম্ব খেয়েই চলে গেছিলো।

ক্যালান সাহেব বললেন, মাস্ট বী আ টাইগার, নট আ টাইগ্রেস্।

সন্ধে হবার আগে আগেই আমাদের প্রোটেক্শানে ওরা ভাল্লুক আর শম্বরকে বয়ে গাঁয়ে নিয়ে গেলো। মানুষখেকো বাঘের এলাকা না হলে জঙ্গলেই চামড়া ছাড়ানো যেতো ও মাংসও কাটাকুটি করা যেতো। সারা রাত মহুয়া খেতো, নাচতো, গাইতো ওরা। মাংস মানেই প্রোটিন। বছরে একবার জোটে কি না সন্দেহ। এই এরাই হচ্ছে আসল ভারতবাসী। গত চল্লিশ বছরেও এদের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয়নি। দণ্ডসেনা বললো, ভালুকটির অণ্ডকোষ দুটি ওর দরকার।

সাহেবরা এই টোট্কার খোঁজ রাখেন না। ভাল্লুকের অণ্ডকোষ, গণ্ডারের খড়্গের চূর্ণরই মতো উপকারী বলে মানেন অনেকে। আ গ্রেট অ্যাফ্রোডিসিয়াক্! ওদের গ্রামে শম্বর আর ভাল্লুক নিয়ে পৌঁছনোর পর দণ্ডসেনা বললো যে সে ওখানেই থাকবে। আমরা ক্যাম্পে ফিরে যেন ট্রাকটি এবং কিছু লোকজন বাংলো থেকে পাঠিয়ে দিই। কশিপুর গ্রামের লোকের জন্যেও বেশ কিছু মাংস নিয়ে যেতে চায় ও। তার উপরে আমাদের ক্যাম্পেও লোকজন, খিদমদগার, চৌকিদার, জলতোলা ভারী ইত্যাদি কিছু কম নেই।

জনসন সাহেব বললেন ট্রাকের ড্রাইভারের হাতে বীটারদের পারিশ্রমিক ছাড়া ওদের জন্যে দু-হাঁড়ি মহুয়া পাঠিয়ে দেব। রাতেরবেলা এখানে অলিখিত কার্ফু বলবৎ আছে ও থাকবে যতদিন না মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব বন্ধ হয়।

জীপের হুড খোলা, সামনের বনেটের উপর উইন্ডস্ক্রীনটি শোয়ানো আছে। মানে, চারদিকই খোলা। নামতে-উঠতে, সামনে ও দুপাশে গুলি করতে কোনো অসুবিধাই নেই। ড্রাইভারের নাম রাজুয়াড়ু। অত্যন্ত সাহসী মানুষ। সেদিন ওকে আমরা জোর করেই বাংলোতে রেখে এসেছিলাম যেদিন ঘাসীবনে বাঘের জন্যে বসি। ও-ই জীপ চালাচ্ছে। ওর সাহসিকতাতে আমি এমনই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে ওর স্বনামেই ওকে উপস্থিত করেছি 'নগ্ননির্জন' উপন্যাসে। অনেক পাঠক-পাঠিকার মনেই ও থেকে যাবে আমি যখন থাকবো না তখনও।

গ্রামটার নামটা আজ আর মনে নেই। তবে অদ্ভুত অদ্ভুত নাম সব। একটি গ্রামের নাম মনে আছে অরাটাকিরি। অথচ রোজ ডাইরী লিখে রাখলে এবং সে ডাইরী যত্ন করে রাখলে

ভালো হতো। আবার খারাপও হতো। স্মৃতির পাত্রে যেটুকু তলানি থাকে তার দাম আলাদা

অনেকদিন রেখে দেওয়া তারল্যকে জোরে ঝাঁকালে কোন্‌টা দামী আর কোন্‌টা নয় তার মূল্যায়নে গোলমালও হয়ে যায় হয়তো। মাইল খানেক গিয়েই একটু ফাঁকা জায়গা পেলাম। ডানদিকে ঐ নদীটি বয়ে গেছে, যে নদীর খোলে বসেছিলাম আমরা। বাঁ পাশে সর্ষেখেত। ডানপাশে বিড়ি বা কলাইডাল লেগেছে। বিহারে যাকে বলে কুল্‌থী।

জনসন সাহেব রাজুয়াড়ুকে জীপ থামাতে বললেন। বললেন, ক্যালান লেটস্‌ সেলিব্রেট ইওর মেইডেন ট্রফি আউট ইন্‌ দ্যা ওপেন। দ্যাটস্‌ আ গ্রেট আইডিয়া। ওরা দুজনে বনেটের ওপর উঠে বসলেন দুজনে দুদিকে মুখ করে। আমি পেছনের সীটেই বসে রইলাম। গেলাস ছিলো না। হোয়াইট-হর্স-এর বোতল থেকেই ওঁরা হুইস্কী খাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে রাজয়াড়ুকে দিয়ে আমার দিকে পাঠাচ্ছিলেন। হুইস্কী, শহরে, ক্লাবে, বারে, রেস্তোঁরাতে অনেকেই খান কিন্তু হুইস্কী, এমন পরিবেশেই খেতে হয়। তবে একেবারে একা। অনেক কিছু ভাবা যায়। মনে অনেক কথা ভেসে আসে যা অন্য সময় এবং সঙ্গীদের সঙ্গে থাকলে আসে না।

মিনিট পাঁচেকও কাটেনি। হঠাৎ আমার মনে কীরকম অস্বস্তি হতে লাগলো। আমি চাপা গলায় রাজুয়াড়ুকে বললাম স্টিয়ারিং-এ ফিরে আসতে। দণ্ডসেনা নেই তাই আমিই এখন কম্যান্ডার। শিকারে একজনকে দলপতি মেনে নেন সকলেই। নইলে দুর্ঘটনা ঘটে, মনোমালিন্য, আরও অনেক কিছুই।

জনসন সাহেবরা একটু অবাক হলেন। আমার কাছে গুলি ছিল না আর। দুর্গাকাকুর রাইফেল ও দুটি সফ্‌ট-নোজড গুলি চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম ওঁর কাছ থেকে। ওঁরা দুজনে রাইফেল জীপে রেখেই বনেটে বসেছিলো। জনসন সাহেব পাইপ খাচ্ছিলেন। আমিও। ওঁরা জীপে বসতেই আমি রাজুয়াড়ুকে শুধোলাম যে ওর কাছে স্পট-লাইট আছে কি না ? ও বলল আছে।

দুর্গাকাকুর রাইফেলটা দু-উরুর মধ্যে চেপে ধরে বাঁ হাতে জীপের পেছনের রড ধরে ডান হাতে আলোটি নিয়ে দাঁড়ালাম আমি। রাজুয়াড়ু এক মুহূর্ত নেমে বনেট খুলে গাড়ির ব্যাটারীর সঙ্গে ক্ল্যাম্পদুটো লাগিয়ে নিল স্পট-লাইটের।

কি হলো ? লাল ?

আমি বললাম ঐ নদীটাই এইটা। দণ্ডসেনা বাঘের পায়ের দাগ দেখেই বীটিং-এর বন্দোবস্ত করেছিলো। বাঘ গেলো কোথায় ? দণ্ডকারণ্যর এককালের সরকার নিয়োজিত পেশাদার শিকারির তো এমন ভুল হবে না ! মাইল তিনেক এই কাঁচা রাস্তাটাতে চলো আমরা বার কয়েক আপ এন্ড ডাউন করি জীপে। এই জায়গাটার চেয়ে ভালো টাইগার-কান্ট্রি আর হয় না। কত গুহা, আর শালের জঙ্গল। ঘাসবন, নদী কাছে। ঘন্টাখানেক ঘন্টাদেড়েক দেরী হবে বড় জোর বাংলোয় পৌঁছতে।

জনসন সাহেবকে বললাম তৈরি হয়ে থাকতে রাইফেলের ম্যাগাজিনে পাঁচটি গুলি পুরে এবং চেম্বারেও একটি দিয়ে। রাজুয়াড়ুকে বললাম দশ মাইল স্পীডে সেকেন্ড গীয়ারে জীপ চালাবে। আগে সামনে চলো পিচ রাস্তা অবধি তারপর পেছিয়ে গ্রাম অবধি যাবে।

জীপ স্টার্ট করে আমরা পিচ রাস্তা অবধি গিয়ে ফিরলাম। ফিরে যখন আসছি, যে জায়গায় জীপ দাঁড় করিয়ে আমরা হুইস্কী খেয়েছিলাম সেই জায়গাটা থেকে শ'খানেক গজ দূরে নদীর পাশে হঠাৎই অঙ্গারের মতো লাল প্রকাণ্ড বড় বড় একজোড়া চোখ জ্বলে উঠেই

BanglaBook.org

নিভে গেলো আলোর বৃত্তে। রাজুয়াড়ুর কাঁধে হাত ছুঁইয়ে জীপ থামাতে বললাম।

বাঘেরা বা যে কোনও জানোয়ারের চোখ যখন আলোর সামনে থেকে সরে যায় তখন মুহূর্তের জন্যে সেই নিভন্ত চোখেদের ভূতুড়ে বলে মনে হয়। অমাবস্যার অন্ধকার রাতে নির্জন সৈকতে দেখা, ভাঙা-ঢেউয়ের মাথায়-জ্বলা ফসফরাসের মতো।

কী আশ্চর্য! একটি প্রকাণ্ড বাঘ নদীর ঠিক পাশে বাসন্তী-রঙা সর্ষে খেতে কুকুরের মতো সামনের দু'পা সামনে করে পেছনের শোয়ানো দু পায়ের উপরে বসে আছে। নির্বিকারভাবে। মুখটা পথের দিকে যখন সরিয়ে ছিল, তখনই চোখ জ্বলছিল। এখন চোখ অন্যদিকে বলে জ্বলছে না। ব্রডসাইড, স্টেশনারী টার্গেট হয়ে প্রকাণ্ড বাঘ নট-নড়ন, নট-কিচ্ছু হয়ে বসে আছে। এ মানুষখেকো কি হরিণ-খেকো তা দিয়ে আমাদের দরকার নেই। আগামীকালই আমরা বিকেলে রায়গড়ার দিকে চলে যাবো। রাতে রায়গড়ায় থেকে পরশু দীর্ঘ পথ মোটরে ভাইজাগ স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরব।

ক্যালান সাহেব বাচ্চা ছেলের মতো লাফাচ্ছেন সীটের উপর। বাধ্য হয়ে আমি দুর্গাকাকুর রাইফেলের নল দিয়েই তাঁর মাথায় ধাক্কা দিয়ে নিরস্ত করলাম। উনি মারবেনই বাঘকে। কিন্তু যাঁকে বাঘমারানোর জন্যে ভৌমিককাকুর এতো আয়োজন তিনি তখন গৌতম বুদ্ধ হয়ে ধ্যানে বসেছেন!

ফিসফিস করে ওঁকে বললাম, 'আ চান্স ইন্ আ লাইফ-টাইম। টেক আ কেয়ারফুল এইম অ্যান্ড গেট দ্য টাইগার অফ ইওর ড্রীমস্"।

জনসন সাহেব বললেন, ইয়া! বলে টুপিটা খুললেন। তারপর চশমাটা। পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমার কাঁচ মুছলেন। তারপর ধীরে সুস্থে রাইফেল তুলে এইম নিলেন। রাইফেলের নল কাঁপতে লাগলো। তারপর রাইফেল নামিয়ে নিয়ে কাঁধে আবার রুমাল বের করে চশমা মুছলেন। রুমাল পকেটে রাখলেন। পাইপে দু-টান দিলেন। এতক্ষণে সেই অবিবেচক বাঘ এক লাফে পালিয়ে গিয়ে জনসন সাহেবের ইজ্জত রক্ষা করতে পারতো কিন্তু এ নির্ঘাৎ ব্যর্থ-প্রেমিক অথবা চাকরীতে একস্টেনশান্ না-পাওয়া বাঘ। এ মরবেই। একে ঠেকানো যাবে না। সে মার খেতে চায় কিন্তু জনসন সাহেব মোটে মারতে চান না। অন্য সাহেব বে-এক্তিয়ারে জলের কল দিয়ে বাঘের দিকে পিচ্‌কিরি ছুঁড়বে বলে হন্যে হয়ে উঠেছেন ততক্ষণে। যা হবার তা পরে হবে তখন আমি ক্রমান্বয়ে তাঁর মাথায় রাইফেলের নল দিয়ে গুঁতো মেরে নিবৃত্ত করে চলেছি। লেফট-হ্যান্ড ড্রাইভ আমেরিকার ডিস্‌পোজালের জীপ। রাজুয়াড়ু স্টিয়ারিং-এ। জনসন সাহেব ডান দিকে। ক্যালান সাহেব পেছনে ডানদিকে। আমি বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে আলো ফেলে আছি। বাঘ আছে আমাদের ডানদিকে।

জনসন সাহেবকে গুলি করতেই হল একসময়। নইলে তিনজন সাক্ষী থাকতো তাঁকে বাকি জীবন ভীরু বলে ক্ষেপাবার। বাঘটির মুখ ছিল জীপের মুখ যেদিকে, সেদিকে। মানে আমাদের সামনের দিকে। ফোর টুয়েন্টি-থ্রী রাইফেলের গুলির নির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে ছিলাছেঁড়া ধনুকের মতো বাঘ তড়াক্ করে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো সোজা পনেরো কুড়ি ফিট। শূন্যেই ডিগবাজী খেলো শরীরটাকে গোল করে পাকিয়ে।

তারপর পড়লো যখন নিচে, তখন চিৎপাত চিৎপটাং হয়ে নয়; উপুড় হয়েই। কিন্তু তার মুখটা হয়ে গেলো উল্টোদিকে। তার সোজা উপরে লাফাবার ধরন দেখেই বুঝলাম যে সর্বনাশ হবে এবার। গুলি বাঘের পেটে লেগেছে। বাঘটা মাটিতে পড়েই সড়াৎ করে ঘুরে গেল এক ঝট্‌কাতে। মুখটা করল জীপের দিকে। তারপরই বিদ্যুৎগতিতে মাটি আঁকড়ে

এতবড় শরীরটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে সমান করে দিয়ে উড়ে এলো। যাঁরা ভাবেন আহত বাঘ কখনও হেড লাইট জ্বালানো, এঞ্জিন ধক্-ধক্ করা, স্পটলাইটের আলোর বন্যা জাগানো জীপের শিকারিদের আক্রমণ করে না তাঁদের ধারণা ভুল প্রমাণিত করল সেই বাঘ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দু কান গালের সঙ্গে লেপ্টে দিয়ে লেজটা পেছনে লাঠির মতো শক্ত এবং লম্বা করে দিয়ে সে প্রায় উঠে পড়লো জীপে।

জনসন সাহেব এতই হতভম্ব হয়ে ছিলেন যে তাঁর ম্যাগাজিন রাইফেলের আরও পাঁচটি গুলি থেকে একটি গুলিও আরও করলেন না বাঘকে। অবশ্য করার সময়ও ছিল না। ব্যাপারটা এত কম সময়ে ঘটলো যে তা ভাবা পর্যন্ত যায় না। হতভম্ব এবং ভীত আমিও কিছু কম হইনি।

আমাদের সকলকেই সেই রাতে বাঘ তার দুহাতের থাপ্পড়ে শেষ করে দিয়ে যেতো। তালগোল পাকিয়ে রক্তাপ্লুত হয়ে পড়ে থাকতাম আমরা জীপেরই মধ্যে। কিন্তু আমাদের বাঁচালেন ক্যালান। ঈশ্বররূপী ক্যালান। বাবার জলের কল তুলেই দেগে দিলেন, সে গুলি গায়ে লাগলে বাঘ আরও কত বেশি রাগতো কী স্তব্ধ হয়ে যেতো ওখানেই তা জানি না কিন্তু অ্যাজ লাক, অর ব্যাড লাক উড় হ্যাভ ইট, গুলি বাঘের গায়ে না লেগে তার মাথার এক হাত সামনে মাটিতে পড়লো ধূলি উড়িয়ে। বাঘের সঙ্গে তখন জীপের দূরত্ব হাত দেড়েক মাত্র। কী হলো কেন হলো কে জানে, ক্যালানের গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে হাতে হ্যারিকেন ধরা দু-উরুর মাঝে গুলিশূন্য রাইফেল চেপে-ধরা কম্পমান আমিও "ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়িয়ে" বাঘ ডানদিকে মুখ ঘুরিয়ে দৌড়ে গিয়ে জীপের সামনের কাঁচা রাস্তায় পড়লো। পড়েই রাস্তা ধরে দৌড়তে লাগলো। প্রচণ্ড জোরে। এবং রাজুয়াড়ুও সঙ্গে সঙ্গে সেই গুলি-খাওয়া বাঘকে জোর তাড়া করলো। সামনের কাঁচ নামানো ছিল। জনসন সাহেব ইচ্ছে করলেই একাধিক গুলি করতে পারতেন অনায়াসে। তার মধ্যে একটিও ভালো জায়গাতে লাগলে বাঘ পড়ে যেত, ফোর-টোয়েন্টি-থ্রী রাইফেলের মার কাঁধে বা বুকে বা শিরদাঁড়াতে বা কোমরে লাগলে আর দেখতে হতো না। পেছন থেকে মাথাতেও মারা যেতো। উনি করলেন না গুলি আর ক্যালান পেছনে বসেই গুলি করার জন্যে ছটফট করছিলেন, কিন্তু আমি ঠায় তাঁর মাথার উপরে বসে তাঁকে নিরস্ত করছিলাম। কারণ তাঁর রাইফেলের নল-নিঃসৃত গুলি বাঘের গায়ে না লেগে জনসন সাহেবের বা রাজুয়াড়ুর মাথার খুলিতে লাগার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। অমন দুর্ঘটনা এর আগেও ঘটেছে।

জনসন সাহেব একটিও গুলি করলেন না। বাঘ ত্রিশ সেকেন্ডের মতো সামনে সামনে জোরে দৌড়ে ডানদিকের জঙ্গলে এক লাফ দিয়ে হারিয়ে গেলো। রাজুয়াড়ু বুদ্ধি করে জীপ না থামিয়ে সোজা সেই গ্রামে এসে হাজির হল। দণ্ডসেনাকে তুলে নিয়ে আমরা আবার ঐ জায়গায় ফিরে এলাম। আমি জনসন সাহেবের রাইফেলটি নিয়ে দণ্ডসেনার সঙ্গে নেমে রক্তর দাগ পেলাম। অনেক রক্ত।

তখন কিছুই করার নেই। কাল সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ফিরে এসে রক্তর দাগ দেখে বাঘকে অনুসরণ করে মারতে হবে। দণ্ডসেনা বলল আমি ও আর দুর্গাকাকু আসব। সাহেবদের রেখে আসবে কারণ অত্যন্ত ঝুঁকি নেওয়া হবে তা না হলে। দিশি লোক মরলে কিছু হয় না। সাহেব মরলেই কেলেঙ্কারী।

সারা রাত উত্তেজনায় ঘুম হলো না। ভোররাতে জীপ নিয়ে বেরিয়ে ঠিক যখন ভোর হচ্ছে তখন পৌঁছলাম বাঘ যেখানে রাস্তা ছেড়ে নেমেছিল সেই জায়গাতে। গাছের ডাল ভেঙে পথের পাশে রেখে দিয়েছিলাম চিহ্ন হিসাবে। জনসন সাহেবের রাইফেলটা আমি

BanglaBook.org

নিলাম। দুর্গাকাকু, দুর্গাকাকুর রাইফেল। দণ্ডসেনার হাতে ওর বন্দুক। দণ্ডসেনা গ্রামের লোকেদের বলে রেখেছিল যে গুলির শব্দ শুনে ওরা যেন আসে। কোথায় আসবে তাও আমাদের কাছ থেকে শুনে বলে দিয়েছিল।

আমরা নিঃশব্দে এগোতে লাগলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়, বৃষ্টির মতো শিশিরে ভেজা জঙ্গলে। নিরস্ত্র রাজুয়াড়ুরও যেতে চেয়েছিলো। তাকে শক্ত ভাষায় মানা করে জীপে থাকতে বলা হল। রক্তর দাগ অনুসরণ করছে দণ্ডসেনা। পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল বাঘ নয় বাঘিনী। কাল রাতের বেলা যখন দ্রুত দৌড়ে যাচ্ছিলো তখনও তাই-ই মনে হয়েছিল পেছন থেকে। বাঁয়ে দুর্গাকাকু, ডাইনে আমি। দেড়শ গজ মতো গিয়েই পাহাড়ের পায়ে এসে পৌঁছলাম। প্রচুর রক্ত। এখানে বাঘিনী বসেছিল অনেকক্ষণ। রক্ত এখন থক্‌থকে হয়ে মেটে মেটে রঙের হয়ে গেছে। লাল নেই। এবার পাহাড়ে চড়েছে ব্লাড-ট্রেইল।

দুর্গাকাকু ফিসফিস করে বললেন, এই রকম খাড়া পাহাড়েও যখন বাঘ চড়তে পেরেছে তার মানে তার চোট জব্বর হয়নি।

আমি জবাব দিলাম না। আঁকা-বাঁকা পাকদণ্ডী দিয়ে রক্তর চিহ্ন দেখে দেখে এগোতে লাগলাম আমরা। দেড়শ গজ মতো উঠেই পাকদণ্ডীটা একটা হঠাৎ বাঁক নিয়েছে ডাইনে। বাঁ দিকে দুর্গাকাকু ছিলেন, উনিই প্রথমে দেখেছিলেন। দেখেই মুহূর্তের মধ্যে রিফ্লেক্স অ্যাকশানে রাইফেলের বাট্ তুলে নিলেন ডান বাহুর আর কাঁধের সংযোগস্থলে। আমরাও তাইই করলাম মুহূর্তের মধ্যে। বুড়ো আঙুল চলে গেল সেফটি ক্যাচ-এ। কিন্তু আমরা বাঘকে দেখতে পাওয়ার আগেই দুর্গাকাকু রাইফেল নামিয়ে নিলেন। বিরাট একটা গুহা। তার সামনে প্রকাণ্ড একটি চ্যাটালো কালো পাথর। এত বড় যে তার উপরে পঞ্চাশজন মানুষ পাশাপাশি শুয়ে থাকতে পারে। গুহামুখে ছায়া করে আছে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ। পাহাড়ের গা থেকে উঠেছে সে। বেচারী গুলি খেয়ে, তার বাড়ির দিকেই ফিরছিল। এই গুহারই ভিতরে হয়তো সে তার বিভিন্ন সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে। তার গর্ভের বাচ্চাদের লালন পালনও করেছে এখানেই। তাদের শিকারের প্রথম পাঠ দিয়েছে। সহবাসের ইচ্ছা জাগলে এই পাথরের উপরে দাঁড়িয়েই মুখ ঘুরিয়ে জোরে ডাক পাঠিয়েছে অচেনা পুরুষকে। মেটিং-কল্। ঐ চ্যাটালো পাথরটায় দাঁড়িয়ে বহুদূর অবধিই দেখা যায়। নিচের নদী। এবং আশ্চর্য, কালরাতে যেখানে জীপ থামিয়ে হুইস্কি খাওয়া হচ্ছিল সেই জায়গাটাও। পূবের আকাশ আস্তে আস্তে লাল হচ্ছিল। গ্রেট-ইন্ডিয়ান হর্নবিলস্‌দের কর্কশ আওয়াজ ভেসে আসছিল নিচের কুচিলা-খঁই গাছেদের মগডাল থেকে। বাঘিনী হাত-পা ছড়িয়ে পড়েছিল উপুড় হয়ে। রক্ত গড়িয়ে গেছিল পাথরটার ঢাল বেয়ে। জনসন সাহেবের গুলিটা ওর পেটটাকে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দিয়েছিল। পথে রক্তর সঙ্গে কিছু নাড়িভুঁড়িও আমরা দেখেছিলাম। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছিল পেট। বড় কষ্ট পেয়ে মরল বেচারী। তবু ওইটুকুই শান্তি যে নিজের জায়গায় এসে মরলো।

বাঘিনী মানুষী নয়। তার ঘরে কোনো ভালোবাসার মানুষ বা তার রক্তজাত সন্তানও মায়ের মুখ চেয়ে বসে থাকে না। বাঘিনী বাঘেরই মতো স্বাধীন। বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন সঙ্গীর সঙ্গে তার সহবাস। বাচ্চাদের কিছুটা বড় করে দিলেই তার ছুটি। পূর্ণ স্বাধীনতা। বাঘেদের জীবনে নারী বা পুরুষ কেউই কারো চেয়ে বড় বা ছোট নয়। আমাদের দেশের মেয়েরাও, আমার পাঠিকারাও একদিন বাঘিনীরই মতো স্বয়ম্ভর, পরম আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন, একাকী জীবন যাপন করবেন হয়তো ; যে জীবনে স্বাধীনতার স্বাদই আলাদা। যে জীবন সমস্ত পৃথিবীর মেয়েদের ভবিষ্যতের জীবন। "মাধুকরী"র রুষার মতো জীবন।

দুর্গাকাকু গুহার ভিতরে গেছিলেন। একটি নর কঙ্কাল নিয়ে এলেন পায়ে ঠেলে ঠেলে। বললেন, আরও আছে। এ বাঘিনী মানুষও খেতো।

দণ্ডসেনা তার বন্দুকটা আকাশের দিকে তুলে পরপর দুবার গুলি করল। গাঁয়ের লোকেরা এবারে আসবে।

আমরা তিনজনই আমাদের মাথার টুপী খুলে পাশে নামিয়ে রাখলাম মৃতার প্রতি সম্মান দেখিয়ে। তারপর গুহাগাত্রে হেলান দিয়ে বসলাম।

বরফের মতো ঠাণ্ডা এখন পাথর।

দণ্ডসেনা বলল, আমাদের পৌঁছতে আর পনেরো মিনিট দেরী হলে শকুন পড়ে যেতো বঘিনীর উপর। জনসন সাহেবের বাঘ আর বাঘ থাকতো না। তারপর বলল, আমি বরং রাজুয়াড়ুকে পাঠিয়ে দিই বাংলোতে সাহেবদের নিয়ে আসতে। আর ক্যামেরাও। ওঁরা এলে তারপর বাংলোয় নিয়ে গিয়ে চামড়া ছাড়াবো। গোঁফগুলো দণ্ডসেনা সব ছিঁড়ে নিল নিচে যাবার আগেই। তরতর করে নেমে গেল পাহাড়ী ছাগলের মতো।

আমি পাইপটা ধরালাম। মৃত্যু, রক্ত, এসব আমার ভালো লাগে না। তবু, কেন যে বার বার আমার অমোঘ নিয়তি আমাকে এসবেরই মধ্যে টেনে আনে ? জানি না, আমার নিজের শেষও এমনই হবে কি না।

পাইপের ধুঁয়ো ছাড়লাম। আঃ। নিচের উপত্যকা থেকে বনের গন্ধ ভেসে আসছিল। নদীর গন্ধ, কত সব সুন্দরী গাছেদের গায়ের গন্ধ। পুটুস ফুলের উগ্র-কটু গন্ধ। এই সুন্দর এবং স্নিগ্ধ, উগ্র এবং কটু মিষ্ট এবং তিক্ত স্বাদকে যদি একটি কথায় কেউ প্রকাশ করতে বলেন তখন তাঁকে আমি বলব জীবন।

BanglaBook.org

ফল্গু নদীরই একটি শাখানদী, নাম "জাঁম"। এর কাছেই ফল্গুর আরও একটি শাখানদী আছে। তার নাম "ইলাজান"।

"জাঁম" মানে হচ্ছে পানপাত্র। জাঁম-এর কথাতে সেই বিখ্যাত শায়েরীর কথা মনে পড়ে যায়।

"অ্যায়সা ডুবাঁহু তেরি আঁখোকি গেহরাই মে
হাতমে জাঁম হ্যায় মগর পীনেকি হোঁস নেহী।"

মানে, তোমার আঁখিতারার গভীরে এমনই বুঁদ হয়ে আছি আমি যে, হাতে পানপাত্র থাকা সত্ত্বেও চুমক দেবার কথাই ভুলে গেছি।

স্বর্গীয় বনজ্যোৎস্নায় অবগাহন চান করছে শীতের রাত। গহন। গভীর। ইলাজান পেরিয়ে, জাঁম নদীর বুক মাড়িয়ে জঙ্গলের মধ্যের উঁচুনিচু পথে চলেছে বয়েল-গাড়ি। পথের ধুলো, শীতে আর হিমে বুড়ির মতো গুড়িসুড়ি মেরে লেপ্টে আছে পথেই। গাড়ির কাঠের চাকাদুটি আর জোড়া-বয়েলের চারপায়ের আওয়াজ, ভেজা পথের উপর ফুলশয্যার রাতের বর-বধূর ফিসফিসে কথারই মতো শোনাচ্ছে। দূরে জাঁম নদীর অস্পষ্ট বাঁকে একলা টি-টি পাখি চমকে চমকে ডাকতে ডাকতে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে রাতের রহস্যময় স্তব্ধ নদীপারের নীল কুয়াশায় ঘেরা সবুজ অন্ধকারের গভীর থেকে গভীরে, গভীরতার কোরকে।

একত্রিশ বছর আগের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি এক মাঝরাতে সিজুয়া-হারা থেকে আমাদের এই ফিরতি-যাত্রা। বয়েল-গাড়িটিতে ছই-টই নেই। সিজুয়াহারার রঘু শহর ভাণ্ডারের একজন গঞ্জু মজুর ঠিক করে দিয়েছিলো আমাদের জন্যে এই গাড়িটি। বলতে গেলে প্রায় বিনি পয়সাতেই। পয়সার তখন বড়ই টানাটানিও। আমি ও গোপাল দুজনেই ছাত্র তখন। পাটাতনের উপরে কয়েকবোঝা বিচালি বিছানো। তার উপরে হাজারিবাগের বন-জঙ্গলের দোস্ত গোপাল আর আমি আমাদের "সবেধন নীলমণি" দোনলা বন্দুক দুটিকে লাঠিরই মতো ধরে দু-হাঁটুর মধ্যে নলটি উঁচিয়ে রেখে, জড়িয়ে নিয়ে নিজেরা একে অন্যের গায়ে লেপ্টে বসে আছি। কোট আর জার্কিনের কলারে কান ঢাকা। মাথার বাইরে টুপিও শিশিরে ভিজে গেছে। সেই টুপি যথাসম্ভব টেনে ঘাড় ঢেকে পিঠ অবধি নামানো সত্ত্বেও ঠক্‌ঠকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে চলেছি জৌরির দিকে। সেখান থেকে ভোরের প্রথম বাস ধরে ফিরে যাব চাতরা হয়ে হাজারিবাগে। চাতরা, সীমারীয়া, টুটিলাওয়া আর বানাদাগ হয়ে। ঘন জঙ্গল-পাহাড়ে চড়াই-উৎরাইয়ে সে পথ। এরকম পথে কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হয় না।

জ্যোৎস্নাভরা মধ্যরাতের শিশির-ভেজা বনের গন্ধ, পথ-পাশের ল্যানটানা ঝোপের তীব্র-কটুগন্ধ আর মিহি ট্যালকাম পাউডারের মতো সাদাটে ধুলোর গন্ধে ভরে আছে

আমাদের নাক। হিমের এমনই দাপট যে, মনে হচ্ছে দুজনের নাক দুটিকে নিশ্চিতই এই রাতের পায়ে নিবেদন বা সমর্পণ যাই বলিনা কেন, করে দিয়ে নাক-হীন হয়েই ফিরে যেতে হবে আমাদের কার নাক বনের পথ-পাশে কোন্ বন-ফুল হয়ে যে ফুটে থাকবে পরে, তা কে জানে! নাকি-নাকি গলায় সেই ফুলের প্রশংসা করে, শীত-শেষের কোনো বাসন্তী সকালে পাহাড়তলির গ্রামের কোনো নাক-সোহাগী-নবীনা তুলে নিয়ে যাবে সেই নাক-ফুল। করৌঞ্জ-তেল মাখা চকচকে খোঁপায় গুঁজবে হাটের দিনে। আমাদের নাক দুলবে দোদুল-দুল।

বিহারের হাজারিবাগ এবং গয়া জেলার জানুয়ারির মাঝরাত যে এ পর্যন্ত কত বাঘা-বাঘা নাক-উঁচু মানুষদের নাকও অবলীলায় এবং বিনা অনুষ্ঠানেই খসিয়ে দিয়েছে, তা যাঁরা ঐ অক্টোপাসী শীতের মোকাবিলা আমাদের মতো কখনও করেছেন, তাঁরাই জানবেন।

শীত নেই শুধু আমাদের কাড়ুয়ার। কোসমা বস্তির শিকারি কাড়ুয়ার। যেমন গ্রীষ্ম, অথবা ক্লান্তি অথবা বিরক্তি নেই কোনো রকমেরই। ক্রোধ অবশ্য আছে। এবং বেশ বেশি পরিমাণেই। ক্রুদ্ধ কাড়ুয়ার চেয়ে গুলি-খাওয়া বাঘ আমাদের কাছে শ্রেয়। দেশে বিদেশে অনেক শিক্ষিত অশিক্ষিত শিকারি ও বন-বিশারদের সংস্পর্শে এসেছি কিন্তু কাড়ুয়ার সঙ্গে তাদের খুব কম জনেরই তুলনা চলে। কাড়ুয়ার কোনো বিকল্প নেই। অবশ্য এই সব মানুষদের অনেকেরই কোনো বিকল্প হয়ও না।

হাজারিবাগ শহর থেকে টুটিলাওয়া যাওয়ার পথে ডানদিকে গোন্দা বাঁধ পড়ে। গোন্দার রাজা বানিয়েছিলেন কোনোদিন। সেই বাঁধের বিপরীতে বানাদাগ বস্তির পাশ দিয়ে শাল-জঙ্গল আর লাল মাটির পথে কয়েক মাইল হেঁটে বোকারো নদী পেরিয়ে গিয়ে যে কোসমা গ্রাম, সেখানেই কাড়ুয়ার বাস। কাড়ুয়ার গ্রামের পাতলা জঙ্গলের ফিকে-সবুজ সীমানা গিয়ে মিশেছে গভীর আদিগন্ত জঙ্গলে। দূর দিগন্তের গাঢ় জলপাই-সবুজ বনের রেখার দিকে আঙুল তুলে কাড়ুয়া বলতো! ঐদিকে কর্ণপুরার টাঁড় আর ঐদিকে পানুয়ান্না টাঁড়। বুনো মোষের সব মস্ত মস্ত দল আছে নাকি সেখানে। ঐ সঙ্গে আরও কত্ত জঙ্গলের নাম করতো ও। গা-ছমছম করে উঠতো, অসীম ঔৎসুক্যময়, অল্পবয়সী, অনভিজ্ঞ আমাদের, সেই সব মায়াবী ধোঁয়াটে নাম শুনেই।

কাড়ুয়ার মুখে নাম শোনা সেই সব জঙ্গলের কোনো জঙ্গলেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বাকি জীবনেও কখনও হয়ে উঠবে না যে, তাও জানি। অথচ সেই কারণেই হয়তো 'আরণ্যক'-এর "মহালিখাপুরের পাহাড়" বা "নাড়া-বইহার", "সরস্বতী-কুণ্ড" কিংবা বুনো মোষেদের দেবতা টাঁড়বারোর"ই মতো হঠাৎ-শোনা ছন্দোবদ্ধ নামগুলি চিরদিনই স্বপ্নে দেখা দেবে। শেষ কৈশোরে যেমন দিতো তেমন দিতো শেষ যৌবনেও। এই প্রৌঢ়ত্বেও দেয়।

এক জীবনে, দুটি পায়ে এই বিপুলা পৃথিবীর কটি জায়গাতেই বা যাওয়া যায়? অথচ এই সামান্য কথাটা অনেক অসামান্য মানুষও বোঝেন না। আধহাত লম্বা টিকি দুলিয়ে কদমছাঁটে ছাঁটা ঘন খোঁচা-খোঁচা চুলে-ভরা দুর্গন্ধ সুগোল মাথাখানি নাড়িয়ে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে পরিস্রুত হয়ে আসা বন-জ্যোৎস্না-মাখা পথে লাফিয়ে লাফিয়ে এবড়ো-খেবড়ো পথে চলতে-থাকা আমাদের বয়েল-গাড়ির পেছনে পেছনে দৌড়ে আসছিলো কাড়ুয়া। গান গাইতে গাইতে।

"তু কেহ্‌রো কচ্‌মচ্ ছাতি?
তেরো সুরত্ দেখি মোরা বসলো নজারিয়া হো

বস্‌লো নজারিয়া···
হো তন্ কৈসানা দিনা দেখবো নজারিয়া হো
দেখবো নজারিয়া···
তু কেহ্‌রো· "

কাড়ুয়ার পরনে মিলের ধুতি। হাঁটু অবধি। খাটো। মোটা। গায়ে, গোপালের দান-করা একটি খাকি হাফ-শার্ট। মুখটিতে মার্টিন লুথার কিং-এর মুখেরই মতো এক পবিত্র সততা, সারল্য এবং সাহস মাখামাখি হয়ে আছে। শহুরে, শিক্ষিত, খল এবং ধূর্ত, সংস্কৃতিবান মানুষদের মুখের সঙ্গে সে মুখের কোনই মিল নেই।

কাড়ুয়ার কাঁধে শোয়ানো আছে তার জিগ্‌রী-দোস্ত, রাতের পর রাত স্বপ্নে যে কাড়ুয়ার সঙ্গে অনর্গল কথা বলে, সেই বহুত্‌ই মন-পসন্দ্ হর্‌ওয়াক্ত-এর সাথী একনলা মুঙ্গেরী গাদা-বন্দুকটি। ব্লুয়িং ধুয়ে মুছে গিয়ে সেই একনলার রঙ হয়েছে শুয়োরের গায়েব চামড়ার মতো।

আধো-অন্ধকারে দীর্ঘ শরীরের দৌড়তে-থাকা কাড়ুয়াকে "দারহা" বা "হাচুয়া" ভূতেরই মতো ভুতুড়ে দেখাচ্ছিলো। খালি পায়ে যে ও কি করে দৌড়চ্ছিলো জাঁম নদীর রেফ্রিজারেটরের ধুঁয়োর মতো ধুঁয়োওঠা জল, বরফের মতো বালি ও পথের হিমকণা মাড়িয়ে, তা ও-ই জানে! অবশ্য আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ চোখে ও কোনোদিনও মানুষ ছিলো না। ভগবান অথবা ভূতই ছিলো।

কাড়ুয়ার গানের কোনো যতি নেই। ঐ শীতে দাঁতের পাটি দুটি ঠকঠক করছিলো বলেই বোধহয় তার ঋষভ কণ্ঠে টপ্পার কাজ লাগছিলো অনবধানেই। বড়ই স্ফূর্তি হয়েছে আজ কাড়ুয়ার। শেষ-বিকেলে সিজুয়া-হারা পাহাড়ের নিচের গভীর জঙ্গলে একটি বড়কা ডালপালা ছড়ানো শিংওয়ালা শম্বর এবং দুটি জবরদস্ত দাঁতালি শুয়োর শিকার হয়েছে বলে। দুই নবীন শিকারির দোনলা বন্দুকের উত্তেজনায় কম্পমান চার-নল-নিঃসৃত বুলেট আর এল-জি গুলো, অবাক-কাণ্ড, আজ একটুও অবাধ্যতা করেনি।

বয়েল-গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে এলো। চড়াই উঠতে হবে এবারে। গাড়োয়ান বয়েল দুটোর লেজ ধরে দুর্বোধ্য ভাষায় নানারকম হরকৎ এবং ঝটিতি যোগাসন করতে লাগলো ক্রমাগত। বয়েলদের গতি কমে যাওয়ায় কাড়ুয়া এবার গান থামিয়ে গল্প করতে লাগলো আমাদের সঙ্গে। কত জঙ্গলের কত ভূত আর শিকারের গল্পই যে ও জানতো! আসলে ঐ শীতের মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই ওকে কিছু না কিছু করতে হচ্ছিলোই।

গয়া জেলার কাছাকাছি মারকাচ্চো আর খুলিবল্লী রাজ্যের পত্তন কী করে হয়েছিলো তারই গল্প করছিলো ও আমাদের কাছে। ওর শালার বিয়ে হয়েছিলো নাকি মারকাচ্চোতে। হাজারিবাগ জেলা আগে মস্ত ছিলো। গিরিডিকে তখনও দিয়ে দেওয়া হয়নি তার একাংশ। কাড়ুয়া বলছিলো যে, অনেকদিন আগে ঐ অঞ্চলে ভীষণই এক পাজি লোক ছিলো। নিষ্ঠুর যেমন, তেমনি ধূর্ত। চারদিকের গ্রামের মেয়েদের ধরে নিয়ে এসে সে খুশিমত অত্যাচার চালিয়ে যেতো। তার অত্যাচার যখন তুঙ্গে উঠলো তখন পদ্মার রাজা চারদিকে ঢেঁড়া পেটালেন যে, যে-লোক ঐ পাজিকে মেরে তার মুণ্ডুটি এনে তাঁকে দিতে পারবে সেই লোককে তিনি সাত-ক্রোশের এক জাগির দান করবেন। ঐ পদ্মার রাজারই ব্যক্তিগত শিকারভূমিতে পরে গড়ে উঠেছিলো হাজারিবাগ বা রাজডেরোয়া ন্যাশনাল পার্ক। "রাজডেরোয়া" অর্থাৎ রাজার ডেরা।

সেই পাজি লোকটির মোকাবিলা করে তার মুণ্ডু তো কাটলো এক অসীম সাহসী লোক।

BanglaBook.org

কিন্তু ধূর্ত-চূড়ামণি একজন সেই মুণ্ডুটিই চুরি করে পালিয়ে গেলো। নেপোরা চিরদিনই ছিল। তারপর বহুত ফালানা-ঢামকানার সঙ্গে তো পেশ করেও দিলো সে মুণ্ডু পদ্মার রাজবাড়িতে পৌঁছে রাজার পায়ের কাছে। কথাই ছিলো, যে মুণ্ডু আনবে সে-ই পাবে জাগির। আর রাজা-রাজড়ার কথা বলে কতা! কথামতোই মুণ্ডু-লেতে-আয়া সেই শর্-দারকেই দিতে হলো সাতক্রোশের জাগির।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলো। ঘটনা জানতে পেরে, এবং যেহেতু রূপকথায় বলে রাজামাত্রই মানুষ ভালো ; প্রকৃতই যে মুণ্ডু কেটেছিলো তাকেও ডেকে পদ্মার রাজা দিয়ে দিলেন সাতক্রোশের অন্য এক জাগির। এমনি করেই সৃষ্টি হলো খুলিবল্লী আর মারকাচ্চোর রাজাদের। আর····

বলে চললো কাড়ুয়া আর নাক টানতে টানতে, গল্প শুনতে শুনতে, বয়েল-গাড়িতে ঝাঁকতে ঝাঁকতে চলতে লাগলাম জৌরীর দিকে আমরা। যেখান থেকে বাস ধরবো হাজারিবাগের। ফেরার পথে চাতরায় পান্তুয়া আর সিঙাড়া খাব নাস্তাতে। অমন খাঁটি ঘিয়ে ভাজা পান্তুয়া এবং স্বাদু সিঙাড়া একমাত্র লাতেহার ছাড়া অন্য কোথাওই খাইনি। তখন মানুষ খাঁটি ছিলো, খাঁটি ছিলো ঘি, টাকা ছিলো শুধুই এক নম্বর। স্বাধীন ভারতের আজকের দিনের মতো জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই দু নম্বরের এমন জয়জয়কার ছিলো না।

আজও যখনই অবকাশ পাই, একটু একলা থাকি বা ঘুমঘোরে তখনই যেন সেই জানুয়ারির রাতের দুধলি শীত-রাতে জঙ্গলের মধ্যের নীল কুয়াশা আর বনজ্যোৎস্নাভরা রাতে কাড়ুয়াকে দৌড়ে আসতে দেখি আমাদের পেছনে পেছনে। কত বছর আগের সেই সব দিন ও রাতগুলি চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে। শুধু কাড়ুয়াই নয়, আরও কত মানুষ! শুধু গোপালই নয়, কত জায়গার বন-জঙ্গলের নদী-নালার আরও কত দোস্ত্-বিরাদরেরা। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের নানা ঘটনা, নানা মানুষ, নানা রাত,নানা দিন ভিড় করে উড়ে আসে পরিযায়ী পাখিদেরই মতো বিস্মৃতির শীতার্ত সাইবেরিয়া থেকে স্মৃতির উষ্ণ চিলকায়। দ্রুত ডানায়।

দেখতে পাই পিছনে ফেলে-আসা কত শত বসন্তবনের ফিকে-হলুদ আর সব কচি-কলাপাতা সবুজে- মেশা সিঁদুরে লাল মাটি মাখা স্নিগ্ধ সকাল। কত গ্রীষ্মের প্রখর প্রচণ্ড দাবদাহর মধ্যে চমকাতে-থাকা দিগন্তব্যাপী মরীচিকা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বর্ষার সোঁদামাটি আর কদম্ববনের উড়াল চুলের গন্ধবাহী হাওয়ার সহস্র সহস্র উদ্বেল হাতে উথাল-পাথাল করা সুগন্ধি বনের মধ্যের শান্ত নিশ্চল বনপথগুলি। রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা "দ্যা রোড নট টেকেন"-এর কথা মনে পড়ে যায়। "ইট মেড ওল্ দ্যা ডিফারেন্স"। সার্টেনলি। ইট ডিড। বনজ্যোৎস্নাতে সাদা রাজ হাঁসের মতো বসে-থাকা কত অগণ্য বন-পাহাড়ের অসংখ্য বন-বাংলোর আলোছায়ার ডোরাকাটা শুয়ে-থাকা বাঘের মতো সব বারান্দাগুলি। শীতের দুপুরের কাঁচপোকা-ওড়া দৃপ্ত চাঁদোয়ার নিচের সবুজ বনজ অন্ধকারের আশ্লেষ আমাকে আচ্ছন্ন করে আজও। কত মানুষের গলার স্বর, হাসি-কান্না, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সার সার হেঁটে যায় মিছিল করে বহুবর্ণ ঝরাপাতা স্মৃতির সতরঞ্চী মাড়িয়ে।

BanglaBook.org

একেবারে প্রথম থেকেই তাহলে শুরু করা যাক। অ্যালবামের গোড়ার দিকের পাতা থেকে। কোডারমা পর্ব দিয়ে।

কোডারমা ও গিরিডি অভ্রখনির জন্যে বিখ্যাত। আমার মায়ের দাদু ছিলেন মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। গিরিডির নামী অভ্র-ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। তাঁরই স্ত্রী মনোরমা দেবী। মনোরমা জীবনচরিত হয়তো অনেকেরই পড়া আছে। মনোরঞ্জন ছিলেন মস্ত বড় দেশপ্রেমী। তাঁর গিরিডির বাড়িতে রাজেন্দ্রপ্রসাদ থেকে মতিলাল নেহরু, কোন্ স্বদেশী আন্দোলনের নেতা যে না গেছেন, তা বলা মুশকিল। মায়ের বাবা, আমার দাদুরও, অভ্রর ব্যবসা ছিলো, যদিও প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন স্কুলশিক্ষক। গিরিডির খাণ্ডুলি পাহাড়, উস্রী নদী আর সিরসিয়া ঝিলের মায়াঞ্জন লেগেছিলো বড় মামা সুনির্মলের চোখে। শিশুসাহিত্যিক সুনির্মল বসু। বড় মামা ভালো গান গাইতেন, ছবি আঁকতেন এবং কবিতা তো লিখতেনই। অনেকেরই মতে সুকুমার রায় সত্যেন দত্তর পরেই সুনির্মল বসু ছন্দর ব্যাপারে একজন গুরু।

গিরিডিতে গেছি শিশুকালে একবার। তখন অভ্রর ব্যবসায়ে মন্দা এসেছে। মায়ের দাদু তো তখন বেঁচে ছিলেন না, আমার দাদু বেঁচে ছিলেন। কিন্তু ব্যবসা বন্ধ করে কলকাতায় থাকতেন। মায়ের বাবার ঠাকুর্দাও, গিরীশচন্দ্র বসু ১৮৮৮ সনে বাংলাতে বই লিখেছিলেন তাঁর দারোগা জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে। বারগণ্ডার বাড়িও বিক্রি করে দিয়েছিলেন দাদু। আমরা মায়ের সঙ্গে স্মৃতি-তর্পণের জন্যেই গেছিলাম পুরোনো গিরিডি দেখতে। বিখ্যাত বাঙালীদের এবং বিশিষ্ট ব্রাহ্মদের প্রায় সকলেরই বাড়ি ছিলো একসময় গিরিডিতে। তখনকার গিরিডির পরিবেশে ব্রাহ্ম প্রভাব ছিলো বেশ বেশি। এখনকার শ্রীহীন মুখ্যত অধুনা অবাঙালী ব্যবসায়ীদের পীঠস্থান লোক-গিজগিজ গিরিডি দেখে সেই পুরোনো দিনের শান্ত স্নিগ্ধ গিরিডির কোনো ধারণা করাই সম্ভব নয়।

মা উনিশশো ছিয়াত্তরে তাঁর মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত গিরিডির লালমাটি, শালবন, উস্রীনদী, খাণ্ডুলি পাহাড় আর সিরসিয়া ঝিলের কথা বলতে বসে ভাবাবেগ সংবরণ করতে পারতেন না।

আমার মা ছিলেন ব্রাহ্মভাবাপন্ন কিন্তু বাবা ছিলেন ঘোরতর অব্রাহ্ম এবং সর্বার্থে নাস্তিক। একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছিলেন একবার (যদিও জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস তেমন নেই আমার) যে, মায়ের সঙ্গে আমার বাবার বিয়ে হয়েছিলো বলেই আমি অতি-রোম্যান্টিক, জাগতিক ব্যাপারে সবৈবভাবে অসফল এবং বদ্ধ উন্মাদ হতে হতে বেঁচে গেছি। তবুও অনেকেই আমাকে হাফ-পাগল বলে জানেন। তবে একথা অবশ্যই বলব যে, আমার মধ্যে যদি কিছু সূক্ষ্ম ব্যাপার থেকে থাকে, তা আমার মায়েরই দান।

BanglaBook.org

যেমন লেখা, গান ছবি আঁকা। আর রুক্ষ ব্যাপারগুলি বাবার সূত্রে পাওয়া যেমন কর্মক্ষমতা, পুরুষালি জেদ, শিকার, খেলাধুলো, ক্রোধ ইত্যাদি। ক্রোধ রিপু হিসাবে কামের চেয়েও বেশি দূষণীয়। কিন্তু রক্তবীজে কোনো বিশেষ বিশেষ রিপু অতিমাত্রায় থেকে গেলে তা চিতায় গিয়েই বিনষ্ট হয়। তার আগে তাকে দমন করতে হলে সন্ন্যাস নিতে হয়। সন্ন্যাস নেওয়া হয়নি বলেই রিপুগণ এখনও অতি প্রবল।

গিরিডিতে গেছিলাম মায়ের সঙ্গে তীর্থদর্শন করার মতো। কিন্তু কোডারমা, যে অঞ্চলও অভ্রখনির জন্যে বিখ্যাত, সেখানে যেতাম বাবার সঙ্গে শিকারে। চল্লিশের শেষভাগে রামকুমার আগরওয়াল' এবং তাঁর ভাইয়েরা ইংরেজদের বিশ্ব বিখ্যাত অভ্র প্রতিষ্ঠান ক্রীশ্চিয়ান মাইকা কোম্পানি কিনে নেন। রামকুমার আগরওয়ালা হলেও মাড়োয়ারি ছিলেন না। ওঁদের বাড়ি ছিলো উত্তরপ্রদেশে মীরাট অথবা কানপুরে। ঠিক মনে নেই। রামকুমারবাবুর পুরো পরিবার বাবার মক্কেল ছিলেন।

ক্রীশ্চিয়ান কোম্পানির বাংলোগুলি ছিলো দেখার মতো। কোডারমা স্টেশানে নামলে একদিকে শিবসাগর, যেখানে ক্রীশ্চিয়ান কোম্পানির বাংলোগুলি এবং কারখানা ছিলো, আর অন্যদিকে ঝুমরী তিলাইয়া। নামটি শুনেই কিশোরমনে পুলক বোধ করতাম। 'ঝুমরী তিলাইয়া'!

তখনও তিলাইয়া বাঁধের কাজ আরম্ভ হয়নি। তবে পঞ্চাশের গোড়াতেই সে কাজ শুরু হয়েছিলো।

কোডারমা স্টেশানে ক্রীশ্চিয়ান মাইকা কোম্পানির কর্মচারী একজন পার্মানেন্ট স্টেশান ম্যানেজার থাকতেন। কোম্পানির অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। এবং যাওয়ার দিনে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে ট্রেনে তুলে দেবার জন্যে। তিনি অভ্যর্থনা করে গাড়ির সারির দিকে নিয়ে যেতেন। কোম্পানির কুলিরাই মাল বয়ে নিয়ে আসতো। ঝকঝকে পন্টিয়াক, ডজ, ডেসোটো, ফোর্ড, ক্যাডিলাক গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতো লাইন দিয়ে। উকিল সাহেবের জন্যে খাতিরের কমতি ছিলো না। আমরা গিয়ে উঠতাম পাঁচ নম্বর বাংলোয়। দেখার মতো বাংলো ছিলো সেটি। সাহেবী আমলের গেস্ট হাউস। মস্ত বড় ড্রাইভ। একটি প্রকাণ্ড বেড়াবিহীন শালবনের মধ্যে ছিলো সেই বাংলো। পেছনে ছোট ছোট টিলা ছিলো। সামনে কেয়ারি করা বাগান। দুটি বিরাট বেড রুম। সঙ্গে লাগোয়া বিরাট চানঘর। চানঘরের মাপই সম্ভবত ছিলো ৩০ ফিট বাই ২০ ফিট। বাথটাব ছিলো এমনই যে, বিবাহিতরা ইচ্ছে করলে তাতে দুই স্ত্রী নিয়ে জলকেলি করতে পারতেন।

মধ্যে বসার ঘর। তার পাশে খাবার ঘর। ডানদিকে ছিলো কিচেন। একজন মুসলমান বাবুর্চি, দুজন খানসামা একজন মহারাজ এবং তার দুজন সাগরেদ। তাদের উপরে ছিলেন একজন স্টুয়ার্ড। ভালো ইংরিজি বলতেন এবং ব্রেকফাস্টের আগে এবং ব্রেকফাস্টের পরে এবং হান্টলি-পামার বিস্কিট সহযোগে চা খাওয়ার পরে আমরা কে কি ব্রেকফাস্ট খাবো এবং লাঞ্চ ও ডিনার, তার অর্ডার নিয়ে যেতেন।

বিকেলে তিনটি ঘোড়া সাজিয়ে আনতো সহিস। আমাদের ঘোড়া চড়াবার জন্যে। শিকারের জন্যে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো জিপ ও ওয়েপনক্যারীয়ার। অ্যামেরিকান আর্মি ডিসপোজালের। গাড়িও থাকতো তিন চারটে।

কোডারমাতে আমাদের সঙ্গে অনেকেই শিকারে যেতেন। তাঁদের মধ্যে শিকারি যে সবাই হবেন এমন কথা ছিলো না। কথা থাকার কথাও ছিলো না কারণ বাবার শিকারপার্টি আর যাত্রাপার্টি সমার্থক ছিলো।

BanglaBook.org

বাবার বন্ধুরা আর কে দাস, জে দাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, আর্জেন্দু বক্সী, টি সেন, ডি ওয়াংডি, ভাটপাড়ার বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পরিবারের সুকুমার ভট্টাচার্য (তখন যুবক আয়কর অফিসার এখন বিখ্যাত আয়কর বিশারদ) প্রমুখ ছিলেন। এঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন আয়কর বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। পরে দুই দাসসাহেব ও ওয়াংডি সাহেব ট্র্যাইব্যুনালের মেম্বার হন। অন্যরা কমিশনার। সুকুমার ভট্টচার্য চাকরি ছেড়ে ম্যাকলিওড-এ যোগ দেন। তারপর সে চাকরি ছেড়ে পেশায় যোগ দেন সিং ব্যাগার্থে অ্যাডভোকেটস ফার্মের অংশীদার হয়ে। ওই আয়কর ও অন্যান্য কর সংক্রান্ত আইনের উপর লেখা অনেক বই আছে ওঁর। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ সব বিষয়ে উনি অধ্যাপনাও করেন।

আরও যেতেন, ডি কে সেন (গবু সেন) এস কে বাসু (সমীর কুমার বসু)। এঁরা প্রত্যেকেই বন-জঙ্গল ভালোবাসতেন এবং বিগ-গেম শিকার ব্যাপারটা কি, সে সম্বন্ধে জানতে উৎসুক ছিলেন। তবে ওঁদের মধ্যে যথার্থ শিকারি ছিলেন ওয়াংডি সাহেব এবং চৌধুরী সাহেব (অহীন্দ্র চৌধুরী)। যাঁদের কথা আগেই বলেছি। এবং যথার্থ রসিক, সুরুচি সম্পন্ন ও ঔৎসুক্যর সংজ্ঞা আর্জেন্দু বকসী।

বিজা পুকার সাহেব ছিলেন মারাঠী। ঐ অঞ্চলের লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার বা ঐ রকম কিছু ছিলেন তিনি। ওঁর রাইফেল ছিল না। শটগান্-এই মারতেন কিন্তু চমৎকার হাত ছিলো। আর আমাদের শিকাবের গাইড এবং কখনো ড্রাইভার ছিলো যুগল, যুগলপ্রসাদ। দীর্ঘদেহী, একজোড়া কালো কুচকুচে পাকানো গোঁফ, সুবে-সাম হরওয়াক্ত মহুয়াসেবনে লাল চোখ, পাহাড়ী অঞ্চলের কামট শীতের মোকাবিলা করার জন্যে রাতের বেলা তার পোশাক ছিলো কিম্ভুত কিমাকার একজোড়া গাম বুট এবং একটি ওয়াটার প্রুফ। টুপি-সমেত। যুগলের মতো ভালো ট্র্যাকার কম দেখেছি। দিনে বা রাতে তার হরকৎ-এর রকমই ছিলো আলাদা। পাহাড় চুড়োয় দাঁড়িয়ে থাকা লেপার্ড বা শম্বরকে আলো দেখিয়ে জিপের কাছে নিয়ে আসতে পারতো সে। রাতে পথের উপরে একটি জায়গা হয়তো ভিজে দেখাচ্ছে। তার আগেই পথের ধুলোয় বাঘের পায়ের দাগ দেখেছি আমরা। শীতের ও বর্ষার রাতে গাছের পাতা থেকে টুপটুপিয়ে জল পড়ে বলে বাঘ সচরাচর বনের বড় পথ ধরেই চলে রাজার মতো। বাঘ যে একটু আগেই গেছে আমাদের আগে আগে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে, কত আগে ? যুগল জিপ থামাবার অর্ডার দিয়ে তড়াক্ করে লাফিয়ে নেমে সেই ভিজে জায়গায় দুটি হাতের পাতা চেপে ধরে জায়গাটার উষ্ণতা জেনে নিয়ে বলতো বাঘ পাঁচ মিনিট আগে গেছে। তারপর দু হাতের পাতা নিজের নাকে তুলে নিয়ে বলতো মাদি বাঘ।

অতএব তার অভিজ্ঞতার স্বরূপ সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা অবশ্যই আপনারা করতে পারেন।

একরাতে পাঁচ নম্বর বাংলোর গেটের উল্টোদিকে যে গভীর শালজঙ্গল আছে, যে জঙ্গল গিয়ে মিশে গেছে রজৌলির ঘাটের গহনে এবং শিকারের জন্যে বিখ্যাত জঙ্গলে, সেই জঙ্গলে এক কাণ্ড ঘটলো। খলকতুম্বি অভ্রখনি পৃথিবীর গভীরতম অভ্রখনি। কয়লা খনি, লৌহখনি, তাম্রখনি, আমি দেখেছি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। ভেতরেও নেমেছি। অবশ্য যেখানে ওপেন-কাস্ট মাইনিং হয় সেখানে নামার প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু অভ্রখনিতে নেমেছি কেবল খলকতুম্বিতেই। ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। ওখান থেকে পাথরের চাঁই-এর মতো অভ্রর চাঁই তুলে আনা হয় তারপর শিবসাগরের কারখানাতে মাইকা (অভ্র) 'ফাড়াই' করতো কামীনেরা। ছুরি দিয়ে দিয়ে সেলোটেপ এর মতো স্বচ্ছ পরতের পর পরত মাইকাকে ঐ

BanglaBook.org

মেয়েরা যে কী দক্ষতায় আলাদা করে তারপর ঐ ছুরি দিয়েই কেটে সাইজ করে, খারাপ মাইকা কেটে বাদ দিয়ে দিত, এবং কতখানি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, তা সত্যিই দেখার মতো ছিলো। সত্যিই কী দ্রুতগতিতে যে একাজ তারা করে, তা না দেখলে বিশ্বাস পর্যন্ত করা যায় না।

যাইহোক একরাতে রঙ্গৌলির ঘাটে চক্কর মেরে খলকতুম্বি থেকে ফিরে আসছি। রাত দশটা বাজে। খিদেও পেয়েছে। বাবা বললেন যুগলকে, শালজঙ্গলে একটু ঘুরে চলো। বিকেলে হাঁটতে যাবার সময় আমি লেপার্ডের পায়ের দাগ দেখেছি এখানে।

যুগল বললো, কুচ্ছো না মিলবো আজ সাহাব। নিকালতে নিকালতে সামনাহি মানহুষ পড়েথে!

মানহুষ অর্থাৎ অপয়া। এ অ লে লুমরি অর্থাৎ খেঁকশিয়াল হচ্ছে অপয়া। বিভিন্ন জঙ্গলের শিকারিদের কাছে কী অপয়া, তা নিয়ে মতবিরোধ থাকে।

যুগল বললো, লেপার্ড আবার মারবার মতো জানোয়ার নাকি? দেড়-বোঝা লেপার্ড আছে এই জঙ্গলে। কটা মারবেন?

বাবাও তখন বিগ-গেম-শিকারে বলতে গেলে রংরুট। বললেন, কেন? লেপার্ড কি শিকারের মধ্যে পড়ে না?

যুগল কথা না বলে ওর স্পট লাইট দিয়ে ড্রাইভারের সামনে আলো ফেলে পথ ছেড়ে বাঁয়ে ঢোকার ইশারা করলো। জিপটা পাথুরে লাল মাটির উপর দিয়ে সাবধানে খোয়াই বাঁচিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলো। এ অঞ্চলে এমন খোয়াই আছে যে, একটু অসাবধান হলে জিপের সমাধি হয়ে যাবে।

গাছের উপরে আলো ফেলে যুগল একটা উল্লুক দেখালো। তার চোখ দুটি উল্লুকের মতোই জ্বলছিলো। যুগল বললো, আমি ভেবেছিলাম লেপার্ড। এখানকার লেপার্ডরা গাছের ডালেই বেশি থাকে।

মিনিট দশেক পরে জিপ ঘুরিয়ে আমরা বাংলোর দিকে ফিরছি, এমন সময় একটি ঝোপের আড়ালে তিনজোড়া চোখ একসঙ্গে ঝলসে উঠেই নিভে গেলো।

জিপ এগিয়ে গেলো সেদিকে হেড লাইটের আলো ফেলে। কিন্তু অকুস্থলে পৌঁছনোর পর সেখানে আদৌ যে কোনো চোখ জ্বলেছিলো তার কোনো চিহ্ন পর্যন্ত দেখা গেলো না। ঝোপটার পেছনেই একটি জংলি পিপ্পল্ গাছ। ঝোপটাও ভীষণ ঝুপড়ি। ভিতরে প্রায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। মনে হলো ঝোপের ঠিক পেছনেই একটি খোওয়াই আছে যেটির গভীরতা সম্বন্ধে রাতের কৃত্রিম আলো-ছায়ায় কিছু বোঝা যাচ্ছে না। যুগলের নির্দেশে ড্রাইভার হেডলাইট নিভিয়ে দিলো। যুগলও তার স্পট-লাইট নিভিয়ে দিয়ে হঠাৎ জ্বালালো এবং জ্বালাতেই ঝোপের নিচে এবং খোয়াইয়ের পাড়ে একজোড়া চোখ স্পষ্ট দেখা গেলো। লালচে চোখ। মাংসাশী জানোয়ারের।

আমি রাইফেল তুলেই গুলি করতে পারতাম। এবং সে গুলি লেগেও যেতো। কার্ড শুটিং এবং গেম শুটিং এর মধ্যে এই তফাৎ। গেম শুটিং-এ রাইফেল তুলেই গুলি করতে হয় বেশির ভাগ সময়ে, সময় পাওয়া যায় না মোটেই এবং সে-গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও চলে না। আমিই একমুহূর্তে রাইফেল তুলে গুলি করলাম এবং গুলি করতেই চোখ দুটো বন্ধ হতে হতে যেন ছেঁচড়ে পিছু হটে সেই রাতের অন্ধকার খোওয়াইয়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

যুগল বললো, গোলি লাগা হ্যায় জরুর।

BanglaBook.org

অত্যুৎসাহী এবং দলে কনিষ্ঠতম আমি লাফিয়ে পড়ছিলাম। যুগল আমার ঘাড়ের কাছে কোটের কলার খামচে ধরে বললো, আভি নেই। কাল সুবে আকে দিখনা পড়ে গা। ভুল হয়। ক্যা আপনে? যো তিনঠো জানোয়ার থা। এককাট্টা।

বাবাও তাই বললেন। রাতের বেলা বাঘ বা চিতাকে গুলি করে মাচা বা জিপ কোথা থেকেও নামতে নেই।

কুমুদ চৌধুরীর বইয়ে পড়িসনি?

বাবা বললেন।

অহীনকাকু বললেন, হলে কি হয়! সেই কুমুদ চৌধুরী সাহেবও তো ওড়িশার কালাহাণ্ডীর জঙ্গলে বাঘকে গুলি করে মাচার নিচে নেমেই বাঘের মুখেই প্রাণটা দিলেন।

বক্সীকাকু, বললেন, গুড অ্যাডভাইস ; ব্যাড একজাম্পল আর কী! অ্যাডভাইসকে একজামপল্ না করে তুললে অ্যাডভাইসের দাম থাকে না। অতএব ফিরেই আসা হলো। রাতে খাওয়া দাওয়া হতে হতে বারোটা। সে বারে আমার মা এবং ছোট ভাই বোনেরাও এসেছিলেন। মা তো সব শুনেটুনে বললেন, আমি খোকনকে যেতে দেবো না। আহত চিতাবাঘ! বাবা বললেন, এখন যদি আহত চিতাবাঘের মোকাবিলা না করে, তাহলে বড় হয়ে কি করবে? চৌরঙ্গী আর ড্যালহাউসীতে আহত চিতাবাঘ তো কিছুই নয়, হাজার হাজার আহত আর ক্ষুধার্ত চিতাবাঘ, বড়-বাঘ, ভাল্লুক, গণ্ডার সব হাঁ হাঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের সামলাবে কি করে? তুমি কি তোমার খোকনকে চিরকালটা আঁচলে বেঁধে রাখতে পারবে?

রাতে ঘুম হলো না ভালো। শুধু আমার একারই নয়। ও ঘরেও অহীনকাকু বক্সীকাকুরা হাই তুলছেন, পুটুর পুটুর করে গল্প করছেন এবং কি সব আলোচনা করছেন।

বলতে ভুলে গেছিলাম, সে যাত্রাতে আমার ছোটকাকাও ছিলেন। ভোরের আলো ফোটার আগে আগেই সকলে এক কাপ করে চা খেয়ে তৈরি হয়ে নিলেন। আমি দুধ খেলাম। যে রাইফেল দিয়ে গুলি করেছিলাম সেটি ছিলো থাট্রি-ও-সিক্স ম্যানলিকার শুনার। কিন্তু সকালে বেরোবার সময়ে থ্রি সিক্সটি সিক্স ম্যানলিকার শুনারটিই নিলাম। এর বুলেটের ধাক্কা মারার ক্ষমতা এবং ভেলোসিটি থাট্রি-ও-সিক্স-এর চেয়ে বেশি।

বাবার হাতে বাবার থ্রী সেভেন্টি ফাইভ হল্যাণ্ড অ্যান্ড হল্যাণ্ড, সিংগল ব্যারেল। বাবা ডাবল ব্যারেল রাইফেলে বিশ্বাস করতেন না। ম্যাগাজিন রাইফেলে পাঁচটি গুলি ম্যাগাজিনে থাকে এবং একটি ব্যারেলে। পরপর ছটি গুলি করা যায় তাই সিংগল ব্যারেলই ওঁর পছন্দ ছিলো চিরদিন। বাবা বলতেন, সকলেই কি আর জিম করবেট? আমার মতো শিকারির হাতের মাত্র দুখানা গুলি খেয়ে যদি বাঘ ভাল্লুকের মন না ভরে? নৈবেদ্যর উপচারে কোনো ঘাটতি রাখা কখনোই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। খাদ্যের ব্যাপারে যেমন বেহিসেবী ছিলেন তিনি গুলির ব্যাপারেও তথৈবচ।

ছোটকাকা আর অহীনকাকুর হাতে দোনলা বন্দুক। অন্যরা মানে, গবুকাকু আর বক্সীকাকু দর্শক। বক্সীকাকুর দাদা অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ছিলেন। বক্সীকাকুর কর্তব্য ছিলো আমাদের ক্রিয়াকাণ্ড অডিটরের চোখ দিয়ে দেখা।

জিপটা, যেখান থেকে গুলি করেছিলাম রাতে, সেই অবধি না নিয়ে গিয়ে যুগল বাংলোর হাতা ছাড়ানোর পর দু ফার্লং মতো গিয়ে একটি বড় শালগাছের নিচে রাখতে বললো ড্রাইভারকে। ড্রাইভারের নাম ছিলো আলি হোসেন। রসিক যুগল তাকে বললো, "ক্যা মিঞা? চিতোয়া আনেসে উনক্যা লেকর্ জারা ঘুমা দিজিয়েগা, কারখানাতক্ লে যা কর্,

দেখা দিজয়ে গা ক্যায়সে মাইকা ফাড়তা হ্যায় লেড়কীওনে।" রসিক আলি হোসেন বললো, "হ্যাঁ রে কাফির, অব্ তুমহারা তসরিফ্ ঠিক-ঠাক লেকর্ লওটকে আনা চাহিয়ে। খুদা না খাস্তা চিতা তেরা বদ্সুরত্কো ফাড়্ না দে

নিঃশব্দ এক গাল হেসে ইশারায় পাশের একটি আসন গাছ দেখিয়ে দিয়ে, চিতা তাড়া করলে হোসেন মিঞা যেন ঐ গাছে উঠে যায় এমন নীরব নির্দেশ দিয়ে কড়া কালাপাত্তি জর্দা দেওয়া একটি পান মুখে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চললো যুগল।

দিনের আলোয় পরিষ্কার বোঝা গেল যে, অগণ্য বড়-ছোট শালগাছে ভরা হলেও পুরো জায়গাটাই বেহড়ের মতো। ছোট ছোট ধারা উপধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে পাহাড়ী নালা যদিও এখন প্রায় জলশূন্য। আর অগণ্য ঘন শালগাছ আর কালো পাথরের টিলার পটভূমি। এখানে খুনী, ডাকাত বা গুলি-খাওয়া অথবা না-খাওয়া বাঘের পক্ষে লুকিয়ে থাকাটা কোনো ব্যাপারই নয়।

একদল ছাতারে পাখি ছ্যাঃ ছ্যাঃ করছে। হয়তো আমাকেই। একদল বনটিয়া প্রচণ্ড বেগে ডানা শন্ শন্ করে উড়ে গেল শিবসাগরের দিকে। মস্ত দীঘি শিবসাগরের। জলের সঙ্গে টিয়ার কী সম্পর্কের পত্তন হলো হঠাৎ, কে জানে!

প্রথম খোয়াইয়ের সামনে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। খোওয়াই-এর মধ্যে অসংখ্য গরু বাছুরের হাড় ও কঙ্কাল পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে যুগল ইশারাতে বললো যে, ও নিচে নেমে বড় নালার মধ্যে মধ্যে এগোবে। আমাকে বললো, নালার ডানদিকের পাড় ধরে নালার উপর লক্ষ রেখে এগোতে। বাবা এবং বাবার বন্ধুদের বললো বাঁ দিকের পাড় ধরে এগোতে।

যুগলপ্রসাদ রওনা হতেই খোয়াইয়ের উপরে উপরে ডানদিকে আমি ও বাঁদিকে বাবা এগিয়ে গেলাম। বাবার পেছনে অহীনকাকু এবং ছোটকাকু গার্ডিং আপ্ দ্যা রিয়ার-এ। তারও পেছনে তাঁদের সমর্থকরা, বক্সীকাকু, গবুকাকু এবং সেন কাকু। বাঘ মরলে (যদি কোনো বাঘ দয়া পরবশ হয়ে মরে) বক্সীকাকু ছবি তুলবেন এবং অন্যান্যরা তালি বাজাবেন।

বড় শাল ছাড়াও ছোট ছোট শালের চারাও ছিলো অগণ্য। বড় বড় কালো পাথর ও টিলাও ছিলো বিস্তর। এরকম আন-ডিউলেটেড টোপোগ্রাফিতে আমরা কেউই কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। যুগল নিশ্চয়ই নালার গতিপথ ধরে এঁকে বেঁকে এগোচ্ছে। পাছে পেছনে পড়ে থাকি ওর, অথবা ওকে ফেলে বেশি এগিয়ে যাই, এই ভয়ে মাঝে মাঝেই নালার ধারে এসে যুগলের সঠিক অবস্থান ঠাহর করার চেষ্টা করছি।

মিনিট দশেক এগোবার পর আস্তে আস্তে আরেকবার নালার ধারে এসে তাকাতেই দেখি, যুগল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে আনলাইক যুগল। নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু।এবং তার ঠিক সামনে একটি চিতাবাঘের লেজ। খাড়া নয় শায়িত। তার মানে যুগলের চেয়েও বে-আক্কেলে সে ব্যাটা শুয়ে আছে তখনও শিয়রে শমন নিয়ে। বাঘের শরীরটা আছে হঠাৎ বাঁক নেওয়া সরু নালার ডানদিকে। আন্দাজে অনুমান করলাম।

যুগল আমাকে দেখেনি। রোদ বাঁদিক থেকে আসছিলো বলে নালাতে আমার ছায়াও পড়েনি। আমার পায়ের শব্দও ও পায়নি। একমুহূর্ত ভেবেই আমি নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম, এগিয়ে গিয়ে চিতার শরীর দেখা যায় কিনা তা দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু ইতিমধ্যেই ডেয়ার-ডেভিল-ক্যুডনট্-কেয়ারলেস্ যুগলপ্রসাদ বাঘের লেজ-এর উপরেই এক ব্যারেল এলজি দেগে দিয়েছে। সাধারণত লেজে আঘাত পেলেই বাঘ জাতীয় জানোয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথা ঘুরিয়ে লেজ সামলায়। কিন্তু এ ব্যাটা যুগল-তাড়িত কিম্ভুত বাঘ লাফ

BanglaBook.org

মারলো সামনের দিকে। তারপরই খোয়াই বেয়ে বাঁ দিকের উঁচু পাড়ে উঠে পড়লো। শীতের সকালের রোদ তার চমৎকার চামড়াতে এসে পড়ে ঝলমল করছিল ভেলভেটের মতো জেল্লা দিচ্ছিল তা থেকে। সে যে গতরাতে আমার হাতে আহত হওয়া বাঘ আদৌ নয়, সে বিষয়ে কারোই কোনো সন্দেহ ছিলো না।

বাঘ ওপাড়ে উঠতে না উঠতেই পড়লো গিয়ে দুই শিকারি অহীনকাকু আর ছোটকাকুর সামনে। বাবা অনেকখানি আগে এগিয়ে গেছিলেন।

ছোটকাকু চিরদিনই বেড়াল জাতীয় প্রাণী দেখে অযথা উত্তেজিত হতেন। এবং ওঁর উত্তেজনার রকেট উৎক্ষেপণের প্রথম 'ফেজ' ছিল বন্দুক বা রাইফেল আনসেফ করতে ভুলে যাওয়া। এবারেও ঠিক তাই হলো। চিতাবাঘ যখন "আমি সাত সকালে কোনো খেলাটেলার মধ্যে নেই বলে নিজের মনে বড় বড় পায়ে চলে যাচ্ছে টু সি হিজ আন্টি,তখনও ছোটকাকু তাঁর বন্দুকের সঙ্গে ধবস্তাধবস্তি করছেন দেখলাম। আর কালবিলম্ব না করে আমি দৌড়ে একটু ফাটল মতো দেখেই খোয়াই-এ দৌড়ে উঠে এলাম নালা ডিঙিয়ে। ততক্ষণে বাঘ খেল-কি-ময়দান পেরিয়ে প্রায় তার কাকীমার কাছে পৌঁছে গেছে এমন সময় ছোটকাকুর বন্দুক গর্জে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে অহীনকাকুর বন্দুকও। গুলির সঙ্গে বাঘের যোগাযোগ কতটা হলো তা বোঝা না গেলেও বাঘ যে তার সাধের চামড়া নিয়ে এই সাত সকালের ফাজলামিতে আমার দুই কাকার উপরে বেজায়ই চটেছে তা বোঝা গেল। সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে রণহুংকারে ধেয়ে এলো।

কিন্তু কার দিকে ? আমরা তিন জনেই ভাবলাম 'আমার দিকে' মানে "হিজ হিজ হুজ হুজ"-এর দিকে। কিন্তু এ ব্যাটা বাঘ অর্ধেক টাকা-পাওয়া অর্ধেক দাড়ি-পরা অভিনেতার মতো আর্ধেক খেলা খেলে সবেগে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করতে উদ্যত হলো। আমার থেকে হাত পাঁচেক দূরের একটি খোয়াই বেয়ে আবারও ঐ নালাতে নেমে কেটে পড়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বর সঙ্গে আমাদের 'তিড়ি' দেওয়ার মতলব করলো। যখন সে নামছে নালাতে তখন আমার সুবিধে হলো ! শত্রুকে সবসময় পতনোন্মুখ অবস্থাতেই নিধন করতে সুবিধে। সে বাঘই হোক কী মানুষই হোক। সেই সময় নিজের মোমেন্টামেই সে অধঃপাতে যাবার ধান্দায় থাকে অতএব নৈবেদ্য, সে লাথিই হোক কী রাইফেলের গুলিই হোক, গুলি তখনই ঠুকে দিলে পতনের বেগ দ্বিগুণ হয়ে যায়। অবশ্য ইদানীং আমরা সভ্য সংস্কৃতিবান শিক্ষিত হয়েছি বলে শুধু চরিত্রহনন করি। চরিতখেকো কোম্পানীর নির্ভুল নিঃশব্দ পদ্ধতিতে। গুলি বা লাথি আজকাল প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার হয়ে গেছে। কচকচ করে নির্মল কাঁচা চরিত্র খাওয়াটাই এখনকার ফ্যাশান।

চকিতে নিশানা নিয়ে তার ঘাড় লক্ষ্য করে তো দিলাম ট্রিগার টিপে। থ্রী সিক্সটি সিক্সের (নাইন পয়েন্ট থ্রী) মার বড় নিখুঁত মার। ঘাড় মটকে গেলেও সে লাফ দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। শরীরটা এক দমক এগিয়ে গিয়েই আবার পেছিয়ে এলো। খোয়াই-এর গলিতে। হঠাৎ ব্রেক করলে চেসিস-এর ওপরে গাড়ির বডি যেমন করে। তারপর থরথর করে কাঁপলো কিছুক্ষণ ঐ খোওয়াই-এর আরাম কেদারার মতো খোঁদলেই। এবং তারপরই স্থির হয়ে গেলো।

যুগলপ্রসাদ অদৃশ্যলোক থেকে দৌড়ে এলো। কাকারা এসে হ্যান্ডশেক করে নতুন সিগারেট ধরালেন। বাবার ভারী শরীর। কাঁধে রাইফেল ফেলে পুত্রগর্বে গর্বিত আমীরের মতো ধীরেসুস্থে এলেন। তাঁর কার্থবাটসন হাপারের জুতো নিস্তব্ধ বনে মসস-মস, মস-মসস্ আওয়াজ করতে লাগলো। বাবাও এসে হ্যান্ডশেক করলেন। বাঘটাকে একটা মস্ত বড়

BanglaBook.org

কালো পাথরের ওপর তুলে তার চারপাশে শিকারিরা বসে ফোটোও তোলা হলো। সেইটেই হলো লজ্জার কথা। চুপিচুপি বলি যে, বাঘটা এতই ছোট ছিলো এবং শিকারিরা এতো জন এবং ফোটোটি এত ফালানা ঢামকানা ঢোল বাজানো যে কুলাঙ্গার শিকারিদের লজ্জাস্থান হয়ে রইবে চিরটাকাল।

'তবে লজ্জার তখনও বাকি ছিলো কিছু। তখনও গত রাতে আমার গুলিতে আহত হওয়া বাঘটির কোনো হদিস মিললো না। তাকে খুঁজে বের করতে এসেই এই অনাহত বা অনাহুত বাঘের সঙ্গে কুস্তি লড়তে হলো।

যুগলকে বললাম, তুমি কোন আক্কেলে বাঘের লেজ-এ গুলি করলে?

যুগল বললো, "আক্কেল গুড়ম্" হলে সকলেই অমন করে। আমার কাজ তো বাঘ মারা নয়। কোনোক্রমে বাঘকে শিকারিদের কাছে পাঠানো। আমি জানতাম যে লেজে হঠাৎ গুলি খেয়ে আর গুলির শব্দে ভড়কে গিয়ে ও নালা ছেড়ে উপরে উঠবেই। তাছাড়া লেজে আমি গুলি করিনি। লেজ-এর ছ'ইঞ্চি ওপাশে করেছি। উদ্দেশ্য ছিলো শুধুই তাকে ভড়কে দেওয়া। ওর লেজ-এ একদানা এল জি লাগলেও আমার টুটি কামড়ে ধরতো।

তারপর প্রায় ঘন্টাখানেক ডানদিকের ও বাঁদিকের জঙ্গলে সকলে মিলে খোঁজাখুজির পর দূর থেকে একটি গুহা চোখে পড়লো। অদ্ভুত গুহাটা। পাহাড়ের পায়ের কাছেই। দুর্গম নয়। এবং গুহা বলতে আমরা যেমন বুঝি তেমনও নয়। একে রক্-শেল্টার বলাই ভালো কিন্তু তিনটি দিকই ঢাকা কেবল একদিক খোলা। একটি টিলার পাদদেশে। জমির সমান্তরালে। এইরকম গুহাতেই তো গুলি-খাওয়া বাঘের থাকবার কথা। খোলা-মুখটি আগলেই সে বসে থাকবে কারণ ঐ দিকে কেউ এলেই আক্রমণ করবে সে তাকে। সাধারণ বুদ্ধির কথা।

কিন্তু আক্রমণ করার সুযোগ আর বেচারি পেলো না। আমার গতরাতের গুলিটা লেগেছিলো ওর ডানদিকের হাঁটুতে। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে সামনে দুটি পা ছড়িয়ে দিয়ে মাথা উঁচু কান-খাড়া করে বসে ছিলো সামনের দিকে চেয়ে। চারদিকে প্রথম শীতের চমৎকার চেকনাই-ভরা রোদ্দুর। তখনও গাছেদের পাতা-ঝরা শুরু হয়নি। ঘন সবুজ পাতায় পাতায় রোদ চমকাচ্ছে। পাখি ডাকছে নানারকম, কাঁচপোকা উড়ছে। সমস্ত বনের শরীর থেকে সবে চান করা ওঠা কিশোরীর শরীরের গন্ধের মতো এক ধরনের গভীর ঝিম্-ধরা গন্ধ উঠছে। এমন সময় কাউকেই মারতে ইচ্ছে করে না। কারোরই নিশ্চয়ই মরতেও ইচ্ছে করে না এমন সকালে। মাত্র একটাই তো জীবন। সকলেরই।

যুগল বাবাকে এসকর্ট করে নিয়ে গেলো গুহার পেছন দিকে, মানে বাঘের পেছনে। সেখানে একাধিক ছোট বড় ফুটো ছিলো। পাথরের ফাঁক-ফোঁক। একটি ফুটো ছিল বেশ বড়। সেই ফুটো দিয়ে বাবাকে রাইফেলের নল ঢুকিয়ে দিতে বললো যুগল। বাবা মাথা নাড়লেন। একে স্পোর্ট বলে না। দু পক্ষেরই সমান সুযোগ থাকা উচিত।

যুগল আকারে ইঙ্গিতে বোঝালো যে আহত বাঘ। আক্রমণ তো করতেই পারে। না করলে গুহার অন্ধকার কোণে গিয়ে লুকোবে। তখন তাকে মারা আরও অসুবিধের হবে। তাছাড়া আহত করে তাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি না দেওয়াটা কোনো ভদ্রলোক শিকারির উচিত কর্ম নয়। পরে সে মানুষখেকোও হয়ে যেতে পারে।

অতএব দ্বিধাগ্রস্থ আঙুলে রাইফেলের নল পাথরের উপরে রেখে ভালো করে নিশানা নিয়ে বাবা ট্রিগার টানলেন। কী হলো, তা বোঝার আগেই বাঘটির উঁচু মাথা লুটিয়ে পড়লো। মৃত্যুভয় যে আসবে সেই সময়টুকুও থাকলো না আর।

BanglaBook.org

শিকারের ক্ষেত্রে আমরা একাধিক অপকর্ম করেছি। হয়তো সব শিকারিই করে থাকেন। অবধানে এবং অনবধানে। কিন্তু এইরকম শিশুবধ আর কখনওই করিনি। যদিও শিশুরা আদৌ দুগ্ধপোষ্য ছিলো না। বেটি তাগড়া চিতা এবং সম্ভবত মা, তাকে কব্জা করা গেলো না। যেতো যদি আমরা আর দু দিন থাকতে পারতাম। যুগল বলছিলো যে, বাছুর বা চিতা বাঁধলেই সে নির্ঘাৎ আসতো। বাবা বললেন প্রায় পূর্ণবয়স্ক হয়ে ওঠা বাচ্চারা মারা পড়াতে ও এই অঞ্চল ছেড়ে চলেও যেতে পারে হয়তো।

তা পারে।

যুগল বললো।

কিন্তু আমাদের সেই রাতেই কলকাতা ফেরার ছিলো। হাতে যার সময় নেই তার যেমন প্রেম হয় না, তেমনই শিকারও হয় না। হয়তো কোনো কিছুই হয় না। হওয়ার মতো।

BanglaBook.org

কৈশোরাবস্থায় এই কোডারমার চারদিকের অঞ্চলের জঙ্গলে আমরা একসময় যে কত শিকার করেছি, তা বলার নয়। ঢোঁড়াখোলায়, ইস্‌রি, ইটখোরি-পিতিজ, রজৌলির ঘাট, সিঙ্গারের উপত্যকা, ঘাট পেরিয়ে গিয়ে, নওয়াদার দিকে না গিয়ে বাঁদিকে বেঁকে যেতে হতো। গভীর রাতের ভিজে চাঁদে বনজঙ্গলের যা রূপ, যা রহস্যময়তা তা আমার কিশোর মনে গভীর রেখাপাত করেছিলো। শিকারটা ছিলো আমার কাছে নিছকই বাহানা, চিরদিনই অ্যালিবাই, আসল ছিলো প্রকৃতির বুকের কোরকে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ। কোনোদিনও গুলি-করে মারা জানোয়ারের কাছে যেতে ভালো লাগেনি। যথাসম্ভব যাইওনি। চারদিকে মাথা উঁচু পাহাড়ের মাঝের উপত্যকায় একটি নড়বড়ে কুঁড়েঘরের মধ্যে এবং বাইরে আগুন জ্বালিয়ে যে বীর ভারতবাসী তার স্ত্রী ও শিশুকন্যা এবং পালিত পশু নিয়ে শুয়ে বাঘ, ভাল্লুক, টিয়া ও টিকায়েতের অত্যাচার সহ্য করে বিঘাখানেক কুলথি ক্ষেত শম্বরদের নীল গাইদের শুয়োরদের এবং চিতল হরিণদের মুখ থেকে বাঁচিয়ে রাখার দুর্মর স্বপ্নে অভাবনীয় শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক ও স্নায়বিক চাপের মধ্যে বেঁচে থাকে তাকে বাহবা না দিয়ে পারিনি কখনো। তাদের কাছ থেকে দেখেছি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান নানারকম অধিবাসী। জেনেছি, এরাই আমার দেশ, আসল দেশ, এদের ভালোটাই দেশের ভালো, এরাই আমার ভাই।

তার গায়ে একটি দেহাতি কুটকুটে কম্বল, পায়ে মোটা কর্কশ চামড়ার নাল লাগানো জুতো, কাঁধে চুট্টা, কখনও কখনও বা মহুয়ার দমক দমক মহক্। যখনি আমরা ডেকেছি মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে জানোয়ারের চলাচলের খবরাখবর দিতে, তারা আনন্দের সঙ্গে সব খবর দিয়েছে। ভক্তিভরে প্রণাম করেছে। তার স্ত্রীকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। কারণ যুগ যুগ ধরে অর্থবান ধনবান ক্ষমতাবান মানুষের নানাবিধ অত্যাচার সয়ে সয়ে ওদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে ওরা আমাদের প্রতি। শহুরে শিক্ষিত জানোয়ারদের প্রতি।

এই বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে না পারলে ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে যে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা সকলেই যে সমান এ-কথা নেতাদের মতো করে নয়, আমাদের মতো করে অন্তরের অন্তরতম থেকে সকলকে বোঝাতে হবে। নিজেদেরও বিশ্বাস করতে হবে।

পরে বুঝতে পারতাম যেটাকে ভক্তি ভেবেছি চিরদিন সেটা আসলে ভয়। ওরা আসলে ভক্তি করেনি, আমাদের ভয় করেছে। এই ভয়কে যদি কখনও ভালোবাসায় রূপান্তরিত করা যেত, তবে এই ভারতবর্ষর চেহারা অন্যরকম হয়ে যেত। দুঃখের বিষয় গত একচল্লিশ বছরে এই ভয়টাই এক ভয়াবহ আতঙ্কের রূপ নিয়েছে। ব্যবধান বেড়ে গেছে অনেক। ওদের আর আমাদের মধ্যে ভূমিকম্পে যেমন ফাটল ধরায় মাটিতে তেমনই গভীর

সাঁকোহীন ব্যবধান রচিত হয়ে গেছে। আমাদের জনগণের নেতাদের ধন্যবাদ। আমাদেরও ধন্যবাদ। কুকুরের বাচ্চাদের নেতা কখনও বাঘের বাচ্চা হয় না।

এই গহ্বর, এই ফাটল পেরোতে গেলে কোনো মিরাকেলের দরকার এখন। স্বামী বিবেকানন্দের মতো কারোর জন্মানোর দরকার।

শিকারের শখ থাকে বহু মানুষের কিন্তু সাহস থাকে না। সামর্থ্যও হয়তো থাকে না। অনেকের আবার উৎসাহ উদ্দীপনা যে পরিমাণ থাকে সেই পরিমাণ আক্কেল থাকে না। যতখানি উদ্দীপনা যার পক্ষে বওয়া সম্ভব তার চেয়েও বেশি উদ্দীপ্ত হলে তার তো বটেই, আশেপাশে যারা থাকে তাদের সকলেরই সমূহ বিপদ।

বাবার বন্ধু ছিলেন জে দাশ সাহেব। পাকা সাহেব মানুষ। ওরকম দীর্ঘদেহী গৌরবর্ণ সুপুরুষ বাঙালীদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। তিনি আই-সি-এস। ফলে সত্যিই মানাতো। তিনি ইন্ডিয়ান রেভিন্যু সার্ভিসে ছিলেন এবং কলকাতা থেকে আয়কর আপীলেট ট্র্যাইব্যুনালের মেম্বার হয়ে রিটায়ার করেন। তাঁর স্ত্রীও অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। দাশকাকু একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেন। চিত্রাকাকিমা শান্তিনিকেতনের মেয়ে। ভালো রবীন্দ্রসংগীত গান। মেমসাহেবের মতো ইংরিজি বলেন। ওঁরা স্বামীস্ত্রী যখন তাঁদের ছোট সিঙ্গার গাড়ি করে, একটু দেরি করে টেস্ট খেলা দেখতে যেতেন ইডেনে এবং হয়তো নিজেদের দেখাতেও, তখন সকলে খেলা ছেড়ে ওঁদের দেখতেন। দেখার মতোই ছিলেন। কোনো সন্দেহ নেই তাতে। তখনকার দিনে 'মেড ফর ইচ আদার' কথাটা বিজ্ঞাপন কোম্পানিদের দৌলতে এমন মুখে মুখে ফিরতো না কিন্তু আমি আমার জীবনে এরকম আর একটিও "মেড ফর ইচ আদার" দম্পতি দেখিনি। অন্তত শরীরগত দিক দিয়ে।

দাশকাকু সৌখীনও ছিলেন খুব। মুখে পাইপ। নিচু স্বরে ভারী হাস্কি গলায় কথা বলতেন। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। এ যাবৎ শতাধিক মেম্বারের মোকাবিলা করেছি ট্র্যাইব্যুনালে কিন্তু কোর্ট রুমে দাশ সাহেব যেমন বাঘের মতো শোভা পেতেন, দু পক্ষের এক পক্ষও একটু উল্টোপাল্টা বললে যেমন শাসন করতেন, বাচাল উকিল এবং ডিপার্টমেন্টাল রিপ্রেজিনটিটিভদের, তেমনটি আর কাউকে করতে দেখেনি। আজকাল তো দেখিই না। কোর্টের ডিগনিটি যে তিনি বজায় রাখতেন ব্যবহারে, একথা তাঁর বেঞ্চে যাঁরাই অ্যাপিয়ার করেছেন কখনও, তাঁরাই স্বীকার করবেন। অর্ডারও লিখতেন চমৎকার। ওঁর অর্ডারে কোনোদিনও কোনো মিসেলানিয়াস অ্যাপ্লিকেশন হয়েছে বলে মনে পড়ে না। দু পক্ষের সওয়ালের প্রত্যেকটি পয়েন্ট নথীবদ্ধ করে তারপর নিজের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করতেন। মামলার রায় যেদিকেই যাক না কেন, অর্ডারের যুক্তি নিয়ে কারওই কিছু বলার থাকতো না।

সেই দাশকাকু, কাকীমা এবং দাশকাকুর এক ভাই একবার কোডারমায় এলেন। কাকীমা শিকার করা পছন্দ করতেন না। নরম মনের মানুষ ছিলেন। দাশকাকু ; দাশকাকুর ব্যাচেলর ছোট ভাই, আমি এবং বাবা একদিন সন্ধের পর বেরোলাম। দাশকাকুর ইচ্ছে বাঘ মারার। কিন্তু তার আগে বিগ গেম বলতে তেমন কিছুই করেননি বলতে গেলে।

যুগল বললো, যায়েগা আর আয়েগা। কিন্তু জন্তুদের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট অত্যন্ত দড়। আমরা রওয়ানা হবার সঙ্গে সঙ্গে বনে পাহাড়ে নালাতে খবর রটে গেলো যে গুহসাহেব এবং দাশসাহেব বাঘ নিধনে আসছেন,অতএব আত্মসম্মানজ্ঞানী ব্যাঘ্রকুল তোমরা এরকম শিকারিদের হাতে হত হওয়ার অসম্মান থেকে যদি বাঁচতে চাও তাহলে মানে মানে অবিলম্বে দেশ ছাড়ো। এমন শিকারিদের হাতে মরলে তোমাদের নরকবাস অবধারিত।

বাবাও তখনও বিগ-গেমে রংরুট। বিগ-গেম-এর সুযোগ সকলের হয় না। বাবা নিজস্ব

পেশা আরম্ভ করার পর থেকেই রাজা মহারাজা কেউকেটা সব মক্কেলদের দৌলতে আমাদের বিগ-গেম-এর অফুরন্ত সুযোগ জুটে গেছিলো। আমি যেহেতু তখনও কিশোর এবং ছোট ভাইয়েরা আমার চেয়ে অনেকই ছোট, আমিই তার ফায়দা উঠিয়েছিলাম সবচেয়ে বেশি।

সেই বয়েসে বাবার সঙ্গে শিকারে গেলে প্রায়শই আমাকে একটা পয়েন্ট টু-টু রাইফেল হাতে দিয়ে পেছনের সিটে যুগলের পায়ের কাছে বসিয়ে রাখা হতো। বাবা এবং তাঁর বন্ধুদের গুলিতে কোনো গুলিখোর জানোয়ার ধরাশায়ী হলে এবং তখনও তার প্রাণবায়ু নিঃশেষিত না হলে, তার কানের ফুটো দিয়ে একটি পয়েন্ট টু-টুর হলোপয়েন্ট বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে তার কান-খুসকি এবং প্রাণ একই সঙ্গে হাপিস করে দেওয়ার কাজ ছিলো আমার। কাজটা যত সহজ মনে হচ্ছে তত সহজ ছিলো না। কারণ অধিকাংশ জানোয়ারেরই প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হওয়া দূরে থাক, তাদের জবরদস্ত জান-এর অনেক খানিই বাকি থাকতো। এবং নীলগাই-এর চাঁট বাঁচিয়ে শুয়োরের দাঁতের অথবা শজারুর কাঁটার অমোঘ পরিণতি সম্বন্ধে বিলক্ষণ অবহিত থেকেও প্রাণ-নিষ্কাশনের কাজটি মোটেই সুখকর ছিলো না।

দাশকাকু কোর্টরুমে বাঘ হলেও জঙ্গলে তাঁর সে-সাহসের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট থাকতো না। দাশকাকুর সেই ভাই পরে আত্মহত্যা করে মারা যান। কেন যে, তা আমার ঠিক মনে নেই।

জঙ্গল ক্রমশই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। কৃষ্ণপক্ষর রাত। তবে গরমের দিন। জিপের সামনের কাঁচ বনেটের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। হুড খোলা। সামনে ড্রাইভার আলি হোসেন। তার পাশে দাশকাকু। ডানদিকে বাবা। একটি পা বাইরে রেখেছেন স্থান সংকুলানের জন্যে। বাবার দৈর্ঘ ছিলো ছ ফিট এক ইঞ্চি। সমানুপাত প্রস্থ। ওজন প্রায় দু মণ। কিন্তু জীবনীশক্তিতে সবসময়ই ভরপুর।

মাইল দশেক যাওয়ার পর যুগলের আলোয় ঘন পাতা-ঝরা বনের মধ্যে চোখ জ্বলে উঠলো। করেন কি। করেন কি! বলার আগেই বাবার ফোরটুয়েন্টি থ্রী ফ্রেঞ্চ রাইফেল থেকে চার গাছা অদম্য গুলি পড়ি-কি-মরি করে ছুটে গেলো সেই কে-জানে-কী জানোয়ারের চোখ অথবা টোখের দিকের। শেষে যুগল যখন ব্যারেল উপরে করে দিলো ধাক্কা মেরে, তখন বাবার হুঁস হলো।

বাবা বললেন ক্যা বা?

যুগল বললো, মাইকা। অর্থাৎ অভ্র।

ঐ অঞ্চলের অনেক পাহাড়েই মাইকা আছে। অভ্রর চাঙর পাথরের চাঙড়ের ভিতর ভিতর থাকে। পাথরেরই মতো দেখতে তবে ভালো করে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে পাথর নয়। মাইকার উপর আলো পড়তেই জ্বলে উঠেছিলো এবং আর কি তর সয়?

জিপ এগোলো মাইকা শিকারের পর আরও মাইল খানেক। এমন সময় এক হতভাগা, কিন্তু ফ্লোর ক্রসিং-করা এম-এল-এ বা এম-পির মতো ধুরন্ধর পাটকিলে-রঙা, ধেড়ে, হাড়-বজ্জাত খরগোস গান্ধীটুপি ছাড়াই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলো। গতজন্মে সে ব্যাটা নিশ্চয়ই কোনো সার্কাসের ক্লাউন অথবা বাবা ও দাশকাকুর পয়লা নম্বরী দুশমন ছিলো। সে যা ঘটনা ঘটালো সে কথা বলি শুনুন।

যুগল তাকে দেখেই বেজায় বিরক্ত হয়ে বললো, মানহুষ। আজ শিকার কুচ্ছো নেহি মিলেগা। মানহুষ অর্থাৎ অপয়া।

খরগোসকে বড় শিকারিরা শিকারের মধ্যে গণ্যই করেন না যদিও ইংল্যান্ডে ফক্স-হান্টিং

এক দারুণ ব্যাপার। খরগোস বলেই বাবা দাশকাকুর ভাইকে বললেন মারো। উনি-আমার পাশে বসেছিলেন। ডাবল-ব্যারেল বন্দুক তুলে উনি গুলি করলেন, গুড়ুম। লাল ধুলো উড়ে গেলো কিছুটা। বসন্ত উৎসব জিপের মনে জিপ চলতে লাগলো, অবশ্য আস্তে আস্তে, সেকেন্ড গিয়ারে, খরগোসের মনে খরগোস চার পা জোড়া করে লাফ মেরে মেরে। খরগোস নির্বিকার। বাবা বললেন আবার মারো। আবার গুলি। গুড়ুম। যথাপূর্বং তথাপরং। খরগোস নাচতে নাচতে একবার পথের ডানদিকে আরেকবার বাঁদিক করতে করতে এগোতে লাগলো। জিপও তাকে অনুসরণ করতে লাগলো।

এবার বাবা বললেন মার দাশ।

দাশকাকু সামনের সিটে বসে বন্দুক তুলে মারলেন। একই ব্যাপার। খরগোস চলেছে লাফাতে লাফাতে।

অন্য ব্যারেল এবার।

গুড়ুম্। আবার পাউডারের মতো মিহি ধুলো উড়লো। খরগোস চলেছে নাচতে নাচতে, আমাদের নাচাতে নাচাতে।

এতোবড় অপমান রাশভারী দাশ সাহেবকে কেউই করেনি। তাঁর ফর্সা গাল লাল হয়ে উঠেছে রাগে। এমন সময় খরগোসও শিকারিদের স্ট্যাটাস সম্বন্ধে বোধহয় ইনফরমেশান পেয়ে গেছে জন্তুদের ওয়ারলেসে। তাকে বলা হয়েছে তুই এত বড় শিকারিদের হাতেও মরতে পারলি না! তোর নরকবাস হবে। সঙ্গে সঙ্গে মরবে বলে বদ্ধপরিকর হয়ে সে রাস্তা ছেড়ে রাস্তার ডানদিকের একটি গাছের গুঁড়ির সামনের দু পায়ে ব্রেক কষে নাচ থামিয়ে লেজ দুলিয়ে দাঁড়ালো। এবং লজ্জায় মুখ লুকোলো গাছের গুঁড়িতে। কিন্তু সমস্ত শরীরটা বেরিয়ে রইলো আড়ালহীন। যেন নীরবে বলতে লাগলো, "আরো আরো আরো প্রভু আরো, এমনি করে, এমনি করে আমায় মারো, আরো আরো আরো প্রভু আরো"।

বাবা তখন এতোই উত্তেজিত যে বেমালুম ভুলে গেছেন যে তাঁর হাতে বাঘ মারা রাইফেল। ঐ রাইফেলের গুলি যদি খরগোসের গায়ে দৈববিপাকে লেগে যায় তাহলে সে আর খরগোস থাকবে না,কিমা হয়ে যাবে। কিন্তু ক্রোধ রিপু হিসেবে অতি জঘন্য। বাবা কী একটা স্বগতোক্তি করে নল বের করলেন। নল তো নয় যেন ট্যাঙ্কের কামান মাথা তুললো। তারপর নট-নড়ন-চড়ন-নট-কিচ্ছু খরগোসের গায়েই প্রায় মাজল ঠেকিয়ে ঘোড়া দেবে দিলেন। হিরোসিমায় বোমা ফাটলো। ধুলোয় ধুলোয় সব অন্ধকার হলো। ব্যাঙের ছাতার মতো ধুলোর মেঘ। খরগোস, জিপ এবং বীর শিকারিরা সবাই ধুলোর মেঘে একে অন্যকে হারিয়ে ফেললাম। ধীরে ধীরে ধুলোর মেঘ সরলো। মাটিতে থিতু হলো। তখন দেখা গেলো, খরগোস মুখ থুবড়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে পড়ে আছে ধুলিশয্যায়।

বাবা হাসলেন। নেপোলিয়নের যুদ্ধ জয়ের হাসি।

দাশকাকু বললেন, কনগ্রাচ্যুলেশনস্।

দাশকাকুর ভাইও বললেন।

শুধু আমি পয়েন্ট-টু-টু-ধারী শিকারি চুপ করে বসে রইলাম। আমার মতামতের মূল্যই বা কি? আর চাইছেই বা কে?

বাবা বললেন, আলি হোসেন, পান খিলাও।

আলি হোসেন জিপের পকেট থেকে বাবার রুপোর পানের ডিবে বের করে দিলো। বাবা মঘাই পান খেলেন। বেনারসী জর্দা ফেললেন মুখের উপর থেকে। দু পাত্তি উড়ে আমার নাকে চলে গেলো।

আলি হোসেন জিপটিকে স্টার্টেই রেখে লেফ্‌ট-হ্যান্ড ড্রাইভ সিট থেকে নেমে সামনে দিয়ে ঘুরে ডানদিকে গিয়ে খরগোসের ঠ্যাং ধরে টেনে তুলবে বলে ঠ্যাং ধরলো। এবং পরক্ষণেই আলি হোসেনের হাতে শুশু করে নখ দিয়ে হাত আঁচড়ে শিকারিদের হতভম্ব করে দিয়ে অন্ধকার বনে এক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেলো বাবার জর্দার পিক গেলা হলো না।

দাশকাকু বললেন, এতো ভৌতিক ব্যাপার। হলোটা কি ? আলি হোসেন বললো, গুলি লাগা নেহি হ্যায় সাহাব। ইতনা হেভী রাইফেলকা আওয়াজইসে উ বে-হোঁশ হো গ্যয়া থা সায়েদ।

ততক্ষণে আমরাও বে-হোঁশ !

হতোদ্যম হয়ে আবার এগোনো গেল। রাস্তা ক্রমশই সরু হয়ে আসছিলো আর পথের দুধারে উঁচু মাটির পাড়।

দাশকাকু বললেন, এই রকম পথে আর যাওয়া কি সমীচীন হবে ?

বাবা বললেন, পথ যখন আছে তখন যাওয়া নিশ্চয়ই সমীচীন হবে।

কয়েক ফার্লং যেতেই বাঁদিকের উঁচু পাড়ের উপরে একজোড়া লাল ঘূর্ণায়মান চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। যুগল স্পট লাইটের আলো ধরে থাকলো তার উপরে। বাবা বললেন, মার ! দাশ !

কী ! কী ? ওটা কি ? টাইগার ?

দাশকাকু বললেন।

বাবা বললেন, মার্ না।

আমি না।

তখন বাবা রাইফেল ওঠালেন। এবং ওঠাতেই দাশকাকু বুড়ো থো দিয়ে নল চেপে ধরে যেদিকে লাল চোখ কিংবা বাঘ কিংবা অন্যকিছু সেদিকের বিপরীতে ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, গুহ। আমার ছেলেমেয়েরা বড় ছোট। বাঘ উন্ডেড হয়ে জাম্প করবে আমাদের উপরে। প্লীজ। প্লীজ। প্লীজ ফিরে চল্।

এই সময় শিকারীদের কান্নাকাটি শুনে বাঘ কিংবা যা হোক তো এক লাফ মেরে পথের উপর পড়লো এবং লেজ পাকিয়ে গোঁফ-পাকিয়ে বললো ভৌরাউআও-ও-ও-ও।

আমি দেখলাম বনবেড়াল। মস্ত।

বাবা বললেন, দুস্‌স্‌স্‌.....।

দাশকাকু বললেন, বাঘ তো হতেও পারতো। আজ এক সন্ধেতে অনেকই টেন্‌শান্ গেছে। এবার জিপ ঘুরিয়ে বাংলোতে ফিরে চলো।

অতএব তাই করা হলো।

BanglaBook.org

রজৌলির ঘাটের মতো সুন্দর এবং ভয়াবহ ঘাট বিহারে বেশি নেই। তবে এখন তার চেহারা কেমন হয়েছে, বলতে পারবো না। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে জঙ্গল যেমন দুর্ভেদ্য ছিলো, জানোয়ারও ছিলো তেমন। বড় বাঘ, ঝুণ্ডকে, ঝুণ্ড শম্বর, ভাল্লুক, কোটরা, লেপার্ড, ময়ূর, বনমুরগীর লেখা-জোখা ছিলো না।

ব্যাসাল্ট আর কোয়ার্টজাইটের বড় বড় চাঙ্গর, রক্-ফেস্, রক-শেল্টার আর গুহাতে ভর্তি ছিলো ঐ ঘাটের পাহাড়-জঙ্গল। বাঁকের পর বাঁক। ঘাটের উপরে খলকতুম্বি মাইনের পাশের কাঁচা রাস্তাতে কিছুদূর গেলেই বড় খাদ ছিলো একটা। বিভিন্ন ঋতুতে, দিনে ও রাতের বিভিন্ন সময়ে ঐ পাহাড় বনের যা রূপ ছিলো, তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে পত্রশূন্য গাছেরা তাদের পায়ের কাছের বিভিন্নরঙা ঝরা-পাতার গালচে নিয়ে উর্দ্ধবাহু হয়ে সার সার দাঁড়িয়ে থাকতো। সারা দিন এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো গরম হাওয়া চলতো লক্ষ লক্ষ রঙিন পাতা উড়িয়ে-ছড়িয়ে। ঘূর্ণী উঠতো সেই হাওয়ায় কখনও। মনে হতো, উর্ধ্বাকাশে বনদেবতার জন্যে নৈবেদ্য সাজিয়েছে বন। বিচিত্রবর্ণা। তার মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল রেশমী, নীলকণ্ঠী ময়ূর অথবা ঘোর-লাল অথবা কালো অথবা করমচা-রঙা বনমুরগী হেঁটে যেতো। দ্রুত চালে চলে যেতো বহুবর্ণা সাপ ঐ প্রেক্ষিতে প্রেক্ষিত হয়ে। বেলা পড়ে আসতো। ফেড-আউট্ করে যেতো দিন। কৃষ্ণপক্ষের রাতে তারারা ফুটে উঠতো একে একে আকাশ নিবিড় করে। মনে হতো পাতা-ঝরা গাছেদের ডালে লাল- নীল টুনি-বাল্ব জ্বলছে যেন। আর শুক্লপক্ষে চাঁদ উঠতো বিশ্বচরাচর উদ্ভাসিত করে। বনের আনাচ-কানাচ কলুষহীন বনজ্যোৎস্নায় ভরে দিয়ে। পাহাড়ী ইঁদুর তাদের চাল- রঙা পিঠ নিয়ে শুকনো পাতা মচ্‌মচিয়ে ইতি উতি ঘুরে বেড়াতো সাপের নজর এড়িয়ে। কিন্তু পেঁচার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়তো তারা। দুরগুম্ দুরগুম্ দুরগুম্ করে বুক কাঁপিয়ে ডেকে উঠতো পেঁচা। জংলী কুকুরের দল কম্যান্ডো বাহিনীর মতো ক্ষিপ্রতায় আর অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ধাওয়া করে যেতো শম্বরকে। প্রাণ ভয়ে দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে খানা-খন্দ-খাদ না দেখে প্রবল বেগে দৌড়তো শম্বর। একটু পর বনে-পাহাড়ে তার হেরে-যাওয়া আর্তনাদ ঠিক্‌রে যেতো ঘ্‌ব্বাক্-ঘ্‌ব্বাক্-ঘ্‌ব্বাক্। খাদের ওপাশের গুহা থেকে বাইরে এসে গুহাসংলগ্ন কালো পাথরের চ্যাটালো বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে ডেকে উঠতো বড় বাঘ উঁ—আ—উ করে। স্তব্ধ হয়ে যেতো সমস্ত বন, বনের রাজার ডাকে। "অ্যা-টে-নশা-ন্" বলতো যেন কোনো অদৃশ্য কম্যান্ডার। সমস্ত প্রকৃতির সমস্ত মনোযোগ থাকতো তখন বাঘেরই উপর।

গ্রীষ্মর দিনে পলাশ আর শিমুল, লালে লাল করে দিতো বনকে। কালো পাহাড় আর নীল আকাশের পটভূমিতে তাদের রূপের বাহার পথিককে মুগ্ধ করে দিতো। মাটিতে

ফুটতো লাল ফুলদাওয়াই, গাঢ় বেগুনী জীরহুল, হলুদ পিলাবিবি আর সাদা সফেদিয়া। দমক দমক হাওয়ায় গন্ধ ভাসতো মহুয়ার। বন পাহাড় আর বনপাহাড়ের, মানুষ আর প্রাণীরা বেহোশ হয়ে যেতো সেই মহুয়ার নেশায়। সন্ধের পর করোঞ্জ আর কানৌদের গন্ধে ভারী হয়ে থাকতো হাওয়া মহুয়ারও গন্ধে।

বর্ষাকালে আবার এই ঘাটেরই অন্য রূপ। পত্রপল্লবের শোভাতে সবুজের সমারোহে সে যেন অন্য কেউ হয়ে উঠতো। বুনো কদম, চাঁপা, চাঁরের দিন তখন। নালা ও ঝরনার ঝরঝরানি আর কুলকুলানি ঘুমপাড়ানী সুর হয়ে কানে বাজতো।

শীতের রূপ আবার অন্য। বন তখন মৌন তাপস। গেরুয়া ধুলো মেখে সার সার নাগাসন্নিসীর মতো না-হেঁটে হেঁটে যায় গাছেরা সারি সারি।

সব ঋতুতেই সুন্দর কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর লাগে রজৌলির ঘাটকে বসন্তে। সিঁদুরে মাটি, কালো গাছ ও পাথর আর কচি-কলাপাতা পাতারা এক অপরূপ বেশে সাজিয়ে দেয় বনকে। শিলাজতুর অসভ্য অসভ্য গন্ধ পুটুসের তীব্র উগ্র গন্ধের সঙ্গে মিশে যায়। হলুদ-বসন্ত পাখি আর কোকিল গলার শির ফুলিয়ে ডাকে। চিতল হরিণ এই পাহাড়ে কম। তবু আছে। তখন তাদের শৃঙ্গার দেখার মতো।

ঘাট পেরিয়েই সিঙ্গার উপত্যকা। সে উপত্যকায় শীতের সময় যখন ফসল লাগে, অড়হড়, কুল্‌থী, মটরছিম্মি, কাড়ুয়া ; তখন রাতের বেলা এক একদলে দু আড়াইশ শুয়োর, জোড়ায় জোড়ায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শজারু, খরগোস আর শম্বরের মেলা লাগে। এই সিঙ্গারেই একটি কালো চিতা দেখেছিলাম। যদিও অনেক দূরে ছিলো। আর কি জীবনে আর কোনো বনেই কালো চিতা দেখিনি। বিহারে চিতাবাঘকে (লেপার্ড, আফ্রিকান চিতা নয়) বলে "শোন্‌চিতোয়া"।

বিজাপুকার সাহেবের বড় মায়া ছিলো গুলির উপর। একবার রাতের বেলা কোটরা ভেবে একটি খরগোসকে গুলি করেন এল্ জি দিয়ে। এল জির একটি দানা লাগে তার গায়ে। উনি নেমে তাকে ঠ্যাং ধরে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে দেখেন সে এক পা এক পা করে গভীর জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে। আধমরা শিকারের উপর আর গুলি খরচ করা শ্রেয় নয় ঠিক করে, তিনি বন্দুকের নল দিয়েই তার যাত্রাপথ রোধ করার চেষ্টায় বিফল হয়ে ধৈর্য হারিয়ে নল ধরে বন্দুকটিকে লাঠির মতো ব্যবহার করলেন খরগোসটির উপরে। লাভের মধ্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বন্দুকের কুঁদোটাই ভেঙে যায়। খরগোসও ঢুকে যায় নিশ্ছিদ্র জঙ্গলে।

বাবা গুলি করে জিপ থেকে নেমে যেতেই বিজাপুকার সাহেব বাবার গুলির ব্যাগ হাতড়ে ভালো ভালো ইংলিশ ইলী কীনক্ ও চেকোস্লাভাকিয়ান ও ইটালিয়ান গুলি দ্রুত হস্তে পকেটস্থ করতেন। রোটাক্স-বল, লেথাল-বল, স্ফেরিক্যাল-বল, কনটাক্ট-বল, এল জি, এস এস জি, থ্রী এ, বিবি, ইত্যাদি নানা কার্তুজ। শিকারীদের জগতে গুলি-চুরিটা চুরির মধ্যে গণ্য হয়নি কখনও।

কোডারমা অঞ্চলে বছর পাঁচেক আমরা মুখ্যত জিপ থেকেই শিকার করেছি। সময় যাদের কম, তাদের পক্ষে ঐরকম শিকার প্রশস্ত বটে কিন্তু ঐ শিকারকে ঠিক শিকার বলা যায় না। বনের মধ্যে দিনে পায়ে হেঁটে পাল্‌সা শিকার অথবা হাঁকোয়া শিকার বন,বন্যপ্রাণী ও বনের মানুষজনকে যতখানি জানার সুযোগ দেয় একজন শিকারীকে তা জিপের শিকার কখনওই দিতে পারে না। সে কারণে পরবর্তী জীবনে বিহারের অন্যত্র পায়ে হেঁটে যে শিকার করেছি তার স্মৃতিই মনে বেশি করে জাগরুক আছে। তবুও কোডারমা পর্বর কথা ভোলা যায় না কারণ বিগ-গেম শিকারে বাবারই সঙ্গে ওখানেই আমার হাতে খড়ি।

লেপার্ড ছাড়াও অনেক শম্বর, নীলগাই ও কোটরা শিকার করেছিলাম ওখানেই স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন। সেই অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে কাজে লাগে।

হাজারীবাগ জেলার ইটখোরি-পিতিজ্-এ বাবার মক্কেল বদীবাবুর (বদী রায়) একটি শিকারের লজ ছিলো। তাঁর সেলারে ছিলো না এমন বিদেশী মদের নাম করা মুশকিল ছিলো। বেয়ারা বাবুর্চি খানসামা জেনারেটর সবই মজুদ ছিলো সেখানে। বদীবাবু ছিলেন কয়লাখনির মালিক। তাঁর খনি ছিলো ধানবাদ অঞ্চলে। ঝরিয়াতে তাঁর বাড়িতেও যাঁরা কখনওই খেয়েছেন তাঁরাই জানেন সেই খানার বহর। ডিপ-ফ্রিজে পাঁচ দশ বছর আগে মারা কোটরা বা চৌশিঙা বা রাজহাঁস বা নাকটার মাংস থাকতো। শম্বরের সুস্বাদু আচার। তাঁর স্ত্রী ও পুত্রবধূরা ঘিরে বসে জামাই আদরে খাওয়াতেন।

ইটখোরি-পিতিজে বদীবাবু একবার দীর্ঘদিনের জন্যে ক্যাম্প করেছিলেন কারণ ঐ অঞ্চলে একটি সাদা বাঘ দেখা গেছিলো। মানে, অ্যালবিনো। সেই সাদা বাঘ মারার জন্যে শিকারিদের মধ্যে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিলো দীর্ঘদিন। মাছ ধরার নেশাও ছিলো খুব ওঁর। নিজে ঝরিয়া ওয়াটার বোর্ড-এর মেম্বার ছিলেন। সেই সুবাদে তোপচাঁচীর হ্রদে প্রায় প্রতি শনি-রবিবার তিনি পাত্র-মিত্র সমভিব্যাহারে মাছ ধরতে যেতেন। তখনকার দিনেও একশ টাকার নোট ছাড়া কাউকে বকশিস দিতেন না। এবং তখন তাঁর দিবারাত্রির সঙ্গী ছিলো স্কচহুইস্কী। ধুতির উপরে খাকি হাফশার্ট পরে, চোখে সান-গ্লাস পরে যখন তিনি মাছ ধরতে যেতেন তোপচাঁচীতে, তখন যাঁরা তাঁকে চেনেন না তাঁদের পক্ষে ধারণা করাই মুশকিল ছিলো যে, ইনিই বদীবাবু। তখন ছিপছিপে রোগা ছিলেন। হুইস্কীর কল্যাণে গায়ের রঙ তামাটে তামাটে হয়ে গেছিলো। পরে যখন হুইস্কী ছেড়ে দেন তখন ধবধবে ফর্সা ও মোটাসোটা হয়ে যান। কোলিয়ারি ন্যাশানালাইজড্ হয়ে যাবার পর এখন তিনি হাজারীবাগে বাড়ি করে আছেন। এই বয়সেও ছেলে ও নাতিদের সঙ্গে সমানে ব্যাডমিন্টন খেলছেন। একবারে এনার্জির বাণ্ডিল।

ঝরিয়ারই আরেকজন ছিলেন অর্জুন আগরওয়ালা। কোলিয়ারিকিং। অন্য আরেকজনও ছিলেনকোলিয়ারিকিং। একজন নন, দুটি গুজরাটি পরিবারের যৌথ সংস্থা। চানচানী অ্যান্ড ওড়া। মাড়োয়ারী অর্জুনবাবু এবং গুজরাটি চানচানী অ্যান্ড ওড়া একে একে আরামী বাঙালীবাবুদের সবকোলিয়ারিকিনে নিয়ে নিজেরা প্রায় একচেটিয়া কারবার করতে থাকেন। ঐ চানচানীদের বাড়ির এক শরিকের ছেলে দীনুভাই ছিলো আমার কলেজের সহপাঠী। আমরা একই সঙ্গে সি-এ পাশও করি। দীনু ব্যবসায়ে না গিয়ে নিজস্ব পেশা শুরু করে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে।

অর্জুন আগরওয়ালা ছিলেন বাবার মক্কেল। ঐ রকম দানশীল ব্যবসাদার বিহারে আর ছিলেন না। কত কোটি টাকা যে তাঁর দান ছিলো তা বলার নয়। অল্পবয়সে স্ত্রীবিয়োগ হয়েছিলো। কাজ-পাগলা মানুষ ছিলেন। ছ'ফিটের বেশি লম্বা, ছিপছিপে, কালো। মুখের মধ্যেই এক ধরনের অসাধারণত্বর ছাপ ছিলো। উনি হেসে বলতেন, পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই যে দেশের নারীর সঙ্গে উনি সহবাস করেননি। শিকারও করতেন। তবে নিরামিশাষী জানোয়ার নয়। শুধুই মাংসাশী জানোয়ার।

ঝরিয়ায় ওঁর অতিথিশালার নাম ছিলো 'আনন্দভবন'। আনন্দভবনের গারাজে পঞ্চাশটি গাড়ি থাকতে পারতো একসঙ্গে। নিরামিষ হলেও চমৎকার খাওয়া-দাওয়া। তখন বিহার জুড়ে পাঁচশালা পরিকল্পনায় নানা বাঁধ তৈরি হচ্ছে। মাইথন, তিলাইয়া, পাঞ্চেত ইত্যাদি। আনন্দভবনে থেকে সেই সব বাঁধ দেখতে যেতাম আমরা। আর শিকার করতে যেতাম তাঁর

BanglaBook.org

রাঁচীর বাড়িতে। কাঁকে রোডে। বাড়ির নাম 'গোল্ড হাউস'। একশ কুড়ি বিঘার উপরে দেওয়াল দেওয়া বাড়ি। বাড়িটি ছিলো ইংলিশ ক্যাসল-এর মতো। বিহারের শেষ ইংরেজ গভর্নরের এক আত্মীয়ার কাছ থেকে কিনেছিলেন উনি। গেটে ঢুকে বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি চালিয়ে তারপর বাড়িতে পৌঁছতে হতো। বাড়ির মধ্যে স্বাভাবিক পাহাড় ছিলো। তার একপাশে পাহাড়ের গায়ে ছিলো শুটিং রেঞ্জ। চিড়িয়াখানা ছিলো বাড়িতে। সেই রেঞ্জে আমি বাবাকে পয়েন্ট টু টু রাইফেল দিয়ে গ্যাঁদা ফুলের পাপড়ি গুলি করে একটি একটি করে ছিঁড়তে দেখেছিলাম একবার। চমৎকার হাত ছিলো বাবার। ফ্লাইংও মারতেন চমৎকার।

রাঁচী শহর চল্লিশের দশকের শেষে কি পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় একটি ছবির মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনোমুগ্ধকর শহর ছিলো। বড় বড় টানা রিক্সা চলতো। দুজন রিক্সাওয়ালা টানতো সে রিক্সা। মোটর গাড়ি ছিলো কম মানুষের। বি এন আর হোটেলটিও ছিলো দেখার মতো। কলকাতার বহু মানুষ শীতকালে চেঞ্জে এসে এই হোটেলে থাকতেন।

রাঁচী থেকে অর্জুনবাবুর অগণ্য বড় বড় গাড়ি ও ওয়েপন ক্যারিয়ারে করে আমরা বিভিন্ন দিকে শিকারে যেতাম। মহাষ্টমীর দিনে টোড়িতে (চান্দোয়া টোড়ি) পুজো দেখতে-কাম-শিকার করতে গিয়ে খুব একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। একটি বড় ডেসোটো গাড়িতে আমার মা এবং বাবার বন্ধুবান্ধবদের স্ত্রীরা ছিলেন। অন্য একটি পন্টিয়াক গাড়িতে বাবা ও তাঁর বন্ধুরা। অর্জুনবাবু ছিলেন স্টিয়ারিং-এ। আর একটি ওয়েপন-ক্যারিয়ারে রাইফেল বন্দুক গুলি এবং খাবার দাবার। তিনজন খিদমদগার, খাওয়ার দাওয়ার সার্ভ করবার জন্যে। সামনে ড্রাইভারের পাশে আমার ছোটকাকা। পেছনে খিদমদগারদের সঙ্গে আমি। যথারীতি হাতে একটি পয়েন্ট-টু-টু রাইফেল নিয়ে। রাঁচী থেকে লোহারডাগার রাস্তায় গিয়ে কুরু বলে একটি ছোট্ট গ্রাম আছে, বিজুপাড়া এবং সঁস্ পেরিয়ে। কুরুতে ডানদিকে মোড় নিয়ে চান্দোয়া টোড়িতে যেতে হয়। ঘাট পেরিয়ে। টোড়িতে পুজো দেখে মায়েরা ফিরে যাবেন রাঁচী আর আমরা ওখান থেকে লাতেহারের দিকে নয়তো চাতরার দিকে শিকারে যাবো এমনই কথা ছিলো। মায়েদের গাড়ি ছিলো আগে। তারপর ওয়েপন ক্যারিয়ার। তারও পরে বাবাদের গাড়ি।

ওয়েপন ক্যারিয়ার ঘুরে ঘুরে ঘাটে উঠছে। সন্ধে হয় হয়। পশ্চিমাকাশে তখনও গোলাপি আর লাল আলোর আভা আছে স্পষ্ট। তবু পাহাড়ী ও দুর্গম পথ বলে গাড়ির হেডলাইট জ্বেলে দিয়েছে ড্রাইভার। সামনেই একটি বাঁক এবং তার ডানদিকে উঁচু পাড়। বেশ খানিকটা খোলা জায়গা সেখানে গভীর জঙ্গল আরম্ভ হবার আগে। সেই পাহাড়ি পথ থেকে ফিট ছয়েক উঁচু হবে। দূর থেকে দেখি ঐ ফাঁকা জায়গাটিতে একটি শিয়াল বসে আছে। এবং শিয়ালটার ঠিক বিপরীতে মায়েদের গাড়িটা থেমে আছে। আমাদের ওয়েপন ক্যারিয়ার যতই এগোতে থাকলো ততই শিয়ালটা বড়ো হতে হতে ক্রমশ একটি প্রকাণ্ড বড় রয়াল বেঙ্গল টাইগার হয়ে গেলো।

শিয়াল তো বাঘ হলো, এখন করণীয় কি ? আমার বয়স তখন বারো-তেরো। সেটা কোনো কথা নয়। কথাটা হচ্ছে আমি তখনও খরগোসমারা শিকারি। পিতৃ আজ্ঞা ছাড়া অন্য কোনো জানোয়ারের প্রতিই আমার বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য প্রদর্শন মানা।

বাঘ দেখে তো খিদমদগার দুজন "বাবাগো" বলে ওয়েপন ক্যারিয়ারের বেঞ্চের তলায় ঢুকে গেলো। বীরপুঙ্গব আমি একা। প্রায়খোলা ওয়েপন ক্যারিয়ারের বেঞ্চে বসে আকুল নয়নে বাঘ-শোভা দর্শন করছি। তখন টোড়ির ঘাটের পথের পাশে বাঁধানো দেওয়াল ছিলো না। ড্রাইভার ওয়েপন ক্যারিয়ার প্রায় খাদে ফেলে আর কী ! থর থর করে তার পা কাঁপছে।

BanglaBook.org

ছোটকাকা তাকে ধমকে-ধামকে হ্যান্ড ব্রেক টেনে দিলেন গাড়ির

ওদিকে মায়েদের গাড়িতে কম কাণ্ড হচ্ছিলো না। ড্রাইভারের নাম ছিলো গিরিশ তার ইয়াইয়া দুটি গোঁফ। সেও শিকারি। সে কেবলি বলে, সাহেবরা কি করছেন ? এমন বাঘ হাতছাড়া হবে ? বলেই সে যেই দরজা খুলে সাহেবদের গাড়ির দিকে যেতে চাইছে অমনি মা তার গোঁফ ধরে আটকাচ্ছেন। মায়ের কোলে সুকুমারকাকুর (বিখ্যাত আয়কর আইন বিশারদ সুকুমার ভট্টাচার্য) শিশুপুত্র শায়িত ছিলো। সুকুমার কাকুর স্ত্রী মার পাশে বসা। সুকুমারকাকু ছিলেন বাবাদের গাড়িতে। এদিকে উত্তেজনাতে মার কোল থেকে কখন যে শিশু পায়ের কাছে পড়ে গেছে কারোই খেয়াল হয়নি। সুকুমার-কাকিমা কেবলই পেছনের কাচ দিয়ে চাইছেন আর বলছেন মাকে : ও দিদি ! সে কোথায় গেলো ? সে ? কিন্তু তখন হিজ-হিজ-হুজ-হুজ ব্যাপার। অন্যের "সে" কোথায় গেলো সে খোঁজ নেবার সময় আছে কার ?

এদিকে বাবাদের গাড়িও এসে আমাদের ওয়েপন ক্যারিয়ারের একটু পেছনে দাঁড়িয়েছে। অর্জুনবাবু স্টিয়ারিং-এ। বাবা অসীম সাহস দেখিয়ে বাঘের সাত হাতের মধ্যে গাড়ির দরজা খুলে নেমে এসে আমাকে বললেন, আমার রাইফেলটা দে। গুলি দে। ঠাণ্ডা মাথায় আমি রাইফেল এবং বন্দুকও বাবাকে দিলাম। গুলিও। বাবা ঐ গাড়ির আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে নিশানা নিলেন রাইফেল তুলে বন্দুকটা গাড়ির মধ্যে চালান করে দিয়ে। ট্রিগার টানতে যাবেন এমন সময় অর্জুনবাবুর পা ব্রেক থেকে আলগা হয়ে যেতেই গাড়ি গড়িয়ে গেলো সামনে। আমার বাঘসদৃশ বাবা এবং সত্যি বাঘ তখন মুখোমুখি। আড়াল সরে যেতেই বাবা গুলি করার দুঃসাহস বর্জন করে দৌড়ে এসে গাড়ির আড়ালে দাঁড়ালেন। বাঘ শরতের স্বাস্থ্যকর হাওয়া খাওয়ার বাসনা তখনকার মতো পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। ওরে বাবা ! কত বড়ো বাঘ ! তারপর তার সামনে অনুষ্ঠিত নানা প্রকার ক্রিয়াকাণ্ড ও নারী পুরুষের সম্মিলিত চাপা আওয়াজে ভ্যাবাচাকা খেয়ে বাড়ি ফেরা মনস্থ করে হাঁটতে শুরু করলো অন্যদিকে। আর তখন তর সইতে না পেরে অর্জুনবাবু বাঁ কাঁধে বন্দুকের কুঁদো ঠেকিয়ে স্টিয়ারিংএ বসেই অপসৃয়মান বাঘের উদ্দেশে গুলি দেগে দিলেন গদ্দাম্ করে। বাঘের সঙ্গে গুলির কোনো সংযোগ হলো না। বাঘ নেমে গেল অস্তাচলে এবং যেখানে বাঘ অস্তমিত হলো ঠিক সেইখানেই উদিত হলো নির্মল শরতাকাশ আলো করে অষ্টমীর চাঁদ।

বাঘ যে চলে গেছে এবং তার যে প্রত্যাবর্তনের আশু সম্ভাবনা নেই সে বিষয়ে নিশ্চিত হতেই গুলির বদলে কথা চলতে লাগলো। ততক্ষণে গিরিশের ডানদিকের গোঁফের আর্দ্ধেক চুল মার মুঠোতে। পায়ের কাছে অযতনে ফেলে রাখা সুকুমারকাকুর প্রথম বংশধর (যে এখন নিজেও বাবা) ককিয়ে কেঁদে উঠলো। এতক্ষণ সেই কনসিডারেট শিশু তার গর্ভধারিণী এবং আমার মায়ের অবস্থা দেখে টুঁ শব্দটিও করেনি।

বাঘ চলে যেতেই বাবা, অর্জুনবাবু এবং সঙ্গীসাথীরা কি করলে বাঘ নির্ঘাৎ মরতো তার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনায় মুখর হলেন এবং মা তাঁদের সকলকেই 'বে-আক্কেলের দল' বলে সমানে কটূক্তি করে চললেন।

ততক্ষণে সন্ধের অন্ধকার নেমে এসেছে। বাবা বললেন, মহিলা-সঙ্গে কখনও শিকার হয় ? মা বললেন, কত বড় শিকারি সব দেখা হয়েছে। আমাদের গিরিশের কাছে একটা বন্দুক থাকলে পাঁচবার বাঘ মেরে দিতো গিরিশ। এতো এতো প্রশস্তিতেও আধখানা গোঁফহীন গিরিশ প্রসন্ন হলো না। যন্ত্রণাও তার কম হচ্ছিলো না।

কোন শিকারীর হাত কত ভালো সেটা বড় কথা নয়। শিকারে আসল ব্যাপার হলো

স্নায়ু, অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। সেইটে গড়ে উঠতে সময় লাগে। এবং বাঘ মারতে হাত যত না ভালো লাগে তার চেয়ে অনেক বেশি লাগে ঠাণ্ডা মাথা ও সাহস। পরবর্তী জীবনে একথা বহুবার জেনেছি বড় বাঘের মুখোমুখি হয়ে।

টোড়িতে পুজো দেখার পর মহিলামহলের প্রচণ্ড আপত্তিতে শিকার-যাত্রা বাতিল করে আমরা রাঁচীতে ফিরে এলাম 'গোন্ডা হাউসে' এবং বাঘের উপর রাগের ঝাল খাদ্যদ্রব্যের উপর হামলে পড়ে পূরণ করা হলো।

অফিসে পোস্টিং চেকিং করছি এমন সময় বাবা ডাকলেন। বাবার চেম্বারে এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন। গ্রাম্য চেহারা। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। পান খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলো কালাপাত্তি জর্দাতে একেবারে খয়েরি হয়ে গেছে। টুইলের সাদা ফুলশার্ট গায়ে। কলার তোলা। ফুল শার্টের হাতের বোতাম খোলা। নিম্নাঙ্গে ধুতি। পায়ে কালো চামড়ার পাম্পশু। একটি রুমাল বুক পকেটে। গোল করে বলের মতন পাকানো। হাতে ক্যাপস্টান সিগারেটের প্যাকেট।

বাবা বললেন, ওঁর নাম মুকুন্দ লাল বিশ্বাস। ডালটনগঞ্জের বাঁশ ও কাঠের কন্ট্রাক্টর। পালাম্যুরে বেশির ভাগ জঙ্গলেই ওর কাজ। এবার ইয়ার-এন্ডিং-এর পর এপ্রিলের গোড়াতে ওঁর কাছে শিকারে যাব আমরা।

পালাম্যুর নাম শুনেই বুক নেচে উঠলো। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "পালাম্যু"। এম· এল বিশ্বাস কোম্পানির অডিটর এবং ট্যাক্স-কনসালট্যান্ট নিযুক্ত হলাম আমরা।

একত্রিশে মার্চ শেষ হতেই এক রাতে বাবা, দুর্গাকাকু (শিলিগুড়ির দুর্গা রায়) ছোটকাকু এবং আমি দুন এক্সপ্রেসের একটি ফারস্ট ক্লাস ফোর বার্থ কম্পার্টমেন্টে ডালটনগঞ্জের উদ্দেশে চেপে পড়লাম। রাতে গোমো স্টেশনে সেই বগিটি কেটে বারকাকানার গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দিলো। তখন আমরা গভীর ঘুমে। ভোর হলো গুমিয়া স্টেশনে (গোমিয়া, ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভ এর কারখানা যেখানে)। তারপর নয়নভুলানো পথ দিয়ে ছুটে চললো ট্রেন বারকাকানার দিকে। বারকাকানাতে ঐ বগি ত্যাগ করে চোপান এক্সপ্রেসের বগির ফারস্ট ক্লাসের একটি কম্পার্টমেন্টে ওঠা হলো। ওখানেই প্রাতরাশ সেরে নেওয়া হলো। বারকাকানার পর জঙ্গল পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যখন ট্রেন চলতে লাগলো তখন দুপাশের মুগ্ধকরা দৃশ্যর মতো দৃশ্য যা দেখলাম, তা বড় বেশি দেখিনি। আর স্টেশনের কী আশ্চর্য সব নাম! দুপাশে বসন্তের বনে বনে কচি কলাপাতা আর সিঁদুরের আর কালোর হোরিখেলা। পত্রাতু, খিলাড়ি, ম্যাকলাস্কিগঞ্জ, মহুয়া মিলন, টোড়ি, হেহেগাড়া, রিচুঘুটা চৈটর, কুমান্ডি, চিপাদোহের সব পেরিয়ে এসে ভরদুপুরে পৌঁছলাম ডালটনগঞ্জ স্টেশনে।

মুকুন্দবাবু নিজে নিতে এসেছিলেন। তাঁর ফোর্ড কনসাল গাড়ি নিয়ে। আমাদের নিয়ে ওঠালেন তাঁর নয়াটোলির খাপরার চালের বাড়িতে। স্টেশনের কাছেই। ভদ্রলোকের বাইরের আড়ম্বর বেশি ছিলো না কিন্তু হৃদয় ছিলো সমুদ্রের মতো। নিজে কোনোদিনও থার্ড ক্লাস ছাড়া অন্য ক্লাসে যাতায়াত করতেন না এবং রাঁচী হয়েও কলকাতা আসতেন না। বরাবর ঐ জঙ্গলের লাইনের ট্রেনেই যাতায়াত ছিলো তাঁর। ডালটনগঞ্জী কেক্‌রো-মেক্‌রো ভাষায় কথা বলতেন। মনে হতো যেন চিরদিন ওখানেই কাটিয়েছেন। ওঁর দু'ভাই ছিলেন ডাক্তার। একজন মেজোভাই আমাদের মেজোকাকা ছিলেন চিপাদোহরের সরকারি

ডাক্তার। চিপাদোহরের সবচেয়ে বেশি রোগী ছিলো সিফিলিস আর গনোরিয়ার। ছোটকাকাও ডাক্তার অন্যত্র চাকরি করতেন। সেজকাকাও ছিলেন জঙ্গলের ঠিকাদার। তবে তিনি কাজ করতেন মুখ্যত ওড়িশায়। তাঁর অতিথি হয়েও একবার ওড়িশার বাঘরাতে শিকারে গেছিলাম সেকথা অন্যত্র বলব

অ্যান্ড্রু ইউল কোম্পানির সাবসিডিয়ারি কোম্পানি ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প লিমিটেড (আই· পি· পি·) যার বর্তমান চেয়ারম্যান জ্যোতি বসুর ভায়রাভাই জয়ন্ত রায়, বাঁশের ঠিকাদারী দিয়েছিলেন এম. এল বিশ্বাস কোম্পানিকে। পালামুর জঙ্গল থেকে লক্ষ লক্ষ বাঁশ ওয়াগনের "রেক" এর পর রেক-এ বোঝাই হয়ে চলে আসতো কলকাতায়, টিটাগড়ের কাগজ কলে। কোম্পানি ভালো অ্যাডভান্সও দিতেন তাই ঐ কাজে নিজের ক্যাপিটালও বেশি লাগতো না। কিন্তু বর্ষা নামার আগেই কোম্পানির চাহিদা মিটিয়ে দিয়ে সময়মতো বাঁশ "রেক"এ লাদাই করে চালান দেওয়ার দায়িত্ব ছিলো কোম্পানির। দুর্গম অরণ্যের বিভিন্ন ব্লকে বাঁশ কেটে তা ট্রাকে ঢোলাই করে বিভিন্ন রেল স্টেশনের ইয়ার্ডে গাদা দিয়ে রাখা হতো। জঙ্গলের কাজ তিরিশে জুন থেকে তিরিশে সেপ্টেম্বর অবধি বন্ধ থাকে। তিরিশে জুনের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে হতো। আবার নভেম্বরে বা অক্টোবরের শেষে মহাধুমধামে কালীপুজো করে কাজ আরম্ভ করতেন ওঁরা। মুকুন্দবাবুর সমস্ত পরিবারই খুব কালীভক্ত ছিলেন। আজও ওঁদের প্রত্যেকটি মার্সিডিস ট্রাকের মাথাতে মাকালীর ছবি থাকে। আমরা যখন প্রথমবার যাই, তখন মুকুন্দবাবুর বড় ছেলে মোহন চোদ্দ পনেরো বছরের ছিলো। মুকুন্দবাবুর মৃত্যুর পর মোহন (আর কে বিশ্বাস) বাবার ব্যবসাকে অনেক বড় করেছিলো। অগণ্য ট্রাক এবং কুড়ি পঁচিশটি প্রাইভেট গাড়ি এবং গোটা দশেক জিপ ছিলো মোহনের। বেশিই ছিলো এয়ারকন্ডিশানড আর তেমনই ছিলো গাড়ির যত্ন। প্রতিটি গাড়িই শো-রুম কন্ডিশানে থাকতো। পঞ্চাশ মাইল ঘুরে এলেই সার্ভিস হতো গাড়ি। নতুন করে পালিশ হতো। পরে মোহনের নাম হয়ে গেছিলো "দ্য প্রিন্স অফ পালামু"। মোহনের আতিথ্য গ্রহণ করেননি এমন গণ্যমান্য লোক কলকাতায় কমই আছেন। সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু করে কে নন? অরূপ ও রুমা গুহঠাকুরতাকে (আমার সম্বন্ধী ও তাঁর স্ত্রী) তাঁদের পঞ্চশর ছবির শ্যুটিং-এর সময় আমিই মোহনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে মোহনকে সবরকম সহযোগিতা করতে বলি। রুমা বৌদির সূত্রেই সত্যজিৎ রায় (রুমা বৌদির মামা) মোহনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন 'অরণ্যে দিনরাত্রি' শুটিংয়ের জন্যে। সত্যজিৎ রায়ও মদ খান না মোহনও নয়, কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন পড়ে "অরণ্যের দিনরাত্রির" শ্যুটিং চলাকালীন। মোহন ওর চিপাদোহরের ডেরায় সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে যে পার্টি দিয়েছিলো, তাতে যে কত কেস স্কচ হুইস্কি উড়েছিলো তার হিসাব কেউ রাখেনি। বিনা স্বার্থে, বিনা অনুরোধে অন্যের জন্যে এমন করে করার মতো কোনো মানুষ আর আমি দেখিনি। আতিথেয়তারই আরেক নাম মোহন বিশ্বাস।

আবার মুকুন্দবাবুর কথাতেই ফিরে আসি।

সেই আমাদের প্রথমবার পালামু ভ্রমণ। তাই মুকুন্দবাবু আয়োজনের ত্রুটি করেননি। মুন্ডু বাংলোতে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। তখন মুন্ডু বাংলোও (বেতলা ও ফৈড় এর মধ্যে) যথেষ্ট দুর্গম ছিলো। আদিবাসী বাবুর্চি "জুম্মন"কে আগেই রসদ-টসদ দিয়ে পাঠানো হয়েছে ট্রাকে করে আমদের দেখভাল-এর জন্যে। সঙ্গে তার দুজন খিদমদগার। তা ছাড়া চৌকিদার ও তার সঙ্গীসাথীরা তো ছিলই।

জুম্মনের রান্নার কোনো জবাব নেই। 'কোয়েলের কাছে' উপন্যাসে সে স্বনামে আছে—

মোহনের আমলে ওদের বাড়িতে একজন রাঁধুনি ছিলো সে থেকে গেছে আমার আর একটি উপন্যাসে 'লাল্টু পান্ডে' হয়ে। এমন কত মানুষই যে কাছে এসেছে তাদের সুখ দুঃখ ক্রোধ ভালোবাসা নিয়ে যে, তা বলার নয়। শিকারের শখ না থাকলে তো এমন এমন সব মানুষের কাছাকাছি আসার সুযোগও হতো না

প্রথমবারের শিকার যাত্রা সম্বন্ধে তেমন কিছু বলার নেই। হাঁকোয়া করে শিকার হয়েছে। চিতল, শম্বর শুয়োর এবং ভাল্লুকও শিকার হয়েছিলো সেবারে। কিন্তু বলার আছে দ্বিতীয়বারের শিকারযাত্রা সম্বন্ধে। সেবারও এপ্রিলের গোড়াতে বা মার্চের শেষে গেছিলাম। ঠিক মনে নেই। ঐ একই দল। সেবার মুকুন্দবাবু আমাদের রেখেছিলেন কুমান্ডি বাংলোতে। পরে অগণ্যবার মোহনের অতিথি হয়ে ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন জঙ্গলে গিয়ে থেকেছি, বিভিন্ন বাংলোতে। কিন্তু কুমান্ডিই "কোয়েলের কাছে"তে কুমান্ডি হয়ে থেকে গেছে। যদিও ভৌগোলিক বিবরণ মিলবে না। কারণ কুমান্ডি কাল্পনিক স্থান।

যেবার কুমান্ডি বাংলোতে ওঠা হয়েছিলো, শিকার হয়েছিলো কুমান্ডি ব্লক-এ, সেবারের ঘটনা বলি। মুকুন্দবাবুর বিশেষ কাজ থাকাতে ওঁকে দুদিনের জন্যে পাটনা যেতে হয়েছিলো আমরা পৌঁছবার পরেই। মুকুন্দবাবুর নয়াটোলির প্রতিবেশী মালদেওবাবুকে (মালদেও পান্ডে) আমাদের দেখাশোনার ভার দিয়েছিলেন উনি। মালদেওবাবু হৃষ্টপুষ্ট মানুষ। ধুতি ও দেহাতি খদ্দরের পাঞ্জাবি পরনে। বিহার বা উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেসের নেতার মতো চেহারা। মোষের মোটা চামড়ার নাগড়া পায়ে দিয়ে কটাং কটাং আওয়াজ করে হাঁটতেন।

উনি অধীর আগ্রহী আমাকে বললেন, "কই ফিক্কর নেহি। ইয়ে হামারা রাজ হায়। যো দিল চাহ্‌তা হ্যায় ওহি ধড়কা দিজিয়ে।

যো দিল চাহ্‌তা হ্যায় ?

জী হাঁ। যো দিল চাহতা হ্যায়। ইয়ে জঙ্গল জানোয়ার সে ভরা হুয়া হ্যায়।

প্রথম দিনের হাঁকোয়াতে এক জোড়া ঘুঘু বেরোলো শুধু। অথচ মাচা বাঁধা হয়েছিল জাঁকজমক সহকারে। প্রায় পঞ্চাশজন হাঁকোয়া করামওয়ালাও জোগাড় হয়েছিলো। তবে যারাই হাঁকোয়া বা বীটিং শিকার সম্বন্ধে জানেন তারাই জানেন যে শিকারে কোনো গ্যারান্টি নেই। কখনও কখনও গভর্নরের "শুট"এও ঐরকম "পান্ডুকই" বেরোয়। তাই প্রথম দিনের ব্যর্থতার দুঃখ জুম্মনের রাঁধা পোলাও মাংস খেয়ে ভোলা গেল।

পরদিন সকালবেলার বীটিং-এ হাতির দল বেরিয়ে পড়লো। এদিকে আমরা বসে আছি ন-দশ ফিট উঁচু মাচাতে। মালদেওবাবুর "ইয়ে হামারা রাজ হ্যায়" বলা সত্ত্বেও হাতি তো আর মারা যায় না। মারলে জেলে যেতে হতো। ভয়ে ভয়ে চোরের মতো মুখ করে বসে রইলাম। আমাদের প্রত্যেকের মাচার দুপাশ দিয়ে বৃংহণ করতে করতে শুঁড় পাকাতে পাকাতে হাতিরা জার্মান জেনারেল রোমেলের এক ডিভিশন ট্যাঙ্কের মতো চলে গেলো। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

সবচেয়ে বেশি রাগ হলো ছোটকাকুর। ছোটকাকু অ্যামেরিকানদের মতো ট্রিগার-হ্যাপি। শিকারে বেশি আসতে পারতেন না বলে যখন পারতেন তখন সর্বক্ষণই ট্রিগার টানার ধান্দাতে থাকতেন। এদিকে দুদিন হয়ে গেল একটিও গুলি হলো না।

বাবা বললেন এ যাত্রা আর কপালে শিকারের মাংস খাওয়া নেই। পট-হান্টিং ও মুরগী-তিতির-কোটরা মারা হবে ভেবে মুকুন্দবাবুকে সঙ্গে বেশি মুরগী দেওয়া থেকে নিরস্ত করেছিলেন। তাছাড়া প্রয়োজনে পাঁঠা, মুরগী গ্রাম থেকেই সংগ্রহ করা যাবে। সেদিন বাবা জুম্মানকে বললেন একটা পাঁঠা জোগাড় করো। আজও যদি শিকার না হয় তবে কাল সেই

BanglaBook.org

পাঁঠাকে কাটবে। বাংলোর চৌকিদার এবং সন্যান্যরা এবং ফরেস্ট গার্ডরাও সকলে খাবে। তোমাদের সকলের সঙ্গে আমরাও খাবো। সেদিন হাকোয়া শুরু হলো। আমি যে গাছে বসেছিলাম তার ডান পাশ থেকে একটি গেম-ট্র্যাক এসে মাচার সামনে দিয়ে গিয়ে সামনের পাহাড়ে উঠে গেছিল। মাচা থেকে হাত পাঁচেক দূরে ডানদিকে একটি মোটা করম গাছের কাছে এসে দুভাগ হয়ে এক ভাগ মাচার পেছনে দিয়ে সমান্তরালে কিছুটা গিয়ে পেছনের গভীর জঙ্গলে মিশে গেছিলো।

আমার ডানদিকে দোনলা বন্দুক। বত্রিশ-ইঞ্চি গ্রীনার। বাঁদিকে থ্রী-সিকসটি-সিক্স রাইফেল। প্রয়োজন মতো তুলে নিয়ে মারব। হাঁকোয়াওয়ালাদের আওয়াজ ক্রমশ জোর হতে লাগলো। কিন্তু গত কদিনের অভিজ্ঞতাতে আমরা সকলেই মনে মনে ধরে নিয়েছিলাম যে, কোনো দৈব-দুর্বিপাকে ওই ব্লকের সব জানোয়ার মাস-ক্যাজুয়াললিভ নিয়ে অন্যত্র বেড়াতে চলে গেছে। কারো সঙ্গেই আমাদের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু শিকারে অসম্ভব বলে যেমন কিছু নেই অপ্রত্যাশিত বলেও কিছু নেই

হাঁকোয়া প্রায় শেষ হয়ে আসছে। বীটাররা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে আসছে। দূর থেকে যা সমবেত কণ্ঠের আওয়াজ মাত্র বলে মনে হয়, কাছে আসতে তাই স্পষ্ট কথোপকথন হয়ে উঠছে। এখন জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে মাঝেমাঝে বীটারদের পা বা গায়ের একটু একটু দেখাও যাচ্ছে। আমি পাইপটা ধরাতে যাবো বিরক্ত মনে এমন সময় বীটারদের মধ্যে কে যেন হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল শোনচিতোয়া হো! শোনচিতোয়া!

তাড়াতাড়ি পাইপ মাচায় নামিয়ে রাখার সময় প্রকাণ্ড লাফ-মারা উড্ডীন একটি লেপার্ডের এক ঝলক চোখে পড়ল। আরও একটি লাফেই সে আমার মাচার সামনের করম গাছের প্রায় গোড়াতে এসে পড়বে। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার ভাবনা হলো লেপার্ডটি আমার সামনের গেম ট্রাক দিয়ে যাবে না পেছনের গেম ট্রাক দিয়ে? সে কথা লেপার্ড নিজেও হয়তো ঠিক করেনি। সে যদি আমাকে দেখে থাকে অথবা দেখে নাও থাকে তবেও করম গাছের কাছে লাফিয়ে পড়েই হয়তো সে ডিসাইড করবে যে, কোন দিকে যাবে। খুব ভুল হলো আমার বন্দুকটা না নিয়ে রাইফেলটি হাতে তুলে নেওয়ার। অত শর্ট-রেঞ্জে বন্দুক, রাইফেলের চেয়ে অনেকই বেশি এফেক্টিভ। বন্দুকের স্টপিং-পাওয়ার এবং ধাক্কা শর্ট-রেঞ্জে রাইফেলের থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু Slip-second dicision ওরকম ভুল হয়ই। এই জন্যেই বোধ হয় কথায় বলে "It's all in the game"!

রাইফেলটি তুলেই আমি করমগাছের গুঁড়ির মাঝবরাবর লেপার্ডটির উচ্চতার দ্রুত একটি আন্দাজ করে নিয়ে রাইফেল সেই রকম ভাবেই নিশানা করে রইলাম। দরকার মতো ডানদিকে অথবা বাঁদিকে ঘোরাবো।

এতো সব লিখতে লিখতে যত সময় লাগলো তার এক দশমাংশ সময়েরও কম সময়ে সব কিছুই ঘটে গেল। এবং আমাকে চমকে দিয়ে লেপার্ডটা করমগাছের আড়াল থেকে তীরের বেগে বেরিয়েই বাঁদিকের গেম-ট্রাক দিয়ে ধেয়ে যেতেই গাছের কাছেই আমি ট্রিগার টানলাম। লেপার্ড থামলো না। তীর বেগেই চলে গেলো।

গাছ থেকে নেমে দেখি করমগাছের গুঁড়িতে লেপার্ডের মাংসর কিমা এবং লোমসমেত কিছুটা চামড়া লেগে রয়েছে। সকলে মিলে দেখে আঘাত কি ধরনের হতে পারে তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা করার পর দুর্গাকাকু আর আমি ব্লাড-ট্রেইল ফলো করে এগোতে লাগলাম। রক্ত তেমন ছিলো না। গাছের পাতাতে দু এক ফোঁটা। তাও দূরে দূরে। কিছুদূর যেতেই বোঝা গেল যে গুলি শরীর ভেদ করে যায়নি, শুধু চামড়ার গা ঘেঁষেই গেছে। শরীর ভেদ

করে গেলে অনেকই বেশি রক্ত পড়তো ও লেপার্ডও অমন ডোন্ট-কেয়ারে যেতে পারতো না থ্রী-সিক্সটি-সিক্স রাইফেলের নাইন পয়েন্ট থ্রী গুলির চোট বড় কম চোট নয়। বডি-উন্ড হলে লেপার্ডের হরকৎ অন্যরকম হতো।

সামনের পাহাড়টি পুটুস বা ল্যানটানা ঝোপে ভরা ছিলো, যা লেপার্ডের পক্ষে আদর্শ লুকিয়ে থাকার জায়গা। কিন্তু লোভ সামলাতে পারলাম না। মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম যাকে বলে, "উইশফুল থিংকিং" যেগুলি লেপার্ডকে ভালো মতোই আহত করেছে তাই ফলো করে তাকে শেষ করতে পারব। কিন্তু খুব ঝুঁকি নিয়েও যতই পাহাড় চড়তে লাগলাম ততই রক্তর চিহ্ন ফোঁটা ফোঁটা যা আগে গাচ্ছিলাম তাও ক্ষীণ হয়ে ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। দুর্গাকাকু বললেন "ওয়াইল্ড-গুজ চেইজ" করে লাভ নেই। চলো ফিরে যাই। এই খাড়া পাহাড়ে যখন সে অবলীলায় উঠে গেছে তখন তার উপর চোট যে আদৌ মারাত্মক হয়নি, তা বোঝাই যাচ্ছে।

এটিও কোনো গল্প নয়। গল্পটি এর পরে। সেদিন বিকেলে বাবা হাট থেকে যে পুরুষ্টু পাঁঠাটি কিনে জুম্মানের জিম্মাতে দিয়েছিলেন সেটি আগামীকাল কাটা হবে এই ঠিক হয়েছিল। কিন্তু পরদিন সকালে হাঁকোয়া শিকারে বেরুনোর সময় পাঁঠার খোঁজ করে জানা গেল যে রাতে পাঁঠাটি বাবুর্চিখানায় পাশের গারাজে বাঁধা ছিলো কিন্তু সকালে বে-পাত্তা হয়ে গেছে।

তাকে কি লেপার্ড নিল ? না কি হায়নাতে ?

জুম্মান বললো তা নয়। কারণ দড়িটি যেমনটি তেমনই আছে। নিজগুণে সেই বে-পাত্তা হয়েছে। হয় কোনও মানুষে তাকে গায়েব করেছে, নয় কোনক্রমে ফাঁস আলগা করে সে নিজেই বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হয়েছে। মুক্তির কামনা তেমন তীব্র হলে উপায়ের অভাব থাকে না।

বাবা বললেন এবারের যাত্রাটাই অশুভ হয়েছে। তিনদিনের ক্যাম্পে কোনো শিকারই হলো না !

সেদিন মালদেওবাবু বললেন, আজ যেখানে মাচা বাঁধা হয়েছে সেখানে এতো জানোয়ার বেরোবে হাঁকাতে যে মেরে শেষ করা যাবে না। অকুস্থলে পৌঁছে জঙ্গলের চেহারা দেখেও আমাদের মেজাজ শরিফ হয়ে গেলো। সবচেয়ে প্রথম মাচায় দুর্গাকাকু আর মালদেওবাবু উঠবেন। পরের মাচায় আমি। তারপরের মাচায় ছোটকাকু। এবং একেবারে শেষের মাচায় বাবা। প্রতি মাচার মধ্যে পঁচাত্তর গজ মতো ফাঁক। ঐ তিনদিনে একবারও বন্দুকের ঘোড়া দাবাতে না পেরে ছোটকাকুর ধৈয্যের বাঁধ তখন প্রায় ভাঙো ভাঙো। ছোটকাকু বললেন, আজ হাতিই বেরোক কী খরগোস, ছাড়াছাড়ি নেই কোনো।

হাঁকোয়া শুরু হলো। আমরা যেদিকে মুখ করে বসে আছি সেদিকেই একটি পাহাড়। এবং ঐ পাহাড় পেরিয়ে আধমাইল মতো গেলেই যে বাংলোতে আমরা আছি সেই বাংলোটি। হাঁকোয়া আরম্ভ হবার পরই এক ঝুন্ড শম্বর বেরোলো। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে প্রত্যেকটিই মাদী। পাঁচটি ছিলো সব সুদ্ধ। তারা দুর্গাকাকুর মাচার নিচে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে গেলো মাচা অতিক্রম করে।

তার কিছুক্ষণ পর বাবার আর ছোটকাকুর মাচার মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে একটি কোট্‌রা বার্কিং-ডিয়ার ছুটে গেলো। কেউ গুলি করার আগেই সে অদৃশ্য হয়ে গেলো ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে। হাঁকোয়া যখন শেষ হয়ে আসছে তখন ছোটকাকুর মাচা থেকে পরপর দুটি গুলির শব্দ শোনা গেল। আমি খুব খুশি হলাম, ছোটকাকু শেষ পর্যন্ত ঘোড়া দাবতে

BanglaBook.org

পারলেন বলে।

হাঁকোয়া শেষ হলে আমরা সবাই ছোটকাকুর মাচার কাছে হেঁটে গেলাম।

বাবা বললেন, কি মারলি ?

গোমড়া মুখে ছোটকাকু বললেন, জানি না তবে মেরেছি

কি ?

দেখিনি। বলব কি করে ? জঙ্গল নড়ছিলো মেরে দিয়েছি। আর কত ধৈর্য্য ধরবো ?

আমাদের বুক কেঁপে উঠলো ভয়ে। কারণ হাঁকাওয়ালাদের মধ্যে কয়েকজন দশ বারো বছরের কিশোরও ছিলো। মোটা পয়সার লোভে তাদের বাবারা তাদেরও সঙ্গে এনেছিলো। গুলি দুটো হয়েছে হাঁকায়া প্রায় শেষ হয়ে আসার সময়েই। ভাবলাম, তাদের মধ্যে কারোর পদচারণেও তো ঝোপ ঝাড় নড়াচড়া হতে পারে। কি জানোয়ার, তা না দেখে গুলি করার মতো হঠকারিতা আর হয় না। যে উচ্চতায় আলোড়ন দেখেছিলেন বলে উনি বললেন, সেই উচ্চতা কোটরা হরিণ বা চিতল বা লেপার্ড বা বাঘ অথবা ক্ষুদে বীটারেরও হতে পারে। ছোটকাকু গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, যাই এসে থাকুক না কেন, সে গুলি খেয়েই চিৎ-পটাং হয়ে পড়েছে যে, তা ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে আলোড়ন দেখেই বুঝেছি। তাতে আমাদের চিন্তা আরো বেড়ে গেলো। বস্তুটি যে কি, তা নিয়ে সত্যিই দুর্ভাবনা দেখা দিলো সকলেরই। শুধু ছোটকাকু নির্বিকার। বললেন, ও মরেছে নিশ্চয়। একগুলিতেই আমি মারি, যা মারবার। সেকেন্ডটা ওভার সিওর হবার জন্যে মেরেছিলাম। ছোটকাকু তাঁর "শিকার" খুঁজতে যেতে অস্বীকার করলেন। বললেন, সেতো "ডেড অ্যাজ হ্যাম"। খোঁজার আবার কি আছে ?

যাই হোক, আমরা ঝুঁকি নিতে পারলাম না। বাবা আমি আর দুর্গাকাকু অর্ধচন্দ্রাকারে ছোটকাকু যেখানে গুলি করেছেন বলে বলছিলেন সেই দিকে রাইফেল-বন্দুক বাগিয়ে এগোতে লাগলাম। কাছাকাছি গিয়ে সেই কল্পিত শিকার যদি আহত বাঘ বা লেপার্ড হয় এই ভয়ে পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগলাম। তাতেও ঝোপের মধ্যে কোনোরকম প্রাণের স্পন্দন দেখা গেলো না। রুদ্ধশ্বাসে ঝোপের একেবারে কাছে গিয়ে সেফ্‌টিক্যাচে আঙুল ছুঁইয়ে রাইফেলের নল দিয়ে ঝোপ ফাঁক করে যা দেখলাম তাতে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেলো। দেখি, বাবার সওদা-করা পাঁঠাটি বুকে গুলি খেয়ে জিভ-বের করে পড়ে আছে। সত্যিই "অ্যাজ ডেড অ্যাজ হ্যাম"। ছোটকাকু মিথ্যে বলেননি।

বাবা বকলেন ছ্যাঃ ছ্যাঃ। শেষে পাঁঠা শিকার করলি।

ছোটকাকু বললেন, ভালইতো হল। শিকারও হলো। পাঁঠাও খাওয়া হবে।

সেদিন রাতে লুচি মাংস খাওয়া হলো। এদিকে "অ্যাপলজেটিক" মালদেওবাবুও নিজের ইজ্জৎ রক্ষার্থে বললেন, যদিও বে-আইনী হবে, তবু জিপ নিয়ে এক চক্কর ঘুরে আসি। কিছু না কিছু শিকার হবেই। আপনাদের এ তিনদিনে কিছুই মারাতে পারলাম না।

বাবা বললেন মুকুন্দবাবু ডালটনগঞ্জে নেই। কোনো ঝামেলা-টামেলা হবে না তো !

মালদেওবাবু বললেন "ছোড়িয়েতো ! ইয়ে সবহি হামারা রাজ হ্যায়।"

অতএব খাওয়া-দাওয়ার পর স্পটলাইট নিয়ে বেরোনো হলো। বাংলো থেকে বেরুতে না বেরুতেই পথের বাঁদিকের পাহাড়ের ঘন সেগুন জঙ্গলের মধ্যে অনেক জোড়া চোখ জ্বলে উঠলো। চোখগুলির উচ্চতা পরিধি এবং রঙ দেখেই বুঝলাম যে, শম্বর কিন্তু "স্ট্যাগ" না "ডো" তা বোঝা যাচ্ছে না কারণ চোখগুলিই খালি চমকাচ্ছে। একটিরও শরীর বা শিং দেখা যাচ্ছে না। মাদী শম্বরের শিং থাকে না। আমরা কি করব ভাবছি, এমন সময় মালদেওবাবু

BanglaBook.org

বললেন "শোচ্ ক্যা রহা হ্যায় আপ্‌লোগোনে ? মারিয়ে না।"

মর্দ ইয়া মাদীন্ পাত্তাই চল্ নেহি রহা হ্যায়।

বাবা বললেন।

আরে মর্দ মর্দ। ইয়া বড়কা বড়কা শিং নেহি দিখ রহা হ্যায় আপলোগোনে ? অজীব অদমী !

আমাদের যে কি মতিভ্রম হলো উপোসী ছারপোকার মতোই আমরা মালদেওবাবুর কথাতে কামড় বসিয়ে রাইফেল তুলেই দেগে দিলাম। আমি আর বাবা। দে-দনাদন্ ! দে-দনাদন্ ! বাপ মারিস্ ! বেটা মারিস্ ! বেটা মারিস্ ! বাপ মারিস্ !

ধপ্পাধপ্ করে দুটো শম্বর পড়ে গেলো। অন্যরা ভাগলবা দিলো। অথবা ভোগ্‌লা দিলো ! জিপ থেকে নেমে কাছে গিয়ে লজ্জায় এবং আতঙ্কে মরি। দুটিই মাদীন। মাদীন ? ছিঃ ছিঃ।

তখন মালদেওবাবুর মুখ চুন হয়ে গেলো। বললেন, হাই রাম। ই ক্যা বাওয়াল হো গ্যায়া।" আর বাওয়াল্ হো গ্যায়া !

আয়তো আয়, ঠিক সেই সময়েই এক বরাতি-পার্টি হ্যাজাকের পর হ্যাজাক জ্বলিয়ে শিঙে ফুঁকতে ফুঁকতে ধামসা বাজাতে বাজাতে বউ-বরকে নিয়ে উল্টোদিক থেকে এসে হাজির। তাদের মাথার উপরে ধরা হ্যাজাকের আলোতে আমাদের কুকীর্তি গোপন রইলো না। মালদেওবাবু তাদের ধমকে বললেন "আঁখ্ উসতরফ্। আঁখ উসতরফ্।"

কেউ কেউ অন্যদিকে মুখ ঘোরালে বটে কিন্তু অনেকেই ঘোরালো না।

মালদেওবাবু বললেন, "ক্যা দেখা ? বোলো তুমলোগোনে ক্যা দেখা ?

একজন বললো "শম্বর। মাদীন। দোগো বা।"

মালদেওবাবু বললেন, কুছ্ নেহি দেখা। কুছ নেহি দেখা। দিখ্‌নেসে খারাব্ হো যায়েগা !

আর খারাব্ হো যায়েগা

বাবা বললেন, আপনি এখনি জিপ নিয়ে ডালটনগঞ্জে চলে যান মালদেওবাবু। আমাদের দোষ কবুল করা দরকার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে। যা পেনাল্টি লাগে দিতে হবে। অন্যায়টা অন্যায়ই। ভুল করে করা হলেও অন্যায়।

মালদেওবাবু মুখ কাঁচুমাচু করে চলে গেলেন। ঐ রাতে শম্বর দুটিকে আনা সম্ভব ছিলো না অথচ ঐখানে ফেলে রেখে গেলে শিয়ালে আর হায়নাতে খাবে। ভোর হলেই শকুন পড়বে তাদের উপরে। তাই ফরেস্ট গাড়িতে একটা বন্দুক দিয়ে গাছে বসে পাহারা দেবার জন্যে মালদেওবাবুর সঙ্গে জিপে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। মালদেওবাবু ডালটনগঞ্জে যাবার পথে অকুস্থলে গার্ডকে নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

সারা রাত অপরাধবোধে আমাদের ঘুম হলো না। ভোর হতেই চৌকিদার গ্রামের লোকজন সব জড়ো করে শম্বরদুটি বাংলোয় বয়ে নিয়ে আনার জন্যে গেলো। ছোটখাটো ঘোড়ার মতো সাইজের জানোয়ারদের অতখানি পথ বয়ে নিয়ে আসাও চাট্টিখানি কথা নয়।

শম্বরদের নিয়ে যখন ওরা ফিরলো হৈ হৈ করতে করতে তখন আমরা ব্রেক-ফাস্ট করছি। ওদের খুব আনন্দ। কতদিন পরে একটু মাংস খেতে পাবে। প্রোটিন ওরা প্রায় খেতেই পায় না। আইন তো গরিবের উপরেই বেশি করে প্রযোজ্য হয়। বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করে আইনের তামাসা দেখে। তাদের গায়ে আঁচড়টি লাগে না। যেমন আমাদের গায়েও লাগবে না।

BanglaBook.org

দুপুরবেলা যখন আমরা খেতে বসেছি তখন গাল ফোলা-ফোলা মালদেওবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মুকুন্দবাবুও এলেন জিপ নিয়ে। হোঃ হোঃ হোঃ করে হাসতে হাসতে বুক পকেট থেকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটি কাগজ বের করে দেখিয়ে বললেন, এই যে পেনাল্টির রসিদ। আপনাদের কোনো "কিন্তু, কিন্তু" করার দরকার নেই। যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। ইচ্ছা করে তো আর করেননি!

দুর্গাকাকু মালদেওবাবুকে নকল করে বললেন, ইচ্ছা করে করবো কেন? চাইলে তো আজ সকালেই মারতে পারতাম। রাতে যে সব বাওয়াল হয়ে গেলো।

বেচারি মালদেওবাবু অপরাধীর মতো মুখ করে বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাবা বললেন, আসুন। আসুন। খেতে বসুন।

মালদেওবাবু বললেন "ভুখ্ নেহি হ্যায় বিলকুল।"

ডালটনগঞ্জে এবং পালামুর জঙ্গলে তারপরে কম করে প্রায় একশোবার গেছি গত তিরিশ বছরে। তারমধ্যে শিকারে কয়েকবার। তারপরে শুধুই বেড়াতে। কিন্তু প্রথম দিকের ঘটনা বা দুর্ঘটনাগুলিই যেন মনে গেঁথে আছে।

তখন অ্যান্ড্রুইউলের আই·পি·পির সাহেবদের মধ্যে একজন ছিলেন বব্ রাইট। তাঁর স্ত্রী ছিলেন অ্যান্ রাইট। বব্ এবং অ্যান প্রতিবছরই শীত-গ্রীষ্মে মুকুন্দবাবুর এবং পরে তাঁর অবর্তমানে মোহনদের অতিথি হয়ে শিকারে আসতেন। একবার অ্যান্ রাইট কে দেখেছিলাম ওঁর এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বন্ধু জন-এর সঙ্গে গরমের সময়ে শিকারে যেতে, কেস-কেস হুইস্কী আর জিন্ নিয়ে। অ্যান্ রাইটই এখন ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ডের একজন হর্তাকর্তা।

অনেক বছর বাংলোর পাশে ক্যারাভান ও তাঁবু খাটিয়ে উনি বিদেশী ট্যুরিস্টদের জানোয়ার দেখিয়ে পয়সা রোজগার করতেন। তিন-চার বছর আগে মধ্যপ্রদেশের কান্হা ন্যাশনাল পার্কেও দেখেছি যে, অ্যান্ রাইট ঐ রকম ক্যাম্প করে বিদেশীদের জানোয়ার দেখাচ্ছেন।

বব্ রাইট এখন টালীগঞ্জ ক্লাবের রেসিডেন্ট ডিরেক্টর। মৃণাল সেনের 'মৃগয়া' ছবিতে বব্ রাইট অভিনয়ও করেছিলেন।

পালামুর বনে-পাহাড়ে যে কত ঘুরেছি আর শিকার করেছি, তা বলার নয়। কেচ্কী, বেতলা, মুণ্ডু, কেঁড়, গাড়ু, কুমান্ডি লাত্, মারুমার, রুদ এবং কুট্কু। কত বাংলোয় যে থেকেছি বিভিন্ন সময়ে। বারোয়াডি, হুটার, কুজরুম, মহুয়াডার, সইদূপ্ ঘাট, রাংকা, মীর্চাইয়া ফলস্ আর হুলুক পাহাড়। পালামু আজও আমাকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। সময় করতে পারলে আজও যাই। তবে এখন জীবনে অনেক কিছুই আছে শুধু সময়েরই বড় অভাব।

ইদানীং স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে আসছে বলে মনে হয়। জায়গার নাম, মানুষের মুখ আর তেমন স্পষ্ট মনে পড়ে না। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে আসছে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে। তাই এখনই এই সব পুরোনো কথা লিখে ফেলার সময়। এর পরে স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

আগেও বলেছি যে, শিকার আমার কাছে চিরদিনই এক বাহানামাত্রই ছিলো। শিকারী বলে পরিচিতও হতে চাইনি কখনও। তবে শিকার ও শিকারীদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে অনেকই ভ্রান্ত ধারণা আছে। খারাপ এবং ভালো, সে ধারণা যাই হোক না কেন এ কথা ঠিক যে শিকারীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রত্যন্ত প্রদেশের গ্রাম ও বনের মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখ সম্বন্ধে যেমন ফারস্ট-হ্যান্ড-অভিজ্ঞতার

BanglaBook.org

সম্মুখীন হন, তেমন খুব কম সোশ্যাল-ওয়ার্কার বা পলিটিকাল-ওয়ার্কারই হন। তবে দেশের মানুষের সুখ দুঃখকে ছুঁতে হলে একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল মন থাকা চাই নরম দুটি চোখ। নইলে, শিকারীর কথায় এবং লেখায় শুধুই তার শৌর্যবীর্যর দম্ভ, তার বৈভবের বর্ণনা এবং তার চারপাশের মানুষ এবং জানোয়ারও যে তার তুলনাতে অতি তুচ্ছ এই কথাই ফুটে ওঠে। এবং তা ফুটে উঠলে পাঠককে তা পীড়িত করে এবং যাদের কথা পাঠকদের কাছে লেখকের পৌঁছে দেওয়ার কথা তাদের কথা পৌঁছনো আর হয়ে ওঠে না।

দেশে ও বিদেশে অনেক বিত্তবান এবং রাজা মহারাজার আতিথ্যও গ্রহণ করেছি কিন্তু মোহনের মতো অতিথিপরায়ণতা, আবারও বলবো নিঃস্বার্থ অতিথিপরায়ণতা, বড় কমই দেখেছি। মুকুন্দবাবুর আকস্মিক মৃত্যুর পর মোহন সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় করিয়ে দিতো। 'বড়ে ভাইয়া' বলে। 'বড়ে ভাইয়ার' মর্যাদা ও চিরদিনই দিয়ে এসেছে আমাকে।

একবার আমার প্রায় জনা ছয়েক বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পনেরোই অগাস্টের ছুটির সঙ্গে আরও কয়েকদিন ছুটি যোগ করে নিয়ে বেতলা যাবো ঠিক করলাম। মাত্র কয়েক বছর আগের কথা। মোহনের কলকাতার যে ম্যানেজার তিনি আমতা আমতা করে বললেন একটা ব্রিজ ভেঙে গেছে তবে···ঠিক আছে। আমি খবর পাঠাচ্ছি।

রাঁচী-এক্সপ্রেসে রাঁচী পৌঁছে সাউথ-ইস্টার্ন রেলের হোটেলে আমরা উঠে চানটান করে ব্রেকফাস্ট করলাম। সঙ্গে তিন জন মহিলাও ছিলেন। এবং তাঁরা কোনোরকম কষ্টই সহ্য করতে পারেন না। বড়লোকের স্ত্রী ও মেয়ে। সঙ্গে মালপত্রও কম ছিলো না। কারণ, ঠিক ছিলো বেতলা থেকে ফিরে আমরা ম্যাকলাস্কিগঞ্জে আমার পর্ণ-কুটির "দ্যা টপিং-হাউসে" দিন দুই থেকে আসব। ওঁরা ম্যাকলাস্কিগঞ্জ জায়গাটা কখনও দেখেননি। সে কারণে সঙ্গে নানাবিধ খাদ্য-পানীয়র সমন্বয়ও ঘটেছিলো ভালোই।

মোহন তিনখানি গাড়ি পাঠিয়েছিলো সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে হোটেলে। আমরা তো ব্রেকফাস্ট খেয়ে গাড়িতে উঠলাম। ম্যানেজার ঘরভাড়া ও ব্রেকফাস্টের পয়সাও নিলেন না। বললেন, মোহনবাবু দেবেন। আমার উপর খুব রাগ করবেন নিলে। আমার ওপর আপনার ব্যাপারে স্ট্যান্ডিং-ইনস্ট্রাকশন আছে।

কুরু হয়ে, টোড়ির ঘাট হয়ে (যে ঘাটে, আমার মা গিরিশের গোঁফ ছিঁড়েছিলেন) টোড়ি থেকে বাঁয়ে বেঁকে আমরা লাতেহারের পথ ধরলাম। লাতেহারের পণ্ডিতের দোকানে গোলাপজামুন আর নিমকি খেয়ে আবার চলা শুরু। এই গোলাপজামুন আর নিমকি পালাম্যুর লাতেহার, আর হাজারীবাগ জেলার টাটিঝারিয়া (বগোদর আর হাজারীবাগের মধ্যে) এবং চাতরায় যেমনটি স্বাদের তেমনটি বড় বেশি জায়গায় খাইনি।

সাতবারোঁয়ার কাছে এসে প্রথম আক্কেল হলো যে কী প্রকার বে-আক্কেলে কাজ করেছি এই অসময়ে এত জন অতিথি সঙ্গে করে মোহনের উপরে অত্যাচার করতে এসে।

সাতবাঁরোয়ার ব্রিজ সেবারের বন্যায় জলের তোড়ে ভেসে গেছে। আমাদের তিনখানি গাড়িই এদিকে দাঁড়িয়ে রইলো। আমরা নেমে হেঁটে ডাইভার্সন পেরিয়ে নদীটি পেরোলাম। ডালটনগঞ্জ থেকে পাঠানো পাহাড়ী নদীতে জল নেই। শুধু বালি। ব্রিজ মেরামত হচ্ছে। আমাদের সব মালপত্র ডালটনগঞ্জ থেকে পাঠানো মোহনের লোকজনেই বয়ে নিয়ে এসে অন্য পাড়ে দাঁড়িয়ে-থাকা তিনখানি গাড়িতে তুলে নিয়ে সেলাম করে আমাদের বসিয়ে নিয়ে গেল বেতলাতে।

মোহনের কলকাতার ম্যানেজার যে কেন আমতা আমতা করেছিলো তা তখন বুঝলাম। তখন যদি ব্যাপারটা আসলে কী, তা জানতাম তাহলে পরে এরকম বিব্রত বোধ করতাম

BanglaBook.org

না।

টুরিস্টলজ-এর তিনটি কামরাই আমার অতিথিদের জন্যে বুক করা ছিলো। আর আমার জন্যে কেঁড়-এর বাংলো। মোহন জানতো যে, টুরিস্টলজ-এর কিছুটা কৃত্রিম পরিবেশের চেয়ে বন-বাংলোর পরিবেশই আমি বেশি পছন্দ করি। যদিও বন-বাংলোর অধিকাংশেতেই এখনও ইলেকট্রিসিটি নেই যাই হোক মোহন যখন দেখা করতে এলো আমার সঙ্গে কেঁড় বাংলোতে, মোহনকে বললাম, তুমি এতো অসুবিধে করে বন্দোবস্ত করলে কেন ? এই যে ব্যাপার তা জানালেই তো হতো ! এতো ঝামেলা কেউ করে ? আমি কি অবুঝ ?

মোহন বললো, এটা কোনো ব্যাপারই নয় লালাদা ! আপনি আসতে চেয়েছেন আর আমি ওই সামান্য অসুবিধের জন্যে বলব যে আসবেন না ?

যতবার পালাম্যুতে গেছি ততবারই যাতায়াতের ভাড়া থেকে (ফার্স্ট ক্লাস এসি অথবা প্লেনে, যবে থেকে প্লেন যাচ্ছে রাঁচীতে) এয়ারকন্ডিশনড গাড়ি, জঙ্গলের মধ্যে আমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে একটি জিপ থেকে খাদ্য এবং পানীয়র জন্যে আমার কোনোদিনও একটি পয়সাও খরচ করার সুযোগ হয়নি। আর পানীয় মানে কি ? বছর চারেক আগেই একবার এপ্রিলে কেঁড়-এ গিয়েছিলাম একা। মোহন সকালে ব্যাংকক হয়ে ফিরলো, কী কাজে গেছিলো ; একটি রয়্যাল স্যালুট এবং দুটি সিভাস রিগ্যাল-এর বোতল নিয়ে। কেঁড় বাংলোতে এসে নিজে পৌঁছে দিয়ে গেলো।

আমি গত পনেরো কুড়ি বছরে যতবার অতিথি হয়ে গেছি, আমার জন্যে বরাবর এয়ারকন্ডিশনড গাড়ি পাঠিয়েছে ও স্টেশন অথবা এয়ারপোর্ট থেকে আনতে এবং জঙ্গলের যে বাংলোতেই থেকেছি সেখানে একজন বাবুর্চি একজন খিদমদগার মজুত থেকেছে। মজুত থেকেছে বড় টিনের বাথটাব। তাতে বরফের মধ্যে বীয়ারের বোতল। যদি জঙ্গলে ঘুরে এসে খেতে ইচ্ছে করে। যদিও বীয়ার আমার পছন্দ নয় আজকাল। প্রতিদিন সকালে ডালটনগঞ্জ থেকে ট্রাক বা জিপ বা গাড়ি করে কাঁচা বাজার, মাছ মাংস মুরগী এসেছে। সবচেয়ে কাছের বেতলা থেকেই ডালটনগঞ্জের দূরত্ব পনেরো মাইল। আর ভিতরের বাংলোতে থাকলে তো সে দূরত্ব ত্রিশ চল্লিশ মাইলও হয়েছে। প্রতি দিন সকালে এবং বিকেলে মোহন নিজে নয়তো মোহনের কোনো বিশ্বস্ত লেফটেন্যান্ট এসে খোঁজ খবর করে গেছে। সামান্য অসুস্থ হলেও ডালটনগঞ্জ থেকে ডাক্তার নিয়ে এসেছে।

জঙ্গলে অসুস্থ হলে মোহন কি করেছে না করেছে তা "জংগলের জার্নালে" লিপিবদ্ধ আছে। মোহন, মোহনই। ও যা করেছে তার বদলে ওর জন্যে কিছুমাত্রই করতে পারিনি। কলকাতায় এলে ওর একবেলা খাবারও সময় থাকে না।

শারীরিক ভাবে তো বটেই মানসিক ভাবেও আজকাল বড় ক্লান্ত বোধ করি। মাঝে মাঝেই মনে হয় কেওড়াতলাই এখন আমার একমাত্র গন্তব্য।

এ জীবন অন্যের, দেশের সমাজের কিছুমাত্র উপকারেই আসে না। শুধু নিজেরই ক্ষুন্নিবৃত্তি নানাবিধ কর্তব্য আর সঞ্চয় আর যশের ডালি যাতে ভরে সেই সাধনায় ব্রতী হয়ে বেঁচে থাকাটাকে আমার কাছে মানুষের মতো বেঁচে থাকা বলে মনে হয় না। সত্যিই মাঝে মাঝেই ভীষণই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়। বিখ্যাত ইতালীয় চিত্রপরিচালক আন্তোনিওনির মতো আমিও বিশ্বাস করি যে "If life is a gift of God then the right to take it away is also a gift of God." এইসব চিন্তা মনের মধ্যে বারবার ঘুরে ফিরে আসে বলেই মনে হয় কৃতজ্ঞতার যে গভীর ঋণ তিল তিল করে বিভিন্ন নারী ও পুরুষের কাছে জমা করে তুলেছি দীর্ঘসময় ধরে, সেই সব ঋণ শোধার সময় বুঝি হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এইসব

ঋণের খুব কমই শোধ হয়ে ওঠে এক জীবনে আর যেহেতু জীবন একটাই, জীবন শেষ হওয়ার আগে সেইসব ঋণ স্বীকারও না করে যেতে পারলে কৃতঘ্নতার অপরাধে ক্লিষ্ট হয়ে থাকতে হয়

অবশ্য কৃতঘ্নতাই হচ্ছে "order of the day" কৃতজ্ঞতা বোধ খুব কম মানুষের বুকেই আজ বেঁচে আছে তবে আমরা পঞ্চাশ পেরিয়েছি। বুড়োই বলবে অনেকে। আমাদের সময়কার শিক্ষা এবং মূল্যবোধ কিছু অন্যরকম ছিলো। ইংরিজি মিডিয়াম স্কুলে গলায় টাই ঝুলিয়ে পড়তে যাইনি বটে তবে মা-বাবা, কাকা-মাসী, ঠাকুমা-দিদিমা কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন, শিখিয়েছিলেন কিছু সহবৎ, মেরুদণ্ড টানটান করে চলার উত্তরাধিকার, তাই কারো হাতে এক গ্লাস জল খেয়ে থাকলেও গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি যে, তাঁর কাছে আমি ঋণী।

বছর পনেরো আগে একবার জানুয়ারি মাসে দেবব্রত মৈত্রকে নিয়ে হঠাৎই একটি লং উইক এন্ডে ম্যাকলাস্কিগঞ্জে যাব ঠিক করে গাড়িতে বেরিয়ে পড়লাম। সকাল সকালই বেরিয়েছিলাম। আমিই গাড়ি চালাচ্ছিলাম যদিও দেবুও গাড়ি চালায়। সন্ধের আগে আগে প্রায় তিনশো মাইল গাড়ি চালিয়ে যখন "চামা" থেকে ম্যাকলাস্কিগঞ্জ অবধি সাফারি র‍্যালির সাহারা রুটের মতো কাঁচা, অসমান পাথর ও নানাবিধ বাধা-কণ্টকিত কাঁচা পথে (তখন ম্যাকলাস্কিগঞ্জের ঐ পথটি কাঁচাই ছিলো) 'দ্যা টপিং হাউসে' গিয়ে পৌঁছলাম তখন দেখলাম যে, ভুলো-মনের-আমি চাবি আনতেই ভুলে গেছি। মালী ও তার স্ত্রীর কাছে বসবার ঘরের চাবি যদিও ছিলো তাতে কোনো লাভ হলো না। নিজের বাড়ি, তাই শীত গ্রীষ্মর জামাকাপড়, বাড়িতে পরার পায়জামা-পাঞ্জাবি, চটি, জুতো সব কিছুই তো ভেতরের ঘরগুলোতে। এদিকে দ্রুত রাত নেমে আসছে। অন্ধকারে ঐ কাঁচা রাস্তা পেরুতে গেলে চেম্বারে চোট লাগার বিস্তর আশঙ্কা। অথচ এতদূরে এসেছি। দেবুও কখনও দেখেনি আমার বাড়ি। মহা সমস্যাতেই পড়লাম।

পরমুহূর্তেই বুদ্ধি খেলে গেলো। মালীকে, আমরা কাল কি পড়শু ফিরে আসছি আবার, বলেই বেরিয়ে পড়লাম।

দেবুকে বললাম, চল ডালটনগঞ্জে যাব। তবে আজ রাতে নয়। টোড়ি থেকে ডালটনগঞ্জের রাস্তার যে অপরূপ সৌন্দর্য তা রাতে গেলে তুই মিস করবি। রাতে কোথাও থেকে একেবারে ভোরে রওয়ানা হবো।

কোথায় থাকবি ? দেবু বললো।

দ্যাখই না তুই। "দেশে দেশে মোর ঘর আছে।" হাজারীবাগ আর পালামৌ জেলার পথঘাট, বিশেষ করে জঙ্গলের, প্রায় আমার হাতের রেখার মতোই জানি আমি। কথাটা একটু বাড়িয়ে বললাম কি ? চিনি না বরং কলকাতারই পথঘাট।

বিজুপাড়া হয়ে কুরুতে পৌঁছে কুরুর ঘাটে ওকে "আমঝারীয়ার" বাংলোতে নিয়ে গেলাম। সেদিন কোন তিথি ছিলো মনে নেই। বোধহয় দ্বাদশী বা ত্রয়োদশী ছিলো। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কিন্তু নীল কুয়াশা আর হলুদ চাঁদের আলো মিলে-মিশে এক দারুণ মোহাবরণ সৃষ্টি করেছিলো, এ অঞ্চলে প্রথমবার আসা দেবুর জন্যে। আমঝারীয়ার বারান্দায় ইজিচেয়ারে পা তুলে বসে আমরা দুটি করে হুইস্কী খেলাম। হুইস্কী-টুইস্কী খেতে হলে এমন নির্জনে এসেই একা অথবা বেশি হলে দোকা বসে খেতে হয়। মাথার মধ্যে নিজের শৈশব কৈশোর ও যৌবন হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে থাকে, ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে থাকে মনের দেউড়িতে তরোয়াল হাতে খোজা প্রহরীর মতো। বেচাল দেখলেই বুঝি মুণ্ডু নেবে।

BanglaBook.org

দেবুতো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলো। আমি বুঝলাম চাঁদ ঢুকে গেছে ওর শিরা উপশিরায়। এমন হয় অনেকের। জঙ্গলে পৌঁছে ওঝা লাগাবো ওর পেছনে। আমঝারীয়ার বাংলোর মতো সুন্দর বারান্দা ও সামনের দৃশ্য খুব কম বাংলোরই আছে। তবে পঁচিশ তিরিশ বছর আগে নিচের উপত্যকার জঙ্গল আরও গভীর ছিলো হাজারীবাগ ও চাতরা অবধি একেবারে লাগাতার গহন বন ছিলো। নেতারহাটের পালাম্যু বাংলো থেকে অনেকদিন আগে যেমন দেখাতো তেমন এখন গাছ আর জঙ্গল প্রায় সব শেষই হয়ে গেলো।

আমঝারীয়া থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে ঘাট পেরিয়ে এসে চাঁন্দোয়া-টোড়িতে পৌঁছলাম। ডাক বাংলোতে জায়গা নেই। এই ডাকবাংলো আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে (তারই কিছু আগে তৈরি হয় বাংলোটি) আমি ঋতু এবং দীপক চক্রবর্তী যখন নেতারহাট থেকে নেমে এসে এ বাংলোতে ছিলাম তখন এই ডাক-বাংলোর বাবুর্চিই "হাওয়াই-পুটিন্" খাইয়েছিলো। 'ক্যারামেল কাস্টার্ড'-এর নাম "হাওয়াই পুটিন"। তাই বাংলোটাকে যতবারই দেখি ততবারই ঐ "হাওয়াই পুটিনের" কথা মনে পড়ে যায়।

দেবু নার্ভাস হয়ে গেলো। বললো, কী ঠাণ্ডারে! মরে যাব যে রাস্তাতেই মাথা গোঁজার জায়গা না পেলে!

পাবি পাবি। তুই আমার সঙ্গে রয়েছিস। ভয় কি তোর!

ওকে বললাম মুরুব্বীর মতো।

ও চুপ করে থাকলো। তবে ভরসাও যে বিশেষ পেলো তা মুখ দেখে মনে হলো না।

টোড়ি বস্তির শেষ প্রান্তে লেভেল-ক্রসিং পেরিয়ে বাখড়া মোড়ের পথে একটু এগিয়ে গিয়ে আমি মোহনের টোড়ির ডেরাতে গিয়ে গাড়ি লাগালাম। এই ডেরার ম্যানেজার ছিলেন রামচন্দরবাবু। বাবু রামচন্দর সিং। প্রকাণ্ড লম্বাচওড়া, ইয়া বড় ভুঁড়িওয়ালা মানুষ। কিন্তু এনার্জির বান্ডিল। রামচন্দরবাবু আমার মতো দশাসই মানুষকেও কোলে বসিয়ে ঝিনুক করে দুধ খাওয়াতে পারেন। প্রতি দুপুরে এমনই এক ভাতের পাহাড়কে তিনি কাঁসার থালায় আক্রমণ করতেন, খাঁটি গাওয়া ঘি, কড়কড়ে করে আলুভাজা এবং সোনালি মুগের ডাল এবং নানারকম জিভে-জল-আসা সবজি ও মাছ মাংস সহকারে যে, দেখলে মনে হতো ঐ ভাতের পাহাড় বেড়ালেও ডিঙোতে পারবে না লাফিয়ে। মোহনের সাগরেদ রমেনবাবু তাই রামচন্দরবাবুর নাম দিয়েছিলেন "ক্যাট-জাম্পিং-রাইস"।

এখন রামচন্দরবাবু নিজস্ব ব্যবসা করেন। খুব বড়লোক হয়েছেন। দুটি ঝিং-চ্যাক ভিডিও বাসের মালিক উনি। টাট্টু ঘোড়াতে করে যাতায়াত করেন।

সে রাতে রামচন্দরবাবু সারা দিনের পরিশ্রমের পর একটু আরাম করছিলেন। মহুয়ার বোতল খুলে। সারা দিন পাহাড়ে বনে ঘোড়ার পিঠে চেপে ঘুরেছেন আজ।

আমি ভাবছিলাম, আহা! রামচন্দরবাবুরই যদি এতো কষ্ট হয়েছিলো তো যে বেচারা ছোট্ট-খাট্ট টাট্টুঘোড়া তাঁকে বয়ে বেড়িয়েছিলো তার না জানি কত কষ্টই হয়েছিলো!

আমাদের দেখেই তো "পাধারিয়ে! পাধারিয়ে! বলে উদ্বাহু হয়ে আপ্যায়ন জানিয়ে বসালেন। সব শুনে বললেন, "ইয়ে মেরী খুশনসীবী যো মুঝকো ইক রাতকি লিয়ে আপ্‌কি খিদমদগারীকি মওকা মিল গ্যয়ে হ্যায়।"

রামচন্দরবাবুই শুধু নন, মোহনের সমস্ত জায়গার কর্মচারীরাই ওকে 'মালিক' বলে সম্বোধন করতেন। কিষুণ ড্রাইভার (মোহনের খাস ড্রাইভার বলতো) মালিককে লিয়ে ম্যায় খুন ভি দেনে শকতা হুঁ।

যাক আমাদের 'খুন'-এর দরকার ছিলো না। কিন্তু সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল। গরম

জলের ইস্তেজাম হলো। ভাজা মুগ ডালের খিচুড়ি, ডিম ভাজা, আলুভাজা, নিমু ঔর আমলকির আচার, পাঁপর সেঁকা শুকনো লঙ্কা ভাজা ইত্যাদি সব কিছুরই অর্ডার হয়ে গেলো

রামচন্দরবাবু আমার দুর্বলতা জানতেন। অবশ্য শুধুই খাবার ব্যাপারের এবং তাও একটিই। আমার দুর্বলতাই তো বেশি ; বল কম।

রাম-এর বোতল ও নৈবেদ্য এসে গেল মুহূর্তের মধ্যে। তবে আমার সঙ্গে একটি কাটি-সার্ক ছিলো। তা থেকেই আমঝারিয়াতে খাওয়া হয়েছিলো। তাই আর মুখ বদলালাম না।

গরম জলে চান করে ফ্রেশ হয়ে কিঞ্চিৎ হুইস্কী পান করে খিচুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। একটি ঘরেই দুজনের বিছানা করা হয়েছে। নতুন চাদর, নতুন বালিশে নতুন ওয়ার, নতুন লেপ, নতুন মশারি।

দেবু বললো দুসস্। সবই দিলো তোর মক্কেল তবু এই ঘরে, এই নতুন বিছানায় নতুন বালিশে নতুন বউ ছাড়া শোওয়া যায় ? এরা তো ইচ্ছে করলে বউও দিতে পারতো !

আমি বললাম, বড় সাহস হয়েছে ! কলকাতা চল্ রুমাকে বলে দেবো।

আমি বললাম, ভালো করে ঘুমো। কাল সকালে তোকে ব্রহ্মদৈত্য দেখাবো আর গরুর বাঁট থেকে কী ভাবে দুধ না বেরিয়ে কুল্‌ফী বরফ বেরোয় ঠাণ্ডাতে, তাও।

ভোরের পাখির ডাকাডাকি শুরু হতেই আমি দেবুকে প্রায় জোর করেই লেপের তলা থেকে টেনে তুললাম। একটি বালিশকে এমনই কায়দায় কোলবালিশ করে ঘুমোচ্ছে ও, যেন নিজের বউকেই কোলবালিশ করেছে। একটু গাঁই-গুঁই করে উঠলো যদিও কিন্তু বললাম, চল্ ব্রহ্মদৈত্য দেখবি।

তুই কি করে জানলি যে এসেছে ?

ঘুম চোখে বলল দেবু। কিন্ডার গার্ডেনের ছেলের মতো সরল বিশ্বাসে।

আমি যে বহুবার দেখেছি রে।

ঘরের বাইরে থাকতেই ওকে দেখালাম ডেরার সৎ-ব্রাহ্মণ মুহুরী পাঁড়েজী জানুয়ারির সকাল পাঁচটায় পুবের আকাশে তখনও সুপ্ত কিন্তু ক্রমশ উদিত সূর্যকে আবাহন করতে করতে কুয়ো থেকে বালতি করে জল তুলে তুলে মাথায় ঢালছেন কূয়োর বলয়েরই উপরে দাঁড়িয়ে। এক এক বালতি জল ঢালছেন আর ওঁর সারা গা থেকে ধুয়ো উঠছে। ধুঁয়োর কুণ্ডলী ওঁকে গ্রাস করে ফেললো। ওঁকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে ; মনে হচ্ছে সারা গায়ে আগুন লেগে গেছে পাড়েজীর।

দেবু অবাক হয়ে চেয়েছিলো।

আমি বললাম, উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ। নিম্নবর্ণের হাতে জলগ্রহণও করেন না।

দেবু বললো দি ব্যাটাকে কুয়োয় ঠেলে ফেলে ?

আমি বললাম, তুইতো বারেন্দ্র। আমাকে ছোটজাত বলে মাঝে মাঝে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কটু-কাটব্য করিস না কি ? দীপক রাঢ়ী তো আকছার করতো !

ও বলল, করি না, তবে করা উচিত ছিল। দীপক ঠিকই করে।

আমি বললাম, তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে বাথরুম করে নে। চল্ এককাপ করে চা খেয়ে বেরোই। সকালের মিস্টি শীতের রোদে টায়ারে প্যাচ-প্যাচ করে কুয়াশা মাড়িয়ে আস্তে আস্তে দেবুকে সব দেখাতে দেখাতে যখন ডালটনগঞ্জে গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেলা দশটা হবে।

BanglaBook.org

মোহন ওর বসত-বাড়ি সংলগ্ন অফিসে কাজ করছিলো। দেবুকে পথের সৌন্দর্য ও নানা জায়গা চেনাতে চেনাতে আসলাম বলেই এতো দেরি হলো। মোহন সব শুনে কলকাতায় ট্রাঙ্ককল করে ওর ম্যানেজারকে বললো এক্ষুনি আমাদের বাড়িতে ফোন করে ঋতুর সঙ্গে কথা বলতে আর লোক পাঠিয়ে ম্যাকলাস্কিগঞ্জের বাড়ির চাবি আনিয়ে নিয়ে আজই রাতের ট্রেনে তাকে দিয়ে পাঠাতে যেন কাল সকাল বারোটার মধ্যেই চাবি ডালটনগঞ্জে পৌঁছয়।

তারপর বলল, ম্যাকলাস্কিগঞ্জে বাড়ি করে তো আমাদের ভুলেই গেছেন। এসেছেন যখন তখন আর ছাড়াছাড়ি নেই। দু-তিন দিন থেকেই যেতে হবে। পরশুর পরদিন যাবেন এখান থেকে।

সেই তিনদিন খুবই মজা করা গেল। দেবু খুব রসিক এবং নানারকম গল্প ওর স্টকে আছে। বিভিন্ন রসের গল্প। তা শুনে তো মোহন এবং মোহনের লেফটেন্যান্টরা দেবুকে হীরোই বানিয়ে নিল। দেবুকে ন্যাশনাল পার্কে জানোয়ার দেখানো এবং দিনেরবেলাতে গাড়ু হয়ে মীরচাইয়া ফল্‌স হয়ে মারুমারে নিয়ে পিকনিক করল। দেবু খুব খুশি। এতো একেবারেই উইন্ডফল্। ওর তো আসার কথা ছিল না এ অঞ্চলে এসেছিল তো ম্যাকলাস্কিগঞ্জের নাম করেই।

যাবার দিন আমার গাড়ির চাবি আমার হাতে ফিরে এলো। কেন না পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে আমার গাড়ি মোহনের গাড়ি ও ট্রাকের কারখানায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঝকঝকে করে পালিস করে, পেট্রল ট্যাঙ্ক ফুল করে মোহনের খাস ড্রাইভার কিষুণ চাবি দিয়ে সেলাম করল।

মোহন বলল, সাসপেনসানের একটু কাজ ছিল এবং বাঁদিকের চাকাদুটোর অ্যালাইনমেন্ট ঠিক ছিল না। ঠিক করিয়ে দিয়েছি, লালাদা। আবার কবে আসছেন?

দেখি! ইচ্ছে তো করে। সময়ই করে উঠতে পারি না।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে গেল যে, আমার এক শ্যালকের চার-পাঁচজন বন্ধু গাড়িতে করে বেতলার জঙ্গলে যাচ্ছিল। তারা সবাই ছেলেমানুষ। ব্যাচেলার! এবং সবে চাকরিতে ঢুকেছে। সামান্যই মাইনে-পত্র পায়। যেদিন ওরা বেরুচ্ছে সেদিনই ঋতু বাপের বাড়ি গেছিলেন। ঋতুকে দেখে শ্যালক বললেন, দিদি, তুমি মোহনদাকে এক লাইনের একটা চিঠি লিখে দাও। যদি কোনো বিপদ আপদ হয়। পুরানো থার্ড-হ্যাণ্ড গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে ওরা।

ঋতু একটা স্লিপ প্যাডে এক লাইন লিখে দিলেন "মোহন, এরা খোকনের বন্ধু। যদি বিপদে পড়ে তো সাহায্য কোরো। ইতি—ঋতুবৌদি।

পুঃ— আশা করি ভালো আছ।

মোহন ডালটনগঞ্জে থাকলে প্রতিদিন বিকেলে একবার ছিপাদোহরে যায়ই। সন্ধের পর ফেরে ওখানকার কাজকর্ম দেখে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আঠারো মাইল রাস্তা। ছিপাদোহরেও ওদের ঘরবাড়ি, গারাজ সব আছে। টাইগার প্রজেক্ট হওয়ার আগে ছিপাদোহর সবসময় গম্‌গম্ করতো ট্রাকে আর বাসে আর কুলি-কামিন-মুন্সীতে।এখন কোর-এরিয়ার মধ্যে কাজ বন্ধ বলে ছিপাদোহরের সেই চাঁদের হাট আর নেই।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সেদিন ও ফিরে আসছে। সাতমাইলের মোড়ে এসে ডালটনগঞ্জের রাস্তায় পড়ে একটু যেতেই দেখে, পথের বাঁদিকে একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কলকাতার নাম্বার। গাড়ির নাম্বারের ব্যাপারে মোহনের এক অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা আছে। নিজে একশ কুড়ি কিমিতে গাড়ি চালাতে চালাতেও সরু পাহাড়ী রাস্তাতে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির নাম্বার ও চকিতে পড়ে নিতে পারে। এবং ওর মগজে ওর জানাশোনা প্রত্যেক

BanglaBook.org

মানুষেরই গাড়ির নাম্বার এবং ফোন নাম্বারও মুখস্ত থাকে। যেন কম্প্যুটার "গাড়ির আমি গাড়ির তুমি তাই দিয়ে যায় চেনা" গোছের ব্যাপার আর কী!

ও গাড়ির নম্বর মুখস্ত ছিল না কিন্তু মুকুন্দবাবুর আমল থেকেই কোনো বাঙালীর ডালটনগঞ্জে বিপদ হয়েছে এবং বিশ্বাসদের কল্যাণে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাননি, এমন কথা পরম অবিশ্বাসীও বিশ্বাস করবেন না।

মোহন নিজের গাড়ি পাশে দাঁড় করিয়ে বললো, কী মশাই? এখানে কী করছেন আপনারা?

আর বলবেন না দাদা। গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে।

মোহন গাড়ি থেকে নেমে ভালো করে গাড়িটা নিরীক্ষণ করে বলল: সে কি মশায়! আপনাদের সাহস তো দেখি কম নয়। এইরকম টায়ারের অবস্থা, এইরকম ব্যাটারির অবস্থা, আর এঞ্জিন তো প্রোটেস্ট করছেই, তা সত্ত্বেও কোন সাহসে আপনারা কলকাতা থেকে এ গাড়ি নিয়ে এতদূরে চলে এলেন?

তা কী করব দাদা! আমরা বন্ধুরা মিলে চাঁদা তুলে এ গাড়ি কিনেছি।

তা চাঁদা তুলেই একে কেওড়াতলায় পুড়িয়ে আসা উচিত ছিল। তা ডালটনগঞ্জে যাওয়াটা হচ্ছিল কোথায়? থাকা হচ্ছিলো কোথায়?

কোনো হোটেল-টোটেল খুঁজে নিতাম। আগে তো আসিনি কখনও।

কোনো খোঁজ খবর না নিয়েই চলে এলেন এতদূর। এখানে তেমন হোটেল কোথায়? একি দিল্লী বম্বে নাকি?

জঙ্গল দেখব তো। তাছাড়া ছেলেরা এসেছি। মাথা গোঁজার জায়গা একটা হয়েই যাবে। বেতলা ন্যাশনাল পার্ক দেখব বলে এসেছি।

একজন বলল, সেরকম অসুবিধা হলে মোহন বিশ্বাসের সাহায্য নেব। উনি নিশ্চয়ই কোথাও থাকার বন্দোবস্ত করে দিতে পারবেন। এখানের সবাইতো ওঁর চেনাজানা।

তাকে আপনারা চেনেন নাকি? সে তো একটা ফোর-টোয়েন্টি মশায়।

না চিনি না। কোনোদিন দেখিনি। তবে ওঁর সম্বন্ধে ওরকম বলবেন না। চিনলেও, চিনি।

তাই? তা কেমন চেনেন?

না। তেমন নয়। মানে ঋতুদি একটি চিঠি দিয়ে দিয়েছেন।

কে ঋতুদি।

ঐ যে গান গান -না! বুদ্ধদেবদার...

তাকেই বা আপনারা চিনলেন কি করে?

মানে, আমরা হলাম ঋতুদির ভাইয়ের বন্ধু।

ও। তা মোহন বিশ্বাসকে আমিও চিনি। সে লোক মোটেই সুবিধের নয়। তাছাড়া সেতো কালই কলকাতায় গেছে।

তাই? এই রে কি হবে? ওরা বন্ধুদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বিড়-বিড় করতে লাগল।

একজন বলল, কি হবে তাহলে!

কি আবার হবে। শীতেই মরুন এখানে। যেমন বে-আক্কেলের কাজ তেমনি শাস্তি। চলি।

দাদা, মোহন বিশ্বাসকে যদি একটু খবর দিতে পারতেন।

BanglaBook.org

বললাম তো, সে শহরেই নেই। থাকলেও তো সে এই সময়টাতে একেবারে মদে চুর হয়ে থাকে।

সে কি! উনি তো মদ ছোঁন না।

আপনারা ঘোড়ার ডিম জানেন ওর সম্বন্ধে।

বলেই মোহন গাড়ি চালিয়ে চলে এল। ডালটনগঞ্জে পৌঁছে একটি গাড়ি এবং একটি জিপ পাঠালো টো-চেন সমেত। জিপ ও গাড়ি চলে যেতেই ফটাফট পাঁচটি বিছানা লেগে গেল, দুটি ঘরে পাঁচটি চৌপায়াতে। মশারি টানানো হল। সব পাটভাঙা। গরম-গরম পুরী আর আলুর চোকা এবং সন্দেশ এবং লেবুর আচার তৈরি থাকল যাতে তারা এসেই খেতে পারে। পিটার স্কচ হুইস্কি বীয়ার বরফ-সোডা ইত্যাদির বন্দোবস্ত রইল। কলকাতার ছেলে ছোকরা। হাঁসের বাচ্চা যেমন ডিম থেকে বেরিয়েই সাঁতার কাটে এরাও তেমনি নার্সিংহোম থেকে বেরিয়েই ড্রিঙ্ক করে। দেশ অনেকই এগিয়ে গেছে কিছু কিছু ব্যাপারে। সন্দেহ নেই।

মোহনের গাড়ি গিয়ে ওদের নিয়ে এল মালপত্রসমেত। আর মেকানিকরা টো-চেনে বেঁধে ওদের গাড়ি নিয়ে গেলো সোজা কারখানায়।

ব্যাপার দেখে তো তারা থ। বলল, আমরা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

পরে বুঝবেন। এখন হাত পা ধুয়ে খান, লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। জল-খাবার খাওয়া হলে গায়ে জোর করুন। বন্দোবস্ত আছে। রাতে পোলাও আর মাংস রান্না হচ্ছে। ঘণ্টা দুই দেরি হবে।

বলেই, তার লেফটেন্যান্টদের হাতে তাদের ছেড়ে দিয়ে নিজের বাড়ি চলে গেল পথের উল্টোদিকে।

ঐ ছেলেরা তিনদিন ছিল। মোহন তাদের খাইয়ে দাইয়ে নিজের গাড়ি দিয়ে সব জায়গা ঘুরিয়ে দিয়ে তাদের গাড়ি পুরো মেরামত করে, টায়ার বদলে, টোল সারিয়ে এককোট পেইন্ট করে, পালিশ করে, পেট্রোল ট্যাঙ্ক ভর্তি করে যাবার ক্ষণে গাড়ির চাবিটা তাদের হাতে দিয়ে দিল।

বলল, গাড়ির কণ্ডিশন যদি খারাপ থাকে তবে খবর্দার সে গাড়ি নিয়ে হাইওয়েতে বেরোবেন না। হাইওয়েতে গাড়ি নিয়ে বেরনো আর আপনাদের বালিগঞ্জের পাড়ার পুজোর প্রতিমা আর সুন্দরী মেয়ে দেখে বেড়ানো এক নয় মশাই।

এই ঘটনার কথা আমার জানা ছিল না। ম্যাকলাস্কিগঞ্জের চাবি কলকাতায় ফেলে না গেলে ডাল্টনগঞ্জেও হয়তো যেতাম না। ওদের যাওয়ার কথা জানতেও পেতাম না। পরেও কখনই নয়। মোহন বলত না। আমার সূত্রে পরিচিত হয়ে, আমার নাম ভাঙিয়ে অনেক মানুষই যে মোহনের আতিথেয়তার সুযোগ এ পর্যন্ত নিয়েছেন, আমাকেও না জানিয়ে সে খবরও আমি রাখি। কিন্তু খোকনের বন্ধুদের ব্যাপারটা আলাদা। তাছাড়া মোহন বিশ্বাসের উপর আমার কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। যে যার বিবেক ও রুচি মতো যা করার করছেন। আমি মানাই বা করতে যাব কেন?

মোহনকে বললাম, এখন তো তোমার ব্যবসা ভাল যাচ্ছে না, তুমি কি এখনও এই ভাবেই চালিয়ে যাবে?

মোহন অ্যাপলোজেটিকালি বলল, কী করব? আপনি তো আচ্ছা কনফিউজড লোক হচ্ছেন। বৌদির চিঠি দেখালো আর আমি তাদের ফেলে দিতে পারি? অজীব্ আদমী আপনি লালাদা।

অজীব আদমী যে কে তাই ভাবছিলাম! এমন অজীব আদমী দেশে যদি অনেক থাকত

BanglaBook.org

তবে দেশের চেহারা হয়তো অন্যরকম হয়ে যেত। এই স্বার্থপর কুটিল নগ্ন জগতে মোহন বিশ্বাসেরা সত্যিই আজ ব্যতিক্রম একখড়্গ ভারতীয় গণ্ডারের মতোই এই রকম স্বভাবের মানুষেরা বিরল হয়ে আসছেন।

দেবু বলছিল, ফিরে আসার সময়, ঈশ্বর করুন, মোহন যেন চিরদিনই এরকমই থাকে। এবং যাতে থাকতে পারে তারজন্যে অঢেল ঐশ্বর্য যেন চিরদিনই ওর কুক্ষিগত থাকে, ঈশ্বরের দয়ায়।

আমিও তাই ভাবছিলাম। তাই যেন হয়।

মুকুন্দবাবু এবং মোহনের দাক্ষিণ্যেই যে পালামুর বন-পাহাড়ে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্তে যে বার বার যেতে পেরেছি, খুশিমত বেড়াতে পেরেছি, দিনের পর দিন বনের গভীরের গ্রামে এবং বাংলোতে থাকতে পেরেছি, একথা চিরদিনই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করব। কত আশ্চর্য সব শিশির-ভেজা সকাল, মর্মর ধ্বনি জাগানো লাগামহীন বুনো হাওয়ার দুপুর, কত উদার শান্ত সন্ধ্যা আর নীল কুয়াশা মাখা বনজ্যোৎস্নায় আর সবুজ অন্ধকারে মাখা কত শত পাহাড়তলীর মায়াবী রাতের স্মৃতি যে মনের গভীরে জমা আছে, তা কী বলব।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

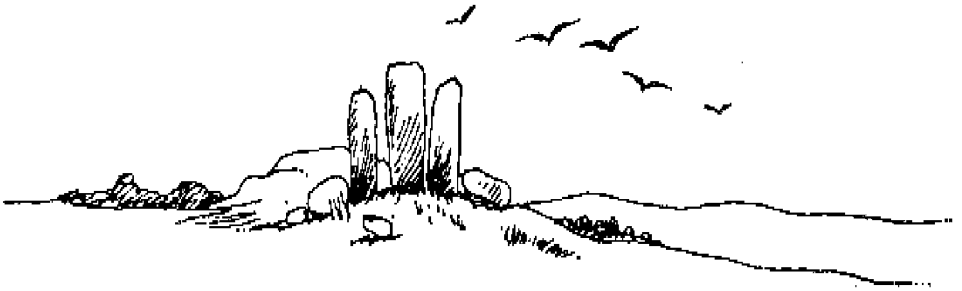

এবার আবার হাজারীবাগেই ফিরে যাই।

হাজারীবাগের মত সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর শহর বিহারে খুব কমই আছে। প্রথমবার আমি যাই উনিশশো সাতান্নতে, আমার শিকারী বন্ধু গোপালের (মিহির সেন) সঙ্গে। গিয়ে উঠি ওদেরই গয়ারোডের "পূর্বাচল" বাড়িতে। "পূর্বাচল" আমার জীবনের একটি অঙ্গ হয়ে গেছে। ও বাড়ির মালিক যে আমিও নই একথা কখনও ভাবিওনি। গোপালও অবশ্য সে কথা বলে। বলে যে বাড়ির মালিক আমিও। বলে, গোপালের দুই ছোট ভাই সমীর ও তিমির এবং ভগ্নিপতি অমিয়ও। অমিয় দত্ত এখন ভিলাই-এর জেনারেল ম্যানেজার। সীতাগড়, কান্‌হারী আর শিলওয়ার এই তিন পাহাড় ঘিরে রয়েছে হাজারীবাগকে।

আজ তিরিশ একত্রিশ বছর পরে (১৯৮৮) জায়গাটা অনেক ঘিঞ্জি হয়ে গেছে। শুয়োরের মতো বংশবৃদ্ধি হওয়া মানুষ তাদের সর্বগ্রাসী খিদে আর আগ্রাসী লোভে পৃথিবীর সব কিছু সুন্দর জিনিসই প্রায় নষ্ট করে দিতে বসেছে। অরণ্য ধ্বংস হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে বন্যপ্রাণী, পাখি, শান্তি, স্বস্তি আনন্দ। এবং গেছে বলেই পিছন ফিরে সেই সব দিনগুলির কথা ভাবলে বড়ই আনন্দ পাই। এক গভীর শান্তিতে ভরে ওঠে মন।

যদিও সঙ্গী সাথী পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই আজ চলে গেছেন, কেউ যথাসময়ে কেউ বা অসময়ে, তবু মনে হয়, তাঁরা যেন সকলেই আছেন আমাদের ঘিরে। স্মৃতি যেমন ভিখারি করে আবার কখনও কখনও রাজাও করতে পারে কাউকে কাউকে।

চমনলাল ছিল গোপালদের বাড়ির কাজের লোক। গোপালের মা ছিলেন ভারী লক্ষ্মী মহিলা। 'পূর্বাচল'-এ উনিশশো সাতান্নতে যে টি-পট থেকে শীতের সকালে পুবের বারান্দার রোদে বসে চা ঢেলে খেয়েছি এবং যে বেতের চেয়ারে বসে আজও সেই টি-পট, চেয়ার একইরকম আছে। টি-কোজী অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই বদলাতে হয়েছে এই দীর্ঘ সময়ে একাধিকবার। তবু একটি টি-কোজী এখনও আছে। একইরকম। মাসীমার ভাঁড়ার ও রান্নাঘরটি দেখবার মতো ছিল। কোথাও এতটুকু ময়লা বা নোংরা নেই। সার সার চাল, ডাল, মশলাপাতি, আচার, তেল, ঘি সাজানো। রান্নাও করতেন মাসীমা। ইংলিশ, চাইনীজ, কন্টিনেন্টাল এবং ভারতীয় কত পদ যে জানতেন রাঁধতে। গোপালের বাবাও, (জে· সেন) ছিলেন অত্যন্ত সৌখিন মানুষ। মাসীমা, মেসোমশায়ের জন্যে নিজ হাতে প্রি-ডিনার হুইস্কির জন্যে কাটলেট বা অন্য কিছু বানিয়ে দিতেন। মেসোমশাই ছিলেন 'বিলিভার ইন কোয়ালিটি' আর আমার বাবা ছিলেন 'বিলিভার ইন কোয়ানটিটি'। খাবার ব্যাপারে।

মাসীমার গুণটি গোপাল পুরোপুরিই পেয়েছে। বাবার শৌখিনতাও পেয়েছে পুরোপুরি। কতরকম রান্না যে গোপাল জানে এবং রেঁধে খাওয়ায় আমাদের, তা বলার নয়। উনিশশো সাতান্নতেও আমার কাজ ছিল শিকার থেকে ফিরে এসেই ঘুমিয়ে পড়া। আর গোপাল

মুরগী, তিতির,কালিতিতির, খরগোস, কুটরা, নানারকম হাঁস, চিতল বা শম্বর বা শুয়োর যাই শিকার হোক না কেন, তা পরিপাটি করে রান্নাতে লেগে যেত। এবং আমাকে ঘুম থেকে তুলে পিলে চমকানো সব কন্টিনেন্টাল নাম বলে সেই রান্না করা পদ পরিবেশন করত। তখনই এত ভালো রাঁধত আর এই তিরিশ বছর পরে যে তার রন্ধন প্রতিভা আরও চাকচিক্যময় হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী। বাগানেরও খুব শখ ছিল ওর। জাপান থেকে ফিরে এসে বাগানের মধ্যে একটি জাপানীজ গার্ডেন করেছিল।

চমনলাল-এর মত ইন্টারেস্টিং চরিত্র খুব বেশি দেখা যায় না। লম্বা ছিপছিপে, ঘোড়ার মতো লম্বাটে মুখ, দুটি প্রকাণ্ড কান, বড় বড় চোখ। চমনলালের কানদুটি প্রকাণ্ডই শুধু ছিল না, তাদের প্রতিভাও ছিল অসাধারণ। সে উত্তেজিত হলে গাধা বা ঘোড়ার কানের মতোই তার কানদুটি নড়ে উঠতো। এবং তার চেয়েও বড় কথা, চমন ইচ্ছে করলে শুনতো কান দিয়ে,ইচ্ছে না করলে শুনতো না। তার মানে ভীষণই মতলবী ছিল কানদুটি। যে কাজে ওর মতি নেই সেই কাজের কথা ও শুনতে পেতো না, আর যে কাজে নাফা, সে কাজের কথা চটজলদি শুনতে পেতো। মাসীমা আর গোপালের ট্রেনিং-এ চমনলালও একজন ক্ষুদে 'শেফ' হয়ে উঠেছিল। চমন এখনও আছে পূর্বাচলে, টি-পটের বা চেয়ারের মতোই "পূর্বাচলীয়" প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে। আমাদের চমনও উনিশশো অষ্টাশীর নভেম্বরের মাঝামাঝি আমাদের ছেড়ে চলে গেল ! এই মাত্র খবর পেলাম।

চমন ছাড়া আরেকজনকে দেখে আসছি সেই প্রথম দিন থেকে, সে ধরম আলি। সিঁদুর গাঁয়ে বাড়ি তার। পবিত্র, শান্ত, লোভহীন গোলমুখ। অতি ঠাণ্ডা স্বভাবের, গাছপালা ভালোবাসা মানুষ। ধরম এখনও আছে।

মহাবীর ছিল পরামাণিক। লম্বাটে মুখ আর ধূর্ত এক জোড়া চোখের মালিক ছিল সে। ছিপছিপে চেহারা। কথা কম বলত। কিন্তু যখন বলত, তখন তার কথা না শুনে উপায় ছিল না। আমরা যে কদিন হাজারীবাগে থাকতাম মহাবীর এসে আমাদের দাড়ি কামিয়ে দিত এবং তেল মাখিয়ে দিত। বিশুদ্ধ কড়ুয়া তেল। এবং তেল মাখাবার সময় সে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার উজাড় করে জিন্-পরী, ভূত-পিরেত, ডাকু-বদমাসদের গল্প বলত। মহাবীরের কাছেই ডাকাইত দিগা পাঁড়ের গল্প শুনেছিলাম। দিগা পাঁড়ে নামটি আমাকে আকর্ষণ করত। পরবর্তী জীবনে একে নিয়ে একটি গল্প লিখেছিলাম। 'মাধুকরী' উপন্যাসেও এই নামে একটি চরিত্র এনেছি। কিন্তু আমার সৃষ্ট দুই দিগা পাঁড়ের একজনও ডাকাইত নয়, সন্ত।

মহাবীর অনেক টোটকা-টাটকিও জানত এবং উপযাচক হয়ে আমাদের সর্দি অথবা জ্বর অথবা অন্য কোনো উপসর্গ দেখলেই নিজের টোটকার জ্ঞান বিতরণ করত। বলাবাহুল্য, গোপাল অথবা আমি কেউই ওর কথা শুনতাম না। কিন্তু আমার মা, বাবার সঙ্গে যখন উনিশশো একষট্টিতে গোপালদের 'পূর্বাচল' গিয়ে কিছুদিন ছিলেন শীতকালে, তখন কলকাতার সব ডাক্তার বিফল হবার পর মহাবীরই মাকে চিকিৎসা করে ভালো করেছিল। মায়ের হাঁটুতে দুরারোগ্য আর্থারাইটিস হয়েছিল। এমনই তার প্রকোপ ছিল যে, আমার ছোটবোনের বিয়ের সময়ও মা দোতলা থেকে নেমে একতলায় আসতে পারেননি। মহাবীর শুকনো মহুয়া তাওয়াতে সেঁকে ন্যাকড়ার পুঁটলি করে মায়ের পায়ে ঘষে ঘষে মায়ের আর্থারাইটিস চিরদিনের মতো সারিয়ে দেয়। মহাবীরকে আমরা হাজামৎ সাব বলে ডাকতাম। তারপর থেকে আমি তাকে ডক্টর সাব বলে ডাকতে শুরু করি। মহাবীর না থাকায় পূর্বাচলের একটি কোণ শূন্য হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

গোপালদের বাড়ির পাশেই একটি সুন্দর দোতলা বাড়ি ছিল। সেই বাড়ির মালিক ছিলেন কোনও সাহেব। বাড়ির কেয়ারটেকার ছিলেন একজন ভদ্র এবং দীর্ঘ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মিঃ কিং ভদ্রলোক বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আর্থিক অবস্থাও বিশেষ ভাল ছিল না। গোপাল হাজারীবাগে গেলেই যা-ই শিকার হোক না কেন, কিং সাহেবের জন্যে অবশ্যই মাংসর এক ভাগ পাঠিয়ে দিত। কিং সাহেব কখনও সখনও প্লেইন কেক বা পুডিং করে আমাদের দিয়ে যেতেন। ঐ বাড়িটিতে কতগুলি ফুলের গাছ ছিল। তাদের নাম আমি আজও জানি না। কিন্তু সেই সব বড় গাছ বসন্তকালে ফিকে বেগুনি এবং ফিকে গোলাপি এমন সব ফুলের স্তবকে স্তবকে ভরে যেত যে, মনে হত কৈশোরের মধ্যরাতের সব নরম লাজুক স্বপ্নগুলিই বুঝি ফুটে রয়েছে ফুল হয়ে।

মহম্মদ নাজিমের বন্দুক আর জুতোর দোকান ছিল হাজারীবাগ বাজারে। বলতে গেলে, অল্পবয়সী আমাদের উনিই ছিলেন হাজারীবাগের লোকাল গার্জিয়ান। সাইকেল চড়ে আসতেন পূর্বাচলে নাজিম সাহেব, টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি পাটনার বাখরখানি রোটি, উম্‌দা বিরিয়ানি ইত্যাদি নিয়ে। তাছাড়া তাঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন তো লেগেই থাকতো আমাদের। স্বভাবে হারুনুর রসিদ ছিলেন তিনি। একা খেতে পারতেন না। বকর্‌-ঈদের সময়, মুহারম্‌-এর সময় এবং অন্যান্য পরবের সময়ও দাওয়াত্‌ থাকত। সাদা বক্‌রী আমাদের চোখের সামনেই শশীকলার মতো বাড়ত। তাকে টিউবওয়েলে লাইফবয় সাবান দিয়ে ধোপ-দুরস্ত করা হত। এবং তেওহারের দিনে তারই বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে রান্না বিভিন্ন পদ মহাসমারোহে খাওয়া হত। চাঁব, চৌরি, পায়া, কবুরা, কোর্মা, কাবাব। তক্কর এবং হামদর্দ কোম্পানির 'পাচনল' বটি সহযোগে পরিবেশিত হত। প্রখর শীতের রাতে, আণ্ডেকা রোশান্‌ হালুয়া (নাজিম সাহাবের মতে, দেড়শো বছরের পুরনো) খেতাম। সে হালুয়া চ্যবন প্রাশের মতো একটুখানি আঙুলে করে খেলেই সব গরম জামাকাপড় ছেড়ে উলঙ্গবাহার নাচ নাচতে হত। নাজিম সাহেবই প্রথমবার আমাদের "ঈত্তর ঈ গিল্‌"-এর কথা বলেন। মানে মৃত্তিকাগন্ধী আতর। বাঘ শিকারের সময় নবাবেরা ঐ আতর মেখে মাচায় বসতেন যাতে বাঘে তাঁদের গায়ের গন্ধ না পায়।

নাজিম সাহেবের কিছু জমিজমা ছিল। হাজারীবাগ থেকে টুটিলাওয়া যাওয়ার পথে বনাদাগ গ্রামের পাশ দিয়ে লালমাটির পায়েচলা পথটি বোকারো নদী পেরিয়ে দিগন্তনীল জঙ্গলের কোলের কোসমা গ্রামে গিয়ে পৌঁছেছিল। এই কোসমা গ্রামের পটভূমিতে সুবোধ ঘোষের একটি গল্প আছে। শুনেছি সুবোধ ঘোষ মশায় এই অঞ্চলে, হাজারীবাগ-টোড়ি এবং হাজারীবাগ-চাত্‌রা লাইনের বাসের কণ্ডাকটর ছিলেন একসময়। হতেও পারে। নইলে ওঁর এ অঞ্চলের অভিজ্ঞতা এমন গাঢ় হত না।

"ক্ষেতি-জমিন" ছিল সিরিফ্‌ বাহানা। যা কিছু ফসল কোসমাতে উনি লাগাতেন তা ধানই হোক কি গেঁহু আর কুল্‌থীই হোক কী মটরছিম্মি সবই খরগোস, হরিণ, শম্বরের ভোগের জন্য লাগাতেন। যাতে ঐ সব ক্ষেতিতে বসে রাতেরবেলা তিনি ইতমিনান্‌সে বন্দুক রাইফেলের ঘোড়া দাবতে পারেন। বিবিকে বলতেন, চমৎকার ফসল ফলেছে এবং বাজারের সেরা দোকান থেকে চাল-ডাল সব কিনে বিবিকে দিতেন।

কোস্‌মাতে নাজিম সাহেবের ডান হাত ছিল কাড়ুয়া। আর তার ভাই আসোয়া। কাড়ুয়ার যে গাদা-বন্দুক ছিল, সে তার সঙ্গে রাতেরবেলা কথা বলত। কাড়ুয়ার এক বন্ধু নাগেশ্বরোয়াকে একটি বড়কা দাঁতাল শুয়োর ফেড়ে দিয়ে মেরে ফেলেছিল। ঘনঘোর এক বর্ষার রাতে কাড়ুয়া তার মাটির ঘরে শুয়ে আছে এমন সময় দেওয়ালের পেরেকে ঝোলানো

তার মুঙ্গেরী গাদাবন্দুক তাকে ফিসফিস করে বলল, "আর্‌রে কাড়ুয়া। নইতালাওকি বগলমে যো শটি খেতোয়া উস্‌মে শূয়ার আওলথু।" সেকথা শোনামাত্র বন্ধুর মৃত্যুর বদলা নেবার জন্যে কাড়ুয়া তার গাদা বন্দুকে আড়াই আঙুল বারুদ "কস্‌কে" গেদে নিয়ে সামনে একটি সীসার জব্বর তাল গেদে ছুটে চলল বৃষ্টির মধ্যে নইতালাওয়ের দিকে। গিয়ে দেখে, বন্দুক যা বলেছে তা হুবহু ঠিক। ঘনঘোর শটিবনের মধ্যে গুচ্ছের কাদা আর গাছ ছিটকে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ফোঁৎ-ফোঁৎ শব্দ করে শুয়োর মনের আনন্দে শটি খাচ্ছে। একটি অর্জুন গাছের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে সে "হুম্মচ্‌কে" ঝেড়ে দিল গুলিখানা। শুয়োর তো গুলি না খেয়ে বাঁই বাঁই করে পাক খেতে লাগল একই জায়গাতে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে কাদা ছিটিয়ে। কিছুক্ষণ ঘুরে শুয়োরতো পড়ে গেল। বন্ধু নাগেশ্বরোয়ার মৃত্যুর বদলা নেওয়া হল শেষমেশ।

নাজিমসাহেবের ছ'ফিট ছিপছিপে (নেয়াপাতি ভুঁড়িটা বাদ দিলে) শরীরের মধ্যে যা সবচেয়ে আগে চোখে পড়ত, তা হল তাঁর চোখদুটি। চোখদুটি যেন মুখমণ্ডল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইত। এমন গোলাকৃতি বড় ও বিপজ্জনক ও অলুক্ষণে উজ্জ্বল চোখ আমি কারোর দেখিনি। সে চোখজোড়ার গুণাবলীও ছিল অসীম। মাঝে মাঝেই নিজ খেয়ালে মোটর গাড়ির হেড লাইটের মতোই ডিমার-ডিপার হত সে চোখজোড়া। উত্তেজিত হলে ডিপার। সাধারণ অবস্থায় ডিমার।

উনি আমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে পরম স্নেহে বলতেন "হঁওড়াপুত্তান্‌"।

কোসমাতে সারারাত বন্দুক কাঁধে করে টাঁড়ে টাঁড়ে এবং জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে আমরা শিকার করতাম। পায়ে হেঁটে অন্যান্য জঙ্গলেও যেতাম। ছাড়োয়া ড্যামের পাশে শুয়োর মারতে। পদ্মার রাজার বাড়ির পেছনে। টুটিলাওয়ার পথে। কিন্তু একটি জিপের অভাব বড়ই অনুভব করতাম আমরা। যন্ত্রযান না থাকলে পৃথিবী স্বভাবতই ছোট থাকে।

এমনসময় একবার বর্ষাকালে সীতাগড়া পাহাড়ে একটি মানুষখেকো বাঘের আগমন ঘটল। সীতাগড়ার গায়ে একটি পিজরাপোল ছিল। বাঘটা প্রথমে পিজরাপোলের গরু মোষ মারতে লাগল ইচ্ছে মত। একই দিনে খেতে পারবে না জেনেও দু-তিনটে করে জানোয়ার মারতে লাগল। তারপর মানুষও মারতে শুরু করল। অবশ্য, আমরা যখন খবর পাই তখন মাত্র দুটি মানুষ সে মেরেছে।

সাইকেল রিক্সা করে সীতাগড়ার পাদদেশে পৌঁছে তো একদিন জঙ্গলের ভিতরে ঢোকা হল। নাজিম সাহেব নালার মধ্যে বাঘের পায়ের দাগ দেখালেন আমাদের। উরেবাব্বা! অতবড় পায়ের দাগ জন্মে দেখিনি। কতবড় বাঘটা কে জানে! "ড্যাডি অফ অল গ্রান্ড ড্যাডিজ।"

ঠিক হল যেখান দিয়ে বাঘের নিত্য চলাচলের চিহ্ন, সেইখানে রাস্তার পাশে একটি পিপ্পল গাছে মাচা বেঁধে বসব আমরা। নিচে গরু বা মোষ বেঁধে। কিন্তু অর্থ এবং যন্ত্রযানের অভাবে সেদিন সন্ধের মধ্যে গ্রামের মুখিয়ার অসহযোগিতাতে গরু বা মোষ জোগাড় করা গেল না। গোপালও অংশত দায়ী ছিল। খেয়ে দেয়ে পায়জামার দড়ি ঢিলে করে এক পক্কড় ঘুম না হলে তার চলত না। গোপাল বলত, ওর শরীরের ইঞ্জিনটি গরম হতে সময় একটু বেশি নেয় বটে কিন্তু একবার গরম হলে একেবারে আরবী ঘোড়া।। গোপাল সেদিনও দুপুরে ঘুমিয়েছিল তাই পৌঁছতে দেরী।

নাজিম সাহেবের বুদ্ধিই আলাদা এবং তিনি দমবার পাত্র আদৌ নন। গরুর গলার একটি ঘণ্টার সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঘণ্টাটি অনেক দূরের ঝোপঝাড়ের মধ্যের একটি বেঁটে পলাশগাছের ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে দড়ির শেষ প্রান্ত নিজের হাতে নিয়ে মাচায় বসলেন। অন্ধকার

নেমে অন্দরেতেই থেমে থেমে দড়িতে টান লাগাতে লাগলেন। ঘণ্টা বাজতে লাগল টুং টুং করে। যেন কোনো গরু বা মোষ পথ হারিয়ে গ্রামের গোয়ালে বা পিজরাপোলে ফিরতে পারেনি এবং তারই গলার ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বাঘ নাজিম সাহেবের "তিড়ি" গিলল। রাত আটটা নাগাদ বাঘ এল অতবড় বাঘ তার আগে এবং পরবর্তী জীবনেও দেখিনি কখনও। তবে বাঘ কাছে এল না। সেই পলাশ গাছের বিপরীতে পঞ্চাশ গজ দূরে একটি মস্ত কালো চ্যাটালো পাথর ছিল একমানুষ মতো উঁচু। সেই পাথরের উপরে বসে সে ঐ অজীব ঘণ্টাধ্বনির তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করতে লাগল। আমাদের কারোরই তখন রাইফেল ছিল না। তিন জনেরই বন্দুক। এবং বাঘ যেখানে বসে আছে তাতে তাকে পাঁচ ব্যাটারীর টর্চের আলোয় আবছা মতো দেখা যাচ্ছে বটে, তার চোখের সঙ্গে আলোর সংযোগ হলেই ভাঁটার মতো চোখও জ্বলে উঠছে কিন্তু বন্দুকের রেঞ্জের অনেকই বাইরে। তাছাড়া বাঘকে কখনও ক্লোজরেঞ্জ ছাড়া মারা উচিত নয় ; বন্দুক দিয়ে তো নয়ই। রাইফেল থাকলেও রাতে ঐ রেঞ্জে মারা উচিত হত না।

রাত দশটা অবধি বসে থাকলাম। বাঘ ধারে কাছেও এলো না। বোধহয় নাজিমসাহেবের খেলাটা শেষকালে ধরে ফেলে থাকবে। দশটার পর গাছ থেকে নেমে অনভিজ্ঞ আমরা অভিজ্ঞ নাজিমসাহেবের সঙ্গে সিংগল ফরমেশনে হেঁটে সাবধানে শহরের দিকে এগোলাম। বড় রাস্তায় পড়ে অত রাতে আর রিক্সা পাই না। শেষে একটি ট্রাক ধরে কাচারী অবধি আসা হলো। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে পূর্বাচলে।

হাজারীবাগের পুলিশ সাহেব ছিলেন তখন এস· সি· চ্যাটার্জি সাহেব। পূর্বাচলের কাছেই সার্কিট হাউসের উল্টোদিকের রাস্তাতে শেষ বাংলো পুলিশ সাহাবের। ছ'ফিট লম্বা অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান রাশভারী এবং একজোড়া পুরুষ্ট গোঁফের মালিক চ্যাটার্জি সাহেব। কান্‌হারী পাহাড়ে যেতে আসতে অনেকবারই দেখেছি তাঁকে বাংলো থেকে বেরুতে বা বাংলোয় ঢুকতে।

গোপাল খবর জোগাড় করল যে, চ্যাটার্জি সাহেবের নাকি প্রায় আমাদেরই সমবয়সী একটি ছেলে আছে। তাঁর বড় ছেলে। এবং তারও শিকারের সখ আছে। গোপাল বুদ্ধি করল কোনোরকমে পুলিশ সাহাবের ছেলের সঙ্গে দোস্তী করতে পারলে আমাদের জিপের অভাব হবে না!

অতএব এই মতলবে গোপাল বলল, তুমি বাংলাতে একটা ভালো চিঠি মকসো কর তারপর ধরম মালিকে দিয়ে চিঠিটি পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

চিঠিতে সীতাগড়ের মানুষখেকোর টোপটি তাকে দেওয়া গেল। যদি টোপ গেলে পুলিশ সাহেবের ছেলে।

টোপ অবশ্য সে গিলল কিন্তু দেখা গেল, বুদ্ধি সেও কম রাখে না। ধরম মালি সাইকেল করে ফিরে আসার পর পরই একটি ঢাউস কালো মার্কারী ফোর্ড চালিয়ে সুব্রত এল আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে। বলল, বাবা কাল কোডারমাতে ট্যুরে যাচ্ছেন ; বাবার সঙ্গে যাব। ফিরে আসব তরশু। ফিরেই আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।

আমি পরশুদিনই কলকাতা ফিরে এলাম। সেই ঘণ্টাবাঁধা দড়ি নিয়ে বসে থাকা রাতের পর দিন। গোপালও ফিরল আর কদিন পর। সীতাগড়ার মানুষখেকো সুব্রতর ভাগ্যেই ছিল। সে এবং টুটিলাওয়ার জমিদার ইজাহারুল হক একদিন সদ্য মারা গরুর কিল-এর উপরে শেষ বিকেলে মাচাতে বসে বাঘ মারল। বাঘের মতো বাঘ। সাড়ে দশ ফিট। এখন সেই বাঘ সুব্রতর কলকাতার মিডলটন রোডের ফাউনটেইন-কোর্টের ফ্ল্যাটের দেওয়ালে

BanglaBook.org

শোভা পাচ্ছে। সীতাগড়ের বাঘ আমাদের মারা হলো না বটে তবে সুব্রতর সঙ্গে জীবনভরের দোস্তি হলো। কিন্তু সেই দোস্তিতে শিকারের জন্যে জিপ পাওয়ার কোনোই সুবিধা হলো না। কারণ সুব্রতর বাবা, আমাদের মেসোমশাই খুব কড়া ধাঁচের মানুষ ছিলেন। অফিসিয়াল গাড়ি নিজের ব্যক্তিগত কাজেই ব্যবহার করার ঘোরতর বিপক্ষে ছিলেন উনি আর আমাদের ব্যবহার করতে দেওয়া তো দূরস্থান!

নাজিমসাহেবের দোকানের পেছনের বড়া মসজিদের গলিতে হোসেন মিঞা একটি টি এইট মডেল ফোর্ড গাড়ি সারিয়ে-টারিয়ে নিয়ে ভাড়া দিতো। গাড়িটার হুড খুলে নিলে জিপের মতো ব্যবহার করার অসুবিধে ছিলো না কোনো। মসজিদের ছায়াতে গাড়িটা পোষা জানোয়ারের মতো শুয়ে থাকতো। গ্রীষ্মের "লু" তার খোলে ধুলোময়লা বোঝাই করতো। বর্ষায় জলে পচতো। সে গাড়ি ভাড়া নিতে ক্বচিৎ কদাচিৎ কোনো নিরুপায় লোকেই আসতো। তবে একটা মস্ত সুবিধা ছিলো এই যে, গাড়িটা জলেও চলতো তেলেও চলতো। ভাড়া ছিলো সারাদিন রাতের জন্যে তিরিশ টাকা। তেল ঢালো আর "টিকিয়া-উড়ান" চলো।

তিরিশ টাকাও তখন মোটেই কম টাকা নয়। দিন-পনেরোর জন্যে আমরা হাজারীবাগে যেতাম ট্যাঁকে একশ টাকা নিয়ে। হাওড়া থেকে বম্বে মেলের থার্ড ক্লাসে বন্দুক কাঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসে শেষ রাতে হাজারীবাগ রোড স্টেশানে নেমে সারিয়া থেকে বাসে চেপে ঝিমুতে ঝিমুতে বগোদর হয়ে বিষুনগড়ের মোড় হয়ে এসে পৌঁছতাম টাটিঝারিয়াতে। টাটিঝারিয়ার একটু আগে পুবের আকাশ লাল করে ভোর হতো। টাটিঝারিয়ার পণ্ডিতজীর দোকানে আমরা নিমকি আর কালাজামুন আর মশলা দেওয়া চা খেয়ে রাতের ক্লান্তি অপনোদন অবদমন করতাম।

যাই হোক, গোপালের বুদ্ধিতে আমরা হোসেনের গাড়ি এক রাত ভাড়া করে একটা "গ্যাম্বল" নিলাম। সুব্রত তখন গোমিয়াতে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস্-এর যে নতুন কারখানা চালু হয়েছে সেখানে চাকরিতে জয়েন করেছে। তখন ছুটির সময় ছাড়া আসতে পারতো না। সুব্রতর ছোট ভাই মুকুল ছিলো। ততদিনে মেসোমশাই পুলিশসাহাব হিসেবে রিটায়ার করে কানহারী হিল রোডেই বাড়ি কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। ইউক্যালিপটাস গাছের সরণি ছিলো বলে বাড়ির নাম রেখেছিলেন "দ্যা ইউক্যালিপটা"। ইউক্যালিপটাস্-এর প্লুরাল ইউক্যালিপ্টা। ওঁদের বাড়িতে অনেকখানি জায়গা ছিলো। ইউক্যালিপটা ছাড়াও খুব ভালো ভালো আমের গাছ ছিলো। গরমের সময়ে খুব আম খেতাম আমরা। রান্নাঘর থেকে খোয়াই পেরিয়ে ঝাঁটি জঙ্গলে ভরা টাঁড় এবং গয়া রোড দেখা যেত। মাসীমা দারুণ ওমলেট বানাতেন। অন্যান্য সব রান্নাও দারুণ করতেন। আমার সঙ্গে কড়ার ছিলো খাওয়ার টেবলে বসে গান গাইতে হবে মাসীমা যতক্ষণ রান্না করবেন।

গোপালও ফরমায়েস দিয়ে গান শুনতো। বর্ষার দিনে "মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে" ছিলো ওর অন্যতম প্রিয় গান। তাত্ত্বিকেরা ঝগড়া করুন গিয়ে এ গানটি বর্ষা পর্যায়ের না পূজা পর্যায়ের, গোপালের শুনতে ভালো লাগতো এবং আমার গাইতে। সুতরাং ও সব তত্ত্ব নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা ছিলো না।

যাই হোক গোপাল তো গাড়ি ভাড়া করে ফেললো। মুকুল, আমি, গোপাল নাজিমসাহেব এবং ভুতো পার্টি। ভুতো ছিলো গোপালের চামচে তথা দক্ষিণ কলকাতায় ওর একটি মোটর গ্যারাজ ছিলো। বয়স সতেরো কি আঠারো হবে তখন। চারকোণা, এঁচড়েপাকা মুখ। পরনে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-বসন্ত জিন-এর ট্রাউজার এবং চকরা-বকরা গেঞ্জি।

BanglaBook.org

হাজারীবাগের বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ানো শীতেও ও যে কী করে ঐ পোশাকে কাটিয়ে দিতো ভেবে পেতাম না। ভুতো খুব ভালো গাড়ি চালাতো। অসম্ভব কষ্টসহিষ্ণু ছিলো খিদেতৃষ্ণা শীত গরম বলে কিছুই ছিলো না ওর। এবং সবচেয়ে যা বড় কথা চমৎকার 'কম্পানি' ছিলো। ওর চারপাশে যা কিছুই ঘটুক না কেন এবং যে-ই তা ঘটাক না কেন, (আমি এবং গোপাল ইনক্লুডেড) তারই মধ্যে ও হাসির খোরাক খুঁজে পেতো। ভুতো সঙ্গে থাকলে কারোই মুখ-গোমড়া করে থাকার উপায়ই ছিলো না।

সন্ধের পরপরই একদিন কপাল ঠুকে আমরা তো টুটিলাওয়ার দিকে চললাম হোসেন মিঞার গাড়ি চেপে। সামনের সিটে আমি ও গোপাল এবং হোসেন মিঞা। পেছনের সিটে ভুতো, মুকুল এবং নাজিমসাহেব। সবে বনাদাগ পেরিয়ে ডানদিকে গোন্দা ড্যামের অন্ধকার ছায়া পেরিয়ে আমরা করোগেটেড কাঁচা কিন্তু পাথর-কঠিন পথে ঢুকেছি। দু দিকে তখনও ছাড়া ছাড়া জঙ্গল, ঝাঁটি জঙ্গল এবং টাঁড়। ঐ জঙ্গলে ছিলো ময়ূর খরগোস তিতির বটের আর কালিতিতিরের আড্ডা। তবে খরগোস ছাড়া অন্যদের রাতের বেলা দেখার কথা ছিলো না। পথ আরোও এগোলে তবে জঙ্গল দু পাশেই ঘনতর হয়েছে। কিন্তু বেশিদূর যেতে হলো না। তার আগেই পথের ডানদিকের ঝাঁটি জঙ্গল ভেদ করে ধাড়ি—মদ্দা-মাদী-বাচ্চায় মিলিয়ে প্রায় শ দেড়েক বুনো শুয়োর রুট-মার্চ করে রাস্তা পেরিয়ে বাঁদিকের জঙ্গলে যাচ্ছিলো। আর যায় কোথায়! প্রত্যেকের বন্দুকই অগ্নিবর্ষণ করলো। এবং অত শুয়োর একসঙ্গে দেখার উত্তেজনাতে মুকুল পেছনের সিটে বসেই একটি আহত এবং পলায়মান শুয়োরের গতিরোধ করার মহৎ প্রচেষ্টায় আমার মাথার আধ ইঞ্চি পাশ দিয়ে তার বুলেট ছুটিয়ে দিলো। ব্যারেলে এল· জি· থাকলে সেদিনই খেলখতম্ হয়ে যেতো। বাবাগো! বলে মাথা নিচু করে বসে পড়লাম আমি। প্রায় এক মাস ডান কানে ভালো শুনতে পাইনি তারপর।

প্রাণ যখন সে যাত্রা বেঁচেই গেলো তখন চেয়ে দেখলাম সামনে শুয়োরের ডানকার্ক। আটটি শুয়োর পড়ে রয়েছে। আর বাকিরা মেদিনী কাঁপিয়ে ধুলোর ঝড় তুলে মিশ্র চিৎকারে রাতের শান্তি চিরে দিয়ে ধপ্পর-ধাপ্পর করে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বাঁদিকের বনের গভীরে। গুলির শব্দেও কিন্তু ওরা পথ বদলায়নি। একেই বলে শুয়োরের গোঁ।

নাজিমসাহেব কোনো কিছু শিকার হওয়ামাত্রই দৌড়ে গিয়ে সে জানোয়ারকে 'হালাল' করেন তাঁর চাকু দিয়ে। আড়াই প্যাঁচ না মারলে তাঁর ধর্মে কোনো কিছুই খাওয়া মানা। তবে সে জানোয়ার জীবিত কী মৃত তার উপরে নাজিমসাহেবের হালাল নির্ভর করতো না। অনেক আগেই পটল-তোলা জানোয়ারকেও অবলীলায় হালাল করে দিতেন। তবে শুয়োরের বেলা নাজিমসাহেবের কোনো ঔৎসুক্য ছিলো না। হারামজাদারা অস্পৃশ্য। ইসলাম ধর্মে শুয়োর হচ্ছে হারাম আর অন্য ধর্মাবলম্বীরা "কাফির" বা অবিশ্বাসী।

আইডিয়াটা প্রথমে ভুতোর মাথাতেই খেলে গেলো আমরা ভাবছিলাম শুয়োরগুলো কোসমা গ্রামের লোকেদের দিয়ে দেব। কাড়ুয়াকে দলপতি করে ওরা মহানন্দে খাবে। আমাদের দেশের গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষরা, আদিবাসীরা, শুয়োরের মাংস যেমন আদর করে খায় আর কোনো মাংসই বোধহয় তেমন নয়। কিন্তু ভুতো বললো, আমাদের ক্যাশ নেই। চলুন শুয়োরগুলো নিয়ে গিয়ে হাজারীবাগে সর্দারজীদের হোটেলে বেচে দি। সর্দারজীরা শুয়োর খেতে খুব ভালোবাসে আর হাজারীবাগে সর্দারজী নেহাৎ কমও নেই।

গোপাল বললো, ভালো আইডিয়া।

আমি গোপালকে বললাম, সবচেয়ে যেটা ছোট সেটাকে রেখো, মাংস নদনদে হবে আর

BanglaBook.org

তোমার হাতের 'পর্ক ভিণ্ডালু' যা হবে ঐ শুয়োরে

অতএব তক্ষুনি আমরা সে রাতের মতো শিকার-যাত্রা শেষ করে হাজারীবাগে ফিরলাম

গোপাল বললো, আমি এ সবের মধ্যে নেই এসব ছোটোলোকামি ! সোজা বাড়ি চলো। ভুতো বললো, ছোটলোকামি না করে কে কবে বড়লোক হয়েছে ? আমি ছোটলোকই, যা করার সব করব। পূর্বাচলের গারাজের সামনে শুয়োরগুলোকে সার সার শুইয়ে রাখুন, আমি সর্দারজীদের ডেকে নিয়ে আসছি।

আমরা যখন শোবার আয়োজন করছি, তখন দেখি ভুতো সত্যি সত্যিই চার-পাঁচজন সর্দারজীর সঙ্গে গারাজের সামনে শুয়োরের দাম নিয়ে "হিগল" করছে। সব সুদ্ধু তিনশো পঁচিশ টাকা পাওয়া গেছিলো শুয়োর বিক্রি করে। হোসেনের গাড়ির দশদিনের ভাড়া গুণেও আরও হাতে থাকবে চা পান সিগারেটের জন্যে কিছু। রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাওয়ার আনন্দে সে রাতে আমাদের ভালো ঘুম হলো না।

কিন্তু হোসেনের গাড়ি হোসেনেরই গাড়ি। আমরা প্রত্যেকেই রিস্‌ল্‌ভ করেছি যে সি· এ পাশ করে রোজগার করতে আরম্ভ করলেই সবচেয়ে আগে যা চাই তা একটা নিজস্ব গাড়ি। কিন্তু তখনও আমরা ছাত্রই।

আমরা কলকাতায়। গোপাল একদিন ফোন করে বললো যে মুকুল চিঠি লিখেছে নাজিমসাহেব নাকি গাড়ি কিনেছেন। কথাটা বিশ্বাস হলো না। নাজিমসাহেব সাইকেলেই যাতায়াত করতেন এবং মসজিদের কাছে মুসলমান এলাকাতে দু পাশে দুর্গন্ধ কাঁচা নর্দমাওয়ালা কাঁচা রাস্তার উপরে একটি বারান্দাওয়ালা একতলা বাড়িতে থাকতেন। সম্ভবত ভাড়া বাড়ি।

কিন্তু অবিশ্বাস করারও কিছু রইলো না কারণ গোপাল নিজেও চিঠি পেলো। "গাড্ডি মুলায়া। ফরন্‌ন্‌ চলা আইয়ে। শিকার খেলেঙ্গে।" আমাকে কিছু লেখেননি। নাজিমসাহেব আমাকে কিছুদিন চিঠি লেখা বন্ধ করেছিলেন। তার পেছনে একটি কারণও ছিলো। ইংরিজিতে উনি তেমন দড় ছিলেন না। না-থাকাটা লজ্জারও কিছু নয়। যতই হোক ইংরিজি তো বিজাতীয় ভাষা। একটি পোস্টকার্ড লিখেছিলেন উনি আমাকে, প্রসঙ্গত লিখেছিলেন যে "আই অ্যাম সরী টু টেল ইউ দ্যাট মাই এল্ডেস্ট সান ডায়েড প্রেজেন্ট স্যাটরডে।"

এখন, নাজিমসাহেবের এল্ডেস্ট সন-এর নাম ছিলো ওয়াজ্জু মহম্মদ।

ওয়াজ্জু আমাদের সঙ্গে কোসমাতে যেত। ভারী ছটফটে ছেলে ছিলো। সবসময় হিন্দী সিনেমার গান গাইতো। নাজিমসাহেবের কোসমার চালাঘরে একবার সে বেমক্কা লোডেড পয়েন্ট টু-টু রাইফেলের ঘোড়া টেনে দিয়ে আমাকে প্রায় কাবাব বানিয়ে দিয়েছিলো। ওয়াজ্জুর বয়স তখন হবে ষোলো সতেরো। আমি তো শোকে অভিভূত হয়ে লম্বা চিঠি লিখলাম নাজিমসাহেবকে "মে হিজ সোওল রেস্ট ইন পিস টিস" বলে। তারপর গোপালের সঙ্গে একদিন ফোনে কথা হতে যখন ওকে একথা বললাম, গোপাল বললো সর্বনাশ করেছো। ওয়াজ্জু তো মারা যায়নি, মারা গেছে নাজিমসাহেবের বারো না তেরো নম্বর ছেলে। তখনকার মতো যে ইয়াংগেস্ট সে। ছ মাস বয়স হয়েছিলো।

আমি তো যাকে খবরের কাগজের ভাষায় বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তাই। টেলিগ্রাম করলাম ওয়াজ্জুর দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা জানিয়ে, নাজিমসাহেবের কাছে ক্ষমা চেয়ে।

তারপর থেকেই নাজিমসাহেব আমাকে আর ইংরিজিতে কোনো চিঠি লেখেননি। পরে যখন চিঠি লেখা আবার শুরু করলেন তখন হরফটি ইংরিজি কিন্তু বয়ানটি উর্দুমিশ্রিত

BanglaBook.org

HZB 23.12.58

MY DEAR LALABABU.

AP KYSE HAI ? KHUDAKI DOYASE HAMLOG SABEE THIKHI HAI. HIAN THANDA BARA JOR-PARI HAI. KULTHIME SAMBAR AA RAHA HAI. GONDA AUR CHAROA ME GEESE AUR NAKTA DUCH AA PAHUCHA HAI. TIKHORI-PITIZME ALBINO TIGARKI KHABAR HAI.

FARANN CHALA AIYEGA GOPALBABUKA LE KAR.

FATHER, MATHER KI KHUS KHABARE VEJIYEGA. APKI LIYE DUA.

APKI, MD NAZIM.

গোপাল বলল, ব্যাপারটা তো সরেজমিনে তদন্ত করতে হয়। ভুতোকে চাঁদা করে পাঠিয়ে দেওয়া যাক ফার্স্ট হ্যাণ্ড ইনফর্মেশন নিয়ে আসতে। নাজিমসাহেবের গাড়ি সম্বন্ধে।

ভুতো গেলো হাজারীবাগ এবং ফিরেও এলো। এসে যা বললো, তা শুনে আমরা তাজ্জব বনে গেলাম। নাজিমসাহেব নাকি পাঁচশো টাকা দিয়ে একটি গাড়ি কিনেছেন ড্রাইভারসমেত। নাইনটিন থার্টিফোর মডেলের গাড়ি। কাঠের স্পোক, মেটাল রাবারের টায়ার। ড্রাইভারও ঐ একই মডেলের। চেহারাটি হুবহু আমেরিকান আর্মির ডিসপোজালের জিপগাড়ির শক-অ্যাবজর্বারের মতো। তার পোয়জামাটিও নাইনটিন থার্টিফোরের। এখন ছিঁড়ে ছোট হতে হতে আণ্ডারওয়্যার হয়ে গেছে। গাড়ি নাজিমসাহেবের বাড়ির বারান্দায় রাখা আছে।

বারান্দায় রাখা আছে মানে ?

আমরা সমস্বরে ভুতোকে জেরা করলাম।

ভুতো বললো, সত্যি ! মুরগি যেমন করে ডিমে তা দিতে বসে, নাজিমমিঞার গাড়িও তেমনি করে পাঁজা-করা ইটের উপরে বসে ইটে তা দিচ্ছে।

কেন ? কেন ?

আমরা গেলে তো গাড়ির উপর প্রচণ্ড ধকল যাবে তাই গাড়িকে এখন হান্ড্রেড-পার্সেন্ট রেস্ট-এ রাখা হয়েছে।

BanglaBook.org

গোমিয়াতে সুব্রতকে একটা টেলিগ্রাম করে দিয়ে আমরা এক রাতে বম্বে মেলে চড়ে পড়লাম। বলা বাহুল্য ফারস্ট-ইনফরমেশান-রিপোর্ট-ফেচার ভুতো পার্টিও সঙ্গে চললো।

পরদিন ভোরে বাস থেকে নেমে সাইকেল রিক্সা নিয়ে একেবারে সোজা নাজিমসাহেবের বাড়ি। গাড়ি দেখে চক্ষু কর্ণ সার্থক হলো। ড্রাইভার মকবুল মিঞাকে দেখেও। গাড়িটি নাকি গয়ার এক বাইজীর ছিলো। তার পসার গেছে তখন, চোখে দেখে না ভালো, গলার আওয়াজ হয়ে গেছে গিধ্‌ধর এর মতো। ছেলে নেই। মেয়ে নামী বাইজী হয়ে বেনারসের ডাল-কা-মণ্ডিতে চলে গেছে। মাকে দেখে না। তাই সস্তাতে গাড়ি আর ড্রাইভার মেরেছেন নাজিমসাহেব। এক দাওয়ে।

ড্রাইভার মকবুল মিঞা গাড়িকে নিজের বিবির চেয়েও ভালোবাসে। এমন ভালোবাসা যন্ত্রের প্রতি কোনো মানুষের যে আদৌ থাকতে পারে, তা ভাবা পর্যন্ত যায় না। কোনোই দোষ নেই মিঞার। শুধু সবসময় আফিং খেয়ে থাকে। আর একটু রাত-কানা।

ভুতো বললো, তা জঙ্গলে তো আমরা রাতেও যাবো।

তাতে কিছু হবে না। গর্ত-টর্ত দেখতে পায় না, তাবলে পথ কি আর দেখতে পায় না?

নাজিমসাহেব আমাদের ডাঁটকে ডিমের ওমলেট আর গরম গরম পরোটা খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, ঠিক সন্ধে সাতটার সময় পূর্বাচলের সামনে গাড়ি পৌঁছবে। রাত জেগে আসা হয়েছে, বাড়ি গিয়ে ভালো করে খেয়ে দেয়ে ঘুম লাগাও। এদিকে আমার গাড়িকেও তো জাগানোর বন্দোবস্ত করতে হবে। সে তো প্রায় মহানিদ্রায় আছে। কুম্ভকর্ণরই মতো অবস্থা।

আমি গোপালকে বললাম, সাইকেল রিক্সাতে বসে, বুঝলে, ও গাড়িকে জাগানোর সাধনার চেয়ে শবসাধনাও সোজা।

গোপাল সিগারেটটা কাঁচা নর্দমাতে ছুঁড়ে ফেলে বললো, এ যাত্রা প্রাণে বাঁচলে হয়!

"সেজেগুজে রইলো রাই এই লগনে বিয়া নাই।" সাতটার সময়েই আমরা সকলে তৈরি। সুব্রতও টেলিগ্রাম পেয়ে এসে গেছে। তবে, কাল বিকেলেই ওকে ফিরে যেতে হবে। পরশু সকালে ডিউটিতে লাগতে হবে। চমনলাল একেবারে লাজোয়াব খিচুড়ি করেছিলো। দুপুরে মাংসর ঝোল আর ভাত খেয়ে ঘুম লাগিয়েছিলাম জোর। প্রচণ্ড ঠাণ্ডাও পড়েছে। আর তেমনই মশা এবারে।

আটটা বাজলো, নটা বাজলো, তবু নাজিমসাহেবের গাড়ির পাত্তা নেই। ভুতো যখন অধৈর্য হয়ে শুতে চলে যাবে বলে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে এবং আমরাও যখন ড্রইং রুমের সোফাতে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছি প্রায়, এমন সময় কী এক প্রাগৈতিহাসিক জন্তু হঠাৎই ডেকে উঠলো বাইরে।

BanglaBook.org

সুব্রত বললো, ডাইনোসর।

সকলে মিলে বাইরে বেরিয়ে দেখি ডাইনোসরের সমসাময়িক একটি বুনো শুয়োর রাগে থরথর করে কাঁপছে গেটের সামনে। আর পেছনের সাইলেন্সার পাইপ দিয়ে দুর্বাসা মুনির চোখের আগুনের মতো আগুন বেরোচ্ছে।

আমাদের 'থ' মেরে থাকতে দেখে নাজিমসাহেব ধমকে বললেন "ক্যারে ছঁওড়াপুত্তানলোগ ? যানা হ্যায় কি নেহি ? জল্‌দি আইয়ে বড়ী দেড় হো গ্যয়া"।

বড় সাধ করে আমেরিকান আর্মির অফিসাররা যে উলেন "ব্যারেথিয়ার" পোশাক পরতেন সেই 'ব্যারেথিয়ার' একটি শিকারের পোশাক বানিয়েছিলাম। নাজিমসাহেব পেছনের সিটের ডানদিকে বসেছিলেন। আমাকে আর গোপালকে ডাকলেন পেছনে। গোপাল উঠে গেল। ওর পিছু পিছু আমি উঠে যেই বসেছি অমনি সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আমার ছাপু কামড়ে ধরলো। সদ্য-বসা অবস্থা থেকে যেই নিজেকে উত্থিত করার চেষ্টা করেছি অমনি ব্যারেথিয়ার ট্রাউজারের পশ্চাৎদেশের আধগিরে কাপড় সীটেই সেঁটে রয়ে গেল। ভালো করে চেয়ে দেখি, ন্যাংটো কয়েল-স্প্রিং,উপরে আনন্দবাজার গঁদের আঠা দিয়ে সাঁটা।

ন্যাংটো কয়েল স্প্রিংই আমার ব্যারেথিয়ার ট্রাউজার-খাকি।

তখন আর কিছু করার নেই। প্রায় ন্যাংটো নিজস্ব পশ্চাৎদেশ পুরো ন্যাংটো কয়েল স্প্রিংকে সঁপে দিলাম।

সকলে উঠলে গাড়ি ছেড়ে দিলো। সেতো গাড়ি ছাড়া নয়, মনে হলো খুলনার স্টিমারঘাটা থেকে 'ফ্লোরিকান' স্টিমার ছাড়লো বরিশালের পথে। সে যে কী আলোড়ন ! বাষ্পর উত্তাপ ! জলের ফোঁস্‌ফোঁসানি ! এঞ্জিনরুমের গড়গড় ধড়ফড় !

গাড়ি চলতেই দেখলাম, দুদিকের হেডলাইট দুটি নড়বড় করছে। দুদিকের হেডলাইটের আলোই একবার পথে পড়ছে আবার পরক্ষণেই জঙ্গলে গিয়ে পড়ছে।

নাজিম সাহাব। ঈ ক্যা ?

গোপাল সারকাস্টিকালি শুধোলো।

নাজিমসাহেব ওপিয়াম-সেবক মৌনী তাপসের মতো ধ্যানমগ্ন ড্রাইভারের দিকে একবার তাকিয়েই বললেন "আরে ছঁওড়াপুত্তান ! শিকারকি গাড্ডিকি হরকৎ তো এইসাহিনা হোনা চাহিয়ে ! বুঝতে না পেরে গোপাল বললো কৈসান ?

একদফে জঙ্গল একদফে রাস্তা, একদফে রাস্তা, একদফে জঙ্গল ! হাঁ। তব্ না শিকারকি গাড্ডি।

গাড়ির এঞ্জিন গরম হতে না হতেই এতোদিন যে অসংখ্য নেংটি ইঁদুর এঞ্জিনের খোলের মধ্যে, সিটের মধ্যে, বনেটের নিচে সুখে ঘরকন্না করছিলো তারা সব একে একে তিড়িং বিড়িং করে বেরুতে লাগলো।

আমাদের গায়ে মাথায় লাফালাফি করতে লাগলো।

আমরা হতভম্ব।

নাজিমসাহেব তাঁর নতুন গাড়িতে চড়ার আনন্দে উত্তেজিত।

টুটিলাওয়াতে পৌঁছে ইজাহারের ভাণ্ডারে লোকজনকে তুলে দারচিনি লবঙ্গ দেওয়া চা বানিয়ে নাজিমসাহেব খাওয়ালেন আমাদের। ইজাহার ও বাড়িতে ফসল ওঠবার সময়ে অথবা কোনো গণ্ডগোল হলেই আসে। পাথরে তৈরি বাড়িখানি। মুসলমানী কায়দায়। বাহিরমহল, অন্দর, মধ্যে খোলা বারান্দা, আকাশ দেখা যায়, বৃষ্টিতে ভেজা যায়।

BanglaBook.org

তারপর গাড়ি চললো ওল্ড চাতরা রোড ধরে। ইতিমধ্যে পথের কত গ্রামের কত দুর্বল চিত্ত নারী পুরুষ যে গাড়ির হর্ন শুনে ঘুমের মধ্যেই হার্টফেল করে মারা গেলো, তার খোঁজ কেউই রাখলো না। এতো হর্ন নয়, কোনো প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের গলার আওয়াজ। কঁ-রঁ-র-র-র-র্-কঁ-র-র-র্ আচমকা ঐ আওয়াজে টুটিলাওয়াতে ঢোকার আগে পথের পাশে একটি বাড়ির সামনে বেঁধে-রাখা টাট্টুঘোড়া চিৎপটাং করে পড়ে গিয়ে চিঁহ-হ্-হ-হ্-হ্-চিঁ-হ্-হ্-হ্-হ্ করে ডাকতে লাগলো। তার ডাক শুনেও যে কত লোক অজ্ঞান হলো ঈশ্বর জানেন। খারাপ বা ভালো সব ক্রিয়ারই চেইন-রি-অ্যাক্শান হয়ই। অ্যাকশান হলেই রি-অ্যাকশান হতেই পারে।

কিছুদূর যাবার পরই পথের ডানদিকে একটি প্রাচীন অগণ্য ঝুরিনামা বটগাছের পেছনে একটি আদিমকালের শম্বরকে দেখা গেল। তার মতো শিঙাল, ওড়িশা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, বা মধ্যপ্রদেশের কোনো জঙ্গলেই দেখিনি।

নাজিমসাহেব টুটিলাওয়াতে চা না খেয়ে মহুয়া খেয়েছিলেন। ওখানে থামার আসল কারণ সেইটাই। বললেন, আমার নতুন গাড়ি এবং নতুন রাইফেলের বউনি করবো আজকে। কিন্তু সামনে দণ্ডায়মান অতবড় শিঙাল শম্বর! কে তখন নাজিমসাহেবের সেন্টিমেন্টের কথা ভাবে? শিকারিমাত্রই অকৃতজ্ঞ। নইলে যার দৌলতে, যার গাড়িতে এই অকুস্থলে আসা তারই অনুরোধের উপরে আমরা জল ঢালি অমন করে? আমরা তো গুলি করেছিলাম। কে আগে করলো মনে নেই। কিন্তু দু তিনটে গুলি হতেই বোঝা গেল যে বন্দুকের গুলি শম্বরের কাছ অবধি পৌঁছচ্ছেই না। বটগাছের ঝুরিতে আটকে যাচ্ছে। নয়তো প্রতিসরিত হয়ে যাচ্ছে ঝুরিতে লেগে। সকলেই একটি করে গুলি করে যখন বোঝা গেল যে, এ হয় "বনদেওতার শম্বর" নয় একে বন্দুক দিয়ে মারা সম্ভব নয়।

নাজিমসাহেব যাত্রার নায়কের মতো পেছনের সিটে দাঁড়িয়ে উঠে নিজের নতুন ফোরফিফটি ফোর হান্ড্রেড রাইফেলটি নিয়ে এক পা পেছনের সিটে রেখে এইম নিলেন। এইম নেবার মতো অবস্থা তখন তাঁর ছিলো না। রাইফেলের ব্যারেলটা একবার আকাশের দিকে আরেকবার মাটির দিকে হচ্ছিলো। আমরা তাঁর মার্কসম্যানশিপের উপর ভরসা করতে পারছি না দেখে উনি ধমকে বললেন, আপনারা সব লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমার গুলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে যাবেন। শম্বর তো পড়বেই! কিন্তু যদি আহত হয় তবে যেন পালাতে না পারে। টেংরি দু হাতে চেপে ধরে থাকবেন তাতে চাই চাঁদিই ফাটুক কী অণ্ডকোষ!

আমরা তো রেডি, গোট, সেট হয়ে পথের উপরে শম্বরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভুতোর ধরে থাকা স্পটলাইটের আলোয় তার চোখ দুটি মস্ত বড় দুটি সবুজ পান্নার মতো জ্বলছিলো।

গদ্দাম্ শব্দ হতেই আমরা 'গো' বলে দৌড়লাম। হড়বড়িয়া-খরবরিয়া মুকুল তো বটের শিকড়ে পা জড়িয়ে দড়াম্ করে একটা আছাড় খেলো। ভাগ্যিস বন্দুকের গুলি ছুটে যায়নি বা বন্দুক ভাঙেনি। আমরা ততক্ষণ অকুস্থলে পৌঁছে গেছি। কিন্তু কোথায় শম্বর? তার চিহ্নমাত্রও নেই। অথচ শম্বর বেশ শব্দ করে, চলাফেরার সময়। অতবড় শম্বরটা পালালেও তার শব্দ আমাদের পাওয়া উচিত ছিলো অথচ আমরা কেউই কিছু শুনিনি। অনেক দূর অবধি খুঁজেও যখন শম্বরের কোনো হদিসই পেলাম না, না রক্তর দাগের না পায়ের দাগের, তখন বিফল মনোরথ হয়ে আমরা গাড়ির দিকে ফিরে এলাম।

BanglaBook.org

পথের উপরে উঠেই দেখি ড্রাইভার সাহাব স্টিয়ারিং-হুইলের উপরে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছেন আর নাজিমসাহেব বেমালুম গায়েব। আর একটু এগোতেই বোঝা গেল যে পুরোপুরি গায়েব নন পেছনের সিটের বসবার কয়েল স্প্রিং-এর উপর দিয়ে একটি জুতোসুদ্ধ খাকি-ট্রাউজার পরা পা অন্ধকার কিন্তু নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে একক বিদ্রোহের মতো উঁচিয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখি, নাজিমসাহেব অজ্ঞান। লোডেড রাইফেলকে প্রায় বুকের সঙ্গে জড়িয়ে তিনি এক পা উঁচিয়ে পড়ে আছেন। সঙ্গে একটা জলের বোতলও নেই। তাঁকে ধরে পথের পাশের শিশিরভেজা ঘাসে শুইয়ে একটু দূরের পাহাড়ি নালা থেকে জেরিক্যানে করে জল এনে ওঁর মাথায় বারে বারে থেবড়ে থেবড়ে দিতেই ওঁর জ্ঞান ফিরলো।

বললেন, লেতে আয়া শম্বর ?

আমরা চুপ করে রইলাম।

নাজিমসাহেব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

আমরা বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু উনি কেবলি একই কথা বলেন। বেশি মহুয়া সেবনের ফল।

গাড়িতে আবার সকলে উঠে রওয়ানা হতেই দেখা গেলো, সামনে-বসা ভুতোর মাথাটা একবার উঁচু আরেকবার নিচু হচ্ছে।

ব্যাপার কি ? আজ কি সত্যিই ভূতপ্রেতে ধরলো নাকি আমাদের। ভুতোকে বলতেই ভুতো গাড়ি দাঁড় করিয়ে নিজেই হিপ পকেট থেকে ছোট্ট টর্চ বের করে ব্যাপারটা ইন্‌ভেস্টিগেট করে বললো, নাঃ ! ঠিক আছে।

কি ঠিক আছে ?

সলিড রাবারের টায়ার তো ! গাড়ি রেস্ট পীরিয়ড-এ থাকাকালীন ছুঁচোতে টায়ারের মিস্টি রাবার খোদল-খোদল করে খেয়ে গেছিলো। সেই খোঁদলগুলো বোজানো হয়েছে অন্য গাড়ির বাতিল টায়ারের বিভিন্ন অংশ কেটে তা পেরেক দিয়ে সেঁটে। ফলে, জায়গাগুলো টিউমারের মতো ফুলে ফুলে উঠেছে টোপা টোপা হয়ে। যখনি ফোলা জায়গাগুলো মাটির সংস্পর্শে আসছে অমনি গাড়ি তড়াক্ করে উঁচু হয়ে যাচ্ছে পরক্ষণেই আবার নিচু।

আধ মাইলটাক যাবার পর দূর থেকে একটি শুকনো নালা দেখা গেলো। তার উপরে একটা "কজওয়ে"। নাজিমসাহেবের গাড়ি যেই সেই কজওয়ের উপরে এসেছে অমনি "ইয়া আল্লা" বলে তিড়িং করে ড্রাইভার মকবুল মিঞা এক লাফ মেরে উঠলো স্টিয়ারিং ছেড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়িও পড়লো গোঁত্তা মেরে। নদীতে। চার ফিট উঁচু থেকে বালিতে পড়ায় এবং ভাগ্যক্রমে ওখানে কোনো পাথর টাথর না-থাকায় আমাদের কারোরই মারাত্মক চোট লাগলো না। কিন্তু কি হলো ? কি হলো ? কেন এমন হলো ? যে গাড়ি ড্রাইভারের জিগরি-দোস্ত সেই গাড়িই এমন বিশ্বাসঘাতকতা করলো কেন ?

মকবুল মিঞাকে জেরা করে জানা গেল যে, একটি নেংটি ইঁদুর মকবুল মিঞার থার্ট্রি টু মডেলের আন্ডারওয়্যার হয়ে-যাওয়া পায়জামার মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়েছিলো। তা বেচারি মকবুল মিঞা জান বাঁচাবে, না গাড়ি। নাজিমসাহেব আমাদের এবম্বিধ কথোপকথনে বিরক্ত হয়ে বালিতে শায়িত অবস্থাতেই বললেন "হামারা গাড্ডিকি ক্যা কসুর ? কসুর যো-কুছ উও সুরতহারাম মকবুল মিঞাকি।"

BanglaBook.org

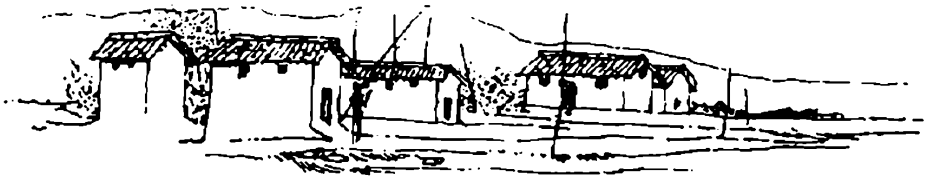

টুটিলাওয়ার জমিদার ইজাহারুল হক ছিলেন পোশাকে আশাকে ফুল বাবুটি। তাঁর চুলের যেমন যত্ন ছিল, গাড়িরও তেমন। তবে ইজাহারুলের সঙ্গে আমি টুটিলাওয়া এবং ক্রোসমাতেই যা কয়েকবার একসঙ্গে হাঁকোয়া শিকার করেছি। অন্যত্র বিশেষ নয়।

হাওড়ার দাশনগরের আলামোহন দাশের একটি বাড়ি ছিল কান্‌হারী হিল রোডে। এখনও আছে। আলামোহনবাবুর মধ্যম পুত্র প্রভাত ছিল খুব ভালো স্কিট্ ও ট্র্যাপ শুটার। দাশনগরে ওরা গান ক্লাবের পত্তন করেছিল ক্লে-পিজন্ শুটিং এবং ডিস্ক শুটিং-এর জন্যে।

প্রভাতের ব্যবহারের কোনো তুলনা ছিল না। অমন সদাশয় সদাহাস্যময় মনের বড়লোকের ছেলে বেশি দেখিনি। প্রভাতের ছোট দুই ভাই রবি ও চাঁদুও ভাল শুটার ছিল। প্রভাত ওলিম্পিকেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছে। দিল্লির সফদরজঙ্গ এয়ারপোর্টের কাছের রেঞ্জে ওরা যখন ওলিম্পিকের ট্রায়ালের জন্যে প্র্যাকটিস করতো, তখন ষাটের দশকের মাঝামাঝি, আমি কাজে দিল্লি গেছিলাম। ঋতুও গেছিলেন আমার সঙ্গে। ন্যাশনাল প্রোগ্রামে গান গাইতে। তখন প্রভাত রোজ এসে জোর করে আমাদের হোটেল থেকে ধরে নিয়ে যেতো। প্রণবও ছিল। আসানসোলের নর্থ ব্রুককোলিয়ারির প্রণব রায়। কাত্‌রাসের বদীবাবুর ভাইপো। বিকানীরের মহারাজা, কোটার মহারাজা এবং যোধপুরের মহারাজার সঙ্গে প্রভাতই আগ্রহ করে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ওলিম্পিক ট্রায়ালের সময়ে।

গোপালের সঙ্গে প্রভাতের লেগে যেতো শিকারের সংখ্যা নিয়ে। দাশ-ভাইয়েদের হাত যেমন ভালো ছিল, তাদের দিশাও ছিল রাক্ষুসে। মুরগী তিতির যদি হাঁকা করে মারলো তো বন ফাঁক করে দিলো। নাক্‌টা বা গ্যাডোয়াল হাঁস তিলাইয়া ড্যামে গিয়ে মারলো তো দু-তিনশো মেরে আনলো। রাজা মহারাজাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করে ওদের শিকারের মেজাজটাও হয়ে গেছিলো রাজা-মহারাজাদের মতো। এই ব্যাপারে জেদাজেদি করে গোপাল একবার প্রভাতকে খুব জব্দ করেছিল। তখন আমি হাজারীবাগে। প্রভাত এলো সন্ধেবেলা। বললো, কাল সকালে ক্রোসমাতে বীট করিয়ে মুরগী-তিতির-কালিতিতির মারবো। ভোর পাঁচটাতে যাবো।

গোপাল বললো, তোরা গেলেই তো সব পাখি মেরে শেষ করবি। চুক্তি করতে হবে পাখির সংখ্যা নিয়ে। যতটুকু খাওয়ার জন্যে দরকার তার বেশি মারা চলবে না।

প্রভাত বললো, তুমি মেলা জ্ঞান দিও না তো, গোপালদা। আমি যদি যাই তুমি ঠেকাতে পারবে ?

গোপাল বললো, না। তা আর কি করে পারবো। জঙ্গল তো আমার কেনা নয়।

কিন্তু প্রভাত চলে যেতেই গোপাল চমনলালকে দিয়ে ধরম মালিকে ডেকে পাঠালো এবং ওকে শর্টকার্ট-এর পথ দিয়ে রাতারাতিই ক্রোসমাতে গিয়ে কাড়ুয়াকে খবর দিয়ে বললো

যে আগামীকাল আমরা গিয়ে না পৌঁছনো পর্যন্ত যেন কোসমার একজন লোকও বীটিং-এ না সামিল হয়।

এই ঘটনা ষাটের দশকের শেষের দিকের। তখন গোপালই বলতে গেলে কোসমার রাজা। সমস্ত গ্রামের মানুষেরা গোপালের কথাতেই ওঠে বসে। সেও কম করে না তাদের জন্যে। শীতে কম্বল আর গরম জামা দেওয়া থেকে আরম্ভ করে সারা বছর জামাকাপড় ওষুধ-বিসুধ সব কিছুই দেয় ওদের। তা ছাড়া জিনিস দেওয়াটাই বড় কথা নয়। ভালোও বাসে অন্তর থেকে। গোপালের জন্যে কোসমাতে আমার খাতিরও কম নয়।

পরদিন ঢিলেমি করে ব্রেকফাস্ট করে আমি, গোপাল আর গোপালের বন্ধু বিশু যখন বিশুর জিপ নিয়ে কোসমাতে গিয়ে পৌঁছলাম তখন প্রায় এগারোটা বাজে। এই বিশুও গোপালের একজন সাগরেদ। সে এতো জোরে জিপ চালায় এবং বিশেষ করে আমি যদি সে জিপে থাকি, তা হলে বুকে ব্যথা ধরে। ইসকিমিয়া অ্যানজাইনা এই রকম নানা কারণেই হয়েছে। কোসমাতে পৌঁছে দেখি প্রভাত, রবি আর চাঁদু একটি গাছতলায় বসে আছে গালে হাত দিয়ে আর কাড়ুয়া আর তার দলবল গোপালভক্ত হনুমানের দলের মতো বসে আছে তাদের সামনে।

গোপাল বললো কি রে? তোরা কটায় এসেছিস?

প্রভাত বললো পাঁচটায়।

তা বীটিং করলি না কেন?

প্রভাত হেসে বললো, গুরু, মানছি। এবারে শুরু করো। অনেক বদলা নিয়েছো।

এই ছিল প্রভাত দাশ। খেলাধুলো, শিকার, অভিযাত্রা করলেই যে সকলে কিছু স্পোর্টসম্যান হয়ে যায়, এমন নয়। প্রভাত ছিল জাত-স্পোর্টসম্যান। যে স্পোর্টসম্যানের অন্তর নির্মল নয় তার খেলাধুলো করাই বৃথা।

প্রভাতের পাশে আমার জায়গা পড়েছিল। বীটিং-এ। বনের মধ্যে গাছতলায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি পঞ্চাশ গজ মতো ছেড়ে ছেড়ে। হাঁকাওয়ালাদের আওয়াজে মুরগী তিতির কালিতিতির এবং বটেরও উড়ছে ভর্‌রর্‌-র-র-র অথবা ফর্‌র্‌র-র-র অথবা সাঁই সাঁই আওয়াজ করে আর সঙ্গে সঙ্গে রবি অথবা চাঁদু অথবা গোপাল সংক্ষিপ্ত চিৎকার করছে 'ব্যর্ড"। প্রভাতের বন্দুকের কুঁদো ডান উরুর উপরিভাগে লাগানো আছে। ডান হাত স্মল অফ দ্যা বাট্-এ আর বাঁ হাত রয়েছে লক আর ব্যারেলের ওপরে। কোনো উড়ন্ত কিছুরই সাধ্য নেই যে,(ইউ ইনফ্লু ইনক্লুডেড)প্রভাতের বন্দুকের ছররার হাত থেকে বাঁচে। দুম্ করে আওয়াজ হয় আর ধপ্ করে পাখি পড়ে। নাজিমসাহেবের ভাষায় যাকে বলে "গোলি অন্দর— জান বাহার।" অনেক শিকারী দেখেছি, প্রভাতের মতো ফ্লাইং-এর হাত খুব কম শিকারিরই ছিল যে, তা বলতে পারি জোর গলায়।

গোপাল এবং আমার বাবারও ফ্লাইং-এর হাত খুব ভালো ছিল। কিন্তু প্রভাতের সঙ্গে তুলনীয় নয়। অবশ্য হবেই বা কোথা থেকে? পনেরো টাকা দামের বন্দুকের গুলি প্রতি মাসে কম করে হাজারখানেক করে ছুঁড়তো প্রভাত এবং তার ভাইয়েরা প্রত্যেকেই। হাত ভালো করতে হলে জেদ যেমন লাগে তেমন 'রেস্তোও' লাগে।

হাজারীবাগে থাকাকালীন প্রভাতের প্রাতঃকালীন ব্যায়াম ছিল কাঠ-চেরাই। প্রায় এক মণ কাঠ সে নিজেই কুড়ুল দিয়ে রান্নার জন্যে চিরতো। কলকাতার রাইফেল ক্লাবে (গান ক্লাবে নয়) তার আরেক খেলা ছিল গাড়ির পেছন ধরে গাড়িকে তুলে ধরা। ফিয়াট, অ্যাম্বাসাডর, এবং অন্যান্য ঐ সাইজের গাড়িকে ও একাই তুলে ধরতো। যেমন লম্বা চওড়া

BanglaBook.org

চেহারা ছিল তেমন শক্তি ধরতো শরীরে। তার নির্মল মুখের হাসিখানি এখনও চোখে লেগে আছে যেন।

হাজারীবাগে একদিন ঐরকম কাঠ চিরছে প্রভাত সকালবেলা, এমন সময় ওর বড়দার বন্ধুরা গাড়ি করে ওদের বাড়িতে আসছিলেন। একেবারে বাড়ির গেটের সামনেই কাদাতে গাড়ির চাকা তো বসে গেল। বর্ষাকাল। তাঁরা প্রভাতকে ভাবলেন মালি বা কাজের লোক। নইলে কি আর বাগানে দাঁড়িয়ে রোদ-বৃষ্টির মধ্যে কাঠ চেরে কুড়ুল দিয়ে? তাঁরা বললেন, মালি, ভাই একটু হাত লাগাও তো আমাদের সঙ্গে। গাড়িটা উঠছে না।

প্রভাত বললো, আপনারা ছাড়ুন, আমি একাই পারব তুলে দিতে। বলেই গাড়িটাকে উঁচু করে তুলে ধরে গাড়ির পেছনের চাকা দুটিকে দেখেশুনে শুকনো জায়গা দেখে নামিয়ে দিল।

গাড়ির ডিফারেন্সিয়াল থাকে পেছনে। পেছনের চাকাই আসলে ঘোরে, সামনের চাকা গড়িয়ে চলে। তাই পেছনের চাকা দুটিই আসল। অবশ্য ফোর-হুইল ড্রাইভ গাড়ির কথা আলাদা। প্রভাতের বড়দার বন্ধুরা গাড়ি কাদা থেকে ওঠানো গেল বলে ভারী খুশি। বহুত খুশি হয়ে পাঁচটি টাকা দিয়ে প্রভাতকে বললো, "এই নাও মালি, মিস্টি খেও। প্রভাত তাঁদের লম্বা সেলাম ঠুকে টাকাটা নিলো। পরে ব্যাপারটি যখন জানাজানি হলো, তখন ওঁরা লজ্জায় মরেন এবং টাকাও ফেরত চান। প্রভাত টাকা ফেরত দেয়নি। বলেছিলো, মাথা খারাপ! এ আমার মেহনতের কামাই। এ টাকা কি দিতে পারি?

BanglaBook.org

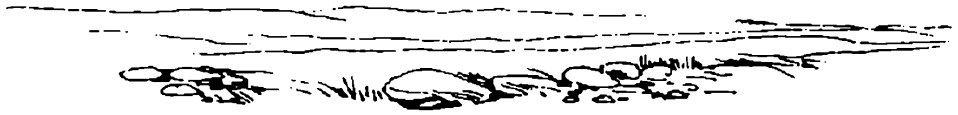

হাজারীবাগের দিনগুলির কথা ভাবলে মন সত্যিই বড় খারাপ হয়ে যায়। আজকে পূর্বাচলের মাসিমা ও মেসোমশাই নেই। সুব্রতর বাবাও নেই। মাসিমাও অসুস্থ। ইজাহার নেই। প্রভাত নেই, যদিও আমাদের চেয়ে ও অনেকই ছোট। হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে বহুদিন আগে সে চলে গেছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা নাজিমসাহেবও নেই। নাজিমসাহেবহীন হাজারীবাগের কথা ভাবতেও কষ্ট হয়।

কাড়ুয়ার ছেলে রত্নাকে সুব্রত গোমিয়াতে ভালো একটি চাকরি করে দিয়েছিল। কাড়ুয়া বুড়ো হয়ে গেলেও এখনও আছে, কিন্তু রত্না নেই। এ ব্যাপারে আগে পরের কোনো ব্যাপার নেই। অসোয়াও নাকি নেই বলে শুনলাম। আমাদের কত দিন-রাতের সুখ ও বিপদের সাথী এরা। জঙ্গলে যে দোস্তি হয় এবং হয়েছে তা শহরে কোনোদিনও হবে না কারও সঙ্গেই।

রাঁচীতে কাজে গেছিলাম। তার আগে শুনেছিলাম, ভুতোর ও গোপালের কাছে যে, নাজিমসাহেব খুবই অসুস্থ। তাই রাঁচী থেকে একটি গাড়ি যোগাড় করে হাজারীবাগে গেছিলাম নাজিমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। এত শত বার তাঁর বাড়িতে গেছি, বিবি মেয়েদের এতো গল্প শুনেছি কিন্তু কোনোদিনও অন্দরমহলে ঢোকা হয়নি। মানা ছিল। কিন্তু সেদিন অন্ধকার অন্দরমহলের বারান্দা দিয়ে গিয়ে একটি আলোকিত নিভৃত ঘরে নাজিমসাহেবের সঙ্গে দেখা হলো দোতলাতে। নাজিমসাহেবের নতুন বাড়িতে। চলচ্ছক্তিহীন, পঙ্গু। আমাকে দেখে দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। আমার চোখও জলে ভিজে এলো। আমি বললাম, শিগগির ভালো হয়ে উঠুন। আবার আমরা কোসমাতে যাব। আপনার হাতের উপাদেয় খিচুড়ি আর আলুর ভাত্তা খাবো। মজা করব, হাসব। ভালো হয়ে উঠুন।

কথাগুলি বলতে বলতেই আমার মন বলছিলো মিথ্যে কথা বলছি। সেই সব দিন তো আর ফিরে আসবেই না এও যেমন ঠিক, নাজিমসাহেবও আর ভালো হবেন না এও ঠিক। আমিও তো আর আগের সেই আমি নেই। আর অমন করে হাসতেই পারবো না। শহরের জীবন, তার বক্রতা, তার জনসংখ্যার চাপ, চেনাজানা তথাকথিত "মহৎ" মানুষদের, "গুণী" মানুষদের চরিত্রর আসল রূপের কদর্যতা আমাকে বড় ব্যথিত, ক্লান্ত, বিরক্ত করে দিয়েছে। এবং জঙ্গলের জীবন থেকে, বন্ধুদের থেকে সরে আসাতে আমি নষ্ট হয়ে গেছি। হাজারীবাগের দিনগুলি পুরোটাই অতীতে পর্যবসিত হয়ে গেছে। এর চেয়ে বড় ও নিষ্ঠুর সত্য আর নেই।

মাইলের পর মাইল হাঁটার পর ক্লান্ত ঘর্মাক্ত আমাদের কত গ্রীষ্মের রাত কেটেছে জঙ্গলের মধ্যে নদীর বালিতে পাশাপাশি রাইফেল-বন্দুক পাশে রেখে শুয়ে। কত রকম ভয় ছিল।

সাপের, বাঘের, ডাকাতের। কোনো কিছুই গ্রাহ্য করিনি। কত প্রচণ্ড শীতের রাত কেটেছে পথে বা বনে জিপ খারাপ হয়ে গিয়ে। অথবা কেটেছে শিকারের নড়বড়ে আস্তানাতে আগুনের পাশে গোল হয়ে বসে। কত সামান্য রসিকতাতে হাসতে পারতাম সেই সব দিনে। কত সহজে সুখী হতে পারতাম। বোঝা বলতে যেদিন কিছুমাত্রই ছিল না, না বয়সের, না কর্তব্যের, না অর্থের, না যশের। ছিল শুধু ভবিষ্যতের কল্পনা। আর আজ ?

ভবিষ্যৎ মুছে গেছে। বর্তমানের বাঘবন্দীর ঘরে হেঁটে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ভবিষ্যৎ। তারপর বর্তমানের চাঁদোয়া ছেড়ে আবারও হেঁটে গেছে অতীতের বাঘবন্দীর ঘরে। এখন স্মৃতিচারণ করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করার নেই। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই। ক্রমশই জীবন, এই জীবন, অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন হয়ে উঠছে।

শিকার ও বনবিহার আমার জীবনের সমগ্র আঙ্গিকের একটি অঙ্গমাত্র ছিল। কিন্তু বড় পুরুষালী, হা হা হাসি, খুশি-করা অঙ্গ ছিল তা। সেই ফেলে আসা জীবনকে বড় ঈর্ষা করি। আজ।

গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডে গাড়ি চালানোও তখন কত আনন্দের ব্যাপার ছিলো। বাগোদর থেকে বাঁ দিকে ঘুরে যখন হাজারীবাগের মোড় নিতাম তখুনি মন আনন্দে নেচে উঠতো। হাজারীবাগ থেকে রাঁচী যাওয়াও ছিল এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। সব জায়গাতেই জঙ্গল কত গভীর ছিল, মানুষজন কত কম ছিল, কত শান্তি ছিল বনে ও মনে। টুটিলাওয়া সীমারীয়া বাঘড়ামোড় হয়ে চাঁদোয়াটোড়ি হয়ে হাজারীবাগ থেকে যখন ডাল্টনগঞ্জ যেতাম, সঙ্গে হান্নানের দোকানের কাবাব-পরোটা নিয়ে, নিজে গাড়ি চালিয়ে একা একা ভাবতে ভাবতে, কোনো শীতের আমেজ ভরা সকালে, তখন আনন্দে "দিলখুশ" হয়ে যেতো।

আজকে যে কোনো পথেই দশ মাইল গাড়ি চালাতেও ইচ্ছে করে না, ট্রেনে চড়তে নয়, বাসে চড়তে নয়। প্লেনে তো নয়ই।

আমাদের চেনাজানা ভালোবাসার পৃথিবী বড় দ্রুত বদলে গেছে বদলে যাচ্ছে। এবং এর জন্যে দায়ী অবশ্য আমরাই।

BanglaBook.org

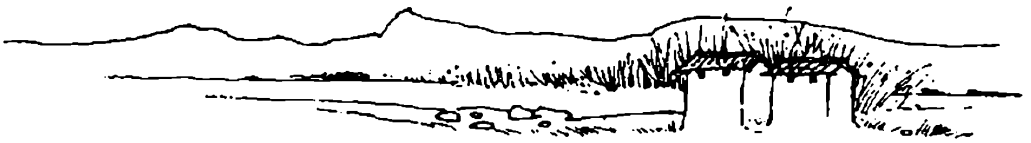

মনে পড়ে গেলো, গোপাল আর আমি একবার নাজিমসাহেবের সঙ্গে সিজুয়াহারা পাহাড়ে গেছিলাম সরজু-শহর ভাণ্ডারে। হাজারীবাগ থেকে বাসে চাত্‌রা হয়ে তো সন্ধের আগে আগে গিয়ে পৌঁছলাম জৌরীতে। সেখানে নাজিমসাহেবের বন্ধু চাতরার সফর আলির এক রিস্তেদার ছিলেন। মৌলবী। একটি এক কামরা মাদ্রাসাতে আমাদের রাত কাটাবার বন্দোবস্ত হলো। মাদ্রাসা বন্ধ ছিলো তখন। মাটির ঘর। তাতে একটি মাত্র দরজা। জানালা ছিলো কিনা, মনে নেই। থাকলেও শীতের প্রকোপে নিশ্ছিদ্র করে তা বন্ধ করা ছিলো। মাটির মেঝেতে কয়েক গাদা খড় এনে বিছিয়ে দেওয়া হলো বিশেষ খাতিরদারির চিহ্ন হিসেবে। খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত হলো মৌলবীর বাড়িতেই। বাড়ির বাইরের ঘরের চৌকির উপরে সাদা চাদর পেতে মৌলবীসাহেব তাঁর আরও কয়েকজন বন্ধু বান্ধব এবং নাজিমসাহেবের সঙ্গে আমরা দুজনেও গোল হয়ে আসন পিঁড়ি করে বসলাম। কেউ বা বসলেন নামাজ পড়ার ভঙ্গিতে। একপাশে তাক করে রাখা বাজরার আঙুলপ্রমাণ মোটা গোটা ত্রিশেক রুটি। মধ্যে বিরাট রঙিন কলাই-করা নানারঙা ফুলের কাজ করা পাত্রে মোরগার ঝোল। ঝোলের পরিমাণ অথৈ, মাংসর পরিমাণ সে তুলনাতে কম। সকলে বাজরার রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে সেই পাত্রে কব্জি ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেতে লাগলাম। আজও সেই বাজরার রুটি হজম হয়নি। বত্রিশ বছর পরও পেটে হাত দিলে সে রুটি কোথায় টিউমারের মতো দরকচ্চা মেরে বসে আছে, তা টের পাই।

মুসলমানদের এই জিনিসটি বড় ভালো লাগে আমার। এই জাতে সত্যিই কোনো বর্ণ-বিদ্বেষ নেই। সবাই সমান। কী ঈদের নামাজে, কী দৈনন্দিন খাওয়া-দাওয়ায়। দোস্তি আর বিরাদরীর ইজ্জৎ দিতে মুসলমানেরা যেমন জানেন পৃথিবীর আর কোনো জাতই তেমন জানেন না। এই ব্যাপারটি অন্য সমস্ত ধর্মাবলম্বীদেরই শেখার। এঁদের এই প্রকৃত সমাজতন্ত্র ও সকলকে একীকরণের প্রক্রিয়াটি আমাকে চিরদিনই চমৎকৃত করেছে।

খাওয়া তো হলো। আকাশে চৌধুরি কা চাঁদ। ঠাণ্ডায় হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে নাজিম মিঞার সঙ্গে আমরা তো গিয়ে মাদ্রাসাতে সেঁধোলাম। শুধু জুতোটি খুলে রেখে জামাকাপড় পরেই খড়ের উপরে নিজেদের একটি করে কম্বল বিছিয়ে এবং অন্যটি গায়ে দিয়ে শুয়েও পড়লাম।

পায়ের কাছে প্রায়-অস্তমিত কালি-পড়া একটি লণ্ঠন। একটু পরেই চিক-ছিক্ শব্দ করে দেড়হাত প্রমাণ অগণ্য ছুঁচো আমাদের বডির উপর ক্রমাগত বডিথ্রো দিতে লাগলো। আমাদের তো চক্ষুস্থির। এমন ডেয়ার ডেভিল ছুঁচো কস্মিনকালেও দেখিনি।

গোপাল বললো "শিকার ক্যা খেলেগা, খুদই শিকার বন্ যায়েগা আজহি রাতমে!"

নাজিম সাহেব বললেন, হাঁ। ছওড়াপুত্তান। ইয়ে বড়ী খতরনাগ্ জানোয়ার হ্যায়।

আদমীকা বদনমে সবসে যো নরম জাগে হ্যায় ওহি পহিলে কাট লেতা উঙ্গুলোগ।

আমি নাকের উপর কম্বল টেনে শুধোলাম, নাক ?

"নারে ছঁওড়াপুত্তান ! নাকসেভি নরম জাগে হোতা কি নেহি মর্দকি বদনমে ?"

আমরা চিন্তায় পড়লাম। কী সে নরম স্থান যা নাকের চেয়েও নরম ?

খিক্-খিক করে হেসে নাজিমসাহেব বললেন "আপলোগোঁকি বিয়া-শাদি ভি নেই হো চুকে হেঁ। ইস্ওয়াক্ত ওহি চিজ কাট লেতা তো দুনিয়াকি কোই ভি দুকানমে স্পেয়ার-পার্টস ভি নেহি না মিলেগা !"

বক্তব্যের সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করে তো আমাদের বাকরোধ হয়ে গেলো। নাক খোলা রেখেই হিজ-হিজ হুজ-হুজ নরমস্য নরম স্থানটিকে দু হাতের পাতা দিয়ে সযতনে আড়াল করে রেখে আমরা ঘুমের বৃথা চেষ্টা করে যেতে লাগলাম।

বোধহয় শেষ রাতে ঘুমিয়ে থাকব। গভীর ঘুম যখন, তখন নাজিমসাহেবের ডাক শুনে আমাদের সাধের ঘুম ভাঙলো। নাজিমসাহেবের ডাকেরও এক আশ্চর্য মহিমা ছিলো। তাঁর গলা ছিলো স্টিমারের ভোঁ বা যান্ত্রিক কোনো আওয়াজেরই মতো একসুরে বাঁধা। উদারা মুদারা তারার কোনো ভূমিকা ছিলো না তাতে। একই স্কেলে একই সুরে সহস্রবার কেষ্টনাম জপ করার মতো তিনি বলে চলতেন লালাবাবু, লালাবাবু। গোপালবাবু,গোপালবাবু। সুব্রত থাকলে সুব্রতকে ডাকতেন খোকাবাবু বলে। যতক্ষণ না, ঘুম ছেড়ে আমরা উঠে বসছি ততক্ষণ ঐ ডাক অনবরত চলতে থাকতো।

উঠে বসে দেখি, নাজিমসাহেব তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতায় এবং এই অনুজদের প্রতি অসীম স্নেহে মাদ্রাসার এক কোণে ইঁটের উনুন করে কাঠ ধরিয়ে একটি ডেকচিতে মুখ ধোওয়ার জন্যে গরম জল এবং একটি কেটলিতে চায়ের জল চাপিয়েছেন। কখন উঠে যে এইসব ইন্তেজাম তিনি করলেন, আমাদের জানা ছিলো না।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখি পথের ধুলো ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে গেছে। দূর পাহাড়ের মাথার কাছে চৌধুরি কা চাঁদ ঝুলে আছে, সে রাতে অস্তমিত হয়ে আগামীকাল পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে ফিরে আসবে বলে। মাদ্রাসার সামনেই একটি বয়েল গাড়ি। বলদ দুটি রাস্তার অপরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে জড়ো করে রাখা খড় খাচ্ছে। আর গাড়োয়ান ছোট্ট একটু আগুন করে সেই আগুনে তার পশ্চাৎদেশ প্রায় ঠেকিয়ে বসে নিজেকে গরম করার বৃথা চেষ্টা করছে।

মুখ ধুয়ে এক কাপ করে চা খেয়ে বয়েল গাড়ি জুড়ে নিয়ে আমরা নিজ নিজ হাতিয়ার কাঁধে নিয়ে উঠে বসলাম গাড়িতে। সূর্য উঠতে,এমনকি পুবের আকাশে আলো ফুটতে তখনও ঘণ্টা দেড়েক বাকি। তাড়াতাড়ি না পৌঁছতে পারলে সুরজ যে হাঁকোয়া শিকারের বন্দোবস্ত করেছে আমাদের জন্যে নিজুয়া-হারার উপত্যকাতে, তার পুরো ফায়দা ওঠানো যাবে না। রোদ চড়ে গেলে হাঁকোয়াতে জানোয়ার তেমন বেরোয় না। জাঁম আর ইলাজান নদীর জল ততক্ষণে জমে বরফ হয়ে গেছে। ফ্রিজ খুললে যেমন ধোঁয়া বেরোয় তেমনই ধোঁয়া বেরুছে নদী দিয়ে। বলদদুটোর পা বুঝি জমে গেল !

তবে অত কষ্ট করা সফল হয়েছিলো সেবারে, কারণ শিকারের কোনো কমতি ছিলো না। কী বিগ গেম আর কী স্মল গেম।

বড় বাঘের কপাল আমার আর গোপালের বিশেষ সুবিধার ছিলো না। পরবর্তী জীবনে আমার নিজের আয়োজিত 'শুট'-এই চারবার বড় বাঘ মেহমানদের অফার করে নিজের পৈতৃক প্রাণটি কোনোক্রমে বাঁচিয়ে ফিরে এসেছিলাম। সে সব ঘটনার কথা অন্যত্র

BanglaBook.org

বলেছি। এবং বলব

সুব্রত সেদিক দিয়ে ছিলো পয়মন্ত। নাজিমসাহেবের খুদাহব হরওয়াক্ত দোয়া ছিলো ওর উপরে। "টাইগার-ক্লাক" বলে শিকারীমহলে একটি কথা চালু আছে। সকলেই তা নিয়ে জন্মায় না। সুব্রতর প্রথম বাঘের কথা বলেছি। সীতাগড়ার মানুষখেকো, রেকর্ড সাইজের। সুব্রত যখন ঐ বাঘ মারে তখন সুব্রতর নিজস্ব বন্দুক পর্যন্ত ছিলো না। পাখিটাখিও মারেনি বিশেষ। বিগ-গেম তো দূরস্থান। প্রথমেই অ্যাকাউন্ট ওপেন করলো ম্যান-ইটার বাঘ দিয়ে মেসোমশাই-এর ফোর-নট-ফাইভ আন্ডার-লিভার উইনচেস্টার রাইফেল দিয়ে। ঐ মডেলের অ্যামেরিকান উইনচেস্টার রাইফেল বড়ই ভজঘট যন্ত্র ছিলো। প্রতিবার গুলি রি-লোড করার সময় ঘ্যাচা-ঘ্যাং করে এমনই শব্দ হতো যে আধমাইল দূরের জানোয়ারেরাও পগার পার হয়ে যেতো। আর বাঘের মতো সাংঘাতিক জানোয়ারকে ঐ রাইফেলে রিপিট-শট্ করাতো অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিলো। বাঘ সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ শুনে শিকারীর অবস্থান পিন-পয়েন্ট করতে পারতো। অবশ্য সীতাগড়ের বাঘ মেরেছিলো সুব্রত মাচাতে বসে এবং সঙ্গে সেকেন্ড গানও ছিলো ; ইজাহার। তবু বাঘকে যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন যে বাঘ কী !

কিন্তু কিছু গুলিখোর বাঘ থাকে যারা বিশেষ বিশেষ শিকারীর হাতে না মরতে পেলে যে তাদের নির্ঘাৎ নরকবাস হবে সে বিষয়ে তাদের কোনোরকম সন্দেহই থাকতো না ! সেই রকম একটি বাঘের কথা বলি। সুব্রত তখন গোমিয়াতে। চাকরিতে অনেক উন্নতি করেছে। গোমিয়াতে রাইফেল-ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছে। মানুষখেকো বাঘ মারা শিকারি হিসেবে ইংরেজ সাহেবদের কাছে সুনামও কিনেছে। কাজের কারণে তো কিনেছেই। তখনও ফেরা আইন হয়নি তাই ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস্-এর বড় সাহেবরা তখনও ইংরেজ।

এক্সপ্লোসিভস্-এর কারখানা অনেক পরিকল্পনা করে বানাতে হয়। দুর্ঘটনা ঘটলে তার জের যাতে পুরো কারখানায় না আসে, তাই প্রত্যেকটি ইউনিট আলাদা আলাদা এবং যেখানেই সম্ভব সেখানেই একটি ইউনিট আর অন্যটির মধ্যে একটি টিলার ব্যবধান রাখা হয়েছিলো গোমিয়াতে। ফলে মজুরদের এবং অফিসারদেরও বিস্তর হাঁটাহাঁটি করতে হতো।

একরাতে একজন মজুর গোমিয়ার ফ্যাকটরির এক ইউনিট থেকে অন্য ইউনিটে হেঁটে যাচ্ছে, এমন সময় তার মনে হলো যে সে একটি বড় বাঘকে সরে যেতে দেখলো। এদিকে পুরো কারখানা প্রায় পনেরো ফিট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। তার উপরে কাঁটা তার লাগানো। একটিই গেট। এবং তাতে সবসময় গার্ড, দারোয়ান, টাইম-কিপারেরা মজুদ। বড় বড় মার্কারিভেপার ল্যাম্প জ্বলে কারখানার গেটে এবং চৌহদ্দীর সর্বত্র।

ফোরম্যানকে মজুর ঐ কথা বলাতে ধমক খেলো খুব। ফোরম্যান বললেন, খুব মহুয়া টেনেছো বুঝি ? মজাকি করার জায়গা পাওনি ? ফ্যাক্টরির দেওয়ালের মধ্যে বাঘ !

দিন দুতিন পরে পরে একজন ফোরম্যান হেঁটে যাচ্ছেন রাতের বেলা, তাঁরও যেন মনে হলো বাঘের মতো কী একটা জানোয়ার চলে গেলো। তিনি সে কথা অন্যদের বলতে তাঁরা তো হেসেই বাঁচেন না। বললেন, নতুন বিয়ে করেছিস তো ! দিনে রাতে কখনও ঘুম নেই, সর্বসময় বউ—আবিষ্কারে ব্যস্ত। এ সব তোর হ্যালুসিনেশন !

কিন্তু তারপরও বিভিন্ন মজদুর এবং ফোরম্যানেরা বাঘের মতো কোনো জানোয়ারকে রাতের বেলা দেখেছেন বলে রিপোর্ট করতে লাগলেন। সকলেই মহুয়া খাননি। সকলেই নতুন-বউ আবিষ্কারে মত্ত নন। অতএব উপর মহলে রিপোর্ট গেলো। ভারী মীটিং বসলো। এবং বড়সাহেবরা সুব্রত চ্যাটার্জির উপর ভার দিলেন বাঘ কিংবা ভূত কিংবা যাই হোক, তার

BanglaBook.org

মোকাবিলা করতে। বাঘ যে নয়, সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ ছিলেন। কারণ ফ্যাক্টরির ঐ দেওয়াল ডিঙিয়ে কোনো বাঘের পক্ষে ভিতরে ঢোকা অসম্ভব ছিলো। তাছাড়া, মরতে কোনো বাঘ যেখানে ডিনামাইট তৈরি হয় সেখানে খামোখা ঢুকতেই বা যাবে কেন ? মানুষ যদি খেতো তো অন্য কথা। তার স্বাভাবিক খাদ্যর মধ্যে যা কিছু পড়ে, তেমন কোনো জানোয়ারই ছিলো না কারখানার ভিতরে। টিলাব ঝাঁটি-জঙ্গলে কিছু বটের তিতির খরগোস হয়তো ছিলো কিন্তু তাতো বাঘের খাদ্য নয়। গৃহপালিত ঘোড়া, গাধা বা গরু-ছাগলও ঐ এলাকাতে একটিও ছিলো না, তাহলে বাঘ কোন্ আক্কেলে ঢুকতে যাবে সেখানে ? আর যদি ভুল করে ঐ উঁচু পাঁচিল টপকে ঐশ্বরিক প্রক্রিয়ায় ঢুকেও পড়ে থাকে, তাহলে এতোদিনে ঐ একই প্রক্রিয়াতে তার বেরিয়ে যাওয়ারও কথা ছিলো।

সুব্রতকে বলা হলো, কাজ কর্ম করতে হবে না। সারা দিন ঘুমোন। সন্ধেবেলা কারখানার মধ্যে ঘুরে দেখতে হবে ব্যাপারখানা কি ? সুব্রত হাজারীবাগ থেকে নাজিম মিঞাকে আনিয়ে নিলো স্পট লাইট সমেত। কোম্পানি জিপ দিলো। কিন্তু হলে কী হয়, এক্সপ্লোসিভস্ ফ্যাক্টরির মধ্যে রাইফেল চালানোও সহজ কথা নয়। যে-কোনো মুহূর্তেই দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। যে, কারখানার ঘোঁৎ-ঘাঁৎ না জানে, সে শিকারীর পক্ষে গুলি চালানো সম্ভবও ছিলো না ! আমাদের খবর না দেওয়ার সেটাই আসল কারণ। ও নিজে কারখানার প্ল্যান এবং ঘোঁৎ-ঘাৎ সব জানতো বলেই একমাত্র ওর পক্ষেই ঐ অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজটি করা সম্ভব ছিলো। দু'রাত্তির নাজিমসাহেব, সুব্রত আর জিপের ড্রাইভার ফ্যাক্টরির পুরো এলাকা চষে ফেললো। কিন্তু কোথায় বাঘ।

মজুরেরা বলতে লাগলো কোনো 'দারহা' কী "কিচিং" ভূত বাঘের রূপ ধরে তাদের ভয় দেখাচ্ছে।

কিন্তু হলে কী হয়, বাঘের এবং সুব্রতর কুষ্ঠি ঠিকুজিতে যা লেখা ছিলো তা অবশ্যই ঘটিতব্য। একরাতে বাঘের সঙ্গে সুব্রতর দেখা হয়ে গেলো। সত্যিই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ! তবে বেচারা না খেতে পেয়ে একেবারে মন্বন্তরের ভিখারির মতো বুক-পিঠ এক করে ফেলেছিলো। সুব্রত তাব নতুন কেনা রাইফেলের একটি গুলিতেই সে ব্যাটা কুলাঙ্গার ডিনামাইট-ভক্ত বাঘের ইহলীলা শেষ করে দিলো। এবং এই খবরটি পর্যন্ত আমাদের জানালো না।

ওকে চিঠি লিখেছিলাম, "বহুদিন তোমার কোনো খবর নেই। খবরাখবর জানাও।"

উত্তরে ও লিখলো "খবর ভালো। দুটি খবর দেওয়ার আছে। **এক নম্বর** আমার গতমাসে একটি মেয়ে হয়েছে। (মেয়ে বানানো যে শুরু করেছে সে খবরও চেপে রেখেছিলো এতোমাস) **দু নম্বর** একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মেরেছি সাতদিন আগে।

এই হচ্ছে কম কথা বলা, মিটি-মিটি-হাসির কর্মবীর বন্ধু আমাদের।

একটা ব্যাপারে সুব্রত আর গোপালের মধ্যে খুব মিল ছিলো। দুজনেই এরা নম্বরী তিড়িবাজ। কে যে কার চেয়ে বড় তিড়িবাজ সে সম্বন্ধে আজও আমি নিঃসন্দেহ নই। হাসতে হাসতে, চোখের পাতা একবারও না ফেলে, মুখের ভাবের বিন্দুমাত্র তারতম্য না ঘটিয়ে, এরা দুজনেই যে কী পরিমাণ নির্দোষ মিথ্যা কথা ও প্র্যাকটিকাল জোক করতে পারে, তা স্বচক্ষে না দেখলে এবং স্বকর্ণে না শুনলে বিশ্বাস হবে না। এদের দুজনেরই নাম এই ক্ষেত্রে গীনেস বুক অফ রেকর্ডস-এ ওঠার যোগ্যতা রাখে।

সুব্রতর আমন্ত্রণে একবার বাবা ও বাগচীবাবুকে (গোপেন্দ্রকিশোর বাগচী) নিয়ে সজনীর জঙ্গলে শিকারে গেছিলাম। সীমারীয়ার ডাক বাংলোতে রাত কাটানো হয়েছিলো। তখনও

BanglaBook.org

পাহাড়ের উপরের ফরেস্ট-বাংলোটি হয়নি। সাতসকালে সীমারীয়া থেকে সজনীতে রওয়ানা হওয়া হয়েছিলো জিপে। মুখ্যত বাঁশ এবং অন্যান্য জঙ্গল পেরিয়ে গোটা পঞ্চাশেক ছোট ছোট পাহাড় নেমে ও উঠে সজনীতে পৌঁছনো হয়েছিলো। ডিসেম্বর বা জানুয়ারি মাস ছিলো। ঠিক মনে নেই। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ছিলো যে, তা মনে আছে। শিকার কিছুই হয়নি সেবারে। উল্টে বদ্ধ-জলাশয়ের জল খেয়ে কলকাতায় ফিরে বাবা ও বাগচীবাবু দুজনেই ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় পড়লেন। বাবার স্বাস্থ্য তার পরে খুবই খারাপ হয়ে গেল।

হাজারীবাগে সত্তরের দশকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বন্য জানোয়ারে নিয়ে যেতে লাগলো। সবসুদ্ধ শতাধিক ছেলেমেয়ে তাদের কবলিত হয়েছিলো। কোন জানোয়ারে তাদের নিচ্ছে তা নিয়েও ধন্ধ দেখা দিলো। গোপাল একদিন ফোন করে বললো, কাল ভোরে হাজারীবাগে যাচ্ছি, ম্যান-ইটিং-লেপার্ড বেরিয়েছে। যত তাড়াতাড়ি পারো, চলে এসো। নামী ফোটোগ্রাফার তারাপদ রায়ও গোপালের ঘনিষ্ঠ ছিলো। তারাপদরও যাওয়ার কথা ছিলো। তারাপদও ভালো শিকারী।

কিন্তু এও যে গোপালের আরেক তিড়ি তা বুঝলাম যখন মে মাসের প্রচণ্ড গরমে তার তিনচারদিন পরে এক সন্ধেতে গাড়িতে রওয়ানা হয়ে গাড়ি চালিয়ে হাজারীবাগে গিয়ে পৌঁছলাম। সঙ্গে ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া আর্মস্ কোম্পানির অনন্ত বিশ্বাস। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম, আসানসোলের এক হোটেলে ঘণ্টা চারেক ঘুমিয়ে, তখন গোপাল এবং বদীবাবু এবং তাঁর ছেলেরা এবং কলকাতা থেকে যাওয়া গোপালের বন্ধু আরও পাঁচ-ছজন শিকারী বীটিং শেষ করে ফিরে আসছে। বললো, লেপার্ড নয়, নেকড়ে।

আমার এখনও সন্দেহ যে লেপার্ড যে নয়, তা গোপাল আগেই জানতো। নেকড়ে মারার উৎসাহ আমার ছিলো না। তাছাড়া শিকার তো তখন ছেড়েই দিয়েছি। তিনদিন থেকে, তার মধ্যে একদিন কোসমাতে পিকনিক করে আবার ঐ গরমে গাড়ি চালিয়ে ফিরে এলাম। হাজারীবাগের টুটু ইমামের ছেলে বুলু ইমাম অবশ্য প্রচার করছিলেন যে, আসল অপরাধী নেকড়েরা নয়। লেপার্ডই। হাজারীবাগের তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অনুপ মুখার্জি, সুদর্শন, পাঞ্জাব প্রবাসী বাঙালি এবং অতি সুশ্রী স্ত্রীর স্বামী, আমাদের সকলকে তাঁর বাংলোয় চায়ের নেমন্তন্ন করে মীটিং করলেন, কী করে ম্যান-ইটিং বন্ধ করা যায়।

নেকড়ের একটি দল ছিলো। গোপাল বারংবার গিয়ে পরে একাধিক নেকড়ে মেরেও ছিলো। ঐ ভৌতিক অত্যাচার চলেছিলো বেশ কয়েকবছর। পূর্বাঞ্চলের সমস্ত কাগজেই এই মানুষ-খাওয়া নেকড়েদের নিয়ে লেখালেখি হয়েছিলো।

শেষবার হাজারীবাগে গেছিলাম নাজিমসাহেবকে দেখতে। আর পালামৌতে গেছিলাম বছর তিনেক আগে এপ্রিলমাসে সেই বারের অভিজ্ঞতা 'জংগলের জার্নাল'-এ লিখেছি।

নাজিমসাহেব শেষ জীবনে বড়লোক হয়েছিলেন। অ্যাম্বাসাডর গাড়ি কিনেছিলেন। বাজারের মধ্যে নিজের বাড়ি করেছিলেন। তারই একাংশে দোকান। তাঁর বড় ছেলে ওয়াজ্জু মহম্মদ একবার হাজারীবাগের মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানও হয়েছিলো।

সব মানুষের কাছ থেকেই শেখার অনেক কিছুই থাকে। যদি শেখার ইচ্ছা থাকে কারো। নাজিমসাহেবের কাছ থেকে অনেকই শিখেছি। তখন সবে "হাওয়াইন চপ্পল" বেরিয়েছে জুতোর বাজারে। নাজিমসাহেবের দোকানে একদিন সন্ধেবেলা বসে আছি, দেখি একজন দেহাতি লোক হাওয়াইন চপ্পল কিনতে ঢুকলো। নাজিমসাহেব অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে আধঘণ্টা কথা বলার পর তাকে একটি লোহার নাল বসানো নাগড়া জুতো গছালেন।

লোকটি চলে গেলে আমি শুধোলাম হাওয়াইন চপ্পলে কি মুনাফা কম ছিলো ?

তিনি বললেন, নাগড়া জোড়ার চেয়ে অনেকই বেশি ছিলো

"তবে নাগড়া বিক্রী করলেন যে।"

নাজিমসাহেব হেসে বললেন, খদ্দের, সে কি জানে তার কোন্ জিনিসের আসল প্রয়োজন ? এ লোকটি দেঁহাতে থাকে। বাস থেকে নেমে কাদাভরা পথে তাকে পাঁচ মাইল হেঁটে যেতে হবে বস্তিতে পৌঁছতে। হাওয়াইন চপ্পল কিনলে তা পথের কাদাতেই গেঁথে থাকতো আর বাড়ি গিয়ে সে গালাগালি দিতো নাজিম মিঞাকেই 'শালা নাজিম মিঞা' বলে। তাই যে জুতো সে দু'বছর পিটিয়ে পরবে এবং যা ছিঁড়ে গেলে আমারই দোকান থেকে আবারও জুতো কিনতে আসবে সেইরকম জুতোই তাকে দিলাম। 'গ্রাহক আকর্ মাঙ্গেগা আম ঔর উন্‌কো বেচেগা ইম্‌লি। এহিতো দুকানদারী হ্যায়।'

কথাটা সামান্য শোনাবে হয়তো, কিন্তু এই কথাই অনেক ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিট্যুটে শেখানো হয়।

বড়লোক হয়ে নাজিমসাহেব কখনও নিজের পুরোনো জীবনকে ভুলে যাননি। যখনি আমাদের কারো গাড়িতে বা জিপে বসে থাকতেন, তখনই রাতের বেলা উল্টো-দিক-থেকে আসা সাইক্লিস্টকে দেখলেই আমাদের বলতেন, বাত্তি ডিমার কিজিয়ে ! ডিমার কিজিয়ে। সাইকেল-আরোহীর চোখে ডিপার করা হেডলাইট পড়ে তার চোখ ধাঁধিয়ে দেবে এবং বেচারি খানাখন্দে পড়ে যাবে, সে জন্যেই বলতেন। নিজেও যে একদিন সাইকেল চালিয়েই যাওয়া-আসা করতেন, এ কথা কখনও ভুলে যাননি তিনি। বেশির ভাগ হঠাৎ-বড়লোক হওয়া মানুষই পুরনো কথা ভুলে যান। পয়সা আসার সঙ্গে সঙ্গে যে সব মানুষের মনুষ্যত্ব চলে যায় তারা মানুষ নয়।

মোহনের কাছেও শিখেছি অনেক। মাঝে মোহনের অবস্থার কিছু তারতম্য ঘটে। যে সব অগণ্য মানুষ মোহনের কাছে অশেষ ঋণী নানা কারণে, তারাও তখন তাকে অপমান করতে ছাড়েনি। হাতি কাদায় পড়লে ব্যাঙও লাথি মেরে যায়। মোহন কিন্তু তাদের একজনকেও কিছু বলেনি। ঐ সময়ে ও আমাকে একদিন বলেছিলো, দুঃখ করে ; "লালাদা, দুনিয়ার বেশির ভাগ মানুষই মানুষের দাম দেয় না।"

সুখ এবং দুঃখকে কি ভাবে সমানভাবে নিতে হয়, তা মোহনকে দেখে শিখেছি যদিও সে আমার চেয়ে বয়সে ছোট। কত বড় হৃদয় থাকলে নিঃস্বার্থভাবে অগণ্য মানুষের অসীম সেবা করার পরও তাদের দেওয়া অপমান গায়ে না-মাখা যায় তা মোহনকে দেখেই বুঝি। আমার মা বলতেন : কার জন্যে কবে কী করেছো, সে কথা মনে রেখো না, কার কাছ থেকে কী পেয়েছো তাই সবসময়, মনে করে রেখো। কারো বাড়ি এক গ্লাস জল খেলেও সে কথা ভুলো না।

মায়ের যোগ্য সন্তান হয়তো হতে পারিনি, তবু কথাটি মনে রাখার চেষ্টা করি।

নাজিমসাহেব, গোপাল, সুব্রত এবং মোহনের কাছে আমার অনেকই ঋণ। তার কিছুমাত্রই শুধতে পারিনি, ও পারবো না এই জীবনে।

যখনই পেছনে তাকাই, মনে হয় বেলা পড়ে আসছে। গাছের ছায়ারা দীর্ঘতর হচ্ছে। নীড়ে ফেরা পাখিদের দূরাগত কল-কাকলিতে কান ভরে ওঠে। সে দিনগুলি চলে গেছে, যে সখ্যের শরিক ছিলাম বহুজনের একদিন, তারাও অনেকেই চলে গেছে 'হ্যাপী হান্টিং গ্রাউন্ডস্'। যারা আছে, তারাও জীবন ও জীবিকার কারণে দূরে সরে গেছে। কলকাতার জঙ্গলে থেকে তাদের সঙ্গেই নমাসে-ছমাসে দেখা হয় বা কথা হয়।

BanglaBook.org

তবু, যখনি একটু সময় পাই, তখনই সেই সব দিনের হাসি ও আনন্দের স্মৃতি সন্ধ্যাতারার মতো স্নিগ্ধ দ্যুতিতে জ্বলজ্বল করে উঠে মনে ফিরে ফিরে আসে। টিটি পাখি, সিঁদুরে মাটি, কচিকলাপাতা-রঙা বসন্তের শালবন, পলাশ, শিমুল, অশোক আর ফুলদাওয়াই-এর লাল টাটিঝারিয়ার চা, চাত্‌রার সিঙাড়া ও পান্তুয়া, লাতেহারের কালাজামুন আর কালাকান্দ, চাহালচুঙরু আর টুটিলাওয়ার চাঁদ এবং শিকারের সাথীদের সান্নিধ্যর স্মৃতি মনকে এক বিধুর আশ্লেষে ভরে দেয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG